কিতাবুল ঈমান

শায়খুল হাদীস মুফতী

মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে তাওহীদ, ঈমান, ইসলাম ও মানব জীবনের অপরিহার্য বিষয়াবলীর উপর দলীল-প্রমাণ নির্ভর বক্তব্যের এক অদ্বিতীয় সংকলন

কিতাবুল ঈমান

শায়খুল হাদীস মুফতি
মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পরিচালক : মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ।
খতীব : মারকাজ জামে মসজিদ
মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা।
সাবেক মুহাদ্দিস : জামিয়া রাহমানিয়া আরাবিয়া, সাত মসজিদ মাদ্রাসা, মুহাম্মাদপুর, ঢাকা।
সাবেক শায়খুল হাদীস: জামিয়া ইসলামিয়া মাহমুদিয়া, বরিশাল।

আল হাদীদ পাবলিকেশন্স
মেট্রো হাউজিং, বছিলা রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।
মোবাইল: ০১৭১২১৪২৮৪৩, ০১৯১২৩৯৫১২৫

কিতাবুল ঈমান

শায়খুল হাদীস মুফতি
মুহাম্মদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

প্রকাশনায়
আল হাদীদ পাবলিকেশন্স
http://jumuarkhutba.wordpress.com
http://furqanmedia.wordpress.com

প্রথম প্রকাশ : আগষ্ট ২০১০ ইং
দ্বিতীয় প্রকাশ: মার্চ ২০১৩ ইং

মূল্য: ২৫০ (দুইশত পঞ্চাশ) টাকা মাত্র

Kitabul Eman
Shaikh Mufti Muhammad Jashimuddin Rahmani
Markajul Ulom Al-Islamia, Dhaka
Price : 250.00 Tk. US.$ 8.00

আমার শ্রদ্ধেয়/স্নেহের..কে
‘কিতাবুল ঈমান’ বইটি উপহার দিলাম ।

....
....
....
সাক্ষর ও তারিখ

আপনার সংগ্রহে রাখার মত লেখকের অন্যান্য কিতাবসমূহঃ

১) কিতাবুল ঈমান
২) কিতাবুল আক্বাঈদ
৩) কিতাবুস সাওম
৪) কিতাবুয যাকাত
৫) কিতাবুল হজ্জ
৬) তাওহীদের মূল শিক্ষা
৭) বাইআত ও সীরাতে মুস্তাকীম
৮) মরনের আগে ও পরে
৯) কিতাবুদ দুআ
১০) দ্বীন কায়েমের সঠিক পথ
১১) সিয়াম ও ঈদঃ বিশ্ব ব্যাপী একই তারিখে পালন করা সম্ভব কি?

সূচীপত্র

তৃতীয় অধ্যায়: 'ইমতেসালুল আওয়ামের'

চতুর্থ অধ্যায়: ইজতিনাবুন নাওয়াহী

ভূমিকা

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদাত করার জন্য। ইরশাদ হচ্ছে-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُون

'আমি জিন এবং মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।' (যারিয়াত, ৫১:৫৬)

আর ইবাদত করার পূর্বে প্রয়োজন হলো যার ইবাদত করবো তার সঠিক পরিচয় জানা এবং তাঁর পছন্দ মতো ইবাদত করা। এক্ষেত্রে তাঁর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক না করা। ইরশাদ হচ্ছে-

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

'সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে।' (কাহফ ১৮:১১০)

একারণেই ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য দু'টি শর্ত রয়েছে। **এক.** إِخْلَاصُ النِّيَّةِ (বিশুদ্ধ নিয়ত করা) **দুই.** إِتِّبَاعُ السُّنَّةِ (সুন্নাহর অনুসরণ)।

إِخْلَاصُ النِّيَّةِ বা নিয়তকে বিশুদ্ধ করার অর্থ হচ্ছে ইবাদতকে শিরক মুক্ত করে খালেসভাবে এক আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার উদ্দেশ্যে পেশ করা। মোট কথা ইবাদতের ভেতরের কাঠামো হবে ইখলাস ভিত্তিক আর বাইরের কাঠামো হবে সুন্নাহ ভিত্তিক। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

'তাদের এ ছাড়া কোনো হুকুমই দেয়া হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে, একনিষ্ঠভাবে একমাত্র আল্লাহর ইবাদত করবে।' (বাইয়্যিনাহ ৯৮: ৫)

আর إِتِّبَاعُ السُّنَّةِ বা সুন্নাহর পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'হে নবী! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা মহান আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও, তাহলে আমার অনুসরণ করো। তাহলে মহান আল্লাহ তোমাদের

ভালোবাসবেন, তোমাদের গুনাহসমূহ মাফ করে দিবেন। আর আল্লাহ তো সীমাহীন দয়াময় ও ক্ষমাশীল।' (আল ইমরান ৩:৩১)

মানুষ ও জিন জাতির বিভ্রান্ত অংশটি ব্যতিত সৃষ্টিলোকে কোথাও তাওহীদ ও একত্ববাদ ছাড়া শিরক, পৌত্তলিকতা ও অংশীবাদের কোনোই অস্তিত্ত নেই। সর্বত্রই চলছে এক সত্য মাবুদের ইবাদত, দাসত্ব ও আনুগত্য। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

'তারা (মানুষেরা) কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ আসমানসমূহ ও জমিনে যা আছে তা তাঁরই আনুগত্য করে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদের তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করানো হবে।' (ইমরান ৩:৮৩)

শুধু তাই না, তারা সকলেই আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

'সাত আসমান ও জমিন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রসংশায় তাসবীহ পাঠ করে না; কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা বুঝ না। নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।' (ইসরা ১৭:৪৪)

আমরা যদিও ভোর রাতে মোরগের আওয়াজ শুনে বলি 'কুক্কুরাতুর' মূলত সে বলে سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ 'সুব্বুহুন কুদ্দুসুন'। এমনিভাবে আমরা পাখির ডাক শুনে বলি 'কুহু-কুহু' মূলত সে বলে الله الله 'আল্লাহু-আল্লাহু'। কিয়ামতের দিবসে সকলেই আল্লাহর দাস হিসেবে মহান রবের সামনে উপস্থিত হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا

'আকাম মণ্ডলি ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে দয়াময়ের নিকট উপস্থিত হবে না বান্দারূপে।' (মারইয়াম ১৯:৯৩)

জন্মগতভাবে প্রতিটি মানুষই একত্ববাদী। প্রত্যেকেই তার হৃদয়ের গভীরে মহান স্রষ্টার পরিচয় ও ভালোবাসা বহন করে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مَوْلُود إِلَّا يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانه أَوْ يُنَصِّرَانه أَوْ يُمَجِّسَانه كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ثُمَّ يَقُولُ فِطْرَةَ اللَّه الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

'প্রতিটি শিশুই আল্লাহর পরিচয়, একত্ববাদ ও ভালোবাসার ওপর জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদি বানায় অথবা খ্রিস্টান বানায় অথবা অগ্নীপূজক বানায়। যেমনিভাবে একটি পশু একটি পরিপূর্ণ বাচ্চা প্রসব করে, যার মধ্যে কোনো দোষ ও অপূর্ণতা থাকে না। তোমরা কি সেগুলোর মধ্যে কোনো কাটা নবজাত বাচ্চা দেখেছো? অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের আয়াতটি আবৃত্তি করেন- فِطْرَةَ اللَّه الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ -
'এটাই (একত্ববাদী দ্বীনের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা) আল্লাহর প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল দ্বীন।' (রূম ৩০:৩০) (বুখারী ৪৭৭৫; মুসলিম ৬৯২৬; আহমদ ১২৪৯৯)

প্রকৃত অর্থে একটি শিশু শাবক নিখুঁত ও পরিপূর্ণ দুটো কানসহ সর্বাঙ্গীন পরিপূর্ণতা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু মানুষ কান কেটে তাকে বিশ্রী ও ত্রুটি যুক্ত করে ফেলে। এভাবে একটি মানব শিশু আল্লাহর পরিচয়, ভালোবাসা ও একত্ববাদী চেতনা নিয়ে জন্ম লাভ করার পর পিতা-মাতা, বন্ধু-বান্ধব ও পীর-ফকীর কর্তৃক বিভ্রান্ত হয়ে শিরক, অংশীবাদ ও অগ্নীপূজায় লিপ্ত হয় এবং কান কাটা পশু শাবকের মতোই অসুন্দর, বিকৃত ও ত্রুটিযুক্ত হয়ে যায়। একপর্যায়ে সে হারিয়ে ফেলে মহান স্রষ্টার প্রকৃত পরিচয়।

স্বভাবগতভাবেই প্রতিটি মানুষ একত্ববাদী চেতনাসহ আল্লাহর ইবাদত করার মনোবৃত্তি নিয়েই দুনিয়ায় আগমন করে। ইবাদত ও দাসত্ব তার প্রকৃতিগত বিষয়, সে কোনো না কোনো সত্ত্বার দাসত্ব করবেই। এজন্যই একমাত্র মাবুদের পরিচয় হারিয়ে ফেললে শত-সহস্র কৃত্রিম অসত্য মাবুদের

ইবাদত করে সে তার প্রকৃতিগত দাসত্ব-প্রবৃত্তির উপশম করতে প্রয়াস পায়। সে নিজ হাতেই বানিয়ে নেয় নিজের মাবুদ। এ পথহারা মানুষকে প্রকৃত সত্য মাবুদের দিশা দেওয়ার জন্যই যুগে যুগে প্রেরিত হয়েছেন নবী ও রাসুলগণ। তারা স্মরণ করিয়ে দেন সেই পরম প্রিয়জনের পরিচয়। যার স্মরণ ব্যতিত মানব হৃদয় কোনো কিছুতেই শান্তি পেতে পারে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّه أَلَا بِذِكْرِ اللَّه تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণে যাদের অন্তর প্রশান্ত হয় (তারাই প্রকৃত মুমিন)। জেনে রাখ! আল্লাহর স্মরণ দ্বারাই অন্তরসমূহ প্রশান্ত হয়।' (রা'দ ১৩:২৮)

জিকির বা স্মরণ শব্দটি তখনই ব্যবহৃত হয় যখন পূর্ব পরিচিত কোনো জিনিষ ভুলে যাওয়ার পর পূণরায় হৃদয়ে আলোচিত হয়। যার সাথে আগে পরিচয় ছিল না তার আলোচনাকে কোনোভাবেই জিকির বা স্মরণ বলা হয় না। এজন্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার আলোচনাকে অর্থাৎ কুরআনকে ذِكْرٌ (জিকির), تَذْكِرَةٌ (তাযকেরা), ذِكْرَي (যিকরা) তথা স্মরণিকা নামে আখ্যায়িত করেছেন। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাম দিয়েছেন مُذَكِّرٌ (মুযাক্কির) তথা স্মরণদাতা, যিনি স্মরণ করিয়ে দেন।

পৃথিবী, পাহাড়, পর্বত, সুন্দর উদ্ভিদ জগৎ এসব কিছুকেও কুরআনে যিকরা বা স্মরণিকা বলা হয়েছে। এসবই হৃদয়ের কাছে পূর্ব পরিচিত দয়াময় স্রষ্টা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে স্মরণ করিয়ে দেয়। আল্লাহর সৃষ্ট মহাবিশ্ব এবং বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র কণিকা থেকে শুরু করে সুবিশাল গ্যালাক্সি সবই এক স্রষ্টা ও শিল্পীর অস্তিত্বের সাক্ষ্য ও সুস্পষ্ট প্রমাণ বহন করে। কিন্তু সেই স্রষ্টা কে? তাঁর নাম কি? কিইবা তার পরিচয়? তিনি কি একক সত্তা? এসবতো আর আকাশ মাটি ও সৃষ্টিজগত আমাদের জানাতে পারে না। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-

عن حُذَيْفَةَ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ... أَنَّ الْأَمَانَةَ نَزَلَتْ فِي جَذْرِ قُلُوبِ الرِّجَالِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنْ الْقُرْآنِ ثُمَّ عَلِمُوا مِنْ السُّنَّةِ

'হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আমানত তথা আল্লাহর প্রতি ঈমান, তার পরিচয়, তাওহীদ ও ভালোবাসা মানুষের মর্মমূলে বা অন্তরের মণিকোঠায় নাজিল হয়েছে। তারপর তারা তা জানতে পেরেছে কুরআন থেকে। অতঃপর জানতে পেরেছে সুন্নাহ থেকে।' (বুখারী ৬৪৯৭; মুসলিম ৩৮৪)
বস্তুত আল্লাহর সাথে সৃষ্টিগত, স্বভাবগত, হৃদয়গত এই পূর্ব পরিচয়টি না থাকলে কুরআন, সুন্নাহ ও সৃষ্টিকুল কোনো কিছু দিয়েই সেই মহান শিল্পী রাব্বুল আলামিনের একক সত্ত্বার সুনিপুণ পরিচয় পাওয়া যেত না। ইমাম ইবনে তাইমিয়া বলেন- 'যে চিরন্তন সত্যটি মানুষ দলিল প্রমাণ দিয়ে জানতে চায় তার সম্পর্কে হৃদয়ে পূর্ব অনুভূতি ও পরিচয় থাকার ফলেই সে তাকে অথবা তার কিছু অবস্থা জানতে দলিলের অন্বেষণ করে। কিন্তু হৃদয় যাকে পূর্ব থেকে অনুভবই করতে পারে না তাকে জানার স্পৃহা কিছুতেই তার মধ্যে সৃষ্টি হয় না।' (কিতাবুত তাওহীদ লি ইবনে তাইমিয়া)
মহান স্রষ্টা ও শিল্পী আল্লাহর সাথে মানব হৃদয়ের এই গভীর পরিচিতি মহাকালের অতীত কোনো ক্ষণে তাদের থেকে নেয়া তার রবুবিয়াতের সাক্ষ্য ও স্বীকৃতি কুরআন-সুন্নাহ ও সৃষ্টি জগতের দলিল দ্বারা তার পরিচয় একত্ববাদ ও ভালোবাসার স্মৃতিচারণ সবই এক দুর্লঙ্ঘ পরম্পরায় শক্তভাবে গাঁথা। প্রথম পরিচয়টি না থাকলে পরবর্তী পরিচয়গুলো হতো নিষ্ফল। পরবর্তী পরিচয় প্রথম পরিচয়ের সমর্থন, নবায়ন ও স্মৃতিচারণ মাত্র।

মায়ের কোলে থেকে থেকে শিশু যখন তার মাকে ভালোভাবে চিনে নেয় তখন আড়ালে থেকে মা তার শিশুকে ডাকলে পূর্ব পরিচয়ের ফলেই অনায়াসে শিশু বুঝে নেয় এই যে আমার মা। পূর্ব পরিচয়টি না থাকলে শিশুটি কিছুতেই বুঝতো না এই আওয়াজ তার মায়ের। প্রতিটি মানবের হৃদয় মূলে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের অতীত এমনই এক পরিচয়, প্রীতি ও একত্বের তুলনাহীন বন্ধন রয়েছে তার দয়াময় স্রষ্টার সাথে যে, প্রকৃতিগতভাবে হৃদয় আর কাউকে ভালোবাসে না। কম্পাসের কাঁটার মতোই সে সর্বদা একমুখী।
সুরা রা'দের ২৮তম আয়াতের অলৌকিক শব্দ বিন্যাস দ্বারা বুঝা যায় মানবাত্মাকে আল্লাহ ব্যতীত আর যে দিকেই নেয়া হোক না কেন সে

সেখানে থেকে দিক পরিবর্তন করবেই। আয়াতটির শব্দ বিন্যাস নিম্নরূপ ذِكْرُ اللهِ আল্লাহর স্মরণ, تَطْمَئِنُّ স্থীর হয়ে যায়, اَلْقُلُــوْبُ সদা বিচরণশীল, পার্শ্ব পরিবর্তনকারী অন্তর। অর্থাৎ মানবাত্মা আল্লাহর প্রণয়, প্রীতি ও স্মরণ না পেলে অস্থিরতা হেতু পার্শ্ব পরিবর্তন করতে থাকে। আর যখনই প্রণয়, প্রীতি হেতু স্মরণরূপ শারাবান ত্বাহুর পেয়ে যায় তখনই সে অস্থিরতা ও দিক পরিবর্তন ত্যাগ করে মুতমাইন ও সুস্থির হয়ে যায়।

শিশুকালে পৃথিবীর পরিবেশজনিত কারণে অন্তর বাধা থাকে মায়ের সাথে, কৈশর ও যৌবনের প্রথম পর্বে বাধা থাকে খেলার সঙ্গীদের সাথে, পরিণত বয়সে বাধা থাকে জীবন সঙ্গীর সাথে, পৌঢ়কালে বাধা থাকে সন্তান-সন্ততির সাথে, বৃদ্ধ বয়সে বাধা থাকে নাতি-নাতনির সাথে। একের পর এক এভাবেই এক সময়ের প্রীতিভাজনকে ত্যাগ করে আরেক প্রীতিভাজনের দিকে দিক পরিবর্তন করতে থাকে। তার পর আসে জীবনের অন্তিম শায়াহ্ন বা একাকী শয্যায় পরে থাকার পর্ব। তারপর এই অসহায়ত্বের পরিসমাপ্তি ঘটে পৃথিবীর সব প্রীয়জনকে চিরদিনের জন্য চিরবিদায় দেয়ার মাধ্যমে। তখন কেহই আর জীবনের সঙ্গী হয়ে সাথে যায় না। অতএব, মানবাত্মাকে তার পরমাত্মীয় চিরস্থায়ী বন্ধু মহান রাব্বুল আলামীনের সাথে বেঁধে দেওয়াই হচ্ছে অসহায়ত্ব, একাকিত্ব, চির সঙ্গীহিনতা ও ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচার উপায় পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

'আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আপনি আমার পরম বন্ধু ইহকালের ও পরকালের।' (ইউসুফ ১২:১০১)
এভাবেই একমাত্র পরম আত্মীয়, চিরস্থায়ী বন্ধু, মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আল্লাকে চিনে তাঁর ইবাদতের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন পূর্বক জান্নাত লাভ করা ও জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়ার মহা সাফল্য অর্জন করাই আমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য।
বক্ষ্যমান কিতাবে কুরআন, সুন্নাহ ও বিজ্ঞানের আলোকে আল্লাহর পরিচয়, তাঁর প্রতি ঈমান, ভালোবাসা ও আনুগত্যের বিষয়ে আলোচনা পেশ করা

হয়েছে। আশা করি এ কিতাবটি আল্লাহর পরিচয় লাভ করে তার আনুগত্য করে উভয় জাহানের কল্যাণ অর্জনে সহায়ক হবে, ইনশাআল্লাহ।
কিতাবটিকে নির্ভুল করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও যদি কোনো ভুল-ভ্রান্তি দৃষ্টিগোচর হয় তা আমাদের অবহিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা গেল। পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

আরজগুজার

মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন রাহমানী

পরিচালক : মারকাজুল উলূম আল ইসলামিয়া, ঢাকা, বাংলাদেশ

মোবাইল : ০১৭১২-১৪২৮৪৩

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى

'যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করলো এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলো, সে তো মজবুত ও শক্ত এক রজ্জুকে আকড়ে ধরলো।' (বাক্বারাহ ০২:২৫৬)

প্রথম অধ্যায় : مَعْرِفَةُ الله আল্লাহর পরিচয়

রবের পরিচয় ও মানুষের অঙ্গীকার

আমরা সকলেই বলি যে, আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করি। এর মানে কি? তাই আমরা প্রথমেই আলোচনা করবো 'আল্লাহ বিশ্বাস করা'-র অর্থ নিয়ে। কুরআন মাজিদের সুরা বাকারার ৮ নাম্বার আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

'মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা বলে যে, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছি, (আমরা তাকে বিশ্বাস করি) কিয়ামতকে বিশ্বাস করি; কিন্তু তারা মুমিন নয়।' (বাকারা ২:০৮)

এই আয়াতে মহান আল্লাহ তাআলা কিছু লোকের নিজেদের ঈমানদার দাবি করার ব্যাপারে বলেছেন যে ওরা মুমিন নয়, ওরা মুনাফিক। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ তাআলা মুনাফিকদের আলোচনা শুরুই করেছেন মূলত এই আয়াত দিয়ে। এর আগে পবিত্র কুরআনের সুরা বাকারার প্রথম পাঁচটি আয়াত হচ্ছে মুমিন সম্পর্কে। তার পরের ২টি আয়াত কাফিরদের সম্পর্কে। তার পরের ১৩টি আয়াত নাজিল হয়েছে মুনাফিকদের সম্পর্কে। তাহলে বুঝা যাচ্ছে যে, সবচেয়ে ভয়াবহ হলো মুনাফিক। এমনকি কাফিরের চেয়েও ভয়াবহ হলো মুনাফিক। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا

'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর তুমি কখনও তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না।' (নিসা ৪:৪৫)

পবিত্র কুরআনে কাফিরদের নামে একটি সুরা নাজিল হয়েছে সুরা আল কাফিরুন - যা মাত্র ৬ আয়াতের। একইভাবে মুনাফিকদের নামেও একটি সুরা নাজিল হয়েছে সুরা আল মুনাফিকুন - যা প্রায় দেড় পৃষ্ঠা। যার আয়াত সংখ্যা ১১। সুতরাং বুঝা গেলো যে, মুনাফিকরা হচ্ছে সবচেয়ে ভয়াবহ। আমাদের ভেবে দেখতে হবে যে, আমরা আবার এই মুনাফিকদের দলে পড়ে যাই কি না? এজন্য শুরুতেই আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান বা 'আল্লাহকে বিশ্বাস করা' নিয়ে আলোচনা করব, ইনশা-আল্লাহ। প্রথমেই আসুন জেনে নেয়া যাক আল্লাহকে বিশ্বাস করার অর্থ কি?

আল্লাহকে বিশ্বাস করার অর্থ হলো চারটি জিনিসকে বিশ্বাস করা।

ক. وُجُوْد بَارِيْ تَعَالَي **'ওযুদে বারী তা'আলা'** অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করা। তিনি আছেন। আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, খাল-বিল, নদী-নালা, পশু-পাখি, গাছ-গাছালি, পাহাড়-পর্বতসহ যাবতীয় কিছু তিনিই সৃষ্টি করেছেন। এসব কিছু স্রষ্টা ব্যতিত এমনিতেই প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয়েছে তা নয়। এভাবে আল্লাহর অস্তিত্বকে বিশ্বাস করা হলো ঈমান বিল্লাহ-এর প্রথম ধাপ।

খ. تَوْحِيْد بَارِيْ تَعَالَي **'তাওহীদে বারী তা'আলা'** অর্থাৎ আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করার সাথে সাথে তাঁর এককত্বে বিশ্বাস করা অর্থাৎ তিনি এক ও একক। তাঁর কোনো শরীক নাই। তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন। সকলেই তাঁর কাছে মুখাপেক্ষী। তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি। তিনি কাউকে জন্ম দেননি। তাঁর সমকক্ষ ও সমতুল্য কেউ নেই। তাঁর সত্ত্বা ও গুণাবলীতে যেমন কোনো শরীক নেই, তেমনিভাবে তাঁর আদেশ-নিষেধ, আইন-বিধানের ক্ষেত্রেও কোনো শরীক নেই। আর না শরীক আছে তাঁর ইবাদতের ক্ষেত্রে। এটাই ইসলামের মূল ভিত্তি 'তাওহীদ'।

গ. اِمْتِثَالُ الْاَوَامِرِ **'ইমতেসালুল আওয়ামের'** আল্লাহর যাবতীয় আদেশগুলোকে মেনে চলা। ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক জীবনসহ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর হুকুমের আনুগত্য করা।

ঘ. اِجْتِنَابُ النَّوَاهِيْ **'ইজতিনাবুন নাওয়াহী'** আল্লাহর নিষেধাবলীকে পরিহার করে চলা। ব্যক্তিজীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে ও আন্তর্জাতিক জীবনসহ সর্বক্ষেত্রে আল্লাহর যাবতীয় নিষেধাবলীকে পরিহার করা।

আমরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে এই চারটি বিষয়ের বিস্তারিত আলোচনা পেশ করবো, ইনশা-আল্লাহ।

প্রথম বিষয় : وُجُوْد بَارِيْ تَعَالَي 'ওযুদে বারী তা'আলা'

মহান আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআন মাজিদে ঘোষণা করে দিয়েছেন-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ

'আমি জিন এবং মানবজাতিকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্য।' (যারিয়াত ৫১:৫৬)

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন যে, তিনি মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন তাঁর ইবাদত, আনুগত্য ও দাসত্ব করার জন্য। আর কারো পরিচয় লাভ করা ছাড়া আনুগত্য করা সম্ভব নয়। যেমন কোনো একটি কারখানায় দশ হাজার কর্মচারী রয়েছে। তাদের একজন অপরিচিত ব্যক্তি এসে বিভিন্ন নির্দেশনা দিচ্ছে। কিন্তু কর্মচারীরা তার পরিচয় না জানার কারণে তার বক্তব্যে কর্ণপাত না করে উল্টো তাকে পাগল বলে উপহাস করতে লাগলো। ইতিমধ্যেই ঐ কারখানার কর্মকর্তারা এসে লোকটির পরিচয় দিলো যে, ইনিই হচ্ছেন আমাদের এই কারখানার মালিক। সঙ্গে সঙ্গেই কর্মচারীদের সবকিছু পাল্টে যায়। লোকটির আসল পরিচয় পাওয়ার পরে সকলেই তার আনুগত্য করে। সে যা বলে তাই আইন হিসেবে গ্রহণ করে। আদেশ করলে বাস্তবায়ন করে। নিষেধ করলে বিরত থাকে। এককথায় সকলেই এখন তার কথায় উঠাবসা করে। ঠিক তেমনিভাবে আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্রসহ মহাকারখানার মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা'আলা মানবজাতীকে তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু মানুষ আল্লাহর পরিচয় না জানার কারণে অথবা ভুলে যাওয়ার কারণে আল্লাহর আনুগত্য না করে তারই মতো অন্য মানুষের আনুগত্য ও দাসত্ব করে থাকে। এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা'আলা মানবজাতীকে দুনিয়াতে পাঠানোর পূর্বেই সমস্ত রূহগুলোকে আরাফাতে ময়দানে একত্র করে একটি ঐতিহাসিক পরিচিতি অনুষ্ঠান করেছিলেন। যেখানে আদম আ. থেকে শুরু করে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করবে সকলকেই সেই সমাবেশে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করা হয়েছিলো। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

'আর স্মরণ করো, যখন তোমার রব বণী-আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তাদের বংশধরকে বের করলেন এবং তাদের তাদের নিজেদের ওপর সাক্ষী

করলেন যে, 'আমি কি তোমাদের রব নই'? তারা বললো, 'হ্যাঁ, আমরা সাক্ষ্য দিলাম।' যাতে কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পার যে, নিশ্চয়ই আমরা এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম।' (আরাফ ৭:১৭২)

এই আয়াতে مِنْ ظُهُورِهِمْ দ্বারা বেশিরভাগ মুফাসসিরীণদের মতে আদম আ. এর পিঠের থেকে তার সরাসরি সন্তানদের রূহগুলো বের করা হয় এবং তাদের পিঠের থেকে আবার তাদের সন্তানদের রূহ বের করা হয়। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ জন্মগ্রহণ করবে তাদের সকলকেই সৃষ্টি করে তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উপরোক্ত বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত বক্তব্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকলের সামনে নিজের পরিচয় তুলে ধরলেন। আর পরিচয় দিতে গিয়ে সর্বপ্রথম তিনি নিজেকে রব হিসেবে পেশ করেছেন। অতঃপর তাদের থেকে পরীক্ষা নিলেন এবং তাদের নিজেদের ব্যাপারে নিজেদের সাক্ষী বানালেন। এজন্য তাদের জিজ্ঞেস করলেন, أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের রব নই? তখন তারা সকলে উত্তর দিয়েছিলো, بَلَى شَهِدْنَا হ্যাঁ, আমরা সকলেই সাক্ষ্য দিলাম অবশ্যই আপনি আমাদের রব।

আরবিতে কোনো কিছু স্বীকার করা, বা সাক্ষ্য দেয়ার ক্ষেত্রে দু'টি শব্দ ব্যবহৃত হয়। একটি হচ্ছে بَلَى আর অপরটি হচ্ছে نَعَمْ । এই দুটির মাঝে পার্থক্য হচ্ছে, যখন কোনো বিষয়কে প্রমাণসহ ব্যক্ত করা হয় তখন বলা হয় بَلَى। অর্থাৎ অবশ্যই আপনি আমাদের রব। شَهِدْنَا আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। কেন এই সাক্ষ্যগ্রহণ করা হলো? এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা'আলা নিজেই ইরশাদ করেছেন-

أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

'যাতে করে কিয়ামতের দিন এটা বলতে না পারো যে আমরা তো এ সম্পর্কে গাফেল ও অজ্ঞ ছিলাম। (আপনি যে আমাদের রব তা আমরা জানতাম না।)' (আরাফ ৭:১৭২)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ

'অথবা যাতে তোমরা একথা বলতে না পারো আমাদের পিতৃপুরুষরা আগে শিরক করেছে। আমরা তো তাদের পরবর্তী তাদের সন্তান ছিলাম তাদের অনুসরণ করেছি মাত্র। আপনি কি আমাদের আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদারা আগে যেই শিরক করেছে সেই পূর্ববর্তী বাতিলদের অন্যায়ের কারণে শাস্তি দিবেন?' (আরাফ ৭:১৭৩)

এই আয়াতের মাধ্যমে আরো একটি বিষয় পরিষ্কার হয়, তা হলো পূর্ববর্তী লোকেরা দলিল নয়। দলিল হবে কুরআন এবং সুন্নাহ। এজন্যই মহান আল্লাহ তাআলা দুনিয়াতে আসার আগেই আমাদের থেকে এ ব্যাপারে অঙ্গীকার নিলেন। أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ আমি কি তোমাদের রব নই? তখন তারা সকলেই উত্তর দিয়েছিলো, قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا সব লোকেরা বললো অবশ্যই আপনি আমাদের রব এবং আমরা এর সাক্ষ্য দিচ্ছি এবং বিষয়টি যথাযথভাবে পবিত্র কুরআনেও উল্লেখ করে আমাদের স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

এভাবে সাক্ষ্য আদায় করে দুনিয়াতে পাঠিয়ে দিলেন এবং দুনিয়াতে তাদের জন্য কিছু ইবাদত নির্ধারণ করে দিলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতের নাম হচ্ছে সালাত বা নামাজ। সেই সালাতের মধ্যে একটা সুরাকে নির্দিষ্ট করে দিলেন যা না পড়লে সালাত হবে না। সেই সুরাটি হলো সুরা ফাতিহা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন-

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ

'উবাদা ইবনুস সামিত রা. থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যেই ব্যক্তি সালাতে সুরায়ে ফাতিহা না পড়বে তার সালাত হবে না।' (বুখারী ৭২৩)

এই হাদিসের ওপর ভিত্তি করে ইমাম আবু হানিফা রহ. বলেন যে, সালাতে সুরায়ে ফাতিহা পড়া ওয়াজিব। যদি কেউ না পড়ে তাহলে সালাত

দোহরাতে হবে। অন্য ইমামরা বলেছেন ফরজ। না পড়লে সালাত হবে না। উদ্দেশ্য একই, তাহলো এই সুরার গুরুত্ব বুঝানো। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই সুরার এতো গুরুত্ব কেন দিলেন? কি রয়েছে এই সুরার মধ্যে যা না পড়লে সালাতই হবে না?

এই সুরাকে বলা হয় উম্মুল কুরআন। তাফসীরের কিতাবে লিখে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আদম আ. থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত রাসুলদের প্রতি যত কিতাব নাজিল করেছেন সমস্ত কিতাবের সারমর্ম হচ্ছে কুরআন মাজিদ। আর কুরআন মাজিদে যা কিছু রয়েছে তার মূল হলো সুরায়ে ফাতিহা। আর সুরায়ে ফাতিহায় যা কিছু রয়েছে তার সারমর্ম হচ্ছে একটি আয়াত সেটি হলো-

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

'আপনারই আমরা ইবাদাত করি, এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই।' (ফাতিহা ১:৪)

এই গুরুত্বপূর্ণ সুরাটি যেই আয়াত দ্বারা শুরু হয়েছে সেখানেও রয়েছে রবের আলোচনা। ইরশাদ হয়েছে-

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের রব।' (ফাতিহা ১:১)

অতঃপর যখন আমরা রুকুতে যাই তখন যে তাসবীহ পড়ি সেখানেও রয়েছে রবের কথা। আর তা হলো-

سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْمُ

'আমার মহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।'

অতঃপর যখন আমরা রুকু থেকে সোজা হয়ে দাঁড়াই তখন যে দোয়াটি পড়তে হয় তার মধ্যেও রয়েছে রবের পরিচয়। আর তা হলো-

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ

'হে আমাদের প্রতিপালক, তোমার জন্যই সকল প্রশংসা।'

অতঃপর যখন সিজদায় যাই, তখনও পাঠ করি سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىْ অর্থ- আমার সুমহান রবের পবিত্রতা ঘোষণা করছি।

এর অর্থ হচ্ছে, সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় রব, রুকু অবস্থায় রব, রুকু থেকে সোজা দাঁড়িয়ে রব, সিজদায় গিয়ে রব। সব স্থানেই রবের আলোচনা

হচ্ছে। দুনিয়াতে আসার আগেও রবের স্বীকৃতি দেয়া হয়েছিলো। দুনিয়াতেও সব জায়গাতেই রবের স্বীকৃতি দেয়া হচ্ছে। দুনিয়া থেকে যাওয়ার পরে আখিরাতের সফর শুরু হবে। আখিরাতের সফরের প্রথম ঘাঁটি হচ্ছে কবর। সেই কবরেও তিনটি প্রশ্নের প্রথম প্রশ্নটি হলো- مَنْ رَبُّكَ؟ কে তোমার রব? জীবনে তুমি কাকে রব হিসেবে গ্রহণ করেছিলে? কোনো শাসক, যাজক ও নেতা নেত্রীকে? না কোনো জনক বা ঘোষককে? নাকি ফিরআউন, হামান ও নমরুদের মতো নিজেদের সার্বভৌম ক্ষমতার দাবিদার, আল্লাহর আইন পরিবর্তনকারী তাগূতদের? কাকে তুমি রব মেনেছো?

বুঝা গেল রবের বিষয়টি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ কারণেই কোনো এক কবি বলেছেন:

'আল্লাহ আমার রব - এই রবই আমার সব।
দমে দমে তনু-মনে - তাঁরই অনুভব।'

রবের পরিচয় পবিত্র কুরআনে :

পবিত্র কুরআনে 'রব' শব্দটি কমপক্ষে ৭৪০ বার উল্লেখ হয়েছে। এখানে আমরা একটি আয়াত নিয়ে আলোচনা করবো, ইনশা-আল্লাহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মূসা (আ.) ও তার ভাই হারুন (আ.) কে ফিরআউনের নিকট দ্বীনের দাওয়াত পেশ করার আদেশ দিয়ে বলেন-

اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى

'তোমরা দু'জন ফিরআউনের নিকট যাও, কেননা সে তো সীমালঙ্ঘন করেছে।' (ত্বহা ২০:৪৩)

মূসা (আ.) ও হারুন (আ.) যখন ফিরআউনের কাছে গিয়ে রবের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত পেশ করলেন, তখন ফিরআউন তাদের কাছে রবের পরিচয় জানতে চাইলো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى

'ফিরআউন বললো, 'হে মূসা, তাহলে কে তোমাদের রব'?' (ত্বহা ২০:৪৯)

এই প্রশ্ন করার মূল কারণ হলো রবের সাধারণ অর্থ ফিরআউনেরও জানা ছিলো। আর সে কারণেই সে নিজেকে রব হিসেবে ঘোষণা করেছিলো। অর্থাৎ প্রতিপালক, লালন-পালনকারী ইত্যাদি। যেহেতু মূসা (আ.)

ফিরআউনের ঘরেই লালিত-পালিত হয়েছিলেন তাই ফিরআউন জানতে চাইলো সে ছাড়া আর কে আছে রব। অর্থাৎ ফিরআউন এটাই বলতে চাচ্ছিলো যে, তোমার রব তো আমিই। তুমি অন্য কোনো রবের দাওয়াত দিচ্ছো?

তখন মূসা (আ.) ফিরআউনকে রবের পরিচয় দিতে গিয়ে যে বাক্যটি বলেছিলেন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সে বাক্যটি আমাদের জানানোর জন্য পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

'মূসা বললো, 'আমাদের রব তিনি, যিনি সকল বস্তুকে তার আকৃতি দান করেছেন, অতঃপর সঠিক পথ নির্দেশ করেছেন।' (ত্বহা ২০:৫০)

অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর সৃষ্টি ও জীবনযাপনের পদ্ধতি যিনি শিক্ষাদান করেছেন। জীবনের ধাপে ধাপে যখন যা প্রয়োজন তখন তা পূরণ করার ব্যবস্থা করেন তিনিই হচ্ছেন রব।

একটি উদাহরণ :

মনে করুন! মানুষ যখন মায়ের পেটে আসে তখন মহান আল্লাহ কিভাবে এক ফোঁটা পানি থেকে তাকে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় সুন্দর করে তৈরি করেন। প্রথম প্রক্রিয়া সম্পর্কে ইরশাদ হচ্ছে-

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

'তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়া মাটির ন্যায় শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা থেকে।' (রহমান ৫৫:১৪)

অন্যত্র আরো ইরশাদ হয়েছে :

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ

'আর অবশ্যই আমি মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। তারপর আমি তাকে শুক্ররূপে সংরক্ষিত আঁধারে স্থাপন করেছি। তারপর শুক্রকে আমি 'আলাকায় (রক্তপিণ্ড) পরিণত করি। তারপর 'আলাকাকে গোশ্‌তপিণ্ডে পরিণত করি। তারপর গোশ্‌তপিণ্ডকে হাড়ে পরিণত করি। তারপর হাড়কে গোশ্‌ত দিয়ে আবৃত করি। অতঃপর তাকে অন্য এক সৃষ্টিরূপে গড়ে তুলি। অতএব, সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়! এরপর অবশ্যই তোমরা মরবে। তারপর কিয়ামতের দিন অবশ্যই তোমরা পুনরুত্থিত হবে।' (মু'মিনুন ২৩:১২-১৬)

দ্বিতীয় প্রক্রিয়া সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে-

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ

'তিনিই তোমাদের মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর শুক্রবিন্দু থেকে, তারপর 'আলাকা' থেকে। অতঃপর তিনি তোমাদের শিশুরূপে বের করে আনেন। তারপর যেন তোমরা তোমাদের যৌবনে পদার্পণ করো, অতঃপর যেন তোমরা বৃদ্ধ হয়ে যাও। আর তোমাদের কেউ কেউ এর পূর্বেই মারা যায়। যাতে তোমরা নির্ধারিত সময়ে পৌঁছে যাও। আর যাতে তোমরা অনুধাবন করো।' (গাফির ৪০:৬৭)

প্রথম প্রক্রিয়ায় মানুষ তার মায়ের পেটে তৈরি হলো, পাঁচ মাস সময় চলে গেছে। বডি তৈরি হয়েছে। রূহ চলে এসেছে। ক্ষুধা লেগে গেছে। এবার মায়ের পেটে ক্ষুধা লাগলে খাওয়াবে কে? বাচ্চার খাবারের ব্যবস্থা করবে কে? কোনো চিকিৎসা বিজ্ঞানী বা খাদ্য মন্ত্রীর পক্ষেও এখানে খাবার সরবরাহ করা সম্ভব নয়। অপরদিকে বাচ্চার পক্ষেও কোনো মিছিল-মিটিং আন্দোলন, হরতাল, গাড়ি ভাঙচুর করাও সম্ভব নয়। এমনকি কান্নাকাটি করাও সম্ভব নয়। তাহলে সেখানে খাবার পৌঁছাবে কে?

মহান রাব্বুল আলামিন, যিনি ঐ বাচ্চাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই খাবারের ব্যবস্থা করছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের থেকে বুঝে শুনে মায়ের মাসিক ঋতুস্রাব বন্ধ করে দিয়ে শিশুর নাভির সাথে মায়ের নাভিকে সংযুক্ত

করে বাচ্চার খাবারের ব্যবস্থা করেছেন। যিনি এমনটি করেছেন তিনিই হলেন রব। সুবহানাল্লাহ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى

'মূসা (আ.) বললেন, আমার রব হচ্ছেন তিনি, যিনি সকল মাখলুকাতকে সৃষ্টি করেছেন এরপর সৃষ্টি থেকে পূর্ণতায় পৌছানো পর্যন্ত প্রয়োজনীয় সকল কিছুর ব্যবস্থা করে দেন।' (ত্বহা ২০:৫০)

এবার মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় সন্তান ধীরে ধীরে বড় হতে লাাগলো। তার বয়স ৯ মাস পূর্ণ হয়ো ১০ দিন পেরিয়ে গেলো। এবার সে দুনিয়াতে আসলো। এখন তার খাবারের প্রয়োজন। দুনিয়াতে এসে কি খাবে? মানুষের তৈরি করা খাবার খেতে পারবে না। ঠাণ্ডা হলে সর্দি লাগবে। গরম হলে মুখ পুড়ে যাবে। শক্ত হলে গলায় আটকে যাবে। তার শরীর এখন দুর্বল। খুবই দুর্বল। বিভিন্ন রোগ-জীবাণু এসে তাকে আক্রমণ করবে। তাই তার জন্য চাই শক্তিবর্ধনকারী, রোগ প্রতিরোধকারী এবং সুষম খাবার। কে ব্যবস্থা করবে সন্তানের জন্য অপরিহার্য প্রয়োজনীয় এমন খাবারের? আবারও মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নিজের থেকে বুঝে শুনে শিশুর জন্য তার মায়ের বুকের মাঝে এমন এক দুধ তৈরি করলেন যার বিকল্প আজ পর্যন্ত কেউ করে দেখাতে পারেনি। মায়ের স্তনে প্রথম যেই শালদুধ তৈরি হয় একটু হলুদ বর্ণের গাঢ় দুধ। ইতিপূর্বে গ্রামের অশিক্ষিত মেয়েলোকেরা মনে করতো এই শালদুধ ফেলে দিতে হবে। কারণ এটি পান করলে ধনুস্টংকার রোগ হতে পারে। অথচ বর্তমান যুগের সমস্ত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ঐক্যমত পোষণ করেন যে, মহান স্রষ্টা এই দুধকে ধনুস্টংকার হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেন নাই। বরং জন্মগ্রহণের পর শিশুর জন্য সবচেয়ে অপরিহার্য পানাহার হচ্ছে মায়ের শালদুধ। তাই আজকাল যে কোনো হাসপাতালে দেখবেন লেখা রয়েছে, জন্মের পরই শিশুকে মায়ের শালদুধ খাওয়ান। কেননা, এই দুধে একদিকে রয়েছ খাবার, অপর দিকে রয়েছে পানীয় অপরদিকে সমানভাবে রয়েছে বিভিন্ন রোগ-জীবাণু থেকে বেঁচে থাকার প্রতিষেধক। এভাবে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মায়ের বুকের দুধে সন্তানের জন্য একই সাথে খাবার, পানীয় এবং ওষুধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। শুধু তাই না, দুধ যাতে একবারে বেশি করে মুখে প্রবেশ করতে না পারে সেজন্য স্তনের বোটার ভেতরে অনেকগুলো চিকন চিকন

ছিদ্র তৈরি করে দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ! বিনা আবেদনে বিনা দরখাস্তে যিনি নিজের থেকে বুঝে-শুনে জীবনের ধাপে ধাপে যখন যা প্রয়োজন সবকিছু ব্যবস্থা করেন তিনিই হচ্ছেন রব।

এবার বাচ্চা দুধ পান করে করে বড় হচ্ছে। প্রায় ২ বছর বয়স হয়ে গেল। এখন আর শুধু দুধের ওপর নির্ভর করা সম্ভব নয়। এবার তাকে খিচুরি খেতে হবে। মুরগির বাচ্চা, কবুতরের বাচ্চা খেতে হবে। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সে জন্য কচি বাচ্চার মুখে মুক্তার মতো কতগুলো সাদা দাঁত গজিয়ে দিলেন। বাচ্চা সেই দাঁত দিয়ে খিচুরি খেতে লাগলো। মুরগির বাচ্চা-কবুতরের বাচ্চা খেতে লাগলো। খেতে খেতে আরো বড় হয়ে গেলো। এভাবে বড় হতে হতে তার বয়স ৭/৮ বছর হয়ে গেল। এবার শুধু বাচ্চা মুরগিতেই কাজ হবে না। তাকে গরুর হাড্ডি, খাসির হাড্ডি চাবাতে হবে। তাই মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবার তার মুখের সেই কচি দাঁতগুলো ফেলে দিয়ে ধীরে ধীরে সেখানে শক্ত ও মজবুত দাঁত গজিয়ে দিলেন। মুখটাও একটু একটু করে বড় হতে লাগলো। দাঁতের সংখ্যাও বাড়তে লাগলো। কি সুন্দর ব্যবস্থা। এক সাথে নয়। ধীরে ধীরে এই পরিবর্তন হতে লাগলো। সুবহানাল্লাহ। বিনা আবেদনে, বিনা দরখাস্তে যিনি নিজের থেকে বুঝে-শুনে জীবনের ধাপে ধাপে যখন যা প্রয়োজন সবকিছু ব্যবস্থা করেন তিনিই হচ্ছেন রব। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

'(তিনিই আমার রব) যিনি আমাকে খাবার ও পানীয় সরবরাহ করেন, যখন আমি অসুস্থ্য হই তখন তিনি আমাকে সুস্থ্য করেন।' (শুআরা ২৬:৭৯-৮০)

মানব দেহের মাধ্যমে রবের পরিচয় :

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

'আর তোমাদের মধ্যেও (ভালোভাবে লক্ষ্য করো) আমার পরিচয় পেয়ে যাবে। এরপরও কি তোমরা অনুধাবন করবে না?' (যারিয়াত ৫১:২১)

মানবদেহ সৃষ্টির সমন্বয়কারী :

আল্লাহর পরিচয়ের জন্য মানুষের নিজের দেহটাই যথেষ্ট। মানুষ যদি নিজের দেহের ভেতর চিন্তা-গবেষণা করে তাহলে অবশ্যই আল্লাহর পরিচয়

পেয়ে যাবে। মানুষের এই দেহটি একটি ক্ষুদ্র পৃথিবী। বিশাল পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে মানবদেহের মধ্যে তার সব কিছুই রয়েছে। আগুন, পানি, মাটি, বাতাস, চন্দ্র-সূর্য, খাল-বিল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, গাছ-গাছালি, বন-জঙ্গল সবকিছুই মানুষের দেহের মাঝে বিদ্যমান। এমনকি বন-জঙ্গলে যেরকম বিভিন্ন পশু-পাখি, পোকা-মাকড় ও হিংস্র প্রাণী বসবাস করে, মানবদেহের মধ্যেও তার নমুনা রয়েছে। মানবদেহে আগুন আছে বলেই জ্বর উঠলে শরীর গরম হয়ে যায়। মাটি আছে বলেই যেভাবে মাটিতে বিভিন্ন ফসল জন্ম হয়, মানবদেহেও সেরকম বিভিন্ন রকমের পশম জন্ম হয়। বরং পৃথিবীতে যত রকম মাটি আছে মানবদেহে তার সব রকমই আছে। পৃথিবীর মাটি সাধারণত তিন প্রকার, কোথাও ফসল বেশি হয়। আবার কোথাও মরুভূমি যেখানে ফসল মোটেই হয় না। আবার কোথাও মাঝামাঝি। মানবদেহেও তিন প্রকারের জমি রয়েছে। বেশি ফসল হওয়া উর্বর জমির সাদৃশ্য হচ্ছে মাথা, দাড়ি ইত্যাদি। আবার মরুভূমি সাদৃশ্য হলো হাতের তালু, পায়ের তালু ইত্যাদি। আর শরীরের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হলো সাধারণ জমি সাদৃশ্য। মানবদেহে পানিও রয়েছে। বরং পৃথিবীতে যতরকম পানি রয়েছে এখানেও সব রকম পানিই মওজুদ আছে। পৃথিবীতে সাগরের পানি লবণ পানি, পুকুরের পানি মিষ্টি পানি, আবার ডোবা ও নরদমার পানি নষ্ট পানি। মানবদেহের ভেতরেও এই সবরকম পানি মওজুদ রয়েছে। চোখের পানি, ঘামের পানি হলো লবণ পানি। ভালো খাবার দেখলে জিহ্বার নিচের থেকে পানি আসে সেটা মিষ্টি পানি। আর পেশাবের পানি, পিত্তের পানি, পেট খারাপ হলে পেটের পানি এসব নষ্ট পানি। আবার পানি থেকে যেরকম জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয় তেমনিভাবে মানবদেহের ভেতর থেকেও এ ধরনের অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেমন বমি হলে, হাঁচি দিলে সিডরের মতো ২০০ মিটার বেগে বাতাস বয়ে যায়। সাধারণত ঝড় তুফানের গতি ১৫০ থেকে ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত হয়। ২০০ কিলোমিটার গতির ঝড় হলে মানুষ পর্যন্ত উড়িয়ে নিয়ে যায়। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন মানুষের নাকের ভেতর যে পশমের নেট আছে তা ভেদ করে যখন ভেতরে ধুলো-বালির অনুপ্রবেশ ঘটে তখন নাকের পানির সঙ্গে তা বের হয়ে যায়। তা সত্ত্বেও যদি কিছু অংশ নাকের ভেতরে ঢুকে যায় তাহলে হাঁচি আসে। হাঁচির সঙ্গে যে বাতাস বের হয় তার গতিবেগ

কখনো কখনো ২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ছাড়িয়ে যায়। যা এই পৃথিবীর ঝড়-তুফান সাদৃশ্য। বিজ্ঞানীরা আরো আবিষ্কার করেছেন যে, মানব দেহে নানা প্রকারের জীবাণু ও ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে। ঈদের বাজারে যেরকম মানুষ গাদা-গাদি করে চলাচল করে, মানবদেহের ত্বকের ওপরেও সেরকম নানা প্রজাতির জীবাণু গাদা-গাদি করে বসবাস করে। এমনকি মানুষের শুধু মুখের মধ্যেই ২০০ প্রজাতির জীবানু বসবাস করে। যা দুই মিনিট ব্রাশ করলে ধবংস হয়ে যায়। তাছাড়া মানুষের রক্তের সাথে, পেটের ভেতরে, মেয়ে লোকের চুলের ভেতরে নানা রকম প্রাণী বসবাস করে। যা জঙ্গলের হিংস্র প্রাণীর সাদৃশ্য। এখানে কবরস্থানও আছে। মানবদেহে বসবাসকারী প্রাণীগুলো যখন মারা যায় তখন ওখানে কবরস্থ হয়। যা পরবর্তীতে বিভিন্ন রকম ফোঁড়া, দাঁদ ও অ্যাজমা রূপে প্রকাশ পেয়ে থাকে। এখানে চন্দ্র-সূর্যও রয়েছে। মানুষের চোখ যুগল চন্দ্র-সূর্য সাদৃশ্য। শিরা-উপশিরাগুলো খাল-বিল, নদী-নালা সাদৃশ্য। বিভিন্ন স্থানের উঁচু হাড্ডি পাহাড়-পর্বত সাদৃশ্য। এখানে ক্যামিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিজও রয়েছে। যা প্রতিদিন অজস্র লিটার পানি নিষ্কাশন করে। এভাবে এ বিশাল পৃথিবীতে যা কিছু রয়েছে সব কিছুরই একটি নমুনা মানব দেহে রয়েছে। এজন্য মানবদেহটাকে জামে'উল খালায়েক বা সকল সৃষ্টির সমন্বয়কারী বলা হয়ে থাকে। এখন যদি এই মানব দেহের আরো গভীরে গবেষণা করা হয়, তাহলে দেখা যাবে নিশ্চয়ই এই মানবদেহনামক ক্ষুদ্র পৃথিবীকে কোনো একটি বস্তু পরিচালনা করছে। ঐ বস্তুটি যতক্ষণ কার্যকর থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত গোটা দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো সচল থাকে। আর ঐ বস্তুটি না থাকলে পুরো দেহটি নিস্তেজ ও অচল হয়ে যায়। সেই বস্তুটি হলো রূহ। এখান থেকে প্রমাণিত হয় এই ছোট্ট পৃথিবীটি যদি কোনো পরিচালক বিহীন চলতে না পারে তাহলে এই বিশাল সৃষ্টিও কোনো পরিচালকবিহীন চলতে পারে না। আর এই বিশাল পৃথিবীর যিনি পরিচালক তিনিই হচ্ছেন মহান রব্বুল আলামীন। এ জন্যই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

'সকল প্রশংসা সারা জাহানের সেই রবের জন্যই।' (ফাতিহা ১:১)

এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, মহান রব্বুল আলামিন কত জন? এক্ষেত্রেও মানবদেহের মধ্যে গবেষণা করলেই বুঝা যাবে যে একাধিক রব হতে পারে

না। কেননা মানবদেহে রূহ বা পরিচালক একটিই। একাধিক হলে দুই রূহের সংঘর্ষে দেহ ধ্বংস হয়ে যেতো। একটি বলতো ঠাণ্ডা খাবো আরেকটি বলতো গরম খাবো। একটি বলতো ইসলাম গ্রহণ করবো, আরেকটি বলতো সেকুলার থাকবো। এভাবে দুই রূহের সংঘর্ষে শরীর শেষ হয়ে যেতো। মানবদেহ নামক এই ক্ষুদ্র পৃথিবীতে যদি একাধিক পরিচালক হলে ধ্বংস নেমে আসে তাহলে এই বিশাল সৃষ্টির পরিচালকও একজন। একাধিক হলে দুই রবের সংঘর্ষে সব কিছু ধ্বংস হয়ে যেতো। কেননা দুই রবের উভয়ে যদি সমপর্যায়ের শক্তিশালী হয়, তাহলে একে অপরের ওপর চড়াও হবে। পবিত্র কুরআনে তাই বলা হয়েছে-

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّه رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

'যদি এই জগতে এক আল্লাহ ছাড়া আরো কোনো ইলাহ থাকতো, তবে এসব নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল ধ্বংস হয়ে যেতো।' (আম্বিয়া ২১:২২)।

সুতরাং বুঝা গেলো মানব দেহের ভেতর গবেষণা করলে শুধু আল্লাহর পরিচয়ই লাভ করা যায় না বরং আল্লাহর এককত্ব বা তাওহীদেরও পরিচয় পাওয়া যায়।

কেউ যদি আবার প্রশ্ন করে মানব দেহের ভেতরে গবেষণা করে কি আল্লাহর রং, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ইত্যাদি বের করা যাবে? হ্যাঁ, তাও বের করা যাবে। কেননা রূহ মানবদেহকে পরিচালনা করে। আর রূহ সম্পর্কে বলা হয়েছে-

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

'আর তারা তোমাকে রূহ সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, 'রূহ আমার রবের আদেশ থেকে, আর তোমাদের অতি সামান্যই জ্ঞান দেয়া হয়েছে।' (বনি ইসরাইল ১৭:৮৫)

এখন আমার প্রশ্ন হলো, রূহের রং, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও বেদ কি? সকলেই বলবে এটি আল্লাহর আদেশ। এর বেশি কিছু আমরা জানি না। তাহলে একজন মানুষ যখন নিজের ভেতরের পরিচালক রূহ সম্পর্কে কিছুই জানে না, তাহলে এই বিশাল সৃষ্টির মহান পরিচালক সম্পর্কে কি করে জানবে? এখানে আমরা সেটাই বলবো যে, যেভাবে রূহের নির্দিষ্ট কোনো দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেদ, কালার ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা নেই। তেমনিভাবে মহাসৃষ্টির মহান স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এর রং, দৈর্ঘ্য, প্রস্থ, বেদ সম্পর্কে জানা সম্ভব নয়। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা

যতটুকু জানিয়েছেন আমরা ততটুকুর প্রতি ঈমান রাখি। তাঁর চেয়ে বেশি কিছু আমাদের জানা নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের যতটুকু জানিয়েছেন, তা নিম্নের কয়েকটি আয়াত থেকে জানা যেতে পারে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

'আল্লাহ তা'আলা আরশে সমাসীন।' (ত্বহা ২০:৫)। তিনি আরো বলেন-

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

'আল্লাহ তা'আলা সকল কিছুকে তার ইলম দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছেন।' (তালাক, ৬৫:১২)।

উপরোক্ত আয়াত থেকে জানা গেলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরশে সমাসীন। কিন্তু কিভাবে তিনি আরশে আছেন তা আমরা জানি না। তবে তিনি সবকিছু দেখেন এবং শুনেন। যেভাবে একটি রূহ তার অধীনস্থ গোটা দেহকে নিয়ন্ত্রণ করে। যদি কারো শরীরে একই সাথে পিঁপড়ায় কাটে, পায়ে কাঁটা বিদ্ধ হয়, আর মাথায় চোট লাগে রূহ সেগুলোকে একই সাথে অনুভব করতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরশে সমাসীন হওয়া সত্ত্বেও গোটা সৃষ্টির সব কিছু দেখেন, শুনেন ও নিয়ন্ত্রণ করেন। গভীর রজনীতে আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশে মসৃণ পাথরের ওপর দিয়ে যদি একটি কালো পিঁপড়া হেঁটে যায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ পিঁপড়ার চলা এবং তার পায়ের আওয়াজ দেখেন ও শুনেন। তবে মানুষের সীমিত জ্ঞান দিয়ে আল্লাহকে আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। তিনি সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

اللَّهُ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

'তিনিই সেই মহান আল্লাহ, যিনি ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও চিরস্থায়ী। তার কখনো তন্দ্রা বা নিদ্রা কিছুই আসে না।

আসমান এবং জমিনের সকল কর্তৃত্ব কেবলমাত্র তারই জন্য নির্দিষ্ট। কে এমন আছে, যে তার অনুমতি ব্যতীত তার কাছে সুপারিশ করবে? কিন্তু তিনি যাকে অনুমতি দিবেন তার কথা ভিন্ন। তিনি তার সামনে পেছনের সকল বিষয়ে সমানভাবে অবগত। তার জ্ঞানের বিশালতাকে কোনো কিছুই স্পর্শ করতে পারে না। কিন্তু তিনি যা চান তা ব্যতীত। তার কুরসি আসমান এবং জমিনে বিস্তৃত এবং তিনি কখনো ক্লান্ত হন না। তিনিই শ্রেষ্ঠ, সুমহান।' (বাকারা, ০২:২৫৫)।

এজন্যই যেসকল বিজ্ঞানীরা মহান আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করেন, তারা অবশ্যই মহান আল্লাহর সামনে নত হয়ে আসেন। আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী হয়ে এক সময় ঈমান গ্রহণ করে থাকেন। অবশ্য সকল বিজ্ঞানী এক নয়। মূল্যবান ফল যত পাকে তত ভারী হয় এবং ডালগুলো আস্তে আস্তে নিচের দিকে নেমে আসে। পক্ষান্তরে তুলা ফল যত পেকে যাবে তত হালকা হয়ে উপরে উঠতে থাকে। একসময় বাতাসের সঙ্গে তার অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। এই তুলা ফল মার্কা বিজ্ঞানী যারা তারা অবশ্য বলে আমরা চাঁদে গেলাম, মঙ্গলে খোঁজ নিলাম কিন্তু কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না তাঁকে যাকে হিন্দুরা বলে ভগবান, খ্রিস্টানরা বলে ইশ্বর, আর মুসলিমরা বলেন আল্লাহ। আর মূল্যবান ফলের ন্যায় যারা প্রকৃত বিজ্ঞানী তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে গবেষণা করতে করতে একপর্যায়ে আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করে তাঁর হুকুমের সামনে নিজের শির নত করে দেয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাঁত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (বলে) 'হে আমাদের রব! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদের আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করো।' (আল ইমরান ৩:১৯১)

এই আয়াতের মর্ম অনুযায়ী এখন আমরা আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ে গবেষণা করবো এবং তার মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ করার চেষ্টা করবো, ইনশা-আল্লাহ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার পরিচয় জানানোর জন্য সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীর প্রতিটি পাতায় পাতায় তার পরিচয় পাওয়া যায়। কাজেই যারা প্রকৃত জ্ঞানী-বিজ্ঞানী তারা আল্লাহর সামনে নত হয়ে আসবে। এজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার নিজের বিস্তারিত পরিচয় না দিয়ে তার মাখলুকাতের মাধ্যমেই বিভিন্ন আয়াতে পরিচয় তুলে ধরেছেন। নিম্নে কয়েকটি আয়াত তুলে ধরা হলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

'আর তোমাদের জন্য পশুর মধ্যে রয়েছে শিক্ষণীয় বিষয়। এর রক্ত এবং বর্জের মধ্য থেকে তোমাদের জন্য আমি সুপেয় দুধ বের করে দেই। যা পানকারীদের জন্য তৃপ্তিদায়ক সুন্দর ও সুস্বাদু। আর বিভিন্ন ফল-ফলাদি যেমন খেজুর-আঙুর এর মাধ্যমে তোমরা রিযক গ্রহণ করে থাকো। নিশ্চয়ই এই সকল বিষয়ের মধ্যে নিদর্শন আছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্য।' (নাহল ১৬:৬৬-৬৭)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'আর তোমার রব মৌমাছিকে ইংগিতে জানিয়েছে যে, 'তুমি পাহাড়ে ও গাছে এবং তারা যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে নিবাস বানাও।' অতঃপর তুমি প্রত্যেক ফল থেকে আহার করো এবং তুমি তোমার রবের সহজ পথে চলো। তার পেট থেকে এমন পানীয় বের হয়, যার রং ভিন্ন ভিন্ন, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগ নিরাময়। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।' (নাহল ১৬:৬৮-৬৯)

সত্যিকারেই মৌমাছির ঘর নির্মাণ, মধু সংগ্রহ ও সংরক্ষণের মধ্যে রয়েছে আল্লাহর পরিচয়। কেননা ঘর তৈরি করার জন্য এক দিকে বিভিন্ন সরঞ্জাম

ও উপকরণের প্রয়োজন হয়। অপরদিকে ঐ সকল উপকরণ ও সরঞ্জামকে যথাযথভাবে সংযোগ ও স্থাপনের মাধ্যমে ঘর তৈরি করতে হয়। মানুষ বাড়িঘর নির্মাণের জন্য ইট, সিমেন্ট, রড, বালু ইত্যাদি ব্যবহার করে থাকে। আর এগুলোর জন্য রয়েছে বিশাল বিশাল কল-কারখানা ইত্যাদি। আবার এগুলোকে কাজে লাগানোর জন্য মানুষকে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। সেজন্য রয়েছে বুয়েট, ডুয়েট, চুয়েট, কুয়েটসহ বড় বড় প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। অথচ উপরোক্ত আয়াতে মৌমাছিকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘর নির্মাণের জন্য হুকুম দিলেন। তাদের না আছে কোনো ইন্ডাস্ট্রিজ আর না আছে কোনো প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়। তা সত্ত্বেও যদি লক্ষ্য করা হয় তাহলে দেখবেন ওদের মধ্যে ঠিকই সব রকম ইঞ্জিনিয়ার পাওয়া যাবে। ওদের মধ্যে আছে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। আপনারা দেখবেন মৌমাছি যখন ঘর বানায় তখন তারা প্রথমে গাছের সাথে এক ধরনের কেমিক্যাল লাগায়। অতঃপর বিভিন্ন উপাদান দিয়ে ঘর তৈরি করতে থাকে। যা প্রমাণ করে তাদের মধ্যে অভিজ্ঞ কনস্ট্রাকশন ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে। আবার ঘরের মধ্যে রয়েছে সুন্দর সুন্দর কক্ষ। কিছু মধু সংরক্ষণের জন্য, কিছু বাচ্চা রাখার জন্য, আবার কোনোটা রাণীর থাকার জন্য বিশেষ কামরা, আবার কোনোটা সাধারণ কর্মীদের জন্য। এমন মজবুত ঘর তারা নির্মাণ করে যা কয়েক মন মধু নিয়ে ঝুলতে থাকা সত্ত্বেও কখনো ছিঁড়ে পড়ে না। অথচ মানুষের তৈরি করা বিল্ডিং ধ্বসে পড়তে দেখা যায়।

ঘর তৈরির পর কিভাবে মধু সংগ্রহ করতে হবে তাও মহান আল্লাহ তাদের শিখিয়ে দিয়েছেন। মধুর সন্ধান করা এবং দূর দূরান্ত থেকে মধু আনতে গিয়ে কোনো মৌমাছি হারিয়ে যাওয়ার খবর শুনা যায়নি। অথচ তাদের কাছে না আছে দিক নির্ণয়কারী কোনো যন্ত্র, না আছে কম্পাস। বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, মৌমাছিরা ১০ মাইল দূরে পর্যন্ত চলে যায় মধু সংগ্রহ করার জন্য। কিন্তু কোনো মৌমাছি তার বাসার ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে বলে শুনা যায় না। অথচ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিত মানব প্রকৌশলীরা যখন সমুদ্রে জাহাজ পরিচালনা করে তখন মাঝে মধ্যেই দিশেহারা হয়ে দিগ্বিদিক ঘুরতে থাকে বলে শুনা যায়। অথচ তাদের কাছে রয়েছে দিক নির্ণয়কারী বিভিন্ন যন্ত্র ও মেশিনারিজ। মধু নিয়ে আসার পরে কোনো

নোংরা বা দুর্গন্ধ যুক্ত মধু আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য একদল বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার মৌমাছি বসে থাকে। তারা যাদের বিরুদ্ধে অন্যায়ের অভিযোগ দায়ের করে তাদের শাস্তি দেওয়ার জন্য রয়েছে একদল বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত পুলিশ মৌমাছি, যারা দুষ্টদের ঘাড় মটকে নিচে ফেলে দেয়। এজন্য আপনি মৌচাকের নিচে অনেক মৌমাছি দেখতে পাবেন, যাদের কারো মাথা নেই কারো হাত-পা নেই। ওরা মূলত মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধী মৌমাছি।

উপরোক্ত আয়াতে আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, আর তা হলো মধু একটি উপকারী বস্তু। যার মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন রোগের শিফা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'তার পেট থেকে এমন পানীয় বের হয়, যার রং ভিন্ন ভিন্ন, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগ নিরাময়। নিশ্চয়ই এতে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য, যারা চিন্তা করে।' (নাহল ১৬:৬৯)

এই মূল্যবান মধু গ্রাম-শহর-নগর সব এলাকার মানুষের জন্যই প্রয়োজন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাই প্রথমে হুকুম দিলেন তোমরা পাহাড়ে ঘর নির্মাণ করো। যাতে পাহাড়ের অধিবাসীরা মধু দিয়ে উপকৃত হতে পারে। অতঃপর গাছের ডালে মৌচাক নির্মাণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে গ্রামের লোকেরা সহজেই মধু পেতে পারে। তারপর শহরের বড় বড় অট্টালিকা, পানির ট্যাংকি ইত্যাদির সাথে মৌচাক নির্মাণ করতে বলেছেন। যাতে শহরবাসীও মধু থেকে বঞ্চিত না হয়। এসব ব্যবস্থা যিনি করেছেন তিনিই হচ্ছেন মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।

এভাবে আল্লাহর সৃষ্টির মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা প্রতিটি জ্ঞানবান মানুষের জন্য জরুরি। কেননা এসব বিজ্ঞানময় সৃষ্টি এক মহান বিজ্ঞানীর সু-নিপুণ সৃষ্টি ছাড়া সম্ভব নয়। একারণেই তাওহীদবাদী মুমিনদের জনক ইব্রাহিম (আ.) স্বীয় পিতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন-

قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'আর (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহিম তার পিতা আযরকে বলেছিল, 'তুমি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহরূপে গ্রহণ করছ? নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ও তোমার কওমকে স্পষ্ট গোমরাহীতে দেখছি'।' (আনআম ৬:৭৪)

ইব্রাহিম (আ.) নিজেও মহান রবের সৃষ্টির মধ্যে গবেষণা করেই তাওহীদের সন্ধান লাভ করেন। যা পরবর্তী আয়াতগুলোতে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে-

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ (৭৭) فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ

'আর এভাবেই আমি ইব্রাহিমকে আসমানসমূহ ও জমিনের রাজত্ব দেখাই এবং যাতে সে দৃঢ় বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। অতঃপর যখন রাত তার ওপর আচ্ছন্ন হল, সে তারকা দেখল, বললো, 'এইতো আমার রব'। অতঃপর যখন তা ডুবে গেল, তখন সে বললো, 'যারা ডুবে যায় আমি তাদের ভালোবাসি না'। অতঃপর যখন সে চাঁদ উজ্জ্বলরূপে উদীয়মান দেখল, বললো, 'এইতো আমার রব'। পরে যখন তা ডুবে গেল, বললো, 'যদি আমার রব আমাকে হিদায়াত না করেন, নিশ্চয়ই আমি পথহারা কওমের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব'। অতঃপর যখন সে সূর্য উজ্জ্বলরূপে উদীয়মান দেখল, বললো, 'এটা আমার রব, এটা সবচেয়ে বড়'। পরে যখন তা ডুবে গেল, তখন সে বললো, 'হে আমার কওম, তোমরা যা শরীক করো, নিশ্চয়ই আমি তা থেকে মুক্ত'। 'নিশ্চয়ই আমি নিবিষ্ট করেছি আমার চেহারা একনিষ্ঠভাবে তাঁর জন্য, যিনি আসমানসমূহ ও জমিন সৃষ্টি করেছেন। আর আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই'।' (আনআম ৬:৭৫-৭৯)

ইব্রাহিম (আ.) যেভাবে চন্দ্র-সূর্য ও তারকারাজির ওপর গবেষণা করে মহান রবের পরিচয় লাভ করেছেন। সেভাবেই সকলকে গবেষণা করতে হবে।

কিন্তু এই চন্দ্র-সূর্য ও তারকার কোনো ইবাদত করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِنْ كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

'আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ । তোমরা না সূর্যকে সিজদা করবে, না চাঁদকে। আর তোমরা আল্লাহকে সিজদা করো যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো।' (ফুস্‌সিলাত ৪১:৩৭)

রবের পরিচয়ের কয়েকটি চমৎকার দৃষ্টান্ত

আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, আল্লাহর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিচয় হচ্ছে তিনি রব। আর রব বলা হয় এক কথায় 'যিনি কোনো জিনিসের সৃষ্টির সূচনা থেকে পূর্ণতায় পৌঁছানো পর্যন্ত যখন যা প্রয়োজন সবকিছুই বিনা দরখাস্তে-বিনা আবেদনে নিজের থেকে বুঝে শুনে পূরণ করেন'। এটা আমরা পূর্বের আলোচনায় মানব সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর দিয়ে প্রমাণ করেছিলাম। এখন আমরা আরেকটি উদাহরণ পেশ করছি। আর তা হলো যেসকল প্রাণী ডিমের ভেতরে জন্ম নেয় সেগুলোর যখন দেহ তৈরি হয়ে যায় এবং রূহ চলে আসে তখন তারও খাদ্যের প্রয়োজন হয়। ডিমের ভেতরে খাদ্য আসবে কোথা থেকে? এখানে কোনো অর্থমন্ত্রী, খাদ্যমন্ত্রী বা কোনো বিজ্ঞানীর পক্ষে খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব নয়। আবার মায়ের নাভীর সঙ্গে সংযোগ দিয়ে খাদ্য সরবরাহ করাও সম্ভব নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের পক্ষ থেকে বুঝে শুনে বিনা দরখাস্তে বিনা আবেদনে ঐ ডিমের ভেতরের বাচ্চার জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, ডিমের ভেতরে দুটি অংশ। একটি সাদা লালা জাতীয়, আরেকটি হলুদ বর্ণের কুসুম। বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে, ডিমের হলুদ অংশ দিয়ে বাচ্চা তৈরি হয়। আর মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ বাচ্চার খাবারের জন্য ব্যবস্থা করলেন ডিমের অবশিষ্ট সাদা অংশ দ্বারা। অতঃপর যখন ডিমের ভেতরে বাচ্চা বড় হয়ে গেল এবং একপর্যায়ে ডিমের ভেতরের খাবারের গুদাম খালি হয়ে গেল, তখন সে কি করবে? আল্লাহ

সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে জ্ঞান দিলেন এবার তুমি দুনিয়াতে আসতে পারো। দুনিয়াতে আসার জন্য তুমি তোমার ঠোঁট দ্বারা তোমার চতুর্পাশ্বের প্রাচীরে আঘাত করো। এটা কোনো জেলখানার দুর্ভেদ্য প্রাচীরও নয় বা চীনের মহাপ্রাচীরও নয়। তুমি আঘাত করলে তা ভেঙে যাবে। বাচ্চা তখন ডিমের ভেতর বসে সমানভাবে চারপাশে আঘাত করতে থাকে। একপর্যায়ে যখন চতুর্পাশ্বের খোসা ভেঙে ফেললো এবারে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হুকুম দিলেন এখন তোমার মাথা দিয়ে ধাক্কা মারো। তখন সে মাথা দিয়ে ওপর দিকে ধাক্কা মারতে থাকে। একপর্যায়ে উপরের ছাদ সরে যায়, সে দুনিয়াতে বেরিয়ে আসে।

দুনিয়াতে আসার পর মনে হয় সে যেন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত। আপনি হয়তো লক্ষ্য করেছেন একটি হাঁসের ডিম থেকে হাঁসের বাচ্চা বের হলো, আরেকটি মুরগির ডিম থেকে মুরগির বাচ্চা বের হলো। দুটো বাচ্চাকে পানির কাছে নিয়ে যান। হাঁসের বাচ্চা পানি দেখলে আনন্দে মেতে উঠবে। দ্রুত পানিতে নেমে সাঁতার কাটতে শুরু করবে। সে যেনো বুঝতে পেরেছে পানি তার জন্য উপযুক্ত। পক্ষান্তরে একটি মুরগির বাচ্চাকে পানির কাছে নিয়ে গেলে সে পানি দেখে ভয় পায়। সে মরতে রাজি তবুও পানিতে নামতে রাজি নয়। কে শিক্ষা দিলো হাঁসের বাচ্চাকে পানি তার জন্য উপযুক্ত। আর কে শিক্ষা দিলো মুরগির বাচ্চাকে পানি তার জন্য উপযুক্ত নয়। যিনি শিক্ষা দিয়েছেন তিনি আর কেউ নন। তিনিই হচ্ছেন মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। আপনি আরো দেখবেন একটি মুরগির বাচ্চা যখন চিল দেখে তখন তার মা একটি আওয়াজ করলে সে দৌড়ে এসে তার মায়ের আঁচলের নিচে আশ্রয় নেয়।

শীত মওসুমে শীতপ্রধান দেশগুলোতে যখন অধিক ঠাণ্ডার কারণে পানি বরফ হয়ে যায়, পাখিদের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় খাবার সংগ্রহ করা এবং সেখানে থাকা কষ্টকর হয়ে যায় তখন তাদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হুকুম জারি করেন তোমরা এখন হিজরত করো। তারা ঐ দেশ থেকে উড়াল দিয়ে অন্য দেশে চলে যায়। অনেক পাখি বাংলাদেশেও চলে আসে। বাংলাদেশের হাওড়-বাঁওড় খাল-বিল, নদী-নালা সবকিছুকে মাতিয়ে তুলে। এদের এক দেশ থেকে আরেক দেশে যেতে কোনো পাসপোর্ট, ভিসা ও টিকিটেরও প্রয়োজন হয় না। উল্টো তাদের জন্য

অতিথি পাখি হিসেবে সতন্ত্র নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধা রয়েছে। তাদের হত্যা করা দণ্ডনীয় অপরাধ হিসেবে আইন রয়েছে। আবার যখন শীত চলে যায় তখন কি এরা এখানে বসে থাকে? না। তারা আবার তাদের আগের স্থানে চলে যায়। কে তাদের এই জ্ঞান দান করেছেন? তিনি আর কেউ নন। তিনিই হচ্ছেন মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।

একটি বাবুই পাখি যখন তালগাছে বাসা বাঁধে তখন কি সুন্দর করে তারা বাসা বানায়। বিভিন্ন কক্ষ তৈরি করে। স্ত্রীর মুখ যাতে দেখতে পায় সেজন্য নরম কাঁদা লাগিয়ে তার সঙ্গে জোনাকি পোকা ধরে এনে এঁটে দেয়। কারণ সেখানে তো আর বিদুৎ বিভাগের পক্ষ থেকে বিদুৎ সাপ্লাই দেয়া হয় না।

এমনকি আমাদের দেশের কুকুরগুলোর গায়ে পশম কম। বিদেশি কুকুরের গায়ে পশম বেশি থাকে। কারণ কি? কারণ সেখানে শীত বেশি। শীতের সময় মানুষ যখন কম্বল গায়ে দিয়ে শীত নিবারণ করে কুকুরগুলোর গায়ে কম্বল পড়াবে কে? আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের শরীরে পশম বাড়িয়ে দিয়ে তাদের জন্য একটি স্থায়ী কম্বলের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমাদের দেশের কুকুরদেরও যদি এরকম বেশি পশম থাকতো তাহলে গরমের দিনে মহিষ যেরকমভাবে পানিতে সাঁতরায় তেমনি কুকুরকেও পানিতে সাঁতরাতে হতো।

ঘোড়ার ঘাড়ে লম্বা পশম। কেন এই লম্বা পশম? এই পশমগুলো দিয়ে সে গরম নেয়। একইভাবে ইঁদুরের যে লম্বা লেজ এই লেজ দিয়ে সে তার শরীরে এয়ার কন্ডিশনের ব্যবস্থা করে। যখন তার শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে যায় তখন সে এই দীর্ঘ লেজ দিয়ে অতিরিক্ত তাপ বের করে দেয়। আবার যখন তাপমাত্রা কমে যায় তখন সে এই লেজ দিয়েই প্রয়োজনীয় তাপ বাড়ায়। কে এই মহা ব্যবস্থাপক। তিনি আর কেউ নন। তিনিই হচ্ছেন মহান রাব্বুল আলামিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। এজন্যই বলা হয়েছে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

'সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি জগতসমূহের রব।'

এভাবে সৃষ্টির প্রতিটি কণায় কণায় মহান রবের পরিচয় রয়েছে। এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার সৃষ্টিকে নিয়ে গবেষণা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'যারা আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে, (তারা বলে) হে আমাদের রব! তুমি কিছুই অহেতুক সৃষ্টি করোনি। আমি তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করছি। তুমি আমাদের জাহান্নামের আজাব থেকে রক্ষা করো।' (আল ইমরান ৩:১৯১)। মূলত সত্যিকার জ্ঞানী যারা তারা কখনো নাস্তিক হয় না। বরং তারা সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী হয়। আর যারা উদভ্রান্ত দিশেহারা বিজ্ঞানী তারাই কেবল নাস্তিক হয়ে থাকে। তারা স্রষ্টায় বিশ্বাসী নয়। বরং তারা মনে করে সবকিছুই প্রাকৃতিক নিয়মে চলে। এজন্য কোনো স্রষ্টার প্রয়োজন হয় না। অবশ্য নাস্তিক বিজ্ঞানীরা আবার দুইভাগে বিভক্ত। এক দলের বিশ্বাস সকল বস্তুই প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্ট এবং প্রাকৃতিক নিয়মেই চলতে থাকে। জীবন যুদ্ধে হেরে গিয়ে কেউ নিজের অস্তিত্বকে হারিয়ে ফেলে। আর কেউ বেঁচে থাকে। আরেকদল বিজ্ঞানী বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী। এরকম একজন প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানীর নাম ডারউইন। যিনি এই বিবর্তনবাদ নামক নাস্তিক আকিদার গোড়া-পত্তনকারী। একারণেই বিবর্তনবাদকে কেউ কেউ ডারউইনের মতবাদ বলে উল্লেখ করে থাকেন।

মানুষ কি বানর থেকে সৃষ্টি?

ডারউইনের বক্তব্য অনুযায়ী মানুষ বানর থেকে জন্মলাভ করেছে। বানর গাছে ঝুলতে ঝুলতে ঘঁষা লেগে লেগে এক সময় তার লেজ পড়ে যায় অতঃপর আস্তে আস্তে সোজা হয়ে হাঁটতে আরম্ভ করে। এভাবে পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন হয়ে মানুষে পরিণত হয়। বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যখন এই মতবাদ পড়ানো হয় তখন ডারউইনের মতবাদে বিশ্বাসী শিক্ষিত বানর অধ্যাপকেরা তাদের ছাত্রদের বলেন, তোমরা যদি বিশ্বাস না করো তবে পেছনের নিম্নাংশে হাত দিয়ে দেখো লেজের গোড়া ঠিকই দেখতে পাবে। তখন ছাত্ররা গোপনে পিছনে হাত দিয়ে দেখে ঠিকই তো লেজের গোড়া

পাওয়া গেছে। আর তারাও ভবিষ্যতে বানর সন্তান হওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত নেয়। অথচ এই শিক্ষিত নামের মূর্খ পণ্ডিতেরা একটু চিন্তা করে দেখেনা যে বানর যেমন পূর্বকালে ছিলো, তেমন বর্তমানেও আছে। বন-জঙ্গলে আছে, চিড়িয়াখানায় আছে। যারা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এখনও গাছের ডালে ডালে ঝুলছে। কিন্তু কই এখনতো কোনো বানরকে লেজ পড়তে দেখা যায় না। কোনো বানরকে সোজা হয়ে হাঁটতে দেখা যায় না। কোনো বানরকে অর্ধেক মানুষ, পোয় মানুষ, সিকি মানুষ দেখা যায় না। এখন সেই বিবর্তন বন্ধ কেন?

আসল বিষয় হলো সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাসী না হওয়ার কারণেই তারা নিজেদের বানরের বংশধর বলে বিশ্বাস করে। নতুবা কোনো প্রাণীর সাথে অন্য আরেকটি প্রাণীর মিল থাকার কারণে একটিকে অপরটির বংশধর জ্ঞান করা কোনো ক্রমেই উচিত নয়। পাবদা মাছ আর বোয়াল মাছ দেখতে প্রায় এক হলেও পাবদা মাছ কিন্তু বোয়াল মাছের পূর্বপুরুষ নয়। গজার মাছ, শৌল মাছ, টাকি মাছের মধ্যে মিল আছে, তাই বলে কি এগুলো একটি অপরটির পূর্ব পুরুষ? না, মোটেই নয়। ঠিক তেমনিভাবে মানুষের সাথে বানর, শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটাং ইত্যাদির অনেক মিল থাকলেও এরা মানুষের পূর্ব-পুরুষ নয়। মানুষের যেমন বানরের সঙ্গে মিল আছে, তেমন অনেক ক্ষেত্রে ইদুরের সঙ্গেও মিল আছে। তাই বলে কি বলতে হবে মানুষ ইদুরের থেকে জন্মগ্রহণ করেছে? তাছাড়া এই নাস্তিকদের যদি প্রশ্ন করা হয় তাহলে বানর কোথা থেকে সৃষ্টি হলো? হয়তো তারা বলবে ইঁদুর বা তেলাপোকা থেকে। আমরা তখন তাদের আবার প্রশ্ন করবো 'ঐ ইঁদুর বা তেলাপোকা কোথা থেকে সৃষ্টি হলো? তখন হয়তো তারা বলবে অন্য কোনো ক্ষুদ্র ইতর প্রাণী থেকে সৃষ্টি হয়েছে। এভাবে হয়তো একের পর এক চলতে থাকবে নতুবা ঘুরে আবার প্রথম জায়গায় আসতে হবে। মূলত এভাবেই তারা বিভ্রান্তির বেড়াজালে ঘুরপাক খেতে থাকবে। আর যারা মুমিন, কুরআন-সুন্নাহতে বিশ্বাসী তারা বিশ্বাস করে যে মানুষ আদম (আ.) থেকে সৃষ্টি। আর আদম (আ.) কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন।

পৃথিবী কি কোনো মহা বিস্ফোরণের ফসল?

কুরআন সুন্নাহতে বিশ্বাসী একজন মুমিন বিশ্বাস করে এই পৃথিবীসহ আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র এক কথায় মহাবিশ্ব আল্লাহ সুবহানাহু

ওয়া তা'আলা মহা পরিকল্পনায় সৃষ্টি হয়েছে। কোনো এক্সিডেন্ট বা কোনো দুর্ঘটনার ফসল নয়। কিন্তু ওহীর জ্ঞান না থাকার কারণে কতিপয় বিজ্ঞানী নিজেরাও বিভ্রান্ত হয়েছে এবং অপরকে বিভ্রান্ত করার জন্য একটা ভ্রান্ত মতবাদ ছড়িয়ে দিয়েছে। আর তা হলো এই পৃথিবী একটি মহা বিস্ফোরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তারা বিগব্যাঙ থিওরি আবিষ্কার করলো এবং খুবই উল্লসিত হলো। অথচ দুর্ঘটনা বা বিস্ফোরণ দিয়ে একটি সুন্দর কিছু পাওয়া যায় না। যেমন মনে করুন, দুটো দ্রুতগামী রেলগাড়ীর মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো। অসংখ্য লোহার টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। এই লোহা দিয়ে গরু জবাই করা বা গোশ্ত তৈরি করা ইত্যাদি কিছুই করা যাবে না। হ্যাঁ, ঐ লোহাগুলোকে কামারের হাপরের ভেতরে পুরে তারপরে দা বানিয়ে বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। এমনিভাবে মনে করুন দুটো দ্রুতগামী বাস মুখোমুখি সংঘর্ষ হলো। অসংখ্য গ্লাসের টুকরো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। এই গ্লাসের টুকরোকে এখনই চশমার গ্লাস বা আয়না হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। হ্যাঁ, ওটাকে কারিগরের কাছে নিয়ে নির্দিষ্ট সাইজ বানিয়ে তারপর কাজে লাগানো যেতে পারে। দুর্ঘটনার মাধ্যমে সৃষ্ট কোনো বস্তুকে সরাসরি কোনো কাজে সাধারণত ব্যবহার করা যায় না। তাই পৃথিবী যদি কোনো দুর্ঘটনা অথবা বিস্ফোরণের ফসল হতো তাহলে এটা বসবাসের উপযোগী হতো না। তবে এটা মনে করতে হবে সত্যিই যদি কোনো বিস্ফোরণের কারণে পৃথিবীর জন্ম হয়ে থাকে তাহলে সেই বিস্ফোরণটিও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মহা পরিকল্পনার কারণেই হয়েছে। কোনো অপরিকল্পিত দুর্ঘটনার কারণে নয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পৃথিবীর সৃষ্টি রহস্য সম্পর্কে বলেন-

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'বলো, 'তোমরা জমিনে ভ্রমণ করো, অতঃপর দেখ' কীভাবে তিনি সৃষ্টির সূচনা করেছিলেন, তারপর আল্লাহই আরেকবার সৃষ্টি করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।' (আনকাবুত, ২৯:২০)

পৃথিবী পরিভ্রমণ করো। কেননা পৃথিবীর ইতিহাস জানবার নির্ভরযোগ্য উপায় এটাই। এই পৃথিবীর ওপর দিয়ে কত যে ভূ-তাত্ত্বিক যুগ ও কাল

অতিবাহিত হয়ে গেছে, তা পৃথিবীর ইতিহাস জানলেই জানতে পারা যেতে পারে। যেহেতু মানুষ এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ম এবং তার বিকাশ ও উৎকর্ষের পর্যায়সমূহ প্রত্যক্ষভাবে দেখেন। এ কারণেই পৃথিবীর বিভিন্ন দিকে ঘুরে ঘুরে সব কিছুর সন্ধান করার নির্দেশ দিয়েছেন। কিভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই পৃথিবীর সৃষ্টিকর্ম শুরু করলেন, কালের ছয়টি অধ্যায় তা কিভাবে সম্পন্ন হলো তা অবশ্যই বুঝতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন-

مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ

'আমি তাদের আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টির সাক্ষী করিনি এবং না তাদের নিজেদের সৃষ্টির। আর আমি পথভ্রষ্টকারীদের সহায়তাকারী হিসেবে গ্রহণ করিনি।' (কাহাফ ১৮:৫১)

তাহলে একথাই সত্য যে, মানুষ সৃষ্টি কার্যক্রম আদৌ দেখতে পায়নি। কেননা মানুষ তখন বর্তমানই ছিলো না। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে তার খোঁজখবর নেওয়ার ও প্রকৃত তত্ত্ব জানবার জন্য চেষ্টা চালানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তারা অতীতের শিলা, এমন কি প্রস্তর অধ্যায়ন করে কিছু না-কিছু জানতে পারে। লর্ড হাট্টন এর একটি কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন-

Hutton enunciated the principle of uniformitarianism in 1785. It was beautifully restrated by play pair in 1802 and popularized by lycll in the munerous editions of his principles of Geology Hutton taught that the `present is the key to the past'. (W.D. Thornbury, principles of geomorphology pp16:35)

'পৃথিবীর ইতিহাস পৃথিবীর খোশার পরতে পরতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।'

তিনি মনে করতেন, বর্তমানই হচ্ছে অতীতের চাবিকাঠি। অর্থাৎ কুরআনের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা যদি ভূ-পৃষ্ঠে পরিভ্রমণ করি, তাহলে আমরা তার ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস পাঠ করতে পারব, যা নিম্নস্থ স্তরসমূহের পৃষ্ঠায় লুকিয়ে রয়েছে।

এতো কুরআনের কথারই প্রতিধ্বনি। কুরআন চৌদ্দশ' বছর পূর্বে যা বলেছে, একালের বিজ্ঞানীদের নিকট তারই সত্যতার স্বীকৃতি পাওয়া গেল।

বিজ্ঞানীরা একে বলেন: Principle of uniformitarianism
কুরআন বলা হয়েছে سِيرُوا فِي الْأَرْضِ পৃথিবীর অভ্যন্তরে পরিভ্রমণ করো سِيرُوا عَلَي الْأَرْضِ ‘পৃথিবীর ওপরে পরিভ্রমণ করো বলেনি।

পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগে অনুসন্ধান চালাতে হবে। সেজন্য প্রয়োজন হবে অনেক যন্ত্রপাতি, গবেষণাগার, তত্ত্ব ও তথ্য সংগ্রহের, তা নিয়ে আলোচনা-পর্যালোচনা করার। সেজন্য পৃথিবীর উপরিতল খুঁজে ফেলতে হবে এবং প্রাচীন জীবনের সন্ধানদাতা বস্তুগত চিহ্নের উদ্ধার কাজ করতে হবে ভূতাত্ত্বিক খনন কার্যের মাধ্যমে।

বস্তুগত আল্লাহর সৃষ্টি কর্মের সূচনা আমাদের জানতে হবে। পৃথিবীর সৃষ্টি-সূচনা সম্পর্কে প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ বাইবেল ধর্ম পুস্তক কি বলছে, তা এখানে উল্লেখ করছি।

আদি পুস্তকের ‘জগত সৃষ্টির বিবরণ’ এই শিরোনামে প্রথম অধ্যায়ে লিখিত রয়েছে-

‘আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি করিলেন। পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিলো এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল, আর ঈশ্বরের আত্মা জলের ওপর অবস্থিতি করিতে ছিলেন।’

এই কথাটির বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করলে কথাটি এই দাঁড়ায় যে, পৃথিবীর উপরিতল মূলত অত্যন্ত উত্তপ্ত ছিল ৪,৫০০ মিলিয়ন বছর পূর্বে। অতঃপর পৃথিবীর পানি বের হলো। যেমন কুরআনের আয়াতে বলা হয়েছে-

أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا

‘তিনি তার ভেতর থেকে বের করেছেন পানি ও তৃণভূমি।’ (নাযিয়াত ৭৯:৩১)

বিশ্ব সৃষ্টির পর্যায়ে কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে-

إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ

‘নিশ্চয়ই তোমাদের রব আসমানসমূহ ও জমিন ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন।’ (আরাফ ৭:৫৪)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা বলেন-

أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا

‘তোমাদের সৃষ্টি করা অধিক কঠিন, না আসমান সৃষ্টি? তিনি তা বানিয়েছেন। তিনি এর ছাদকে উচ্চ করেছেন এবং তাকে সুসম্পন্ন করেছেন। আর তিনি এর রাতকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং এর দিবালোক প্রকাশ করেছেন। এরপর তিনি জমিনকে বিস্তীর্ণ করেছেন।’ (নাযিয়াত ৭৯:২৭-৩০)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরো বলেন-

قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ (৯) وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (১০) ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ (১১) فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَحِفْظًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ

‘বলো, ‘তোমরা কি তাঁকে অস্বীকার করবে যিনি দু’দিনে জমিন সৃষ্টি করেছেন? আর তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ বানাতে চাচ্ছ? তিনিই সৃষ্টিকুলের রব’। আর তার উপরিভাগে তিনি দৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং তাতে বরকত দিয়েছেন, আর তাতে চারদিনে প্রার্থীদের জন্য সমভাবে খাদ্য নিরূপণ করে দিয়েছেন। তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন। তা ছিল ধোঁয়া। তারপর তিনি আসমান ও জমিনকে বললেন, ‘তোমরা উভয়ে স্বেচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আস’। তারা উভয়ে বললো, ‘আমরা অনুগত হয়ে আসলাম’। তারপর তিনি দু’দিনে আসমানসমূহকে সাত আসমানে পরিণত করলেন। আর প্রত্যেক আসমানে তার কার্যাবলী ওহীর মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন। আর আমি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপমালার দ্বারা সুসজ্জিত করেছি আর সুরক্ষিত করেছি। এ হল মহা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞের নির্ধারণ।’ (ফুসসিলাত ৪১:৯-১২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরো বলেন-

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

‘যারা কুফরি করে তারা কি ভেবে দেখে না যে, আসমানসমূহ ও জমিন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম’ (আম্বিয়া ২১:৩০)

এই সব কয়টি আয়াত সামষ্টিকভাবে বিশ্বলোকের মোটামুটি ইতিহাস বলে দিচ্ছে। আল্লাহ এই বিশ্বলোককে ছয়টি দিনে সৃষ্টি করেছেন। তার মধ্যে দু'টি দিন অতিবাহিত হয়েছে পৃথিবীর সৃষ্টি কর্মে। পৃথিবীতে ওপর থেকে পাহাড় বসিয়ে দিয়েছেন, আর অবশিষ্ট দু'দিনে পৃথিবীতে খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহ ও সঞ্চিত করে রেখেছেন। এই চার দিন। বাকি দু'দিনে আকাশমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন।

কথাটিকে মোটামুটি এরূপ করেও বলা যায়-

'আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পৃথিবী সৃষ্টির বিষয়ে বলছেন, আমরা পৃথিবীকে দু'দিনে সৃষ্টি করেছি। পরে সৃষ্টি কর্মকে এভাবে সমাপ্ত করেছি যে, তাতে উপরের দিক থেকে পাহাড় সংস্থাপিত করেছি এবং অবশিষ্ট দু'দিনে তাতে খাদ্য সামগ্রীর বরকত সঞ্চিত করে দিয়েছি।'

পৃথিবী সৃষ্টির মোট সময় চার দিন

চার দিনের দু'টি দিন সুদীর্ঘ কাল অধ্যায় অতিবাহিত হয়েছে পৃথিবীর সৃষ্টি কর্মে। আর দু'দিন সৃষ্টি কর্মকে পূর্ণত্ব দানের জন্য লেগেছে এভাবে যে, আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পাহাড়-পর্বত দ্বারা সে পৃথিবীকে সুসজ্জিত ও আকৃতি সম্পন্ন বানিয়ে দিয়েছেন, আর খাদ্য সামগ্রীর বরকত দিয়েছেন। এতে মোট সময় কাল চার দিন লেগেছে।

তা কি ভাবে? আল্লাহ তা'আলাই তার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি দু'দিনে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, পরে তার সৃষ্টিকর্ম সম্পূর্ণ করেছেন। তাতে সর্ব প্রকারের খাদ্য সামগ্রী সংগৃহও পাহাড় সংস্থাপনের কাজ করেছেন, কেননা তা পৃথিবী সৃষ্টিরই অংশ, তারই সহিত জড়িত। এই মোট অতিবাহিত হওয়া সময় কাল হচ্ছে চারদিন। প্রথমোল্লিখিত দু'দিন এই চারদিনেরই অংশ। কেননা পৃথিবী সৃষ্টিকর্ম সম্পন্ন হতে সর্বমোট চারদিনই ব্যয় হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পূর্বের আয়াতে সৃষ্টিকর্মের বিস্তারিত বিবরণ বলেননি। বলেননি সৃষ্টিকর্মের বিভিন্ন পর্যায়ে ও স্তরের কথা; কিন্তু একটা মোটামুটি ধারণা দিয়েছেন মাত্র। সুরা হা-মীম আস্ সাজ্‌দায় পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে বলেছেন। বলেছেন মূল পৃথিবী সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে দু'দিনে। এই দিন-এর সময় পরিমাণ কত? অপর আয়াতের আলোকে প্রথমে বলা যায়-

وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

'আর তোমার রবের নিকট নিশ্চয়ই এক দিন তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান।' (হজ্ব ২২:৪৩) এ পর্যায়ে দ্বিতীয় আয়াত-

يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

'তিনি আসমান থেকে জমিন পর্যন্ত সকল কার্য পরিচালনা করেন। তারপর তা একদিন তাঁর কাছেই উঠবে। যেদিনের পরিমাণ হবে তোমাদের গণনায় হাজার বছর।' (সিজদাহ্ ৩২:৫) এ পর্যায়ে দ্বিতীয় কথা বলা হয়েছে এ আয়তে-

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ

'ফেরেশতাগণ ও রূহ এমন এক দিনে আল্লাহর পানে ঊর্ধ্বগামী হয়, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।' (মা'আরিজ ৭০:৪)

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্টি কর্মকে সম্পন্ন করেছেন এ ভাবে যে, পৃথিবীতে তিনি পাহাড় সংস্থাপন করেছেন এবং তাতে সমস্ত খাদ্য সামগ্রীর বরকত সংরক্ষণ করেছেন চারদিনে।

এ হচ্ছে পৃথিবী সৃষ্টির ব্যাপার। এতে মোট চারদিন লেগেছে। এরপর মহান আল্লাহ বলেছেন-

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ

'তারপর তিনি আসমানের দিকে মনোনিবেশ করেন। তা ছিল ধোঁয়া।' (ফুসসিলাত ৪১:১১)

পৃথিবী সৃষ্টির পর এটা দ্বিতীয় নতুন পর্যায়। এভাবে পৃথিবী সৃষ্টি কর্ম সম্পন্ন করতে মোট চারদিন লেগেছে।

আর আকাশমণ্ডল সৃষ্টিতে মোট সময় অতিবাহিত হয়েছে দু'দিন। এভাবে সমগ্র সৃষ্টি কর্মে লেগে গেছে মোট ছয়দিন।

এটা মানুষের কল্পনার ব্যাপার নয়। যদিও মানুষ কর্তৃক বিকৃত তাওরাত এসব খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কুরআন মাজিদে পাঁচটি সুরা আল আ'রাফ, আন-নাযি'আত, আল-বাকারা, হা-মীম, আস সাজদাহ্ ও আল-আম্বিয়া থেকে যে আয়াতসমূহ উদ্ধৃত করেছি, এ সব আয়াত বলে দিচ্ছে, সৃষ্টি সূচনায় ধোঁয়া ছিল অনুভবন নিহারীকা বিশেষ, তার অণুগুলোর মধ্যে আল্লাহর كُـنْ হুকুমে গতিশীলতার

সৃষ্টি হয়েছিলো কিভাবে এবং এই ধোঁয়াময় মহা নিহারীকা থেকে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী স্বতন্ত্র অস্তিত্ব লয়ে কিভাবে বের হয়ে এসেছিল। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে-

كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا

'আসমানসমূহ ও জমিন ওতপ্রোতভাবে মিশে ছিল, অতঃপর আমি উভয়কে পৃথক করে দিলাম'(আম্বিয়া ২১:৩০)

পৃথিবী কি করে সৃষ্ট হলো, কি করে তা জমাট বাঁধল, কি করে গড়ে উঠলো পৃথিবীর ছোলা বা চর্ম, তার পানি বের হলো, তার প্রয়োজনীয় খাদ্য পানীয় জোগাড় ও সঞ্চিত হয়েছিলো, পৃথিবীর বুকে ছোট বড় উঁচু পাহাড় গড়ে তোলা হয়েছিল আল্লাহর দিনে মাত্র চারটি দিনে-চারটি কাল অধ্যায়ে। আর অন্য দু'টি দিনে বা কাল অধ্যায়ে কিভাবে মহাকাশ ও তার গবেষণার বিষয়।

বিশ্বলোকের সৃষ্টির ইতিহাস বলা হয়েছে বহু কয়টি আয়াতে। পৃথিবীর ভূ-তাত্ত্বিক ইতিহাস সম্পূর্ণ বলা হয়েছে মাত্র একটি আয়াতে। আর ভুগোলবিদ্যা, ভূ-তত্ত্ব, ভূ-গোল, জীবজগত এবং উপরিমণ্ডলীয় বা গাগণিক তত্ত্ব-এই সব কিছুই আমরা মাত্র তিনটি আয়াতে উল্লেখ পাচ্ছি।

সে আয়াত তিনটি হলো এই,

إِنَّ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

'নিশ্চয়ই আসমানসমূহ ও জমিনে মুমিনদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং যে জীব জন্তু ছড়িয়ে রয়েছে তাতে নিদর্শনাবলী রয়েছে সে কওমের জন্য যারা নিশ্চিত বিশ্বাস স্থাপন করে। আর রাত ও দিনের পরিবর্তনে, আল্লাহ আসমান থেকে যে পানি বর্ষণ করেন তারপর তা দ্বারা জমিনকে তার মৃত্যুর পর পুনর্জীবিত করেন তাতে এবং বাতাসের পরিবর্তনে সে কওমের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে যারা বোঝে।' (জাসিয়া ৪০:৩-৫)

আসমান ও জমিন মিলিতভাবে যে বিশ্বলোক গড়ে, তাতে ঈমানদার লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে। এই নিদর্শন যেমন আল্লাহর

অস্তিত্ব ও একত্ব অকাট্যভাবে প্রমাণ করে, তেমনি স্বয়ং এইগুলো নিয়ে গভীর চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা করার বিরাট অবকাশ রয়েছে মহাসত্য ও গভীর তত্ত্ব আবিষ্কার করার জন্য।

আল্লাহর পরিচয় : মহাকাশ পর্ব

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

'বিশ্বজগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমি তাদের আমার নিদর্শনাবলী দেখাব যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, এটি (কুরআন) সত্য; তোমার রবের জন্য এটাই যথেষ্ট নয় কি যে, তিনি সকল বিষয়ে সাক্ষী?' (ফুসসিলাত ৪১:৫৩)

এই আয়াতে বিশ্ব জগতের মধ্যে আল্লাহর নির্দশনাবলীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা এখন বিশ্ব জগতের বিভিন্ন স্তরে আল্লাহর নিদর্শনাবলীর মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় লাভ করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

প্রথমেই মাহাকশ পর্ব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে মহাকাশের বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে কোথাও বিস্তারিতভাবে আবার কোথাও সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করেছেন। বর্তমান আধুনিক বিশ্বের মহাকাশ বিজ্ঞানীরা মহাকাশ গবেষণার জন্য বড় বড় সংস্থা তৈরি করেছেন। কখনো বা শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে আবার কখনো বিভিন্ন যন্ত্র পাঠানোর মাধ্যমে, আবার কখনো সরাসরি নিজেরা যাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। অথচ তারা দীর্ঘ গবেষণার পর যা কিছু আবিষ্কার করছেন পবিত্র কুরআনে তার সব কিছুই উল্লেখ রয়েছে। মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের সামান্য আলোচনা আমরা নিম্নে তুলে ধরার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

আকাশমণ্ডলের অবস্থান পর্যায়ে, কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে-

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

'আল্লাহ, যিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ উঁচু করেছেন যা তোমরা দেখছ।' (রাদ ১৩:২)

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا

'আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। তিনি খুঁটি ছাড়া আসমানসমূহ সৃষ্টি করেছেন, যা তোমরা দেখছ।' (লোকমান ৩১:২-৩)

আয়াতদ্বয়ে ব্যবহৃত تَرَوْنَهَا শব্দের বিন্যাসে কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে, একটি এই, তোমরা নিজেরাই দেখছ যে, আকাশমণ্ডল কোনো স্তম্ভ বা নির্ভরের ওপর ভর করে উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে নয়। বরং কোনোরূপ স্তম্ভ বা নির্ভর ছাড়াই তা উর্ধ্ব স্তরে অবস্থিত হয়ে আছে। আর দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে, আকাশমণ্ডল পৃথিবী ছাড়া উর্ধ্বলোক অবস্থিত সব কিছু এমন সব স্তম্ভের ওপর ভর করে উর্ধ্বস্তরের মহাশূন্য অবস্থিত হয়ে আছে, যা তোমরা দেখতে পাও না, তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয় না। স্তম্ভ তো অবশ্যই আছে; কিন্তু তা তোমাদের গোচরীভূত হচ্ছে না। আগের কালের তাফসীর লেখকরা আলোচ্য আয়াতের এই দুই ধরনের অর্থই প্রকাশ করেছেন। তবে ইব্‌ন আব্বাস (রা.) ও মুজাহিদ (রহ.) দ্বিতীয় অর্থটি গ্রহণ করেছেন। আধুনিক জোর্তিবিদ্যার দৃষ্টিতে এ আয়াতের তাৎপর্য এভাবে বলা যায়, সমগ্র আকাশ জগতে সীমা-সংখ্যাহীন বিরাট বিরাট তারকা, নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহ, সূর্য ও চন্দ্র নিজের নিজের কক্ষে অদৃশ্যমান আকর্ষণে (মধ্যকর্ষণ) স্থিত হয়ে রয়েছে। এগুলোকে উপরে মহাশূন্যে ধরে রাখা বা বেঁধে রাখার জন্য কোনো স্তম্ভ বা দড়ি-রশি নেই। একটিকে অপরটির ওপর পড়ে যাওয়া থেকে ঠেকানোর মতো কোনো প্রতিবন্ধক বা সুত্র দৃষ্টিগোচর হয় না। শুধু মধ্যাকর্ষণ শক্তিই এই বিরাট বিশাল ব্যবস্থাকে সুদৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত ও দৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ করে রেখেছে। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

'যিনি সাত আসমান স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। পরম করুণাময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোনো অসামঞ্জস্য দেখতে পাবে না। তুমি আবার দৃষ্টি ফিরাও, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি?' (মূলক ৬৭:৩)

একটি জিনিসের সহিত অপর একটি জিনিসের খাপ খাওয়ানো ও সামঞ্জস্যশীল হওয়া এবং সমগ্র সৃষ্টিকর্মে কোনোরূপ অসঙ্গতি, সামঞ্জস্যহীনতা, একটির সহিত অন্যটির অমিল, খাপ না খাওয়া বা বেমিল

হওয়া, পরস্পর থেকে বিপরীত ধর্মী বা সাংঘর্ষিক হওয়ার কথা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করা হয়েছে। এ আয়াতে এবং সৃষ্টিলোকের প্রতিটি অংশের সহিত অপর অংশের প্রতিটি বিন্দু ও কোষের সহিত অপর প্রতিটি বিন্দুও কোষের পূর্ণ মিল সামঞ্জস্য ও পরিপূরকতা থাকার কথা স্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে। আকাশমণ্ডলের একটি অংশের অপর অংশগুলোর ওপর এভাবে বিস্তীর্ণ হয়ে থাকা যে, এটি অন্যটিকে ঢেকে ফেলে এই অবস্থার কথাই বলা হয়েছে আয়াতটিতে। বস্তুত দূর উর্ধ্বলোকের অসীম গভীরতায় যে সব অবয়ব (Celestial boides) রয়েছে, সেগুলোর অবস্থান একটির থেকে অপরটির দূরে বহু দূরে অবস্থান গ্রহণের বাস্তব অবস্থা লক্ষ্য করেই তা নিঃসন্দেহে মেনে নিতে হয়। বলা হয়েছে-

وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ

'আমি নিকটবর্তী আসমানকে প্রদীপপুঞ্জ দ্বারা সুশোভিত করেছি।' (৬৭:৫)

'নিকটবর্তী আকাশ' বলতে আকাশমণ্ডলের সে স্তরকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার তারা নক্ষত্র ও গ্রহ-উপগ্রহসমূহ আমরা খোলা চোখে দেখতে পাই, যেসব আকাশমার্গীয় অবয়ব খোলা চোখে দেখা যায়। যা প্রথমোক্ত স্তরের পিছনে রয়েছে এবং তথায় অবস্থিত অবয়বসমূহ দেখার জন্য দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের আবশ্যক হয়, তা সবই দূরবর্তী আকাশ। আর এসব যন্ত্র দ্বারাও যে সব দেখা যায় না, যা দূর পাল্লার যন্ত্রও দেখতে পারে না, তা আরও দূরবর্তী আকাশ।

বিশ্বলোকের বিশালতা

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ

'তারা কি তাদের ওপরে আসমানের দিকে তাকায় না, কিভাবে আমি তা বানিয়েছি এবং তা সুশোভিত করেছি? আর তাতে কোনো ফাটল নেই।' (ক্বাফ ৫০:৬)

'মহাকাশ' বলতে সমগ্র উর্ধ্বজগত বোঝানো হয়েছে। মানুষ দিনরাত এই মহাকাশকে নিজেদের ওপর সমাচ্ছন্ন ও পরিবেষ্টনকারীরূপে দেখতে পায়। দিনের বেলা সূর্যোদয় হয়, আর রাত্রিবেলা চন্দ্র ও সীমা সংখ্যাহীন গ্রহ-নক্ষত্র তারকা শুভ্র-সমুজ্জ্বল হয়ে নীল আকাশে ভাসমান হয়ে দেখা দেয়।

মানুষ তা নিজেদের খোলা চোখেই দেখতে পায়। মানুষ তা দেখে অবশ্যই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হয়। কিন্তু দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দেখলে এমন এক বিরাট-বিশাল বিশ্বলোক তার সম্মুখে প্রতিভাত হয়ে উঠে, যার কোনো সীমা শেষ পাওয়া যায় না।

কোনখান থেকে তা সূচনা হয়েছে এবং কোথায় পৌঁছে তা হারিয়ে গিয়েছে, তা বুঝতে পারা যায় না। আমাদের এই পৃথিবীর তুলনায় লক্ষ লক্ষ গুণ বড় বিরাট-বিরাট গ্রহ-উপগ্রহ তাতে লাটিমের মতো সদা ঘূর্ণায়ন ও আবর্তনশীল হয়ে রয়েছে। আমাদের সূর্য থেকেও সহস্রগুণ বেশি উজ্জ্বল তারকা সেখানে জ্বলজ্বল করছে। আমাদের এই গোটা সৌরলোক তার কেবলমাত্র একটি ছায়াপথের (Galaxy) একটি কোণে পড়ে রয়েছে। এই একটি মাত্র ছায়াপথে আমাদের সূর্যের ন্যায় অন্তত তিনশ' কোটি অন্যান্য স্থিতিশীল (ثَوَابِتٌ Fixed Star) নক্ষত্র বর্তমান রয়েছে এবং এখন পর্যন্তকার মানবীয় পর্যবেক্ষণ এমন এমন দশ লক্ষ ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই লক্ষ লক্ষ ছায়াপথ গুলোর মধ্যে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী ছায়াপথটি এতটা দূরত্বে অবস্থিত যে, তার আলো প্রতি সেকেন্ডে এক লক্ষ ছিয়াশী হাজার মাইল গতিতে চলে দশ লক্ষ বছরে পৃথিবীতে পৌঁছায়। এটা মহাবিশ্বের কেবলমাত্র সেই অংশের ব্যাপকতা বিশালতার হিসাব, যার আজ পর্যন্ত মানুষের জ্ঞান ও পর্যাবেক্ষণে ধরা পড়েছে। কিন্তু আল্লাহর এই মহা সাম্রাজ্যের বিশালতা ও বিস্তৃতি যে কতখানি, সে বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ধারণা করা মানুষের সাধ্যাতীত। এমনও হতে পারে যে, একবিন্দু পানির তুলনায় মহাসমুদ্র যতটা বড় ও বিশাল, মানুষের জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণে আমাদের মহা বিশ্বলোকের তুলনায় আল্লাহর সাম্রাজ্যের বিরাটত্ব তার অপেক্ষাও অনেক বেশি বিরাট বিশাল হবে।

এই বিস্ময়োদ্দীপক বিশালতা সত্ত্বেও এই বিরাট বিস্তীর্ণ মহাবিশ্ব ব্যবস্থা একটি ধারাবাহিক, পরস্পর সম্পর্কিত ওতপ্রোত জড়িত ও সুদৃঢ় ব্যবস্থা এবং তার বন্ধন ও গ্রন্থণা এতই দৃঢ় ও দুর্ভেদ্য যে, তার কোথায়ও কোনোরূপ ফাটল বা অসামঞ্জস্যতা দেখতে পাওয়া যাবে না। তার ধারাবাহিকতা কোথায়ও গিয়ে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি বোঝানো যেতে পারে। আধুনিক কালের রেডিও জোতির্বিদরা একটি ছায়াপথ মালার পর্যবেক্ষণ করেছে, সেটিকে তাঁরা বলেনঃ Source ও এ,

২৯৫ এ সম্পর্কে তাঁদের ধারণা হলো, তার যেসব আলোরেখা এখন আমাদের পর্যন্ত পৌঁছাচ্ছে, তা ৪০ শত কোটি বছর হতেও বেশিকাল পূর্বে সেখান থেকে যাত্রা শুরু করেছিলো। এই দূরতম দূরত্ব থেকে এই আলোরেখাসমূহের পক্ষে পৃথিবীর ওপর পর্যন্ত পৌঁছা কি করে সম্ভবপর হত যদি পৃথিবী ও সেই ছায়াপথমালার মাঝে বিশ্বলৌকিক ধারাবাহিকতা ও সংলগ্নতা (Contiguity) কোনো স্থানে ছিন্ন হয়ে থাকত, যদি বিশ্বলোক অখণ্ড অবিচ্ছিন্ন একক না হত ও তার বন্ধনে কোথায়ও ফাটল বা ছিন্নতা বর্তমান থাকত?

চারশ, কোটি আলোকবর্ষের (Light years) দূরত্ব থেকে এই আলোকোচ্ছটাসমূহের পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছা এবং এখানে মানুষের তৈরি যন্ত্রপাতিতে তা ধরা পড়া থেকেই নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় যে, সেই ছায়াপথ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমগ্র জগতটি ক্রমাগত ধারাবাহিকতা সম্পন্ন ও এক অখণ্ড অভিন্ন বস্তু বা মৌল উপকরণ থেকেই সৃষ্ট। একই ধরনের শক্তি তাতে কার্যকর ও কর্মে নিয়োজিত হয়ে রয়েছে এবং কোনোরূপ পার্থক্য ও বিভেদ ভিন্নতা ব্যতীত তা সব একই ধরনের নিয়ম-বিধান অনুযায়ী কাজ করছে। তা না হলে এই আলোকোচ্ছটাসমূহ পৃথিবী পর্যন্ত পৌঁছতে পারত না। এবং মানুষ, পৃথিবী ও তার পরিবেশে কার্যকর নিয়ম বিধানের জ্ঞান অর্জন করে যেসব যন্ত্রপাতি নির্মাণ করেছে তাতে তা ধরাও পড়ত না।

বিশ্বলোকের সীমা

গ্রহ-নক্ষত্র ও তারকারাজি সমন্বিত মাহবিশ্বলোক কি স্বসীম, না অসীম? Finite or infinite? তা নিয়ে বিশ্বের প্রধান প্রধান চিন্তাবিদ বৈজ্ঞানিকরা বহুকাল থেকেই গভীর গবেষণায় নিমগ্ন রয়েছেন বহু বছর কাল পূর্ব থেকেই। কিন্তু আজ পর্যন্ত এ বিষয়ের চূড়ান্ত ও দৃঢ় প্রত্যয় সমৃদ্ধ কোনো কথা বলা কি কারো পক্ষেই সম্ভবপর হয়েছে?

এই জগতের সীমা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা নানা ধারণা পেশ করেছেন। কোনো কোনো বিজ্ঞানীর মতে সমস্ত গ্রহ-উপগ্রহ আর অসংখ্য তারকাপুঞ্জ সীমাহীন মহাশূন্যে এক ক্ষুদ্র অংশে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। এই ধারণার সমর্থকরা বিশ্বাস করেন যে, যদি পৃথিবী থেকে মহাশূন্যে একই পথে অর্থাৎ সরলরেখা

বরাবর চলা যায়, তা হলে কোনো এক সময়ে তা যত বেশিই হোক, হয়ত বা এই সমগ্র জগত অতিক্রম করা সম্ভব হবে। এর বাইরে কোনো বস্তু কণা নেই, আছে শুধু শূন্যতা। এই শূন্যতার শেষ কোথায়, তা বিজ্ঞানীদের কল্পনারও অতীত। নিউটন ছিলেন এই ধারণার একজন প্রভাবশালী সমর্থক।

আলবার্ট আইনস্টাইন যদিও জগতের সীমাবদ্ধতা স্বীকার করতেন, কিন্তু নিউটনের ধারণাকে তিনি সম্পূর্ণ সঠিক হিসেবে গ্রহণ করেননি। তার মতে বিশ্বজগতকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে অনন্ত অসীমের সঠিক হিসেবে গ্রহণ করেননি। তার মতে বিশ্বজগতকে সম্পূর্ণ অতিক্রম করে অনন্ত অসীমের সন্ধান কখনই মিলবে না। তার এই ধারণার পেছনে ছিল আপেক্ষিক তত্ত্ব যুক্তি।

নিউটন মনে করতেন, আলো সর্বদা সরল পথে চলে। তাই আলোর গতি পথকেই তিনি সরল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আলোর গতি ১৮৬০০০ মাইল প্রতি সেকেন্ডে। এ গতিতে যে দূরত্ব এক বছর মানের মধ্যে অতিক্রান্ত হয়, তাকে বলে এক আলোকবর্ষ। আমাদের পৃথিবী থেকে দূরতম নক্ষত্রটি ২৭ হাজার আলোকবর্ষ দূরত্বে রয়েছে। আর এ ব্যবস্থার অধিক ক্ষুদ্র কেন্দ্রের দিকে দূরতম নক্ষত্র ৫৪০০ আলোকবর্ষ দূরত্বে অবস্থিত। তাই উপরোক্ত মহাশূন্যে তারকাকে এক দিকে চলার জন্য আলোর গতিপথকেই অনুসরণ করতে হবে। যদিও মাধ্যাকর্ষণহীন স্থানে আলো সরলরেখা বরাবর চলতে থাকে, আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুসারে আলো মধ্যাকর্ষণের প্রভাবে চতুর্দিকে বৃত্তাকার পথে বেঁকে যায়। বিভিন্ন উচ্চতা সম্পন্ন তারকার যেদিক থেকে আলো এসেছিল বেঁকে ঠিক সেই দিকেই ফেরা যেতে পারে। এ থেকে প্রমাণ করতে চাওয়া হয়েছে যে, এই বস্তুজগত সীমাবদ্ধ।

এক হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরের নক্ষত্রপুঞ্জ আবিষ্কার দৈনিক পত্রিকায় ওয়াশিংটন থেকে পাওয়া একটি খবরের এ ছিল চাঞ্চল্যকর সংবাদ। ১৯৮১ সালের ১লা মার্চ বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা থেকে পাওয়া এ সংবাদে বলা হয়েছিলো যে, পৃথিবী থেকে এক হাজার কোটি আলোক বর্ষ দূরে অবস্থিত বিরাট নক্ষত্রপুঞ্জ এই প্রথমবারের মতো আবিস্কৃত হয়েছে। এই বিপুল দূরত্বে অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জ হয়তো নির্ধারণ করতে পারবে বিশ্বলোক

সীমাহীনভাবে প্রসারিত হচ্ছে, না ক্রমেই স্বসীম বিশ্ব অন্তর্মুখী সংকোচনের মাধ্যমে ধ্বংসের দিকে চলেছে।

ক্যালিফোর্নিয়া এবং আরি জোয়ানা থেকে তিনজন বিজ্ঞানী নাসামণ্ডলে একান্ত দূরবর্তী জ্যোতিষ্ক নিয়ে এই নক্ষত্রপুঞ্জের খবরটি জ্যোতিপদার্থ (জ্যোতিভৌত) সাময়িকীতে পরের দিন অর্থাৎ ২রা মার্চ প্রকাশিত হয়েছে।

এক আলোক বর্ষ ৬ কোটি মাইলের সমান এবং এটা ইতিপূর্বে সর্বাপেক্ষা দূরবর্তী আবিস্কৃত নক্ষত্রপুঞ্জের দূরত্ব থেকে ৮০০ আলোক বর্ষ দূরে। বিজ্ঞানীদের অন্যতম বার্ষলের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ড. হাইরন স্পিনার্ড বলেন যে, নব আবিস্কৃত নক্ষত্রপুঞ্জ ছায়াপথ থেকে বৃহত্তর।

ছায়াপথে প্রায় ১০ কোটি নক্ষত্র রয়েছে। তিনি বলেন, নবাবিস্কৃত নক্ষত্রপুঞ্জের উজ্জ্বলতা উৎপাদনের জন্য সূর্যের মতো এক কোটি নক্ষত্রের প্রয়োজন।

ড. স্পিনার্ড বলেন, এরূপ বিপুল দূরত্বে অবস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জের দেখা পাওয়ার ফলে এই প্রশ্নের জওয়াবের পক্ষে সহায়ক হবে যে, এই বিশ্বালোক উন্মুক্ত কিনা এবং অনির্দিষ্টকাল ধরে তা সম্প্রসারিত হচ্ছে, অথবা বিশ্ব স্বসীম এবং এর পরিণতিতে বিশ্ব অন্তর্মুখী সংকোচনের ফলে ধবংস হয়ে যাবে।

পবিত্র কুরআন মাজিদে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন-

وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ

'আর আমি হাতসমূহ দ্বারা আকাশ নির্মাণ করেছি এবং নিশ্চয়ই আমি শাক্তিশালী।' (যারিয়াত ৫১:৪৭)

তাফসীরের কোনো কোনো কিতাবে **لَمُوْسِــعُوْنَ** শব্দের দুটি অর্থ লিখেছেন। একটি শক্তি সামর্থ্য সম্পন্ন হওয়া। আর দ্বিতীয়টি, বিশালতা ও বিপুলতা দানকারী; বিস্তৃতি সৃষ্টিকারী। কিন্তু আমার মনে হয়, এখানে প্রথম অর্থটি অবান্তর, অপ্রয়োজনীয় বরং দ্বিরুক্তি পর্যায়ের। কেননা আল্লাহর যে আকাশমণ্ডল সৃষ্টির ক্ষমতা ও সামর্থ আছে, বর্তমান বিশ্বই তার অকাট্য ও বাস্তব প্রমাণ। তা ছাড়া তাঁর ক্ষমতা-সামর্থ্যের কথা তো **بِاَيْــدٍ** শব্দেই বলা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে তৃতীয়বারে বলা যে, 'আমরা তা করতে সক্ষম' আল্লাহর কালামে এই দ্বিরুক্তি সম্পূর্ণ অকল্পনীয়। তাই আমার বিশ্বাস, দ্বিতীয়

অর্থটিই এখানে একমাত্র অর্থরূপে গ্রহণীয়। বিশেষত শাব্দিক অর্থে যখন তা পুরামাত্রায় স্বীকৃত প্রশস্ততা, উন্মুক্ততা ও বিস্তৃতি দান। এই শব্দটির তাৎপর্য নিহিত গোটা আয়াতের পূর্বাপর সামঞ্জস্যশীলও এই অর্থটিই সুরার শুরুর কথার সহিত এই অর্থেরই মিল রয়েছে। আল্লামা তাবাতাবায়ীও এর অর্থ লিখেছেন تَوْسِعَةَ خَلْــقِ الــسَّمَاءِ 'আকাশমণ্ডল সৃষ্টিতে বিশালতা বিস্তৃতি ও উন্মুক্ততা দান'। সাইয়্যেদ কুতুব শহীদ ও আয়াতটির বিশ্লেষণে এই দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। আল্লামা ইবনুল জাওযী لَمُوْسِــعُوْنَ-এর পাঁচটি অর্থ লিখেছেন। তার একটিতে ইব্‌ন যায়িদের উক্তি হিসেবে উল্লেখ করেছেন- لَمُوْسِــعُوْنَ 'আকাশমণ্ডলে প্রশস্ততা, উন্মুক্ততা, বিস্তৃতি ও বিশালতা দানকারী।'

এ পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, এডিংটন এবং বার্ট্রান্ড রাসেল বিশ্বলোকের যে, উন্মুক্ততা, বিস্তৃতি ও বিশালতা সৃষ্টি হওয়ার কথা বলেছেন এবং বাস্তব ঘটনা দ্বারাও যা প্রমাণিত হয়, কুরআন তা চৌদ্দশ' বছর আগেই বলে দিয়েছে।

কিন্তু আকাশমণ্ডলের এই বিশালতা বিস্তৃতি ও উন্মুক্ততা প্রমাণ করা যে, আকাশমণ্ডলের অবয়বসমূহের পারস্পরিক বন্ধনের দৃঢ়তায় কি ধীরে ধীরে শিথিলতা আসছে, কিংবা এই পাস্পরিক বন্ধনটাই ঐকান্তিক যতটা ইচ্ছা বেড়েও যায়, আর প্রয়োজন হলে কমেও যায়। অথবা এই বিস্তৃতি বিশাল বা ক্রমশই বিশ্বলোকের চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আল্লাহ ছাড়া কারুরই তা জানা নেই।

অথবা এও হতে পারে যে, নতুন নতুন জনপদের সৃষ্টি করছেন, মহাশূন্যের মাহাকাশেও তিনি নিত্য নতুন জ্যোতিষ্কমণ্ডলির সৃষ্টি করে চলেছেন এবং যখনই তা পুরাপুরি গঠিত হয়ে যায়, তখন তা পৃথিবীর দূরবিন বা অণুবীক্ষণ যন্ত্রে ধরা পড়ে যায়। এক হাজার কোটি আলোকবর্ষ দূরত্বে যে নক্ষত্রপুঞ্জের সংবাদ পাওয়া গেছে, হতে পারে তা এই পর্যায়েরই এক নবতর সৃষ্টি; কিংবা পূর্ব সৃষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জের পৃথিবীর দূরতম পাল্লাভেদী টেলিস্কোপে নতুন করে ধরা পড়া।

প্রকৃত সত্য মহান আল্লাহই জানেন।

মহাকাশ তত্ত্ব

'সেরাস' একটি ছোট্ট গ্রহাণু। মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝখানের কক্ষপথ ধরে হাজার হাজার ছোট ছোট গ্রহের দ্বীপপুঞ্জ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। এদেরই বলা হয় গ্রহাণুপুঞ্জ। এদের কোনোটির ব্যাস ৫০০ মাইল, আবার কোনোটির ২০০ মাইল। এদের চেহারা অন্যান্য গ্রহের মতো গোল নয়। এদের ওপর সূর্যের প্রতিফলিত আলো বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এদের উজ্জ্বলতায় বেশ তারতম্য ঘটে। এ থেকে অনুমান করা হতো, এদের চেহারা অমসৃণ এবং ঠিক গোল নয়। মঙ্গল গ্রহে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করার পর এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে। মাঝখানে ৫০০ মাইল ব্যাস বিশিষ্ট একটা ক্ষুদ্র গ্রহ আবিষ্কার করেন। গ্রিক পৌরাণিক দেবতার নাম অনুসারে তিনি এই ক্ষুদ্র গ্রহের নামকরণ করেন 'সেরাস'। মনে করা হয়েছিল, সেরাসই বুঝি সৌর মণ্ডলের ক্ষুদ্রতম গ্রহ। কিন্তু পরবর্তীতে সাত বছরের মধ্যে এই রকম আরও তিনটি গ্রহাণুর অবস্থান জানা গেল। তার পরে জানা গেল আরও এক হাজারেরও বেশি গ্রহাণুর অবস্থান। আজ পর্যন্ত জ্যোতির্বিদরা প্রায় ১৬০০টি গ্রহাণুর চেহারা ও অবস্থানের একটা ক্যাটালগ তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন। অনুমান করা হচ্ছে, এই গ্রহাণুর সংখ্যা ৩০ হাজারের মতো। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এই গ্রহাণুপুঞ্জ সম্বন্ধে আরও বেশি করে জানবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মঙ্গল গ্রহ ছাড়িয়ে যে কোনো মহাকাশ যাত্রায় এই গ্রহাণুপুঞ্জ যেন বাধা হয়ে না দাঁড়ায় তাই ছিল তার কারণ। ৭০ দশকে প্রথম মানুষবিহীন মহাকাশ যা 'পাইওনিয়র এক্স' এই গ্রহাণুপুঞ্জের ব্যূহ ভেদ করে নির্বিঘ্নে বৃহস্পতির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই গ্রহাণুপুঞ্জ সৌরজগত সৃষ্টি ও জীবন সৃষ্টির মূল রহস্যের ওপর আলোকপাত করতে পারবে। মঙ্গলের কৃত্রিম উপগ্রহ মারফত গ্রহাণুদের যে স্পেক্টোগ্রাফিক ফটো পাওয়া গেছে, সেগুলো 'কম্পিউটার এনালাইসিস' করার পর একটা আশ্চর্য জিনিস লক্ষ্য করা গেছে। আর তা হলো, এই সব গ্রহাণুপুঞ্জের বুকে এক ধরনের ভারী মৌলিক পদার্থের প্রচুর সঞ্চয় রয়েছে। এই গ্রহাণুপুঞ্জের কম্পোজিশন আর মহাকাশ থেকে ছুটে আসা উল্কাখণ্ডের কম্পোজিশন এক। কিছু কিছু উল্কাখণ্ড বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করার পর এই অজানা ভারী মৌলিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীদের এই মৌলিক পদার্থটির বিশ্লেষণ থেকে জানা গেছে, স্পেস ফুয়েল সমস্যার

সমাধান এই জিনিসটার দ্বারা হওয়া সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে গ্রহাণুপুঞ্জ থেকে এই ভারী মৌলিক পদার্থ আহরণ করা। আমেরিকান বিজ্ঞানী সরকারের আনুকূল্য সামর্থ নিয়ে ছোট গ্রহাণু 'এরোস' থেকে উক্ত ভারী পদার্থ আহরণের জন্য একটি প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করেছিলেন ড. পল নামক এক জ্যোতির্বিজ্ঞানী। এরোস-এর রয়েছে অনন্ত ধনভাণ্ডার। আর তাতে যে ভারী পদার্থ রয়েছে তা হচ্ছে প্লাটিনাম। সেরাস-এ জমা থাকা প্লাটিনামের মূল্য হবে প্রায় ছ'শ পঞ্চাশ লক্ষ কোটি ডলার।

ড. পল মহাকাশ যানে করে দু'জন অস্ট্রোনট পাঠিয়ে এই 'এরোস' গ্রহাণুতে তিনটি গর্তে মোট ৫০ মেগাটন হাইড্রোজেন বোমা বসাবেন। তা তিনবার বিস্ফোরিত হবে। তা বসানো হবে এমন সময় যখন 'এরোস' তার কক্ষপথে সূর্য থেকে অনেক দূরে থাকবে। কোনো গর্তে কত মেগাটন বোমা বসানো হবে, তা কম্পিউটার ঠিক করে দিয়েছে। এর অর্থ, প্রথম বিস্ফোরণের ধাক্কায় 'এরোস' কক্ষচ্যুত হয়ে পৃথিবীর কক্ষপথের দিকে ছুটে আসবে। এই বিস্ফোরণ এমন সময় ঘটবে যখন এরোসের পেরি-হেলিয়াম পয়েন্ট ও পৃথিবীর পেরি হেলিয়াম পয়েন্ট একই বিন্দুতে থাকবে। কক্ষচ্যুত হবার নয় মাস পরে 'এরোস' এসে পৌঁছবে পৃথিবীর কাছাকাছি। এবার কম্পিউটার ঘটাবে দ্বিতীয় বিস্ফোরণ। হাইড্রোজেন বোমার অবস্থিতি থাকবে তখন 'এরোস'-এর গতিপথে ঠিক উল্টো দিকে। এরোস-এর তীব্র গতিকে প্রতিরুদ্ধ করবে এই বিস্ফোরণ, তখন তার গতিবেগ সরে গিয়ে দাঁড়াবে ঘণ্টায় ২৫০০০ মাইলের মধ্যে। তখন তা থেকে প্রয়োজনীয় ভারী পদার্থ আহরণ হবে। তারপর তৃতীয় বিস্ফোরণে 'এরোস' পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ অতিক্রম করে ছিটকে বেরিয়ে যাবে অনন্ত মহাবিশ্বে।

চন্দ্র

চাঁদের ওপর থেকে সংগৃহীত অনেক প্রস্তরখণ্ড পরীক্ষা করে জানা গেছে, চাঁদের বয়স প্রায় ৪৬০ কোটি বছর। চাঁদের আয়তন পৃথিবীর প্রায় পঞ্চাশ ভাগের এক ভাগ। তার মধ্যাকর্ষণ শক্তি পৃথিবীর মধ্যাকর্ষণ শক্তির ছয় ভাগের এক ভাগ।

আকাশে আমরা যেসব জ্যোতিষ্ক দেখি তার মধ্যে চাঁদ পৃথিবীর সব চেয়ে কাছে। গড় দূরত্ব ২৩৮৩০০ মাইল। পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ।

পৃথিবীর আবর্তনের বিপরীতক্রমে চন্দ্র প্রায় ২৯.৫ দিনে পৃথিবীকে একবার প্রদক্ষিণ করে এবং ঐ সময়ে নিজের অক্ষের ওপর একবার আবর্তন করে। তাই আমরা চাঁদের আলোকিত দিক দেখি না। কারণ, চাঁদের অন্ধকার অংশ পৃথিবীর দিকে থাকে। ঐ সময়কে বলা হয় অমাবস্যা।

সৌরজগত

সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা জ্যোতি বিকিরণ করে বলে এগুলোকে একসাথে বলা হয় জ্যোতিষ্ক। জ্যোতিষ্কগুলো মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত। যথা-নক্ষত্র ও গ্রহ। যার নিজস্ব আলো আছে, সেগুলোকে বলা হয় নক্ষত্র, বা তারা। যে সবের নিজস্ব আলো নেই; কিন্তু সূর্যের আলোতে আলোকিত, সেগুলো গ্রহ। এ ছাড়া আমরা রাতে আকাশে দেখি উপগ্রহ, গ্রহের চতুর্দিকে যারা ঘুরে, তারাই উপগ্রহ এবং ধুমকেতু-উল্কা।

আমাদের পৃথিবী সূর্যের একটি গ্রহ। সৌরজগতে বা সূর্যের পরিসরে আমাদের পৃথিবী একা নয়। বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো- সূর্যের এই নয় গ্রহ এবং এদের একত্রিশটি উপগ্রহ, বহু সংখ্যক গ্রহপুঞ্জ, উল্কা এবং ধুমকেতু নিয়ে গঠিত যে পরিবার, তাকেই বলা হয় সৌরজগত বা সৌরমণ্ডল। সূর্য এই গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে প্রতি সেকেন্ডে ১২শ' মাইল বেগে মহাশূন্যে ভ্রমণ করছে।

সৌরমণ্ডলের রাজা সূর্য একটি তারা। সূর্য আয়তনে পৃথিবী অপেক্ষা প্রায় তের লক্ষ গুণ বড়। এটি একটি জ্বলন্ত অগ্নিপিন্ড। উপরিভাগের তাপ প্রায় ৬০০° ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। সূর্য থেকে উত্তাপ ও আলো সূর্যরশ্মিরূপে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। গ্রহ-উপগ্রহ সেই আলো ও তাপ পাচ্ছে। পৃথিবী সূর্যের চারদিকে উপবৃত্তাকার পথে ঘুরে বলে বছরের সব সময় উভয়ের মধ্যকার দূরত্ব এক থাকে না। গড়ে এই দুরত্ব প্রায় ১৫ কোটি কিলোমিটার (৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল)। সূর্যের প্রচণ্ড তাপের প্রায় ২০০ কোটি ভাগের এক ভাগমাত্র আমরা এই পৃথিবীতে পাই। সূর্যের আলো পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে ৮ মিনিট সময় লাগে।

ধুমকেতু

আকাশে এক প্রকার জ্যোতিষ্ক দেখা যায়, ওরা যেন খেয়াল খুশিমত পৃথিবীর আকাশে এসে পড়ে। ওদের নাম ধুমকেতু। অধিকাংশ ধুমকেতু

একবারই মাত্র আসে। কয়েক রাত্রি দেখা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। তবে কতগুলো ধুমকেতু এমন, যারা কয়েক বছর পরপর নিয়মিতভাবে দেখা দেয়। যেমন হ্যালীর ধুমকেতু। এটি ৭৫ বছরে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। ১৯১০ সালে একবার হ্যালীর ধুমকেতু দেখা গিয়েছিলো। এরপর ১৯৮৫ সালে আর একবার দেখা গিয়েছে। ঠিক ৭৫ বছর পর। প্রত্যাশিত সময়ে ধুমকেতু দেখা না দিলে অনেক সময় উল্কা বৃষ্টি হয়। উল্কা বৃষ্টি হচ্ছে ধুমকেতুর ধ্বাংসাবশেষ।

১৯১০ সালে যখন হ্যালীর ধুমকেতু দেখা যায়, পৃথিবী তার প্রায় পাঁচ কোটি মাইল লম্বা পুচ্ছের ভেতরে এসে পড়ে। সেই সময় পৃথিবী ধবংস হয়ে যাবে বলে অনেকে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ধুমকেতুর পুঞ্জের লক্ষ লক্ষ মাইলব্যাপী পদার্থ গ্যাস খুব হালকা বলে পৃথিবীর কোনো ক্ষতি হয়নি। সে গ্যাসে রয়েছে অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কার্বনের যৌগ। তা লীন হয়ে গেলে পৃথিবী ধ্বংসের আশঙ্কা ক্রমশ তিরোহিত হয়ে যায়। এই বিশাল সৃষ্টির যিনি পরিচালক তিনিই হচ্ছেন মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা।

আল্লাহর পরিচয় : প্রাণীজগত পর্ব

মহান আল্লাহর পরিচয় এই গোটা বিশ্বের প্রতিটি বস্তুর মাঝেই পাওয়া যায়। সেই ধারাবাহিকতায় সৃষ্টির বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করা হচ্ছিল। আমরা এখন প্রাণীজগতকে নিয়ে গবেষণা করার মাধ্যমে মহান রাব্বুল আলামিন সম্পর্কে আরো কিছু জানার চেষ্টা করবো ।

প্রাণীর পশম শীত বস্ত্র তৈরির উপকরণ ও তার গোশ্ত আহার :

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা পবিত্র কুরআনে বলেন-

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ

‘আর চতুষ্পদ জন্তুগুলো তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাতে রয়েছে উষ্ণতার উপকরণ ও বিবিধ উপকার। আর তা থেকে তোমরা আহার গ্রহণ করো।’ (নাহল ১৬:৫)

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা পশু-প্রাণীর সৃষ্টিকারী হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন। সাথে সাথে পশুর মাধ্যমে মানুষ যেসকল কল্যাণ অর্জন করতে পারে তাও আলোচনা করা হয়েছে। এখানে

বলা হয়েছে ‘তাতে রয়েছে উষ্ণতার ওপরকণ’ কেননা পশুর পশমের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের পোশাক ও কম্বল তৈরি হয়ে থাকে । তারপরে বলা হয়েছে ‘তা থেকে তোমরা আহার গ্রহণ করো।’ কেননা অনেক প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া মানুষের জন্য হালাল করা হয়েছে। অপর একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা আরও কিছু উপকারের কথা উল্লেখ করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে-

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْجِبَالِ أَكْنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ

‘আর আল্লাহ তোমাদের ঘরগুলোকে তোমাদের জন্য আবাস করেছেন এবং তোমাদের পশুর চামড়া দিয়ে তাবুর ব্যবস্থা করেছেন, যা খুব সহজেই তোমরা সফরকালে ও অবস্থানকালে বহন করতে পার। আর তাদের পশম, তাদের লোম ও তাদের চুল দ্বারা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গৃহসামগ্রী ও ভোগ-উপকরণ (তৈরি করেছেন) আর আল্লাহ যা সৃষ্টি করেছেন, তা থেকে তোমাদের জন্য ছায়ার ব্যবস্থা করেছেন এবং পাহাড় থেকে তোমাদের জন্য আশ্রয়স্থল বানিয়েছেন, আর ব্যবস্থা করেছেন পোশাকের, যা তোমাদের গরম থেকে রক্ষা করে এবং বর্মেরও ব্যবস্থা করেছেন যা তোমাদের রক্ষা করে যুদ্ধে। এভাবেই তিনি তোমাদের ওপর তার নিআমতকে পূর্ণ করবেন, যাতে তোমরা অনুগত হও।’ (নাহল ১৬:৮০-৮১)

এই আয়াতে পশুর চামড়ার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এভাবে পবিত্র কুরআনে বিভিন্ন উপকারের কথা বলা হয়েছে। তবে সকল প্রাণীর গোশ্ত খাওয়া হালাল করা হয় নাই। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

‘তোমাদের জন্য গৃহপালিত চতুস্পদ জন্তু হালাল করা হয়েছে, তোমাদের নিকট যা বর্ণনা করা হচ্ছে তা ছাড়া। তবে ইহরাম অবস্থায় শিকারকে হালাল করবে না। নিশ্চয়ই আল্লাহ যা ইচ্ছা বিধান দেন।’ (মায়েদা ৫:১)

এরপর মহান আল্লাহ অপর এক আয়াতে বলছেন-

وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

'আল্লাহ তোমাদের পশু-প্রাণীর মধ্যে যাদের রিযক হিসেবে হালাল করেছেন তা তোমরা খাও। তবে শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।' (আনআম ৬:১৪২)

সুবহানাল্লাহ! মানুষের জন্য মহান আল্লাহ গরু-মহিষ-উট-দুম্বা-ভেড়াসহ কত ধরনের প্রাণী খাওয়া হালাল করে দিয়েছেন। আমাদের দেশে তো গোশত প্রকিয়াজাতকরণের ফ্যাক্টরি নেই। বিদেশে এই গোশত প্রক্রিয়াজাতকরণের ওপর স্বতন্ত্র কোম্পানি আছে। তাদের এতো বড় বড় মেশিন আছে যার এক দিক দিয়ে জীবিত গরু-মহিষ-উঁট-ভেরা-দুম্বা-খাসি ঢুকিয়ে দেওয়া হয় আর অপর দিক থেকে তা জবাই হয়ে, চামড়া ছিলে, নাড়ি-ভূড়ি আলাদা হয়ে শুধু গোশত পিস হয়ে প্যাকেট হয়ে বের হয়ে আসে। অবশ্য এই রকম জবাই করা প্রাণী খাওয়া জায়েজ হবে কি না তা ভিন্ন বিষয়। কারণ বিসমিল্লাহ পড়ে জবেহ না করলে তা খাওয়া হালাল নয়, হারাম। এজন্য সেই সকল দেশের মুসলিমরা হালাল গোশত খুঁজে কিনেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রাণীদের ব্যাপারে আরও ইরশাদ করেছেন-

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلا يَشْكُرُونَ

'আর তারা কি লক্ষ্য করে না যে আমি কিভাবে তাদের জন্য পশু-প্রাণীগুলোকে সৃষ্টি করেছি। এরা এই পশুগুলোর মালিক হয়ে যায়, পশু গুলোকে পরিচালনা করে। আমি তাদের জন্য এই সব গুলোকে তাদের অধীনস্ত করে দিয়েছি ফলে তারা এর কিছুর ওপর আরোহন করে এবং বাকি কতগুলোকে আহার করে। আর এগুলোর মধ্যে তাদের জন্য আরো অনেক উপকার এবং পানীয় রয়েছে, সুতরাং তারা কি কৃতজ্ঞ হবে না?।' (আনআম ৬:১৪২)

সুবহানালাল্লাহ! এতো বড় বড় হাতি, তারা এই মানুষের কথা শুনে। কত বড় উট সেও মানুষের অনুগত। একটা বাচ্চাও একটি উট বা হাতির ওপর

চড়ে তাকে নিয়ে বেড়িয়ে আসে। একইভাবে ঘোড়া ও গাধাও। তবে এই সকল প্রাণীর মধ্যে কিছুকে খাওয়া বৈধ। যেমন উট-গরু-মহিষ ইত্যাদি। আর হাতি-ঘোড়া এবং পালিত গাধা খাওয়া জায়েজ নেই। তবে জংলি গাধা খাওয়া যাবে। জঙ্গলের নীল গাই খাওয়া যাবে। এতো উপকারী যে পশু-প্রাণীগুলো রয়েছে তারওতো প্রয়োজন খাবার ও পানীয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই সে ব্যবস্থা করে ঘোষণা করেছেন-

الَّذي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لايَاتٍ لِأُولِي النُّهَى

'যিনি তোমাদের জন্য জমিনকে বিছানা বানিয়েছেন এবং তাতে তোমাদের জন্য চলার পথ করে দিয়েছেন। আর আসমান থেকে তিনি পানি বর্ষণ করেন; অতঃপর তা দিয়ে আমি বিভিন্ন প্রকারের উদ্ভিদ উৎপন্ন করি। তোমরা নিজেরা খাও এবং তোমাদের গবাদি পশু চরাও। অবশ্যই এতে বিবেকসম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।' (ত্বহা ২০:৫৩-৫৪)

আল্লাহু আকবার, উদ্ভিদ জগতের জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি হওয়া, ফুল-ফল এবং মৌমাছি-ভ্রমর এসকল কিছুর প্রজননের যেই বিষয়টি বিজ্ঞানীরা হাজার হাজার বছর গবেষণা করে বুঝতে পেরেছেন, কুরআন সেই বিষয়গুলোকে তারও অনেক আগেই এমন এক সময়ে বলে দিয়েছে যখন এই সকল বিজ্ঞানের কোনো অস্তিত্বই ছিলো না।

বোঝা বহন করার কাজে লাগে :

وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ

'আর এগুলো তোমাদের বোঝা বহন করে এমন দেশে নিয়ে যায়, ভীষণ কষ্ট ছাড়া যেখানে তোমরা পৌঁছতে সক্ষম হত না। নিশ্চয়ই তোমাদের রব দয়াশীল, পরম দয়ালু।' (নাহল ১৬:৭)

পূর্বের যুগে ভারী বোঝা বহন করার জন্য ঘোড়া, গাধা উট, হাতী ইত্যাদি প্রাণী ছিলো একমাত্র বাহন। অবশ্য আধুনিক বিজ্ঞানের চরম উন্নতির কারণে এখন তার স্থানে বিভিন্ন রকমের গাড়ি জাহাজ ইত্যাদি ব্যবহার হয়ে থাকে। তবে পশুর প্রয়োজন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায়নি। বর্তমান আধুনিক যুগেও পাহাড়-পর্বতে কাঠ-লাকড়ি, বড় বড় গাছ বহন করার জন্য

হাতী, ঘোড়া-গাধা ইত্যাদির প্রয়োজন রয়েছে। কেননা সেখানে মানুষের তৈরি করা গাড়ি বা যানবাহন চালানো সম্ভব নয়। বিশেষত পাহাড়-জঙ্গলে যুদ্ধ করার জন্য ঘোড়ার চাহিদা অনস্বীকার্য। এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন-

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا

'কসম ঊর্ধশ্বাসে ছুটে যাওয়া অশ্বরাজির, অতঃপর যার ক্ষুরাঘাতে অগ্নি-স্ফূলিঙ্গ ছড়ায়, অতঃপর যারা প্রত্যুষে হানা দেয়, অতঃপর সে তা দ্বারা ধুলি উড়ায়, অতঃপর এর দ্বারা শত্রুদলের ভেতরে ঢুকে পড়ে।' (আদিয়াত ১০০:১-৫)

এই সুরার তাফসীরে বলা হয়েছে, যে একটি ঘোড়া যাকে তার মালিক সৃষ্টি করেনি, বরং শুধুমাত্র কিছু খাদ্য জোগান দেয় আর দেখাশোনা করে। তাতেই সে তার মালিকের আনুগত্য করে, তাকে ভালোবাসে, তাকে রক্ষা করার জন্য জীবন বাজি রেখে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। অথচ জীবনের মায়া সকল প্রাণীর মধ্যেই রয়েছে। কেউই সহজে মরতে চায় না। একটি গরুকেও লাঠির ভয় দেখালে সে দৌড় দেয়। ঘোড়ার প্রসঙ্গ উল্লেখ করার মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মূলত মানুষকে তার রবের আনুগত্য করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। কেননা মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্টি করেছেন যখন যা প্রয়োজন তা সরবরাহ করছেন। প্রয়োজনীয় বিবেক-বুদ্ধি দান করেছেন। তা সত্ত্বেও মানুষ তার রবের আনুগত্য করে না। আবার কেউ জীবনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে আনুগত্য করলেও বাকি অংশে আনুগত্য করে না। যেমন বর্তমান মুসলিম জাতির অবস্থা। তারা আল্লাহর হুকুম মেনে সালাত, সিয়াম, হজ, জাকাত ইত্যাদি আদায় করলেও সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, আন্তর্জাতিক জীবনে, ব্যাংকে, আদালতে কোথাও আল্লাহর হুকুম মেনে চলে না। এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এই সুরার শেষাংশে ইরশাদ করেছেন-

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ

'নিশ্চয়ই মানুষ তার রবের প্রতি বড়ই অকৃতজ্ঞ। আর নিশ্চয়ই সে এর ওপর (স্বয়ং) সাক্ষী হয়। আর নিশ্চয়ই ধন-সম্পদের লোভে সে প্রবল। তবে কি সে জানে না যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে? আর অন্তরে যা আছে তা প্রকাশিত হবে। নিশ্চয়ই তোমার রব সেদিন তাদের ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত।' (আদিয়াত ১০০:৬-১১)

উট, মহাকাশ ও পাহাড় পর্বতের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় :

أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ

'মানুষেরা কি লক্ষ্য করে না উটের দিকে, কিভাবে তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আসমানের দিকে লক্ষ্য করে না, কিভাবে তাকে সুউচ্চ করে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কি পাহাড়গুলোর দিকে লক্ষ্য করে না, কিভাবে তা সৃষ্টি করেছেন। জমিনের দিকে লক্ষ্য করছে না, জমিনকে কিভাবে বিছিয়ে দেয়া হয়েছে।' (গাশিয়া ৮৮:১৭-২৪)

এই আয়াতে মূলত সর্বস্তরের লোকদের আল্লাহর সৃষ্টির ভেতরে গবেষণা করে আল্লাহর পরিচয় লাভ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। একজন অশিক্ষিত রাখাল যার সামনে বিস্তীর্ণ ঘাসের মাঠ, দূরের দিকে তাকালে ছোট বড় পাহাড়-পর্বত, আর মাথা তুলে উপরের দিকে তাকালে বিশাল আকাশ নজরে পড়বে। সে যদি এগুলোতে গবেষণা করে তাহলে অবশ্যই বুঝবে এগুলো কোনো স্রষ্টা বিহীন এমনিতেই সৃষ্টি হয়নি। আর এগুলো যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই হচ্ছেন মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। এই আয়াতের শুরুতেই রয়েছে উটের প্রসঙ্গ। উট একটি আজব মাখলুক। উট সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَمَّا يَلْتَقِطُهُ فَقَالَ عَرِّفْهَا سَنَةً ثُمَّ احْفَظْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرُكَ بِهَا وَإِلَّا فَاسْتَنْفِقْهَا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَالَّةُ الْغَنَمِ قَالَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ قَالَ ضَالَّةُ الْإِبِلِ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ

'যায়েদ ইবনে খালেদ আল জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একজন গ্রাম্যলোক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে কুড়িয়ে পাওয়া মাল সম্পর্কে জানতে চাইলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি এক বছর পর্যন্ত প্রচার করো অতঃপর প্রাপ্ত মালের মুখ এবং ঢাকনা সম্পর্কে ভালো করে জেনে রাখ। যদি কোনো ব্যক্তি তালাশ করার জন্য আসে তাহলে তাকে দিয়ে দাও। আর যদি না আসে তাহলে খরচ করো। লোকটি বললে, হে আল্লাহর রাসুল! যদি হারানো বকরি পাওয়া যায়? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেটা হয়তো তোমার নইলে তোমার অন্য কোনো ভাইয়ের আর নাইলে নেকড়ে বাঘের। লোকটি আবার প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসুল! যদি হারানো উট পাওয়া যায়? এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চেহারা রাগে, ক্ষোভে লাল হয়ে গেল। তিনি বললেন, তোমার সাথে উটের কি সম্পর্ক? তার সাথে তার জুতা আছে। তার পানির মশক আছে। সে পানির ঘাটে গিয়ে পানি পান করবে। গাছের থেকে পাতা খাবে (আর এভাবে সে একসময় মালিকের সাক্ষাৎ পেয়ে যাবে)।' (বুখারী ২৪২৭; মুসলিম ৪৫৯৬; তিরমিজি ১৩৭২)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবায়ে কিরাম (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, যদি আমরা কোনো হারানো ছাগল পাই, তাহলে তা কি নিতে পারবো? তখন বকরী আরবের লোকদের কাছে অত্যন্ত নগণ্য ও তুচ্ছ বা অল্প দামের বলে গণ্য হতো, তাই) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তখন বললেন, হ্যাঁ তুমি তা কুড়িয়ে নাও। কেননা ওটা হয়তো তুমি নিবে, নতুবা অন্যকেউ নিয়ে যাবে, আর তা না হয় বাঘে নিয়ে যাবে। অতঃপর একজন জিজ্ঞাসা করলো, যদি হারানো উট পাওয়া যায়? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাগ করলেন। বললেন, উটের সাথে তোমার কি সম্পর্ক? তার পায়ে মরুভূমিতে চলার উপযোগী জুতা পড়ানো আছে। তার ভেতরে পানির মশক আছে। তার পেটে পানির টাংকি আছে। সে যখন পানি পান করে তখন সে পানি খেয়ে নিজের টাংকিও পূর্ণ করে নেয়। তারপর সে একটানা ১৫ দিন পর্যন্ত পানি না খেয়েও পথ চলতে পারে। ভেতরে পানি আছে, প্রয়োজন হলে একটু পানি বের করে গলা ভিজিয়ে নেয়। সে আবার চলতে থাকে। উটের পিঠে বসার জন্য নরম কুঁজ

রয়েছে। আবার কোনো কোনো উটের একাধিক কুঁজ রয়েছে। একটি বসার জন্য, একটি হেলান দেওয়ার জন্য, আরেকটি ধরার জন্য। এরকম তিন তিনটি কুঁজ বিশিষ্ট উঁট দেখা গেছে। এমনকি কোনো কোনো উটের সাতটি পর্যন্ত কুঁজ দেখা গেছে। আমাদের দেশে যেমন ঝড়-বৃষ্টি হয়, আরবেও মাঝে মধ্যে প্রায়ই তেমন ধূলিঝড় হয়। মরুভূমির মধ্যে যখন ধূলিঝড় হয় তখন উটগুলো বালুর মধ্যে মাথা গুজে বসে থাকে। উটের নাকের সামনে দু'টি পর্দা আছে। সে তার পর্দা দু'টিকে দিয়ে নাক ঢেকে দিয়ে বসে থাকে। এরপর ঝড় থামলে সে মাথা বের করে আবার পথ চলতে থাকে। নাকে পর্দা থাকার কারণে তার নাকের ভেতর কোনো বালু প্রবেশ করতে পারে না। তার কোনো সমস্যা হয় না। উটের এই বিশেষ বৈশিষ্টসমূহের কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উপরোক্ত আয়াতে উটের দিকে বিশেষভাবে গবেষণা করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।

পশু মানুষের বাহন ও বিনোদনের জন্য :

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لا تَعْلَمُونَ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ

'আর (তিনি সৃষ্টি করেছেন) ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা, তোমাদের আরোহন ও শোভার জন্য এবং তিনি সৃষ্টি করেন এমন কিছু, যা তোমরা জান না।' (নাহল ১৬:৮)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

'আর তোমাদের জন্য তাতে রয়েছে সৌন্দর্য যখন সন্ধ্যায় তা ফিরিয়ে আন এবং সকালে চারণে নিয়ে যাও।' (নাহল ১৬:৬)

এই আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিভিন্ন পশুকে বাহন হিসেবে এবং শোভা ও সৌন্দর্যের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছেন। প্রথম আয়াতটিতে আরও বলেছেন- 'তিনি সৃষ্টি করেন এমনকিছু যা তোমরা জানো না।' এতে বুঝা যায় যে ভবিষ্যতে আরো অনেক কিছু সৃষ্টি করবেন যা তৎকালীন মানুষের জন্য বোধগম্য ছিলো না।

বর্তমান যুগের আধুনিক সব আবিষ্কারও এই আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। অর্থাৎ মহান আল্লাহর প্রদত্ত জ্ঞান দিয়েই মানুষ আজকে যে মোবাইল-কম্পিউটার, উড়োজাহজ, রেডিও, টেলিভিশন প্রভৃতি আবিষ্কার করেছে এবং ভবিষ্যতে আরো যা কিছু আবিষ্কার করবে সবকিছুই মহান আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে ইশারা করেছেন। এইভাবে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার অপর এক আয়াতে আলোচনা করছেন-

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

'আর তিনিই সে সত্তা, যিনি সমুদ্রকে নিয়োজিত করেছেন, যাতে তোমরা তা থেকে তাজা (মাছের) গোশ্‌ত খেতে পার এবং তা থেকে বের করতে পার অলঙ্কারাদি, যা তোমরা পরিধান করো। আর তুমি তাতে নৌযান দেখবে তা পানি চিরে চলছে এবং যাতে তোমরা তার অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় করো।' (নাহল ১৬:১৪)

সাগরে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের খাওয়ার জন্য কত রকম আর কত ধরনের মাছ সৃষ্টি করেছেন। ইলিশ, পাঙাস, রুই, কাতলাসহ হাজারো রকমের সুস্বাদু মাছ আমরা সাগর থেকে পাই। এ ছাড়াও এই সাগরে অনেক প্রাণী রয়েছে। একেক প্রাণীর একেক বিশেষত্ব আছে। সাগরে বসবাসকারী তিমি মাছের পিঠে সেল আছে। যখন পানির গভীরে যেতে চায় তখন সে তার সেলগুলোকে মেলে ধরে এবং শরীরের ভেতরে পানি প্রবেশ করায়। এভাবে সে সমুদ্রের গভীরে চলে যায় খুব সহজে। আবার যখন তার সমুদ্রের উপরে উঠার প্রয়োজন হয় তখন সে তার শরীরের সেই সেলগুলোতে হাওয়া পাম্প করে ভরতে থাকে এবং পানিগুলো বের করে দেয়। এভাবে সে আস্তে আস্তে পানির উপরে চলে আসে। এই তিমি মাছের ওপর গবেষণা করেই মানুষ সাবমেরিন তৈরি করেছে। যিনি এই সব কিছু সৃষ্টি করেছেন তিনিই হচ্ছেন মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা।

পাখি জাতীয় প্রাণীর মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় :

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা প্রাণী জগতকে পবিত্র কুরআনে বিভিন্নভাবে উল্লেখ করেছেন। পশুর কথা উল্লেখ করেছেন, পাখির কথা

উল্লেখ করেছেন, পানির ভেতর যে সকল প্রাণী থাকে তাদের কথাও উল্লেখ করেছেন, মানুষের কথাও উল্লেখ করেছেন। পাখি সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

'তারা কি আকাশে (উড়ন্ত অবস্থায়) নিয়োজিত পাখিগুলোর দিকে তাকায় না? আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদের ধরে রাখে না। নিশ্চয়ই তাতে নিদর্শনবলী রয়েছে সেই কওমের জন্য যারা বিশ্বাস করে।' (নাহল ১৬:৭৯)

যারা প্লেন তৈরি করেছে তারা এই পাখির ওপর গবেষণা করেই বিমান আবিষ্কার করেছে। তারা এই পাখির পেছনে কত যে ধাওয়া করেছে তা আল্লাহই ভালো জানেন। পাখি কিভাবে উড়ে? সামনে কতটুকু অংশ, পেছনে কতটুকু থাকে, তাদের পাখাগুলো কি কাজে লাগে? পেছনে যে পড় আছে সেগুলো কিভাবে ব্যবহৃত হয় এই সব গুলো বিষয় গবেষণা করে মানুষ বিমান তৈরি করেছে। বিজ্ঞানের এই সূত্র পবিত্র কুরআনেই দেয়া রয়েছে। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ

'তারা কি লক্ষ্য করেনি তাদের ওপরস্থ পাখিদের প্রতি, যারা ডানা বিস্তার করে ও গুটিয়ে নেয়? পরম করুণাময় ছাড়া অন্য কেউ এদের স্থির রাখে না। নিশ্চয়ই তিনি সব কিছুর সম্যক দ্রষ্টা।' (মূলক্, ৬৭:১৯)

যারা বিমানে উঠেছেন এবং পাখার কাছে বসেছেন তারা খেয়াল করলে দেখবেন বিমানের পাখায় অনেকগুলো সেল ও পার্ট আছে। বিমান যখন চলা শুরু করে তখন কিছু সেল ও পার্ট দাঁড়ায় আবার কিছু বসে যায়। যখন বিমান অবতরণ করে তখন অনেকগুলো পার্ট খাঁড়া হয়ে যায়। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন পাখি নিয়ে গবেষণা করতে বলেছেন যে কিভাবে তারা তাদের ডানা মেলে আবার কিভাবে তা গুটিয়ে ফেলে। যেই সকল পাখির গলা লম্বা সেগুলো পেছনে মাংস বেশি থাকে। ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। জিরাফ এবং উটের পা যেহেতু লম্বা তাই তাদের গলাও অনেক লম্বা করে সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে তারা ঘাস ও খাবার খেতে পারে।

পশুর মধ্যে যেমন অনেক প্রকার আছে, পাখির মধ্যেও অনেক প্রকার আছে। কিছু পশু যেমন হিংস্র হয়, তেমনি পাখির মধ্যেও হিংস্র পাখি আছে। যেসকল পাখি নখ ও দাঁত দিয়ে শিকার করে এবং নখ ও দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে ফুরে খায় সেগুলো খাওয়া হারাম। শুধু হিংস্র বা শুধু নখ দিয়ে খায় সেগুলো খাওয়া জায়েজ। কিন্তু নখ ও ঠোঁট/দাঁত এই উভয়টা ব্যবহার করে খায় সেগুলো খাওয়া জায়েজ হবে না। এরকমভাবে পশুর মধ্যে যেগুলো হিংস্র বাঘ-ভল্লুক এগুলোও খাওয়া হারাম।

এক লোক বটগাছের নিচে শুয়ে চিন্তা করছিল, বট গাছ এত বড় বৃক্ষ কিন্তু তার ফলগুলো কত ছোট ছোট। অপর দিকে তালগাছ, কাঁঠাল গাছের মধ্যে গাছের তুলনায় ফলগুলো কত বড় বড়। এই অসামঞ্জস্য কেন তাই সে ভাবছিলো। এমন সময় হঠাৎ একটি বট ফল তার মাথায় পড়লো। তখন সে বুঝতে পারলো এবং বলে উঠলো যে, আল্লাহ তুমি কতো দয়ালু। যদি আজকে বটগাছের ফল তালের মতো হতো তাহলে তো আজই আমি শেষ হয়ে যেতাম।

বটগাছকে মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ছায়ার জন্য, পূজা করার জন্য নয়। অনেকে এর পূজা করে। কি বিশাল ছায়া বটগাছের। কিন্তু তার ফলগুলো ছোট। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রতিটি জিনিসকে নির্দিষ্ট কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর যাকে যে কাজের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাকে সে কাজের জন্য উপযোগী করেও সৃষ্টি করেছেন। এজন্যই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ

'নিশ্চয়ই আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাণ অনুযায়ী।' (ক্বামার ৫৪:৪৯)

মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যেখানে যেটা প্রয়োজন সেখানে সেটা দান করেছেন। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষকে নাক দিয়েছেন শ্বাস-প্রশ্বাস ঘ্রাণ নেওয়ার জন্য। যখনই কোনো খাবার মুখে দেওয়া হয় সঙ্গে সঙ্গে নাক রিপোর্ট করে দেয় যে খাবারটি ভালো না নষ্ট।

যদি নাক মাথার পেছনে হতো তাহলে কোনো খাবার নিয়ে তা পরীক্ষা করার জন্য মাথার পেছনে নিয়ে ধরতে হতো। তারপর অনুমতি পাওয়া গেলে সামনে এনে খেতে হতো। কিন্তু মহান আল্লাহ আমাদের এত কষ্ট

দিতে চাননি। তাই তিনি নাককে ঠিক জায়গায় সৃষ্টি করেছেন। এমনিভাবে চোখের ওপর শক্ত হাড্ডি দ্বারা প্রাচীর নির্মাণ করে দিয়েছেন। যদি কোনো আঘাত লাগে তা ঐ প্রাচীরে লেগে যাবে কিন্তু চোখের কোনো ক্ষতি হবে না। কিন্তু যদি মানুষের চোখ ভাসা মাছের চোখের মতো উপরে থাকত তাহলে সামান্য আঘাতেই মানুষের চোখ নষ্ট হয়ে যেতো। এভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার সুনিপুণ সৃষ্টির মাধ্যমেই নিজের পরিচয় তুলে ধরেছেন।

কুকুর সম্পর্কীয় আলোচনা :

প্রাণী জগতের মধ্যে কুকুর একটি ইতর প্রাণী। এই কুকুর সম্পর্কেও পবিত্র কুরআন ও হাদীসে আলোচনা রয়েছে। কুকুরের মধ্যে কিছু ভালো গুণ আছে আবার কিছু খারাপ গুণও আছে। এজন্য কুকুরকে খারাপ মানুষের জন্য যেমন দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়, তেমনিভাবে খাঁটি আল্লাহওয়ালা ভালো মানুষদেরও তুলনা করা যায়। প্রথমে খারাপ দিকটাই তুলে ধরছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অবাধ্য ও প্রবৃত্তির অনুসারী কাফের, মুশরিক ও মুনাফিকদের কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে-

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ

'সুতরাং তার দৃষ্টান্ত হচ্ছে কুকুরের মতো। যদি তার ওপর বোঝা চাপিয়ে দাও তাহলে সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে অথবা যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও সে জিহ্বা বের করে হাঁপাবে। এটি হচ্ছে সে কওমের দৃষ্টান্ত যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে। অতএব তুমি কাহিনী বর্ণনা কর, যাতে তারা চিন্তা করে। উপমা হিসেবে খুবই মন্দ সে কওম যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং তারা নিজদের প্রতিই জুলম করত।' (আ'রাফ, ৭:১৭৭)

কুকুর সম্পর্কে হাদীসে আছে–

عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ يُصَلِّى فَإِنَّهُ يَسْتُرُهُ إِذَا كَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْهِ مِثْلُ آخِرَةِ الرَّحْلِ فَإِنَّهُ يَقْطَعُ صَلاَتَهُ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الأَسْوَدُ قُلْتُ يَا أَبَا ذَرٍّ مَا بَالُ الْكَلْبِ الأَسْوَدِ مِنَ الْكَلْبِ الأَحْمَرِ مِنَ الْكَلْبِ الأَصْفَرِ قَالَ يَا ابْنَ أَخِى سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– كَمَا سَأَلْتَنِى فَقَالَ الْكَلْبُ الأَسْوَدُ شَيْطَانٌ

'আবু যর (রা.) বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি সালাতে দাড়ায়..... নামাজের সামনে দিয়ে গাধা, মহিলা ও কালো কুকুর গমন করলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে।' (মুসলিম ১১৬৫)

অবশ্য ফকীহদের মধ্যে এ ব্যাপারে মতভেদ আছে যে, হাদীসে বর্ণিত কারণে সালাত নষ্ট হবে কিনা। এই কিতাবে সে মাস'আলা আলোচনা করা উদ্দেশ্য নয়। এখানে শুধু এতটুকু আলোচনা করা উদ্দেশ্য যে, কুকুর সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে কিছু নেতিবাচক বক্তব্য রয়েছে। অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَبِي طَلْحَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ

'আবু তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যেই ঘরে কুকুর বা কোনো প্রাণীর ছবি থাকে সেই ঘরে রহমতের ফিরিশতারা প্রবেশ করে না।' (বুখারী ৩১৪৪)

এজন্য ঘরের ভেতরে কুকুর লালন-পালন করা জায়েজ নেই। অবশ্য ঘর-বাড়ি পাহাড়া দেয়া, সম্পদ হেফাজত এমনিভাবে বকরীর পাল দেখাশুনা করার জন্য কুকুর পালন করা জায়েজ আছে। আরবের লোকেরা ছাগলের জন্য রাখাল রাখতো। রাখালের সাথে একটি কুকুরও পালতো। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ রাখালের পরিবর্তে কুকুরই ভালোভাবে বকরীর পালকে নিয়ন্ত্রণ করতো। কারণ কুকুর সব ছাগলগুলোকে একসাথে রাখতো। তাছাড়া কুকুর রাখাল কখনো চোরদের সাথে আঁতাত করে না। যাই হোক এ পর্যন্ত কুকুরের নেতিবাচক দিকগুলো আলোচনা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে কুরআন ও হাদীসে কুকুর সম্পর্কে ভালো ও ইতিবাচক কথাও বলা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকার খাওয়া হালাল করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

'তারা তোমাকে প্রশ্ন করে, তাদের জন্য কী বৈধ করা হয়েছে? বলো, 'তোমাদের জন্য বৈধ করা হয়েছে সব ভালো বস্তু এবং শিকারী পশু-পাখি, যাদের তোমরা শিকার প্রশিক্ষণ দিয়েছ; সেগুলোকে তোমরা শেখাও, যা আল্লাহ তোমাদের শিখিয়েছেন। সুতরাং তোমরা তা থেকে খাও, যা তোমাদের জন্য ধরে এনেছে এবং তাতে তোমরা আল্লাহর নাম স্মরণ করো আর আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে দ্রুত।' (মায়েদা ৫:৪)

এই আয়াতের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত শিকারী কুকুরের শিকার খাওয়াকেও হালাল ঘোষণা করা হয়েছে। কুকুরকে কিভাবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে তাও হাদীসে বলা হয়েছে। বিসমিল্লাহ বলে কুকুরকে শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়তে হবে। অন্তত: তিন দিন পর্যন্ত তাকে দিয়ে শিকার করে পরীক্ষা করতে হবে। সে শিকার করে আনার পর তাকে খেতে দিতে হবে। যদি সে না খায় আপনার জন্য রেখে দেয় তাহলে এভাবে তিনদিন প্র্যাকটিস করার পর বুঝতে পারবেন যে আসলেই সে আপনার জন্য শিকার করেছে। তখন এই কুকুরের শিকার করে আনা হরিণ, খরগোশ ইত্যাদি খাওয়া হালাল হবে। কারণ সেই কুকুরটি শিক্ষিত হয়ে গেছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عدى بن حاتم قال سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُ مَعَ كَلْبِى كَلْبًا آخَرَ فَلاَ أَدْرِى أَيُّهُمَا أَخَذَهُ قَالَ فَلاَ تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتَ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ

'আদী ইবনে হাতেম (রা.) থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, আমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুকুরের শিকার খাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা

করলাম। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষিত কুকুরকে বিসমিল্লাহ বলে ছেড়ে দিবে, তখন সেই কুকুর যদি শিকার করে আনে তাহলে তুমি তা খেতে পারো। তবে যদি তোমার কুকুর সেই শিকারের কিছু অংশ নিজে খেয়ে ফেলে তাহলে তুমি তা খেতে পারবে না। কারণ সে ঐ শিকার তোমার জন্য নয় বরং নিজের জন্য করেছে। অতঃপর সাহাবী (রা.) আরো জিজ্ঞাসা করলেন, যদি প্রশিক্ষিত কুকুরের সাথে অন্য কুকুরও দেখা যায় শিকার করে এনেছে তখন কি হবে? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এমন হলে তুমি সেই শিকার খেতে পারবে না, কারণ তুমি তো তোমার কুকুরকে বিসমিল্লাহ বলে ছেড়েছ, অন্য কুকুরের ক্ষেত্রে বিসমিল্লাহ বলোনি।' (বুখারী ৫৪৮৭; মুসলিম ৫০৪০; নাসায়ী ৪২৮১)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, কুকুরের মধ্যেও পার্থক্য আছে। শিক্ষিত কুকুর আর অশিক্ষিত কুকুর। শিক্ষিত কুকুর শিকার করলে খাওয়া জায়েজ আর অশিক্ষিত কুকুর শিকার করলে খাওয়া জায়েজ নেই। এমনকি শিক্ষিত কুকুরের সাথে অশিক্ষিত কুকুর থাকলেও তা খাওয়া যাবে না। সুতরাং এর থেকে শিক্ষার গুরুত্ব যে কত বেশি তাও বুঝা যায়।

আলোচনা হচ্ছিলো প্রাণী জগতের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় সম্পর্কে। একটি ইতর ও নগণ্য প্রাণীকে নিয়ে গবেষণা করলেও তার মাধ্যমে আল্লহর পরিচয় লাভ করা যায়। শুধু তাই না, বরং এই ইতর প্রাণী কুকুরের মধ্যে এমনকিছু ভালোগুণ ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা প্রতিটি আল্লাহওয়ালা মানুষের মধ্যে থাকা উচিত। 'হায়াতুল হায়াওয়ান' নামক বইয়ের ৪র্থ খন্ডে কুকুর অধ্যায়ে ৩৩৬ নং পৃষ্ঠায় কুকুর সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, একটা কুকুর সব সময় তার মালিকের আনুগত্য করে। মালিক সামনে থাকলে তার মঙ্গল কামনা করে, আড়ালে থাকলেও তার মঙ্গল কামনা করে। মালিক তার প্রতি খেয়াল রাখুক বা না রাখুক, কুকুর তার মনিবের প্রতি খেয়াল রাখে। জাগ্রত কিংবা ঘুমন্ত উভয় অবস্থায়ও ঘোড়া এবং মাছরাঙ্গা পাখির চেয়েও বেশি সতর্ক ও সচেতন থাকে। রাতে ঘুমালেও সে গভীর ঘুমে মগ্ন হয় না। সে দিনের বেলায় ঘুমায়, যখন তার পাহাড়াদারীর প্রয়োজন হয় না।

মালিকের মেহমান আসলে কুকুর তার ভাব-সাব দেখেই বুঝে নেয়। তখন সে সম্মানিত মানুষদের সম্মান দিয়ে থাকে। মালিকের আপনজন কেউ

আসলে তাদের দেখে কুকুর ঘেউ ঘেউ করে না। বরং সে তখন নিজের লেজ নেড়ে নেড়ে তাদের আনুগত্য প্রদর্শন করে। রাস্তা ছেড়ে দেয়। তবে সে যদি সন্দেহজনক কাউকে দেখে তখন ঘেউ ঘেউ শুরু করে দেয়।

কুকুর তার মালিকের কাছে গিয়ে লেজ নাড়ার মাধ্যমে মালিকের আনুগত্য প্রকাশ করে থাকে। তাকে মারলে বা পিটালেও সে একটু পরে আবার চলে আসে। কুকুর যখন তার মালিকের সাথে খেলে তখন সে কামড় দিলেও সেই কামড়ে ব্যথা থাকে না। কারণ সে আস্তে কামড় দেয়। তাকে প্রশিক্ষণ দিলে সে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে। কুকুরের পিঠে মোমবাতি জ্বালিয়ে তার সামনে খাবার দিলে সে খাবারের দিকে যাবে না। কিন্তু তার পিঠ থেকে মোমবাতি সরিয়ে নিলে তখন সে যাবে। ইমাম হাসান বসরী (রহ.) তার রচিত 'ফাদলুল কিলাব' নামক গ্রন্থের **১ম** খন্ডের **৩৪** নং পৃষ্ঠায় বলেন–

فِي الْكَلْبِ عَشْرُ خِصَالٍ مَحْمُوْدَةٍ وَكَذَلِكَ يَنْبَغِيْ أَنْ تَكُوْنَ فِيْ كُلِّ مُؤْمِنٍ

কুকুরের মধ্যে এমন দশটি গুণ আছে যা প্রতিটি মুমিনের অর্জন করার জন্য চেষ্টা করা উচিত। আর তা হলো-

১. **أَنَّهُ لَا يَزَالُ خَائِفًا وَذَلِكَ لَعَلَّهُ مِنْ دَأْبِ الصَّالِحِيْنَ**

কুকুর সব সময় তার মালিককে যেমন ভালোবাসে তেমনি ভয়ও করে। -প্রতিটি মুমিনকেও এমনি হওয়া উচিত। একদিকে আল্লাহর রহমতের আশা করবে, অপরদিকে গজবের ভয়ও করবে।

২. **أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَكَانٌ يُعْرَفُ وَذَلِكَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُتَوَكِّلِيْنَ**

কুকুরের জন্য থাকার কোনো আলাদা স্থান থাকে না। যদি কেউ বানিয়ে দেয় তাহলে তা ভিন্ন কথা। কিন্তু সাধারণত: সে সাধারণ স্থানেই থাকে। কোনো স্থায়ী ঠিকানা নেই। মুমিনদেরও এমন হওয়া উচিত যে তার কোনো স্থায়ী ঠিকানা বা বাড়ি-ঘর থাকবে না। বরং আল্লাহর দ্বীনের জন্য হিজরত করবে এবং পৃথিবীময় দ্বীন প্রচার করবে। অথচ মানুষের চিত্র তার থেকে ভিন্ন। ৭০ বছর বয়সী এক লোক একটি জমি ১০০ বছরের জন্য লিজ নিলো। এই খবর যখন হাসান বসরী (রা.) এর কাছে এসে পৌঁছলো তখন তিনি বললেন, মনে হয় এই ব্যক্তির সাথে আজরাইলের একটি চুক্তি হয়েছে। কারণ তার ৭০ বছর বয়স হয়ে গেছে এখন কবরে যাওয়ার সময় আর সে ১০০ বছরের জন্য জমি লিজ নিয়েছে।

৩. أَنَّهُ لَا يَنَامُ مِنَ اللَّيْلِ إِلَّا قَلِيْلًا وَذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْمُحْسِنِيْنَ

কুকুর রাতের বেলায় কম ঘুমায়। প্রতিটি মুমিনকেও এমন হওয়া উচিত। তারা রাতে কম ঘুমাবে।

৪. أَنَّهُ إِذَا مَاتَ لَا يَكُوْنُ لَهُ مِيْرَاثٌ وَذَلِكَ مِنْ أَخْلَاقِ الزَّاهِدِيْنَ

কুকুর মারা গেলে তার কোনো মিরাস থাকে না। যা ওয়ারিশগণ ভাগ-বাটোয়ারা করতে পারে। প্রকৃত আল্লাহওয়ালাদেরও এমনই হওয়া উচিত যে, তারা দুনিয়াতে কোনো সম্পদ সঞ্চয় করে রাখবে না।

৫. أَنَّهُ لَا يَتْرُكُ صَاحِبَهُ وَلَوْ جَفَاهُ وَضَرَبَهُ وَذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْمُرِيْدِيْنَ

কুকুরকে যদি তার মালিক মারে এবং পিটায় তারপরও কিন্তু কুকুর কখনোই তার মালিককে ছেড়ে চলে যায় না। বরং একটু দূরে গেলেও আবার ফিরে আসে এবং মালিকের দরবারে ধর্না দেয়। একজন প্রকৃত মুমিনকেও এই গুণ অর্জন করা উচিত। যেকোনো বিপদে-আপদে বা কোনো অবস্থাতেই সে যেনো তার রবের কাছ থেকে দূরে সরে না যায়। যদি কখনো গুনাহ হয়ে যায় আবার তওবাহ করে আল্লাহর দরবারে সঙ্গে সঙ্গে রুজু করবে।

৬. أَنَّهُ يَرْضَىْ مِنَ الدُّنْيَا بِأَدْنَىْ مَكَانٍ وَذَلِكَ مِنْ عَلَامَاتِ الْمُتَوَاضِعِيْنَ

কুকুর সামান্য খাবার ও সামান্য বাসস্থানেই খুশি। যা বিনয়ের লক্ষণ। মুমিনদেরও এরকম বিনয়ী ও স্বল্পে তুষ্ট হওয়া উচিৎ।

৭. أَنَّهُ إِذَا طَرَدَهُ أَحَدٌ مِنْ مَكَانٍ وَانْصَرَفَ عَنْهُ عَادَ إِلَيْهِ وَذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الرَّاضِيْنَ

কুকুরকে যদি কেউ প্রহার করে তার নিজ স্থান থেকে তাড়িয়ে দেয়, সেই লোক চলে যাওয়ার পর কুকুর আবারও তার পূর্বের স্থানে ফিরে আসে। এটা মুমিনের গুণ হওয়া উচিত।

৮. أَنَّهُ إِذَا ضَرَبَ وَطَرَدَ ثُمَّ دَعَيْ أَجَابَ بِلَا حِقْدٍ وَذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْخَاضِعِيْنَ

কুকুরকে যদি কেউ অপমান করে বা প্রহার করে তাড়িয়ে দেয় অতঃপর পূণরায় ডাক দেয় সঙ্গে সঙ্গে কোনো প্রকার লজ্জা বা প্রতিবাদ করা ছাড়াই সাড়া দেয়।

৯. أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ شَيْءٌ لِلْأَكْلِ جَلَسَ مِنْ بَعِيْدٍ وَذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْمَسَاكِيْنِ

কুকুরের সামনে খাবার দিলে সে দূর থেকে ধীরে ধীরে খাবারের কাছে এগিয়ে আসে। তারপর বসে এবং আস্তে আস্তে খাবার গ্রহণ করে। প্রকৃত

মুমিনদেরও এই বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। নিজেকে আল্লাহর নেয়ামতের কাছে মুখাপেক্ষী ও বিনয়ী হিসেবে প্রকাশ করবে।

১০. أَنَّهُ إِذَا حَضَرَ رَجُلٌ مِنْ مَكَانٍ لَا يَرْحَلُ مَعَهُ شَيْءٌ يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ وَذَلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْمُتَجَرِّدِيْنَ

কুকুর নতুন কোনো আগন্তককে দেখলে তার পিছু নেয় না, বরং দূর থেকে তাকে পর্যবেক্ষণ করে। প্রকৃত মুমিনদেরও এই গুণ অর্জন করা উচিৎ। কারো দোষ খোঁজার জন্য পিছু নিবে না। তবে সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করবে। এরপর হাসান বছরী (র.) ওমর (রা.) এর একটি আছার নকল করেন–

وَرَأَىْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَعْرَابِيًّا يَسُوْقُ كَلْباً فَقَالَ: مَا هَذَا مَعَكَ، فَقَالَ يَا أَمِيْرَ الْمُؤمِنِيْنَ: نِعْمَ الصَّاحِبُ إِنْ أَعْطَيْتَهُ شَكَرَ، وإِنْ مَنَعْتَهُ صَبَرَ، قَالَ عُمَرُ: نِعْمَ الصَّاحِبُ فَاسْتَمْسِكْ بِه

উমর (রা.) একজন গ্রাম্য লোককে দেখলেন যে, সে একটি কুকুর নিয়ে যাচ্ছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন তোমার সাথে এটি কি?

লোকটি বললো, হে আমীরুল মু'মিনীন! এ আমার খুবই বিশ্বস্ত বন্ধু। আমি তাকে খাবার দিলে সে কৃতজ্ঞতা আদায় করে। আর না দিলে ধৈর্য্য ধারণ করে। একথা শুনে উমর (রা.) মুচকি হেসে বললেন, আসলেই ভালো সঙ্গী। তুমি তাকে তোমার সঙ্গেই রাখো।

আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা.) এক লোকের সাথে একটি কুকুর দেখে জিজ্ঞাসা করলেন এটি কি? লোকটি বললো, এ সব সময় আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, আমার গোপন তথ্যগুলো সংরক্ষণ করে, কখনো প্রকাশ করে না। আমার কর্মচারী আজকে ভালো, কালকে বলে দেয় কিন্তু এ কখনো এমনটি করে না।

আহনাফ ইবনে তাইফ নামক এক ব্যক্তি বলেন, কুকুর যখন তোমার সামনে লেজ নাড়ায় তখন তুমি তাকে বিশ্বাস করতে পারো যে, সে সত্যিই তোমার হিতাকাঙ্খী ও আনুগত্যশীল। কিন্তু মানুষ যদি তোমার সামনে লেজ নাড়ে, মাথা নিচু করে দুহাত মিলিয়ে বিনয় প্রকাশ করে তাতে তুমি ধোঁকায় পড়ো না। কেননা সে মতলববাজ হতে পারে। স্বার্থ সিদ্ধির জন্য তোমার হিতাকাঙ্খী ও আনুগত্যশীল হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করছে।

ইমাম শা'বী (রহ.) বলেন, তুমি কুকুর সম্পর্কে মনে রাখো যে, তার মহব্বতের মধ্যে কোনো মুনাফেকি নেই। যদি সে তোমাকে মহব্বত করে তাহলে সে খালেস মহব্বত করবে তোমার সাথে মুনাফেকি করবে না।
আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, একটি আমানতদার কুকুর খেয়ানতকারী মানুষ বন্ধু অপেক্ষা অনেক ভালো।
মালেক ইবনে দীনার (রহ.) বলেন, খারাপ বন্ধুর চেয়ে একটি কুকুর আমার জন্য ভালো।
কুকুর সম্পর্কে এমন অনেক ঘটনা আছে যে, তার মালিক মারা যাওয়ার পর কুকুরটিও মালিকের শোকে কাঁদতে কাঁদতে মরে গেছে।

সকল প্রাণীই আল্লাহর তাসবীহ পড়ে।

বিভিন্ন প্রাণী সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন–

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

'সাত আসমান ও জমিন এবং এগুলোর মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু তাঁর তাসবীহ পাঠ করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর প্রসংশায় তাসবীহ পাঠ করে না; কিন্তু তাদের তাসবীহ তোমরা বুঝ না। নিশ্চয়ই তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।' (ইসরা, ১৭:৪৪)

এজন্যই আমরা প্রাণী জগতের মাধ্যমে আল্লাহর পরিচয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম। কিভাবে এই প্রাণী জগত মহান আল্লাহর অস্তিত্বের প্রমাণ ও পরিচয় বহন করে। মহান আল্লাহ আমাদের এই সকল প্রাণীদের দ্বারা তার পরিচয় দিয়েছেন। যারা কুরআন এবং আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করে তারা এক সময় স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে, মহান আল্লাহর সকল সৃষ্টিই প্রয়োজনীয়। তিনি অযথা কিছুই সৃষ্টি করেন না। এভাবেই মহান রবের পরিচয় লাভ করে তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করে দেয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

'যারা আল্লাহকে স্মরণ করে দাঁড়িয়ে, বসে ও কাত হয়ে এবং আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (বলে) হে আমাদের রব, তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র মহান। সুতরাং তুমি আমাদের আগুনের আজাব থেকে রক্ষা করো।' (আল ইমরান, ৩:১৯১)

এই আয়াত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এই পৃথিবীর সকল সৃষ্টিই বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণের জন্য মহান আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমস্ত মাখলুককে মানুষের উপকারের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তার গোলামীর জন্য। সুতরাং মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর গোলামী করবে, সমস্ত মাখলুক ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের খেদমতে নিয়োজিত থাকবে। আর মানুষ যখন আল্লাহর গোলামী ও আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে বিভিন্ন নেতা-নেত্রী, পীর-মুর্শিদ ও তাগূতের আনুগত্যে নিয়োজিত হবে, তখন আল্লাহর নির্দেশে সমস্ত মাখলুক তাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে।

আল্লাহর পরিচয় : বিস্তীর্ণ জমীনের মাধ্যমে

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেসকল সৃষ্টির মাধ্যমে নিজের পরিচয়কে তুলে ধরেছেন তার মধ্যে এই পৃথিবী অন্যতম। খাল-বিল, নদী-নালা, গাছ-গাছালি, পাহাড়- পর্বত ও শস্য-শ্যামল বিশিষ্ট এই বিশাল বিস্তীর্ণ জমিন নিশ্চয়ই কোনো মহা বিজ্ঞানী ও মহান কারিগরের সৃষ্টি। আর সেই মহান স্রষ্টাই হচ্ছেন রাব্বুল আলামীন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'আর তিনিই জমিনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন। আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয়ই যে কওম চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে।' (সুরা রা'দ, ১৩:৩)

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী উল্লেখ করেছেন। সত্যিই বিজ্ঞানময় কুরআন জ্ঞানীদের জন্য,

বোকাদের জন্য নয়। বিশাল ক্ষেত দেখে কৃষকের কথা ভুলে যাওয়া যেমন বুদ্ধিমান লোকের জন্য অসম্ভব তেমনি এই বিশাল সৃষ্টিজগত দেখে মহান আল্লাহকে চিনতে না পারা কেবলমাত্র বোকাদের জন্য মানায়, কোনো বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের জন্য এটি সাজে না।

একবার এক আলেম সাহেবের সাথে একজন নাস্তিক বিজ্ঞানীর সৃষ্টিকর্তা নিয়ে বিতর্ক হওয়ার কথা। আলেম সাহেব যথাসময়ে উপস্থিত হতে পারলেন না। নাস্তিক বিজ্ঞানী এই সুযোগে পুরো সমাবেশ মাতিয়ে তুললেন। আর বলতে লাগলেন আলেম সাহেব যেহেতু স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারবেন না তাই তিনি ভয়ে পালিয়ে গেছেন। ইতিমধ্যেই আলেম সাহেব এসে উপস্থিত। নাস্তিক প্রশ্ন করলো, 'আপনি কেন দেরি করলেন? আপনিতো অঙ্গীকার ভঙ্গকারী।' আলেম সাহেব বললেন, 'আমার বিলম্বের কারণটাতো শুনবেন। তারপরে যা বলার বলবেন।' নাস্তিক বললো, 'বলুন, আপনার কি ওজর ছিল?' আলেম সাহেব বললেন, 'আমি যথা সময়েই রওয়ানা করেছিলাম। কিন্তু নদী পাড়ে এসে দেখি কোনো খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা নেই। তাই দীর্ঘক্ষণ নদীর পাড়ে বসে কোনো নৌকার অপেক্ষা করতে লাগলাম। হঠাৎ দেখি নদীর ভেতর থেকে একটি প্রকাণ্ড গাছ বেরিয়ে এলো। দেখতে না দেখতে ঐ গাছটি অটোমেটিক তক্তা হয়ে গেল। কি আশ্চর্য কোনো মিস্ত্রী ছাড়াই তক্তাগুলো অটোমেটিকভাবে একটার সঙ্গে আরেকটা লেগে একটা নৌকা হয়ে গেলো। আরও আজব ব্যাপার, কোনো মাঝি-মাল্লা বিহীন নৌকাটি অটোমেটিকভাবে আমার কাছে এসে ভিড়ে গেলো। আমি উঠে পড়লাম। আর অটোমেটিকভাবে আমাকে নিয়ে অপর প্রান্তের ঘাটে ভিড়ে গেল। এভাবে আসতে গিয়ে কিছুটা বিলম্ব হয়ে গেল।' নাস্তিক বিজ্ঞানী আলেম সাহেবের বক্তব্য শুনে অট্টহাসি হাসল আর বললো, 'আমি শুনেছিলাম আপনি একজন বড় জ্ঞানী আলেম। কিন্তু এখনতো আমি নিশ্চিত হলাম আপনি একজন বড্ড মূর্খ জাহেল বৈ কিছুই নন।' আলেম সাহেব বললেন, 'এর কারণ কি?' নাস্তিক বললো, 'এটা কি করে সম্ভব? একটা গাছ মিস্ত্রী বিহীন তক্তা হলো, অতঃপর নৌকা হলো। আবার মাঝি বিহীন চলতে লাগলো। এটা কি আদৌ বিশ্বাস করার ব্যাপার? এতো পাগল বা অর্বাচীনের প্রলাপ।' আলেম সাহেব বললেন, 'তোমার সাথে আমার বাহাছ-বিতর্ক এখানেই শেষ। তুমি বস্তুবাদে বিশ্বাসী। তাই তোমার সঙ্গে

কুরআন-হাদীস দিয়ে বিতর্ক না করে বস্তু দিয়েই তোমাকে ঘায়েল করার জন্য এ গল্প সাজিয়েছি। একটা গাছ যদি মিস্ত্রী বিহীন অটোমেটিকভাবে তক্তা হতে না পারে, আবার তক্তাগুলো অটোমেটিকভাবে নৌকা হতে না পারে, আবার নৌকাটি মাঝি বিহীন চলতে না পারে, তাহলে এই বিশাল আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, খাল-বিল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, গাছ-গাছালি, লতা-পাতা, তুমি-আমি কি করে কোনো স্রষ্টা বিহীন চলতে পারি? আর এসব কিছুর যিনি পরিচালক ও স্রষ্টা তিনিই হচ্ছেন মহান স্রষ্টা, সুনিপুণ বিজ্ঞানী, আল্লাহ সুবহানুহু ওয়া তা'আলা।' অতঃপর তিনি বললেন,

كَمَا قَالَ بَعْضُ الْأَعْرَابِ، وَقَدْ سُئِلَ: مَا الدَّلِيْلُ عَلَىْ وُجُوْدِ الرَّبِّ تَعَالَىْ؟ فَقَالَ: يَا سُبْحَانَ اللهِ، إِنّ الْبَعْرَةَ لَتَدُلُّ عَلَى الْبَعِيْرِ، وَإِنَّ أَثْرَ الْأَقْدَامِ لَتَدُلُّ عَلَى الْمَسِيْرِ، فَسَمَاءٌ ذَاتُ أَبْرَاجٍ، وَأَرْضٌ ذَاتُ فُجَّاجٍ، وَبِحَارٌ ذَاتُ أَمْوَاجٍ؟ أَلَا يَدُلُّ ذَلِكَ عَلَىْ وُجُوْدِ الْلَطِيْفِ الْخَبِيْرِ

'জনৈক আরব' বেদুইনকে কেউ মহান আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন, কি আশ্চর্যের বিষয়, উটের ল্যাদা (বিষ্ঠা) যদি উটের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে, ছাগলের ল্যাদা (বিষ্ঠা) যদি ছাগলের অস্তিত্বের প্রমাণ করতে পারে, গরুর গোবর যদি গরুর অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারে, মরুভূমির বালুর ওপর পায়ের ছাপ যদি পথচারীর প্রমাণ করতে পারে তাহলে ঐ কক্ষপথ বিশিষ্ট চন্দ্র-সূর্য তারকারাজি দ্বারা সজ্জিত বিশাল আকাশ, এই খাল-বিল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত আর গাছ-গাছালি, পশু-পক্ষি ও বাগ-বাগিচায় বিস্তীর্ণ জমিন এবং পর্বতসম তুফান আর ঢেউয়ে উত্তাল সাগর-মহাসাগর, বৈচিত্র্যময় প্রাণীতে পরিপূর্ণ নদী-নালা কি একজন মহান স্রষ্টার প্রমাণ দিতে পারে না? অবশ্যই পারে। আর এই বিশাল সৃষ্টির সুনিপুণ কারিগর যিনি তিনিই হচ্ছেন মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা' (তাফসীরে ইবনে কাসীর, প্রথম খণ্ড ১৯৭ পৃষ্ঠা)

সুন্দর গাঁথুনী :

এই পৃথিবীর মাটিগুলোকে বিভিন্ন স্তরে সাজানো হয়েছে। গোটা ভূ-খণ্ড একটি পাথর বা ইটের মতো নয়। বরং এতে রয়েছে নানান স্তর। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

'আর জমীনে আছে পরস্পর পাশাপাশি ভূখণ্ড, আঙ্গুর-বাগান, শস্যক্ষেত, খেজুর গাছ, যেগুলোর মধ্যে কিছু একই মূল থেকে উদগত আর কিছু ভিন্ন ভিন্ন মূল থেকে উদগত, যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়, আর আমি খাওয়ার ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির তুলনায় উৎকৃষ্ট করে দেই, এতে নিদর্শন রয়েছে ঐ কওমের জন্য যারা বুঝে ।' (রা'দ, ১৩:৪)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যমীনে অনেক ভূ-খণ্ড রয়েছে । যা একটার সাথে আরেকটা লেগে আছে । এখানে আরো বলা হয়েছে একই জমিনে একই পানি দ্বারা সেঁচ করা হয় । অথচ খাওয়ার ক্ষেত্রে একটি অপরটির তুলনায় উৎকৃষ্ট । সত্যিই তো, আপনি কি লক্ষ্য করেছেন একই জমিনে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেঁপে, পেয়ারা, খরবুজ, তরমুজ, আনার, আঙ্গুর, আমরুল, জামরুল, লেবু, খেজুর, আঙ্গুর ও কলার বাগান থাকে, একই পানি দ্বারা,সেঁচ করা হয় । অথচ সবগুলোর স্বাদ ভিন্ন ভিন্ন । একটির চেয়ে অপরটির স্বাদ উৎকৃষ্ট । কোনো মহান বিজ্ঞানী এই ফলমূলে বিভিন্ন রকমের স্বাদ এনে দেন? তিনি তো আর কেউ নন । তিনিই হচ্ছেন মহান স্রষ্টা, রাব্বুল আলামীন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা । অপর এক আয়াতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলছেন,

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

'আর জমিনকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে সুদৃঢ় পাহাড় স্থাপন করেছি । আর তাতে উৎপন্ন করেছি সকল প্রকার বস্তু সুনির্দিষ্ট পরিমাণে । আর তাতে তোমাদের জন্য এবং তোমরা যার রিযক দাতা নও তাদের জন্য রেখেছি জীবনোপকরণ ।' (হিজর, ১৫:১৯-২০)

এভাবে মহান আল্লাহ তার সৃষ্টি সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন । এমনকি মানুষের মধ্যে কতো মানুষ আল্লাহ (সুব.) সৃষ্টি করেছেন কিন্তু কোনো একজন মানুষের হাতের রেখার সাথে আরেক জনের হাতের রেখার কোনো মিল নেই যা বর্তমানে সর্বজন স্বীকৃত । একইভাবে একজন মানুষের

দেহের ঘ্রাণ ও গন্ধের সাথে আরেকজন মানুষের ঘ্রাণ ও গন্ধের কোনো মিল নেই । একজনের চেহারার সাথে আরেকজনের চেহারার মিল নেই । কি আজব সৃষ্টি । فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত বরকতময়!) সুবহানাল্লাহ । এই সব যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনিই হলেন মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ।

আল্লাহর পরিচয় : পাহাড়-পর্বতের মাধ্যমে

আল্লাহর সৃষ্টির মাধ্যমে মা'রিফাতুল্লাহ বা আল্লাহর পরিচয় লাভ করা নিয়ে আমরা আলোচনা করছিলাম । আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি কোনো নবী ও রাসুল না পাঠাতেন তা সত্ত্বেও বিবেকবান লোকদের জন্য আল্লাহর পরিচয় লাভ করা আবশ্যক ছিলো । ইমাম আবু হানিফা (রহ.) বলেন–

لَوْ لَمْ يَبْعَثِ اللهُ تَعَالَىْ رَسُوْلاً لَوَجَبَ عَلَى الْخَلْقِ مَعْرِفَتُهُ

'মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি এই পৃথিবীতে কোনো রাসুল না পাঠাতেন তবুও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন লোকদের জন্য আল্লাহর পরিচয় লাভ করা ফরজ হয়ে যেতো ।' (তাফসীরে আলূসী, ১০/৪০৩) ।

কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজাতির প্রতি অনুগ্রহ করে নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন এবং তাদের সঙ্গে আসমানী কিতাব দান করেছেন । কেননা আল্লাহর নীতি হলো তিনি কাউকে সতর্ক না করে শাস্তি প্রদান করেন না । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا

'আর রাসুল প্রেরণ না করা পর্যন্ত আমি (কোনো সম্প্রদায়কে) আজাবদাতা নই ।' (ইসরা, ১৭:১৫)

মূলত: আল্লাহর অস্তিত্ত্বের বিষয়টি দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট । তাই এটাকে যুক্তিতর্ক বা দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণ করার কোনোই প্রয়োজন ছিলো না । কিন্তু বর্তমানে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক শ্রেণীর মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্বকে অস্বীকার করায় তাদের মাধ্যমে যুব-সমাজের মাঝে দিন দিন নাস্তিকতাবাদ বেড়েই যাচ্ছে । আর এ জন্যই আমাদের আল্লাহর অস্তিত্ব ও তার পরিচয় নিয়ে আলোচনা করতে হচ্ছে ।

ইতিপূর্বে আমরা বিশাল বিস্তৃত জমিন ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার মাধ্যমে আল্লাহর অস্তিত্ব ও পরিচয় প্রমাণের চেষ্টা করেছি। এরই ধারাবহিকতায় এখন আমরা আলোচনা করবো পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে, ইনশাআল্লাহ।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي رَزِينٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ كَانَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ خَلْقَهُ قَالَ كَانَ فِي عَمَاءٍ مَا تَحْتَهُ هَوَاءٌ وَمَا فَوْقَهُ هَوَاءٌ ثُمَّ خَلَقَ عَرْشَهُ عَلَى الْمَاءِ

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে আবু রাজীন (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, 'আসমান-জমিন সৃষ্টি করার পূর্বে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কোথায় ছিলেন?' রাসুললুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তিনি ছিলেন কুয়াশা বা বাষ্পের ভিতরে। যার উপরেও ছিলো শূণ্য নিচেও ছিলো শূণ্য। অতঃপর তিনি তাঁর আরশ সৃষ্টি করেন পানির ওপর' (মুসনাদে আহমাদ, ১৬১৮৮; ইবনে মাজাহ, ১৮২; তিরমিযী, ৩১০৯ সনদ দুর্বল)

এই হাদীসে আসমান জমিন সৃষ্টির সূচনা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া গেলো। আমাদের এই পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে যা ছিলো তা হলো পানি বা কুয়াশা ও বাষ্প। অতঃপর পানির ফেনাগুলো একত্র হয়ে মাটিতে রূপান্তরিত হয়। আস্তে আস্তে মাটি সম্প্রসারণ হতে থাকে। এভাবেই পৃথিবী সৃষ্টি হয়। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পরে যাতে ভূমিকম্পের কারণে ধবংস হয়ে না যায় সেজন্য পাহাড়-পর্বতমালার মাধ্যমে পেরেখের ব্যবস্থা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বহু আয়াত রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াত পেশ করা হলো–

وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا

'আর পর্বতগুলোকে তিনি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।' (নাজিয়াত ৭৯:৩২)

এখানে শুধু বলা হয়েছে পর্বতগুলোকে সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করা হয়েছে। কিন্তু কেনো করলেন? সেগুলো পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

'আর আমি জমিনে সৃষ্টি করেছি সুদৃঢ় পর্বত, যেন তা পর্বতসমূহ নিয়ে একদিকে হেলে না পড়ে[১], আর আমি তাতে তৈরি করেছি প্রশস্ত রাস্তা, যেন তারা চলতে পারে।' (আম্বিয়া ২১:৩১)

একই বিষয়ে আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে–

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

'আর জমিনে তিনি স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বতমালা, যাতে তোমাদের নিয়ে জমিন হেলে না যায় এবং নদ-নদী ও পথসমূহ, যাতে তোমরা পথপ্রাপ্ত হও।' (নাহল ১৬:১৫)

একই কথা বলা হয়েছে অন্য আরেকটি আয়াতে–

وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

'আর জমিনে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পাহাড়, যাতে তা তোমাদের নিয়ে হেলে না পড়ে, আর তাতে ছড়িয়ে দিয়েছেন প্রত্যেক প্রকারের প্রাণী; আর আসমান থেকে আমি পানি পাঠাই। অতঃপর তাতে আমি জোড়ায় জোড়ায় কল্যাণকর উদ্ভিদ জন্মাই।' (লোকমান, ৩১:১০)

পেরেখ যেমন ছোট বড় হয় পাহাড়গুলোও তেমন ছোট বড় হয়। এজন্য বিশাল উঁচু পাহাড়গুলোর কথা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءً فُرَاتًا

'আর এখানে স্থাপন করেছি সুদৃঢ় ও সুউচ্চ পর্বত এবং তোমাদের পান করিয়েছি সুপেয় পানি।' (মুরসাল, ৭৭:২৭)

এই পাহাড়গুলো যেমন আমরা স্থলে দেখতে পাই তেমনিভাবে জলেও তার অস্তিত্ব রয়েছে। পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতগুলো সেদিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

[১] আধুনিক ভূ-তত্ত্ববিদগণ বলেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থ উত্তপ্ত গলিত পদার্থের তাপ ছড়ানোর কারণে পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ সঙ্কুচিত হয়ে তাতে ভাঁজ সৃষ্টি হয় এবং তার উপরের অংশই হলো পর্বত। পর্বতমালা পৃথিবী-পৃষ্ঠের ভারসাম্য রক্ষা করে।

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

'আর তিনিই জমিনকে বিস্তৃত করেছেন এবং তাতে সুদৃঢ় পর্বতমালা ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন। আর প্রত্যেক প্রকারের ফল তিনি জোড়া জোড়া করে সৃষ্টি করেছেন। তিনি রাত দ্বারা দিনকে ঢেকে দেন। নিশ্চয়, যে কওম চিন্তাভাবনা করে তাদের জন্য এতে নিদর্শনাবলী রয়েছে।' (রাদ, ১৩:৩)।

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ

'আর জমিনকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে সুদৃঢ় পাহাড় স্থাপন করেছি। আর তাতে উৎপন্ন করেছি সকল প্রকার বস্তু সুনির্দিষ্ট পরিমাণে। আর তাতে তোমাদের জন্য এবং তোমরা যার রিয্ক দাতা নও তাদের জন্য রেখেছি জীবনোপকরণ।' (হিজর ১৫:১৯-২০)

কোনো কোনো কিতাব থেকে জানা যায়, পৃথিবীর বুকে সর্বপ্রথম যেই পাহাড় সৃষ্টি করা হয় তা হলো মক্কার জাবালে আবী কুবাইস পর্বত। আল্লাহ রাতকে সৃষ্টি করেছেন মানুষের আরামের জন্য। আর দিন হলো কাজ-কর্ম করে জীবিকা অন্বেষণের জন্য। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেছেন যে, এই গোটা পৃথিবী যদি একটি পাথর হতো তাহলে এখানে মানুষ বসবাস করতে পারতো না। পানি ধারণ করতে পারতো না। পৃথিবীর একেক অংশ একেক রকম করে তৈরি করা হয়েছে। কোনো অংশকে তৈরি করা হয়েছে পানি ধারণ করার জন্য, আবার কোনো অংশকে তৈরি করা হয়েছে পানি নামানোর জন্য। আর কোনো অংশকে তৈরি করেছেন ফসল উৎপন্ন করার জন্য। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন এজন্যই অপর এক আয়াতে বলছেন–

وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُكُلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

'আর জমিনে আছে পরস্পর পাশাপাশি ভূখণ্ড, আঙ্গুর-বাগান, শস্যক্ষেত, খেজুর গাছ, যেগুলোর মধ্যে কিছু একই মূল থেকে উদগত আর কিছু ভিন্ন ভিন্ন মূল থেকে উদগত, যেগুলো একই পানি দ্বারা সেচ করা হয়, আর আমি খাওয়ার ক্ষেত্রে একটিকে অপরটির তুলনায় উৎকৃষ্ট করে দেই, এতে নিদর্শন রয়েছে ঐ কওমের জন্য যারা বুঝে।' (রা'দ ১৩:৪)

পর্বতমালার সৃষ্টি ও প্লেট তত্ত্ব :

এই আয়াতে বলা হয়েছে জমিনে আছে পরস্পর পাশাপাশি ভূ-খণ্ড। এতে বুঝা যায় গোটা পৃথিবীর বিভিন্ন অংশ প্লেটের মতো পাশাপাশি সাজানো রয়েছে। বর্তমান ভূতাত্ত্বিক বিজ্ঞানেও তাই বলা হয়েছে। 'প্রধানত পরস্পর সংযুক্ত হয়ে, অথবা নির্দিষ্ট ক্রম বিন্যাসের অনুসারে পর্বতমালাসমূহ পৃথিবীতে সৃষ্টি হয়েছে। এসকল পর্বতশ্রেণী মহাদেশ সমূহের প্রান্তে সীমানা তৈরি করেছে। এবং দ্বীপমালার আকারে সাগরে-মহাসাগরে গিয়ে মিলিত হয়েছে। পর্বতশ্রেণীর এরূপ বিন্যাসে ধারণা করা যায় যে, এর অংশ বিশেষ মহাসাগরে ডুবন্ত অবস্থায় রয়েছে। পাহাড় শুধু স্থলেই নয় সাগরেও আছে। এভাবে একটি পাহাড় শ্রেণী ভূমধ্য সাগরের উপকূল ধরে এশিয়া মাইনর, ভারত, বার্মা বরাবর বিস্তৃত হয়েছে এবং এর অংশ বিশেষ সমূদ্রে তলিয়ে রয়েছে। তারপর পূর্বদিকে ভারতের ইস্ট ইন্ডিজ বা পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি করে উত্তর দিকে চলে গিয়েছে এবং এর ফলে এ্যালিউশিয়ান (Aleucian) দ্বীপমালার উদ্ভব হয়েছে। এরপর দক্ষিণ দিকে পরিব্যাপ্ত হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপপুঞ্জ সৃষ্টি করত: নিউজিল্যান্ড অবধি গিয়েছে। কুমেরুর (Antarctica) অপরদিকে সম্প্রতি একটি পর্বত শ্রেণী আবিস্কৃত হয়েছে এবং তা নিউজিল্যান্ড পর্যন্ত বিস্তৃত পর্বতশ্রেণীর সাথে যুক্ত হয়েছে। এন্টার্কটিকা হয়ে আটলান্টিক মহাসাগরের তলদেশ দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার আন্দিজ (Andes) পর্বতমালার সাথে গিয়ে সংযোগ ঘটেছে। তারপর সেখান থেকে সমুদ্র উপকূল বরাবর উত্তর আমেরিকার সাথে গিয়ে যুক্ত হয়েছে। প্রশান্ত মহাসাগরের গভীরতা এভাবে একটি পর্বতশ্রেণী দ্বারা পূর্ণভাবে পরিবেষ্টিত হয়েছে। আবার পাইরেনিজ (Antarctica) হতে পামির মালভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত ইউরোপ-ইউরেশিয় পর্বতশ্রেণী ভূমধ্য সাগর, কৃষ্ণ সাগর ও পারস্য উপসাগরের তীর ধরে অগ্রসর হয়েছে। পর্বতশ্রেণীর

এরূপ একটি ব্যবস্থাপনা পৃথিবীর সকল পর্বতের ক্ষেত্রে বিস্তারিতভাবে দেখা যেতে পারে। এভাবে সমগ্র পৃথিবী পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে রয়েছে। আর পর্বতসমূহ এর ওপর শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মহাদেশীয় প্লেটের সীমানাতে পর্বতের সৃষ্টি।

উপরে উল্লিখিত প্রথম পর্বতশ্রেণী ইউরেশীয় প্লেট, আরবদেশীয় প্লেট, অস্ট্রেলীয় ভারতীয় প্লেট, এন্টার্কটীকা প্লেট, সীমানায় সৃষ্টি হয়েছে। আরেকটি শ্রেণী প্রশান্ত মহাসাগরীয় প্লেট, উত্তর আমেরিকা প্লেট ও দক্ষিণ আমেরিকার প্লেটের সীমান্তে উদ্ভূত হয়েছে। অন্যান্য পর্বত শ্রেণীকেও ভিন্ন ভিন্ন প্লেটের সাথে যুক্ত করা যেতে পারে। (তথ্যসূত্রঃ আল-কুরআনে বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা নং ২৬০, প্রকাশনায়, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।)

আল্লাহর পরিচয় : বিজ্ঞানীদের বক্তব্য

যুগে যুগে যত জ্ঞানী-বিজ্ঞানী এসেছেন তারা প্রায় সকলেই মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছেন। বর্তমান যুগেও বিজ্ঞানীরা স্বীকার করছেন। নাস্তিক, যারা মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে একেবারে অস্বীকার করে তাদের সংখ্যা পৃথিবীতে খুবই নগণ্য। বিশ্বের বেশিরভাগ মানুষ ও বড় বড় বিজ্ঞানীরা আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করেন ।

পদার্থ বিজ্ঞানী রবার্ট মরিস পেজ বলেছেন, 'মহাসত্য উদ্ভাবনের জন্য জরুরি শর্তাবলীর ভিত্তিতে মহান আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভের চেষ্টা করা হলে তা স্বতঃস্ফূর্তভাবে স্পষ্ট ও প্রকট হয়ে ধরা দিবে। আল্লাহ ও মানুষের মধ্যে যে সম্পর্ক থাকতে পারে বা থাকা উচিত সে সম্পর্কে কেউ গবেষণা করলে সেই গবেষণার জন্য অবশ্য পালনীয় শর্তসমূহ অতীব গুরুত্ব সহকারে ও সর্বান্তকরণে পূরণ করলে বাঞ্ছিত সম্পর্ক স্থাপিত হতে পারে।'

অর্থাৎ যদি মানুষ সত্যিকারভাবে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য গবেষণা করে তাহলে সে অবশ্যই আল্লাহর পরিচয় পাবে। আল্লাহকে সে জানতে পারবে।

এমনিভাবে গণিত ও রসায়নবিদ, বিশ্বের আরেক বিজ্ঞানী জনাব জন ক্লীভ কথরান লিখেছেন, 'যখন এই জগত নিজেকে নিজে সৃষ্টি করতে পারেনি। পারেনি তার পরিচালনাকারী আইনসমূহ তৈরি করতে, তখন এই সৃষ্টির পেছনে নিশ্চয়ই অযৌগ কোনো প্রতিনিধি দ্বারা সম্ভব হয়েছে। (একটি জড় পদার্থ যে নিজেকে নিজে চালাতে পারে না, নিজে কিছু আবিস্কার করতে পারে না, সুতরাং তাকে নিশ্চয়ই অন্য কোনো অজড় পদার্থ সৃষ্টি করেছে বা অজড় কোনো প্রতিনিধি দ্বারা এগুলো সম্পাদিত হয়েছে।) উক্ত প্রতিনিধি এই কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে অতীব বিস্ময়কর, অলৌকিক ব্যাপারাদি সম্পাদন করেছেন। তাতে এই প্রতিপন্ন হয় যে, এই প্রতিনিধি নিশ্চয়ই সর্বশ্রেষ্ঠ মনীষার অধিকারী যে মনীষাকে মনের প্রতীক বলা যায়। জড় জগতে মনকে কাজে লাগাতে হয়।'

আরেক গাণিতিক ও পদার্থ বিজ্ঞানী ডোনাল্ড হেনরী পেটার বলেন, বিশ্ব প্রকৃতির প্রস্তুতি প্রক্রিয়া সম্পর্কে যে কোনো কিছুই বিবেচনা করা হোক না কেন, অথবা প্রকৃতির উৎপত্তি সম্পর্কে যে কোনো পর্যালোচনাই করা হোক না কেন, একজন বৈজ্ঞানিক হিসেবে সকল বিষয়ে স্বকীয় প্রধান ভূমিকায় আল্লাহকে বসিয়ে আমি পরম সন্তুষ্টি লাভ করি। প্রতিটি ক্ষেত্রে মহান আল্লাহ হচ্ছে মূল চরিত্র। যে সব প্রশ্নের আজো জবাব দেয়া হয়নি, একমাত্র তিনিই তার জবাব।'

শরীরবৃত্তবিদ ও জীব রাসায়নিক অলটার অসকার ল্যান্ডবার্গ নামক বিজ্ঞানী বলেন, 'প্রাকৃতিক প্রপঞ্চে যেভাবে আল্লাহকে মূর্ত করা হয়েছে, তার মাধ্যমে আল্লাহকে হৃদয়ঙ্গম করার ক্ষমতা আজো মানুষের জন্য সীমাবদ্ধ। তাই আল্লাহতেই আল্লাহর অস্তিত্ব। এই বিশ্বাসের একটি আধ্যাত্মিক ভিত্তিও থাকে যা ঈমানের ভিত্তি। তাই মানুষের স্বভাবসিদ্ধ। ঈমানের ভিত্তিকে এক স্বয়ংক্রিয় আল্লাহতে বিশ্বাস করা অনেক মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত আনন্দ ও তৃপ্তি লাভের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।'

এভাবে আরেক কেমিস্ট বিজ্ঞানী রিচার্ড থমাস ডেভিস পার্কস বলেন, 'সামান্য পানি আপনাকে গল্প বলবে' শীর্ষক বিজ্ঞানের একটি জার্নালে তিনি উল্লেখ করেন, 'আমি অজৈব এই বিশ্বে আমার চারদিকে নিয়ম-শৃঙ্খলা আর সুপরিকল্পিত পরিকল্পনাই দেখতে পাই। আমি এটা বিশ্বাস করি না যে, আকস্মিকভাবে ও ভাগ্যক্রমে পরমাণুর একত্রিত হওয়ার ফলে এগুলো সৃষ্টি হয়েছে এবং আমার চারদিকে তারা বিরাজ করছে। তার কারণ মনে করি পরিকল্পনার জন্য মনীষার প্রয়োজন। আর সেই মনীষাকেই আমি আল্লাহ বলে অভিহিত করি।'

আরেকজন পদার্থ ও রসায়ন শাস্ত্রবিদ, অস্কার লিউ ব্রাউয়ার 'আমাদের মুখোমুখি অপরিহার্য প্রশ্ন' নামক একটি বইয়ে বলেন, 'সৃষ্টিকর্তা হিসেবে মহান আল্লাহকে স্বীকৃতি দান এবং তার ফলে মহাবিশ্বের সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক হিসেবে মহান আল্লাহকে মেনে নেয়ার মাত্র একটি অর্থ থাকতে পারে, আর তা হলো, মানুষের প্রতি অমানুষী আচরণের পরিসমাপ্তি।'

বিজ্ঞানী ইরভিং উইলিয়াম নবলচ বলেন, 'আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি। আল্লাহকে বিশ্বাস করার কারণ হচ্ছে আমি মনে করি না যে সর্ব প্রথম ইলেক্ট্রন ও প্রোটন অথবা প্রথম পরমাণু, এমাইনো এসিড, প্লাজম বা সর্ব প্রথম বীজ ও কোষ তৈরির জন্য অযৌগই মূখ্য। আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি। কারণ আমার কাছে এই সকল কিছুর মূলে আল্লাহর পবিত্র অস্তিত্বই একমাত্র যুক্তিসিদ্ধ ব্যখ্যা হতে পারে।'

একইভাবে আরেক বিজ্ঞানী ইঞ্জিনিয়ার ক্লার্ক এম হাওয়ে লিখেছেন, 'আমি যে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দিতে চাই তা হচ্ছে, মহাবিশ্বের পরিকল্পককে অবশ্যই অলৌকিক হতে হবে। আমি বিশ্বাস করি যে, মহান আল্লাহ অলৌকিক।'

আরেক বিজ্ঞানী জ্যোতির্বিদ ও গাণিতিক মার্লিন গ্র্যান্ট স্মিথ বলেন, 'আমার কথা হচ্ছে আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ আছে এবং যারা তাকে অধ্যাবসায় সহকারে পাওয়ার চেষ্টা করেন, তিনি তাদের জন্য মহা পুরস্কার মহান দাতা।'

আরেক রসায়ন বিজ্ঞানী বলেছেন, আল্লাহকে অথবা আল্লাহর কল্পনাকে অবাঞ্ছিত মনে না করে অথবা তথাকথিত অপরিপক্ক বিষয়াবলীর মধ্যে তাকে শ্রেণীভুক্ত বিষয় না করে বরং আমাদের জন্য তাকে মহাবিশ্বের আইন ও শৃঙ্খলার মধ্যে তাকে দেখা এবং তার কাজের প্রশংসা করা উচিত।'

(তথ্যসূত্রঃ স্রষ্টা ও সৃষ্টি তত্ত্ব, পৃষ্ঠা নং ৫৯-৬৪, ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রকাশিত।

অর্থাৎ আল্লাহর সৃষ্টিকে দেখে আল্লাহর পরিচয় লাভ করা এবং তাকে স্বীকার করা এবং তার প্রশংসা করা উচিত। এজন্য কোনো এক ফার্সী কবি লিখেছিলেন–

در سخن مخفی منم چوں بوئے گل در برگ گل

ہرکہ دیدن میل دارد در سخن بیند مرا

যখন কেউ আল্লাহকে দেখতে চায়, 'ফুলের ভেতরে যেমন ফুলের সুগন্ধি লুকায়িত থাকে তেমনি আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনকেও তার সৃষ্টির মাঝে দেখতে পাই।' সুতরাং যারা আল্লাহকে দেখতে চাও, তারা মহান আল্লাহর সৃষ্টি দেখে তার সম্পর্কে ধারণা লাভ করো।

এভাবে যারাই মহান আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে গবেষণা করেছেন, যারাই মহান আল্লাহর সৃষ্টির কিছুটা জ্ঞান রাখেন, তারা মহান আল্লাহর পরিচয়কে স্বীকার করেছেন। উপরোল্লিখিত আলোচনা সমূহের দ্বারা আমরা বুঝতে পারলাম যে, অনেক বিজ্ঞানীই মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করেছেন। এটা যে শুধু আমাদের এই যুগের ঘটনা তা নয়। অতীতেও মুসলিমরা তো বটেই এমনকি ইহুদি-খৃষ্টানদের মধ্যকার অনেক বড় বড় বিজ্ঞানীও মহান আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। নাস্তিক সর্ব যুগে সামান্য কিছু লোকই ছিলো এবং বর্তমানেও এদের সংখ্যা খুবই নগণ্য। বেশিরভাগ লোকেরাই স্রষ্টায় বিশ্বাসী। তবে এতটুকু বিশ্বাস করা পরকালে মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায় : আল্লাহর একত্ববাদ

আল্লাহ আছেন শুধু এতটুকু মানলেই মুসলিম হওয়া যায় না।

এতক্ষণ পর্যন্ত ঈমান বিল্লাহ-র প্রথম ধাপ وُجُوْد بَـــارِيْ تَعَــالَيْ ওযুদে বারী তা'আলা বা আল্লহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। যার মাধ্যমে প্রমাণ করা হয়েছে যে, পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসী। কিন্তু এতটুকু বিশ্বাস করলেই একজন মানুষ মুসলিম হয়ে যায় না। বর্তমান মুসলিম বিশ্বের অধিককাংশ নামধারী মুসলিমরা মনে করে যে, আল্লাহ একজন আছেন। তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিয্ক দাতা, বৃষ্টি দাতা, ফসল দাতা, আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্যের স্রষ্টা ইত্যাদি বিশ্বাস করা আর মাঝে মধ্যে জানাজার নামাজ, জুমার নামাজ, ঈদের নামাজে অংশগ্রহণ করা। আর টাকা পয়সা থাকলে মাঝে মধ্যে হজ্জ্ব-ওমরাহ্ করলেই একজন মানুষ মুসলিম হিসেবে গণ্য হয়ে যায়। অথচ বিষয়টি বাস্তবে একেবারেই ভুল। কেননা যুগে যুগে যারা নবী-রাসুলদের বিরোধিতা করেছে এবং কাফেরদের নেতৃত্ব দিয়েছে তারাও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। ফিরাউন, নমরূদ, হামান, কারুন, আবু জাহেল, আবু লাহাব ও মক্কার অনান্য কাফের নেতৃবর্গ সকলেই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করতো। মক্কার তৎকালীন কাফের আবু জাহেল, আবু লাহাবসহ সকলেই বিশ্বাস করতো আল্লাহ আছেন। তিনিই রিযিক দাতা, বৃষ্টি দাতা, ফসল দাতা, ইত্যাদিসহ অনেককিছুই তারা বিশ্বাস করতো। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা মুসলিম নয় বরং কাফের। আমরা আমাদের এ আলোচনার মাধ্যমে প্রথমে এ দাবির সমর্থনে দলিল পেশ করার চেষ্টা করবো। অতঃপর তারা আল্লাহকে মানা সত্ত্বেও কেনো কাফের মুশরিক তার প্রমাণ করার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

মক্কার তৎকালীন কাফের-মুশরিকদের অবস্থা–

আল্লাহ আছেন এ কথা মক্কার কাফেররাও বিশ্বাস করতো তার প্রমাণ মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার বাণী–

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ

'যদি আপনি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, কে তাদের সৃষ্টি করেছেন, তবে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ্। অতঃপর তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? (যুখরুফ, ৪৩ : ৮৭)

এই আয়াতে দেখা গেলো যে, আমরা যেভাবে আমাদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে বিশ্বাস করি, ঠিক সেভাবে মক্কার কাফেররাও নিজেদের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরও ইরশাদ করেন–

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ

'আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহ্।' (যুখরুফ, ৪৩:৯)

এই আয়াতে দেখা গেলো যে, আমরা যেভাবে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কে বিশ্বাস করি, মক্কার তৎকালীন কাফেররাও একইভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে আসমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করতো। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ

'যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে, অতঃপর তা দ্বারা মৃত্তিকাকে উহার মৃত হওয়ার পর সঞ্জীবিত করে? তবে তারা অবশ্যই বলবে, আল্লাহ্। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্রই। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বোঝে না। (আনকাবুত, ২৯:৬৩)

এই আয়াতে দেখা গেলো আমরা যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-কে বৃষ্টি দাতা ও বৃষ্টির মাধ্যমে জমিনের উর্বরতা দানকারী হিসেবে বিশ্বাস করি ঠিক সেভাবে মক্কার তৎকালীন কাফেররাও বৃষ্টি দাতা ও জমিনের উর্বরতা দানকারী হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কেই বিশ্বাস করতো। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ

'যদি আপনি তাদের জিজ্ঞেস করেন, কে নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছে, চন্দ্র ও সূর্যকে কর্মে নিয়োজিত করেছে? তবে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ্। তাহলে তারা কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে? (আনকাবুত, ২৯ : ৬১)

এই আয়াতে দেখা গেলো আমরা যেভাবে চন্দ্র-সূর্যের পরিচালক হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-কে বিশ্বাস করি, মক্কার কাফেররাও সেই একইভাবে চন্দ্র-সূর্যের পরিচালক হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-কে বিশ্বাস করতো। আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَذَكَّرُونَ

'বলুন পৃথিবী এবং পৃথিবীতে যারা আছে, তারা কার? যদি তোমরা জান। এখন তারা বলবে, সবই আল্লাহ্র। বলুন, তবুও কি তোমরা চিন্তা করো না? (মুমিনুন, ২৩ : ৮৪-৮৫)

এই আয়াতে দেখা গেলো যে, আমরা যেভাবে গোটা পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সকল কিছুর মালিক হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-কে বিশ্বাস করি মক্কার কাফেররাও একইভাবে গোটা পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী সকল কিছুর মালিক হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-কেই বিশ্বাস করতো। অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ – سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ

'বলো, 'কে সাত আসমানের রব এবং মহা আরশের রব'? তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বলো, 'তবুও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না? বলো, 'তিনি কে যার হাতে সকল কিছুর কর্তৃত্ব, যিনি আশ্রয় দান করেন এবং যাঁর ওপর কোনো আশ্রয়দাতা নেই?' যদি তোমরা জান। তারা বলবে, 'আল্লাহ।' বলো, 'তবুও কীভাবে তোমরা মোহাচ্ছন্ন হয়ে আছ?' (মুমিনুন, ২৩:৮৬-৮৯)

এই আয়াতে দেখা গেলো আমরা যেভাবে সাত আসমান ও আরশে আজিমের মালিক হিসেবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে বিশ্বাস করি মক্কার তৎকালীন কাফেররাও তাই করত। আমরা যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-কে সকল কিছুর কর্তৃত্বের অধিকারী ও আশ্রয়দাতা হিসেবে

বিশ্বাস করি মক্কার কাফেররাও তাই করত। আরেক আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُونَ

'বলো , 'আসমান ও জমিন থেকে কে তোমাদের রিয্ক দেন? অথবা কে (তোমাদের) শ্রবণ ও দৃষ্টিসমূহের মালিক? আর কে মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন? কে সব বিষয় পরিচালনা করেন'? তখন তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। সুতরাং, তুমি বলো, 'তারপরও কি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে না'?' (ইউনুস, ১০:৩১)

এই আয়াতে পরিষ্কারভাবে দেখা গেলো যে, আমরা যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে রিয্ক দাতা, শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টি শক্তির মালিক। জীবন ও মৃত্যুর মালিক হিসেবে বিশ্বাস করি ঠিক মক্কার তৎকালীন কাফিররাও একই রকম আক্বীদাহ্ পোষণ করতো।

মুহাম্মাদ (স.) এর পিতার নাম আব্দুল্লাহ–

মক্কার তৎকালীন কাফেরগন শুধু আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা, রিযকদাতা, বৃষ্টিদাতা, ফসলদাতা, আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্যের পরিচালক হিসেবে বিশ্বাস করতো তার জলন্ত প্রমাণ হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পিতার নাম ছিলো আব্দুল্লাহ। আব্দুল্লাহ অর্থ হচ্ছে আল্লাহর বান্দা। অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুনিয়াতে আসার আগেই সেখানকার মানুষ নিজেদের মহান আল্লাহর বান্দা বলে পরিচয় দিতে আনন্দ পেতো। যদি মক্কার লোকেরা আল্লাহকে বিশ্বাস নাই করতো তাহলে তারা আব্দুল্লাহ নাম রাখল কি করে?

আবরাহা ও আব্দুল মুত্তালিবের কথোপকথন

মক্কার লোকেরা যে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করতো তার আরেকটি প্রমাণ হলো যখন ইয়েমেনের তৎকালীন বাদশাহ আবরাহা বাইতুল্লাহ ধ্বংস করতে এসেছিলো তখন তার কিছু সৈনিকেরা মক্কার চারণভূমিতে এসে তৎকালীন

কাবার মুতাওয়াল্লী আব্দুল মুত্তালিবের কিছু বকরী, ভেড়া-দুম্বা ধরে নিয়ে যায়।

আবরাহা বাদশাহ তখন মক্কা থেকে একটু দূরে মিনার শেষ প্রান্তে মুযদালিফার দিকে অবস্থান করছিলো। ঐ স্থানটিকে বলা হয় বাতনে মুহাসসার। যেখানে আবরাহার বাহিনীকে আল্লাহর গযবে আবাবিল পাখি দ্বারা ধ্বংস করা হয়। সেখানে আবরাহা তার মোবাইল সিংহাসনে অবস্থান করছিলো। আব্দুল মুত্তালিব যখন জানতে পারলেন যে, তার কিছু বকরী, ভেড়া-দুম্বা ইত্যাদি আবরাহার সৈনিকেরা ধরে নিয়ে গেছে তিনি তা ফিরিয়ে আনার জন্য আবরাহার নিকট রওয়ানা দিলেন। আবরাহা ইতিপূর্বে আব্দুল মুত্তালিব সম্পর্কে অনেক কথা-বার্তা শুনেছিলো। কুরাইশদের সর্দার, কাবার মুতাওয়ালি হিসেবে আব্দুল মুত্তালিবের প্রভাব আবরাহা বাদশার অন্তরে ছিলো। আব্দুল মুত্তালিব দেখতেও খুবই সুদর্শন ছিলেন। তাই আব্দুল মুত্তালিবকে দেখার পর আবরাহা বাদশাহ আরো প্রভাবিত হলো। নিজের সিংহাসন থেকে নেমে জমিনে বিছানা বিছিয়ে বসলো। আব্দুল মুত্তালিব তখন কোনো ভূমিকা ছাড়াই নিজের বকরী ভেড়া-দুম্বাগুলো ফেরত চাইলেন। তিনি বললেন, 'আমি শুনেছি আপনার লোকেরা আমার কিছু ভেড়া-বকরী-দুম্বা ছিনতাই করে নিয়ে এসেছে। তাই আমি সেগুলো ফেরত নেয়ার জন্য এসেছি।' আবরাহা বাদশাহ এই কথা শুনে বললো, 'আমার অন্তরে আপনার ব্যাপারে একটি বড় প্রভাব কাজ করছিলো। আমি আপনার সম্পর্কে অনেক ভালো কথা শুনেছি এবং আপনাকে দেখার পর তা আরো গভীর হয়েছে। কিন্তু আপনার কথা শুনে সে সব কিছুই ম্লান হয়ে গেলো। আমি অবাক হয়েছি। কারণ, আমি এসেছি আপনাদের কাবা ধ্বংস করার জন্য। যার সাথে আপনাদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, সম্মান ও মর্যাদা জড়িত। অথচ আপনি সেই সংক্রান্ত কোনো কথা না বলে আপনি এসেছেন আপনার তুচ্ছ কিছু ভেড়া-বকরী ফেরত নেয়ার জন্য।' তখন আব্দুল মুত্তালিব যেই উত্তর দিয়েছিলেন তা আমাদের সকলের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়। তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, তুমি ঠিকই বলেছো। আমি আমার ভেড়া-বকরী গুলো নিতে এসেছি কারণ আমি সেগুলোর মালিক। আর তুমি যেই কাবা ভাঙ্গতে এসেছো সেই কাবার মালিক আমি না, সেই কাবার মালিক হলেন মহান

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। কাবার বিষয়ে তিনিই তোমার সঙ্গে বোঝাপড়া করবেন।

এর পরের ইতিহাস সকলেরই জানা। যা সুরায়ে ফিলে আলোচনা করা হয়েছে।

কাবা ঘর পুণ:নির্মাণ ও মক্কার কাফেরদের অবস্থান :

আরবের লোকেরা যে মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করতো তার প্রমাণ শুধু এখানেই শেষ নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বয়স যখন পয়ত্রিশ বছর। তখন খানায়ে কাবা পুন:নির্মাণের প্রয়োজন হলো। মক্কার তৎকালীন সংসদ ভবন দারুন নদওয়ায় বসে আবু জাহেল, আবু লাহাব, আবু সুফিয়ানসহ সকল লিডাররা খানায়ে কাবা পুন: নির্মাণের জন্য পরামর্শে বসলেন। তারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন কাবা নির্মাণে কোনো হারাম উপার্জনের পয়সা লাগানো যাবে না। সে অনুযায়ী হালাল পয়সা জমা করার জন্য বিভিন্ন গোত্রে লোক নিযুক্ত করা হলো। কিন্তু যখন আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ হিসাব করা হলো তখন দেখা গেলো এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে ইব্রাহিম (আ.) কর্তৃক নির্মিত পূর্ণ কাবা পুণ:নির্মাণ করা সম্ভব নয়। তাই হয়ত কাবার কিছু অংশ বাদ দিতে হবে নতুবা হারাম পয়সা যোগ করতে হবে। মক্কার তৎকালীন কাফেররা সিদ্ধান্ত নিলেন আল্লাহর ঘর কাবা পুন:নির্মাণে কোনো হারাম পয়সা লাগানো যাবে না। প্রয়োজনে কিছু অংশ বাদ দেওয়া হবে। তাই করা হলো। আজ পর্যন্ত কাবার সেই অংশ বাহিরেই রয়ে গেছে। যা হাতিমে কাবা নামে ইতিহাস হয়ে আছে। তাহলে বুঝা গেলো বর্তমানে মুসলিম দেশের মসজিদ কমিটির লোকদের চেয়ে তৎকালীন মক্কার কাফেরদের আক্বীদাহ বিশ্বাস অনেক পরিষ্কার ছিলো। কেননা বর্তমানে হালাল হারাম যাচাই করা হয় না। সুদখোর, ঘুষখোর, মদখোর, জুয়াচোর সকলের টাকাই গ্রহণ করা হয়।

মক্কার তৎকালীন কাফেরদের হজ্জ্ব ও তালবিয়া :

মক্কার তৎকালীন কাফেররা আল্লাহকে বিশ্বাস করত বলে যে দাবি করা হলো তার আরেকটি উজ্জ্বল প্রমাণ হলো তারা হজ্জ্ব করতো এবং হজ্জ্বের সময় যে তালবিয়া পাঠ করতো সেটি নিম্নরূপ−

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ – رضى الله عنهما – قَالَ كَانَ الْمُشْرِكُونَ يَقُولُونَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ – قَالَ – فَيَقُولُ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– وَيْلَكُمْ قَدْ قَدْ فَيَقُولُونَ إِلاَّ شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ يَقُولُونَ هَذَا وَهُمْ يَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ

'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, 'মুশরিকরা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করার সময়ে বলতো লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লাশারীকা লাকা লাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নি'মাতা লাকা ওয়াল মূলক, লা শারীকা লাকা।' এ পর্যন্ত বলার পরে রাসুলুল্লাহ (স.) বলতেন, 'থামো থামে বা যথেষ্ট যথেষ্ট।' কেননা তারা এরপরে আরো একটু যোগ করে বলতো, 'ইল্লা শারীকান হুয়া লাক তামলিকুহু ওয়ামা মালাক।'
(সহীহ মুসলিম ২৮৭২, বায়হাকী সুনানে কুবরা ৯৩০৪, মিশকাত ২৫৫৪)

এই হাদীসে দেখা গেলো যে, তালবিয়ার প্রথম অংশ তারা আমাদের মতোই পাঠ করতো। তবে শেষে গিয়ে শিরক করতো।

মক্কার লোকেরা তাওয়াফ করতো উলঙ্গ হয়ে। কারণ তারা বলতো, 'আমরা যখন দুনিয়াতে আসি তখন তো আমাদের কোনো কাপড়-চোপড় ছিলো না। তাই আল্লাহর নিকট থেকে যেভাবে এসেছি সেভাবেই আল্লাহর নিকটে উপস্থিত হবো। তারা আরো বলতো আমাদের উপার্জনে সুদ-ঘুষসহ বিভিন্ন ধরনের হারামের সংমিশ্রণ রয়েছে। তাই হারাম উপার্জনের কাপড়-চোপড় নিয়ে আল্লাহর পবিত্র ঘর তাওয়াফ করা যাবে না। যে কারণে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের পরবর্তী বছর হজ করতে আসেন নি। তিনি ঐ বছর হজের সময় আবু বকর (রা.) কে আমীর করে তার সাথে আলী (রা.) কে পাঠালেন নিম্নোক্ত ঘোষণা দেওয়ার জন্য যে–

قَالَ : بُعِثْتُ بِأَرْبَعٍ : أَنْ لَا يَطُوْفَ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ وَمَنْ كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَ سَلَّمَ عَهْدٌ فَهُوَ إِلَىْ مُدَّته وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عَهْدٌ فَأَجَلُهُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَلَا يَجْتَمِعُ الْمُشْرِكُوْنَ وَالْمُسْلِمُوْنَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا

'আলী (রা.) বলেন, 'আমাকে ৪টি ঘোষণা শোনানোর জন্য পাঠানো হয়েছে
১. কোনো উলঙ্গ ব্যক্তি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতে পারবে না।

২. যাদের সঙ্গে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর চুক্তি রয়েছে তা চুক্তির মেয়াদ পর্যন্ত বহাল থাকবে। যাদের সঙ্গে কোনো চুক্তি নেই তাদের সময় ৪ মাস।
৩. মুমিন ছাড়া কোনো ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না।
৪. এই বছরের পর মুসলিম আর মুশরিক (হজে) একত্র হতে পারবে না।
(তিরমিযী ৩০৯২; বুখারী ১ম খণ্ড, ৮৯ পৃষ্ঠা তরজমাতুল বাব;)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, মক্কার কাফের মুশরিকরাও হজ করতো, তাওয়াফ করতো। যদি তারা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী না হতো তাহলে এগুলো করার অর্থ কি?

বদরের যুদ্ধ ও আবু জাহ্লের আল্লাহর কাছে প্রার্থনা :

শুধু তাই না, বিপদ-আপদে তারা আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতো। বদরের যুদ্ধে আবু জাহ্ল যখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো তখন সে আল্লাহর কাছেই সাহায্য চেয়েছিলো। বদরের যুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কীয় হাদীসগুলো পড়লেই জানা যাবে। একদিকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর তাঁবুতে বসে দোয়া করছেন, 'হে আল্লাহ! যদি তুমি আগামীকাল যুদ্ধে মুসলিমদের পরাজিত করো তাদের হত্যা করো, তবে এই দুনিয়াতে হকের নাম নেয়ার মতো আর কেউ জীবিত থাকবে না। এই ক্ষুদ্র বাহিনী যদি শহীদ হয় তাহলে এই জমিনে কে আর তাওহীদের কথা বলবে, কে আর ঈমানের কথা বলবে। এভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার তাঁবুতে বসে আবু জাহেল আবু লাহাব ও ওতবাদের নাম ধরে ধরে বদ দোয়া করেছেন। সে দোয়ার একটি অংশ নিম্নরূপ :

اللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَا مِنْ قُرَيْشٍ اللَّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا جَهْلِ بْنَ هِشَامٍ وَعُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ وَعُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ وَأُمَيَّةَ بْنَ خَلَفٍ أَوْ أُبَيَّ بْنَ خَلَفٍ

'হে আল্লাহ্! তুমি কুরাইশের সর্দারদের পাকড়াও করো। হে আল্লাহ! তুমি আবু জাহ্ল ইবনে হিশামকে ধ্বংস করো, ওতবা ইবনে রবীআকে ধ্বংস করো, শায়বা ইবনে রবীআকে ধ্বংস করো, উকবা ইবনে আবী মুআইত, উমাইয়া ইবনে খলফ ও উবাই ইবনে খলফকেও ধ্বংস করো।' (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০১৪)

আবু বকর (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে গিয়ে বললেন, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ! অনেক হয়েছে। আর দোয়া করা লাগবে না। আল্লাহ অবশ্যই আপনার কথা শুনবেন।'

একদিকে আল্লাহর রাসুল দোয়া করছেন, অপরদিকে আবু জাহেলও আল্লাহর দরবারে দোয়া করছে। আবু জাহেলের দোয়াও হাদীসের সব কিতাবে পাবেন। সে বলছিলো– 'হে আল্লাহ্! হে কাবার প্রভু! আমরা তোমার কাবা ঘরকে সম্মান করি। হাজিদের পানি পান করাই। আগামীকাল যুদ্ধ হবে আমাদের সাথে ধর্মত্যাগীদের। আমাদের এবং তাদের মধ্যে যারা তোমার কাছে অধিক প্রিয় তুমি তাদের সাহায্য করো।'

পরদিন যুদ্ধে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা মুসলিমদের বিজয় দিলেন। আবু জাহেল নিহত হলো। তার সাথে আরো ৭০ জন কাফের নিহত হলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'আল্লাহ আবু জাহেলের দোয়াকে কবুল করেছেন। সে দোয়া করেছিলো আল্লাহর প্রিয় দলকে সাহায্য করার জন্য। আল্লাহ তার প্রিয় দল তার প্রিয় নবীকেই সাহায্য করেছেন। আর আল্লাহর দুশমন আবু জাহ্লের দলকে পরাজিত করেছেন।'

ফিরআউন ও তার মন্ত্রীবর্গ :

এমনিভাবে ফিরআউন যে নিজেকে একদিকে আল্লাহ বলে দাবি করেছিলো। সেও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলো। তবে মিশর ভূ-খণ্ডের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী জনগণের আনুগত্যের মালিক হিসেবে নিজেকে আল্লাহ দাবি করেছিলো। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ

'আর ফিরআউন বললো, 'হে পরিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ আছে বলে আমি জানি না। অতএব হে হামান, আমার জন্য তুমি ইট পোড়াও, তারপর আমার জন্য একটি প্রাসাদ তৈরি করো। যাতে আমি মূসার ইলাহকে দেখতে পাই। আর নিশ্চয়ই আমি মনে করি সে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।' (কাসাস ২৮:৩৮)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

'ফিরআউন বললো, যদি তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে ইলাহরূপে গ্রহণ করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে কয়েদিদের অন্তর্ভুক্ত করবো।' (শুআরা ২৬:২৯) শুধু তাই না। যেহেতু সে মিশরের একমাত্র মা'বুদ দাবি করেছে সেহেতু তার হুকুম ছাড়া অন্য কারো হুকুম মানা যাবে না বলে আইন জারি করলো এবং দেশের সমস্ত মানুষকে বিশাল মাঠে একত্র করে ঘোষণা করলো, যা পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে-

فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

'অতঃপর সে লোকদের একত্র করে ঘোষণা দিল। আর বললো, 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব'।' (নাযিআত, ৭৯:২৩-২৪)

যে ফিরআউন নিজেকে আল্লাহ এবং সর্বোচ্চ রব বলে দাবি করেছিলো সেও কিন্তু আল্লাহকে বিশ্বাস করতো। পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতটি তাই প্রমাণ করে-

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ

'আর ফিরআউনের কওমের সভাসদগণ বললো, 'আপনি কি মূসা ও তার কওমকে ছেড়ে দেবেন যাতে তারা জমিনে ফাসাদ করে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্য ইলাহগুলোকে বর্জন করে?' (আরাফ, ৭:১২৭)

এই আয়াতে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, ফেরাউনও বিশ্বাস করতো যে, আল্লাহ আছে। তবে সে নিজেকে রব দাবি করেছিলো এই হিসেবে যে সে মিশরের স্বার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং একমাত্র আইন-বিধান দাতা। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ

'আর ফিরআউন তার কওমের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে বললো, 'হে আমার কওম, মিশরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এ সব নদ-নদী কি আমার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না, তোমরা কি দেখছ না?' (যুখরুফ, ৪৩:৫১)

ইয়াহুদি-খ্রিস্টান :

আল্লাহ আছেন একথা ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরাও বিশ্বাস করে। বরং তারা নিজেদের আল্লাহর নাতি-পুতি ও আত্মীয়স্বজন জ্ঞান করে থাকে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ

'আর ইয়াহুদিরা বলে, উযাইর আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে, মাসীহ আল্লাহর পুত্র।' (তাওবাহ্ ৯:৩০)

ইয়াহুদিরা যেহেতু উযাইর (আ.) কে আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করে, আর খ্রিস্টানরা ঈসা মসীহ (আ.) কে আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করে। আর আল্লাহর পুত্রের অনুসারী হিসেবে ওরা নিজেদেরও আল্লাহর সন্তান ও নাতি-পুতি হিসেবে আকিদা পোষণ করে। তাও আবার তাজ্য পুত্র নয়। প্রিয় ও আশীর্বাদ পুষ্ট সন্তান ও নাতিপুতি হিসেবে দাবি করে। যেমন পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ

'ইয়াহুদি ও নাসারারা বলে, আমরা আল্লাহর পুত্র ও তার প্রিয়জন।' (মায়েদা ৫:১৮)

এই আয়াতে ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরা নিজেদের আল্লাহর 'আব্না' দাবি করেছে। 'আবনা' শব্দটি 'ইব্ন' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ পুত্র। আরবি ভাষায় আবনা শব্দটি ছেলেমেয়ে, নাতি-পুতিসহ সকল নবপ্রজন্মকে বুঝায়। সে যাই হোক, এ আয়াতদ্বয়ের মাধ্যমে একটি বিষয় পরিষ্কার হলো যে, ইয়াহুদি খ্রিস্টানরাও আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তা সত্ত্বেও তারা কাফের। বুঝা গেলো আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করলেই একজন লোক মুমিন বা মুসলিম হয় না।

ইবলিস :

আল্লাহ আছেন একথা ইবলিসও বিশ্বাস করে। ইবলিস জান্নাত থেকে বহিস্কৃত হওয়ার পরে আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করেছিলো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ

'সে বললো, 'সেদিন পর্যন্ত আমাকে অবকাশ দিন, যেদিন তাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে'। তিনি বললেন, 'নিশ্চয়ই তুমি অবকাশপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত'।' (আরাফ, ৭:১৪-১৫)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ

'সে বললো, 'হে আমার রব, তাহলে আমাকে অবকাশ দিন সে দিন পর্যন্ত, যেদিন তাদের পুনরুজ্জীবিত করা হবে'। তিনি বললেন, 'তুমি নিশ্চয়ই অবকাশপ্রাপ্তদের একজন'। (হিজর, ১৫:৩৬-৩৭)

এই আয়াত দুটিতে দেখা যায় ইবলিস বিপদে পড়েও কোনো গাইরুল্লাহর কাছে প্রার্থনা করে নাই। আল্লাহর কাছেই প্রার্থনা করেছে। এমনকি বণী আদমকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সে যে শপথ করেছে সেক্ষেত্রেও কোনো গাইরুল্লাহর নামে শপথ না করে আল্লাহর নামেই শপথ করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

'সে বললো, 'আপনার ইজ্জতের কসম! আমি তাদের সকলকেই বিপথগামী করে ছাড়ব।' তাদের মধ্য থেকে আপনার একনিষ্ঠ বান্দারা ছাড়া।' (সোয়াদ, ৩৮:৮২-৮৩)

ইবলীস শুধু আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসীই নয় বরং সে আল্লাহর শাস্তিকেও ভয় করে। পবিত্র কুরআনে দুষ্ট লোকদের শয়তানের সঙ্গে তুলনা করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ

তারা শয়তানের মতো, যে মানুষকে কাফের হতে বলে। অতঃপর যখন সে কাফের হয়, তখন শয়তান বলে, তোমার সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। আমি বিশ্বরব আল্লাহ্ তা'আলাকে ভয় করি। (হাশর, ৫৯:১৬)

শয়তান যে আল্লাহতে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে ভয়ও করে তার আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে বদরের যুদ্ধ। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের দিকে গিয়েছিলেন আবু সুফিয়ানের সিরিয়া থেকে আসা কাফেলাকে ধরার জন্য। তখন আবু সুফিয়ান মক্কায় সাহায্য চেয়ে লোক

পাঠালে আবু জাহেলের বাহিনী বদরের ময়দানে গিয়েছিলো আবু সুফিয়ানের বাণিজ্য কাফেলাকে রক্ষা করার জন্য। কিন্তু আবু সুফিয়ান মক্কায় সাহায্য চেয়ে সে আবার নিজের নিরাপত্তার জন্য নিজেই পথ পরিবর্তন করে সাগরের পাড় দিয়ে বিকল্প পথে মক্কায় পৌঁছে গেলো। মক্কায় পৌঁছে আবু সুফিয়ান আবু জাহেলের কাছে চিঠি লিখলো, আমরা নিরাপদে চলে এসেছি তোমরাও মক্কায় চলে এসো। তখন আবু জাহেল সবাইকে নিয়ে পরামর্শে বসলো যে, যুদ্ধ করবে নাকি বিনা যুদ্ধে মক্কায় ফিরে যাবে। বেশির ভাগ লোক পরামর্শ দিলো ফিরে যাবার জন্য কেননা, তারা যে জন্য এসেছিলো সেই আবু সুফিয়ান নিরাপদে মক্কায় চলে গেছে। তখন শয়তান নজদ এলাকার এক পীর সাহেবের সুরত ধরে সেখানে এলো। শয়তান এসে তাদের যুদ্ধ করার জন্য উৎসাহিত করলো এবং বললো এই যুদ্ধে তোমাদের মোকাবিলা করার মতো শক্তি মুহাম্মদের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে নেই। কেননা মুহাম্মদ (স.) এর সঙ্গে তার সঙ্গী মাত্র তিনশত তের জন। তাছাড়া তাদের কাছে তেমন কোনো অস্ত্রশস্ত্রও নেই। আবার অন্য কেউ তাদের সাহায্য করবে সে সুযোগও নেই। কেননা তারা মদিনার বাহিরে। পক্ষান্তরে তোমরা এক হাজার সশস্ত্র যোদ্ধা। এ যুদ্ধে তোমাদের বিজয় সুনিশ্চিত। এভাবে শয়তান তাদের যুদ্ধ করার জন্য উস্কে দিলো এবং নিজেও যুদ্ধের ময়দানে তাদের সঙ্গে থাকার অঙ্গীকার ঘোষণা করলো। কিন্তু যুদ্ধের ময়দানে যখন উভয় পক্ষ মুখোমুখি হলো তখন শয়তান কেটে পড়লো। কেনো কেটে পড়ল? পবিত্র কুরআন থেকেই দেখে নিন। ইরশাদ হচ্ছে–

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

'আর যখন শয়তান তাদের জন্য তাদের আমলসমূহ সুশোভিত করল এবং বললো, 'আজ মানুষের মধ্য থেকে তোমাদের ওপর কোনো বিজয়ী নেই এবং নিশ্চয়ই আমি তোমাদের পার্শ্বে অবস্থানকারী'। অতঃপর যখন দু'দল একে অপরকে দেখল, তখন সে পিছু হটল এবং বললো, 'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের থেকে মুক্ত, নিশ্চয়ই আমি এমন কিছু দেখছি, যা তোমরা দেখছ

না। অবশ্যই আমি আল্লাহকে ভয় করি এবং আল্লাহ্ কঠিন আজাবদাতা'।' (আনফাল, ৮:৪৮)

এই আয়াতে দেখা গেলো যে, শয়তান আবু জাহেলদের থেকে কেটে পড়ার কারণ হিসেবে বললো আমি যা দেখতে পাচ্ছি তোমরা তা দেখতে পাচ্ছো না। শয়তান সেদিন আসমান থেকে আল্লাহর ফেরেশতাদের নামতে দেখেছিলো। সে আরো বললো। আমি আল্লাহকে ভয় করি।

শয়তানের পক্ষে আল্লাহকে ভয় না করে কোনো উপায় নেই। কেননা সে ফেরেশতাদের সঙ্গে বসবাস করেছে। জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে তার পূর্ণ ধারণা আছে। তা সত্ত্বেও সে মুমিন বা মুসলিম নয়। বুঝা গেলো আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করলেই কেউ মুমিন হয়ে যায় না। যদি তাই হতো তাহলে ফিরআউন থেকে শুরু করে মক্কার আবু জাহ্ল ও আবু লাহাব পর্যন্ত যত কাফের মুশরেক রয়েছে এমনকি শয়তানও মুমিন-মুসলিম হয়ে যেতো। কেননা আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত সরাসরি পবিত্র কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে প্রমাণ করেছি যে, এরা সকলেই আল্লাহর অস্তিত্বকে স্বীকার করতো। আল্লাহকে আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, খাল-বিল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, গাছ-গাছালি, লতা-পাতা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করতো। তারা আল্লাহকে বৃষ্টি দাতা, ফসল দাতা, রিয্ক দাতা হিসেবেও বিশ্বাস করতো। তা সত্ত্বেও তারা কাফের। পরকালে তারা সকেলই চিরস্থায়ী জাহান্নামের অধিবাসী। কারণ কি? কারণ শুধু একটিই। আর তা হলো তাওহীদ! শুধুমাত্র তাওহীদ!! একমাত্র তাওহীদ!!!

তাওহীদ :

ইসলামের মূল ভিত্তি তাওহীদ। তাওহীদের মাধ্যমেই মুমিন ও কাফেরের মধ্যে পার্থক্য হয়ে যায়। ইতিপূর্বে যাদের আলোচনা করা হয়েছে তারা যদিও আল্লাহকে আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, খাল-বিল, নদী-নালা, পাহাড়-পর্বত, গাছ-গাছালি, লতা-পাতা সকল কিছুর সৃষ্টিকর্তা হিসেবে বিশ্বাস করতো। তারা আল্লাহকে বৃষ্টি দাতা, ফসল দাতা, রিয্ক দাতা হিসেবেও বিশ্বাস করতো। কিন্তু তারা তাওহীদে বিশ্বাসী ছিলো না। তাওহীদ বলতে আল্লাহর সাথে কোনো প্রকার অংশীদার সাব্যস্ত করা অথবা কোনো প্রকার ভায়া-মাধ্যম সাব্যস্ত করা ব্যতিরেকে সম্পূর্ণ একনিষ্ঠভাবে

সরাসরি এক আল্লাহর ইবাদত করাকে বোঝায়। আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের ক্ষেত্রে, আল্লাহর গুণাবলীর ক্ষেত্রে কাউকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক বা অংশীদার না বানানো। ইতিপূর্বে যাদের আলোচনা করা হয়েছে তারা একদিকে আল্লাহকে বিশ্বাস করতো, অপরদিকে আল্লাহর একক ক্ষমতা ও আইন-বিধানকে অস্বীকার করতো। ফিরআউন যদিও আল্লাহর অস্তিত্ব বিশ্বাস করতো কিন্তু এক আল্লাহতে বিশ্বাসী ছিলো না। আল্লাহর সার্বভৌমত্ব, আল্লাহর ক্ষমতা ও আল্লাহর আইন-বিধানকে মিশর ভূ-খণ্ড থেকে বাতিল করে নিজের সার্বভৌমত্ব, নিজের ক্ষমতা ও নিজের আইন-বিধানকে কায়েম করেছিলো। মক্কার কাফেররা আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও আল্লাহর একক ক্ষমতাকে অস্বীকার করতো। তারা একদিকে নিজ সন্তানের নাম আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা রাখলেও অপরদিকে অন্য সন্তানদের নাম আব্দুল উয্যা বা মূর্তির বান্দা, আব্দুস শামস বা সূর্যের বান্দা ইত্যাদিও রেখেছিলো। তারা হজ্জ্ব-ওমরাহ্ ও বাইতুল্লাহর তাওয়াফসহ বিভিন্ন ইবাদত করলেও সরাসরি আল্লাহর করতো না। বরং মূর্তি ও দেব-দেবীদের আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী বা মধ্যস্ততাকারী ভায়া-মাধ্যম হিসেবে বিশ্বাস করতো। যেভাবে বর্তমান মুসলিম জাতির বিভিন্ন তরীকার পীর-মাশায়েখদের মুরীদগণ তাদের তরিকার পীর সাহেবদের তাদের মধ্যে ও আল্লাহর মধ্যে মধ্যস্ততাকারী হিসেবে বিশ্বাস করে থাকে। ইয়াহুদী-খৃস্টানেরা আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাসী ছিলো না। তারা উযাইর (আ.)-কে এবং ঈসা মসীহ্ (আ.)-কে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মধ্যস্থতাকারী ভায়া মাধ্যম ও আল্লাহর পুত্র বিশ্বাস করতো। বরং খৃষ্টানরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে এক তৃতীয়াংশ বিশ্বাস করতো। অর্থাৎ আল্লাহ, যিশু, মেরী এই তিনজন মিলে তাদের ভাষায় পূর্ণাঙ্গ প্রভু। যিশু আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার পাপ মোচন করে থাকেন ইত্যাদি।

সাফা পাহাড় থেকে তাওহীদের ঘোষণা :

মক্কার তৎকালীন কাফেররা আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা, আল্লাহকে রিয্ক দাতা, ফসল দাতা, বৃষ্টি দাতা, আসমান জমিন, চন্দ্র-সূর্য পরিচালক হিসেবে বিশ্বাস করাসহ অনেককিছু বিশ্বাস করা এবং হজ্জ্ব, ওমরাহ, বাইতুল্লাহর তাওয়াফ সহ নানা ইবাদত করলেও তাওহীদ বা আল্লাহর এককত্বে বিশ্বাসী

ছিলো না। তারা আল্লাহর ইবাদত করলেও দেব-দেবী ও মূর্তিদের আল্লাহ এবং বান্দার মাঝে মধ্যস্থ্যতাকারী ও সুপারিশকারী হিসেবে বিশ্বাস করতো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

'আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, 'এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী'। বলো, 'তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও যমীনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন'? তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।' (ইউনুস, ১০:১৮)

এই আয়াতে দেখা গেলো যে, মক্কার মূর্তিপূঁজক কাফের-মুশরিকরা মূর্তিগুলোকে সরাসরি আল্লাহ মনে করে ইবাদত করতো না। বরং এগুলোকে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী মনে করে ইবাদত করতো। এরমক আরো একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মূর্তি ও দেব-দেবী পূজারীদের আরেকটি উদ্দেশ্য তুলে ধরেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

'আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা কেবল এজন্যই তাদের 'ইবাদাত করি যে, তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।' (জুমার, ৩৯:৩)

এ আয়াতে আওলিয়া শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যা ওলী শব্দের বহুবচন। বাংলায় যার অর্থ দাড়ায় অভিভাবক, মুরুব্বী। বর্তমানে এদেশের পরিভাষায় পীর, ওলী, বুজুর্গ ইত্যাদি। মক্কার কাফেররা যেভাবে আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণার ভিত্তিতে মূর্তি ও দেব-দেবীদের মধ্যস্থ্যতাকারী ও সুপারিশকারী ওলী বানিয়ে নিয়েছিলো বর্তমানেও বিভিন্ন পীরের মুরিদগণ পীরসাহেবদের সুপারিশকারী ও মধ্যস্থ্যতাকারী জ্ঞান করে থাকে। অথচ আল্লাহ ও তার বান্দার মাঝে ইবাদতের ক্ষেত্রে কোনো ভায়া মাধ্যম নেই।

আর সুপারিশ করার বিষয়টি আল্লাহর ইচ্ছার উপরে নির্ভরশীল। কিয়ামতে তিনি যাকে অনুমতি দিবেন কেবলমাত্র তিনিই সুপারিশ করতে পারবেন। আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্তি ছাড়া কেউ তার কাছে সুপারিশ করতে পারবে না। দুনিয়াতে থাকাবস্থায় কাউকে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যে মধ্যস্থ্যতাকারী বা সুপারিশকারী জ্ঞান করা শির্‌ক, যা তাওহীদের পরিপন্থি। সে কারণেই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুয়্যাত প্রাপ্তির পর প্রায় ৩ বৎসর পর্যন্ত গোপনে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছেন। অতঃপর আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশ এলো–

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ

'সুতরাং তোমাকে যে আদেশ দেয়া হয়েছে, তা ব্যাপকভাবে প্রকাশ্যে প্রচার করো এবং মুশরিকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।' (হিজর, ১৫:৯৪)

এ আয়াতে সাধারণভাবে প্রকাশ্যে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তার নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজন ও পাড়া-প্রতিবেশীকে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

'আর তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দের সতর্ক করো।' (শুআরা, ২৬:২১৪)

এই নির্দেশ নাযিল হওয়ার পরে প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তৎকালীন আরবের প্রথা অনুযায়ী সকাল বেলা গিয়ে সাফা পাহাড়ের চূড়ায় আরোহন করেন, মক্কার বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ডাক দিলেন। আরবের নিয়ম ছিলো ভোর বেলা দূরের থেকে কেউ শত্রু বাহিনী দেখতে পেলে পাহাড়ের চূড়ায় উঠে নিজ সম্প্রদায়কে সতর্ক করার জন্য এবং শত্রু মোকাবেলা করার জন্য, প্রস্তুতি গ্রহণ করার জন্য এভাবে ডাক দেওয়া হতো। সে নিয়ম অনুযায়ী যখন সকাল বেলায় মক্কার লোকদের কানে আওয়াজ পৌঁছলো তখন তারা এটাকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করলো। তারা আরো লক্ষ্য করলো সকাল বেলার এই ডাক সাধারণ কোনো মানুষের নয়। এটা মুহাম্মাদ (স.) এর ডাক। যুবক মুহাম্মাদ, যে সকলের কাছে আল-আমিন খেতাবে ভূষিত, যে কখনো মিথ্যা কথা বলে না। কারো সঙ্গে

প্রতারণা করে না। তাই মক্কার সকল নেতৃবৃন্দ সাফা পাহাড়ে একত্রিত হলো। যে নেতা অসুস্থতার কারণে বা অন্য কোনো কারণে উপস্থিত হতে পারে নাই সে তার পক্ষে প্রতিনিধি পাঠিয়েছিলো। পুরো ঘটনাটি নিম্নের হাদীসে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ صَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبُطُونِ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَجَعَلَ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَخْرُجَ أَرْسَلَ رَسُولًا لِيَنْظُرَ مَا هُوَ فَجَاءَ أَبُو لَهَبٍ وَقُرَيْشٌ فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِيَّ قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَلِهَذَا جَمَعْتَنَا فَنَزَلَتْ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ

ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, যখন وانذر عشيرتك الاقربين অর্থ:'(হে নবী!) আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সাবধান করুন' আয়াতটি নাযিল হয়, তখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পাহাড়ে উঠলেন এবং হে বণী ফিহর! হে বণী আ'দী! বলিয়া কুরাইশদের বিভিন্ন গোত্রকে উচ্চ:স্বরে ডাক দিলেন, ইহাতে তাহারা সকলে সমবেত হল। অতঃপর তিনি বললেন, 'বলতো, আমি যদি এখন তোমাদেরকে বলি যে, এই পাহাড়ের উপত্যকায় একটি অশ্বারোহী সৈন্যবাহিনী তোমাদের ওপর অতর্কিতে আক্রমণের জন্য প্রস্তুত রয়েছে, তবে কি তোমরা আমার কথা বিশ্বাস করবে?' সমবেত সকলে বললো, 'হাঁ, অবশ্যই বিশ্বাস করবো। কারণ আমরা আপনাকে সর্বদা সত্যবাদীই পেয়েছি। আপনার থেকে কখনো মিথ্যা শুনার অভিজ্ঞতা আমাদের নেই।' তখন তিনি বললেন, 'আমি তোমাদের ভবিষ্যতের একটি কঠিন শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করছি।' এ কথা বলা মাত্র আবু লাহাব সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করলো। আর বললো, 'তুমি কি আমাদের এ জন্যই জড়ো করেছো। তোমার গোটা জীবন ধ্বংস হোক।' অতঃপর আবু লাহাবের কথার প্রতিবাদে সুরা লাহাব تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ অবতীর্ণ হয়। যার অর্থ আবু লাহাবের উভয় হাত ধ্বংস হউক এবং তাহার

বিনাশ হউক। (বুখারী ৪৭৭০, ১৩৯৪, মুসলিম ৭০৩৪, মুসনাদে আহমাদ ২৮০১, মেশকাত ৫৩৭২)

এই হাদীসটির আরেকটি সূত্রে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ قَالَ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّفَا فَصَعِدَ عَلَيْهِ ثُمَّ نَادَى يَا صَبَاحَاهْ فَاجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَيْهِ بَيْنَ رَجُلٍ يَجِيءُ إِلَيْهِ وَبَيْنَ رَجُلٍ يَبْعَثُ رَسُولَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي لُؤَيٍّ أَرَأَيْتُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ خَيْلًا بِسَفْحِ هَذَا الْجَبَلِ تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ صَدَّقْتُمُونِي قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ فَقَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ سَائِرَ الْيَوْمِ أَمَا دَعَوْتَنَا إِلَّا لِهَذَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ

এই হাদীসটি উপরোল্লিখিত হাদীসের মতোই। তবে এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম يَا صَبَاحَاهْ ইয়া সাবাহা বলে ডাক দিয়েছিলেন। (মুসনাদে আহমাদ ২৮০১)

আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হযেছে–

يا بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ إِنِّيْ نَذِيْرٌ إِنَّمَا مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ رَأَى الْعَدُوَّ فَانْطَلَقَ يَرْبَأُ أَهْلَهُ فَخَشِيَ أَنْ يَسْبِقُوْهُ إِلَيْ أَهْلِه فَجَعَلَ يَهْتِفُ يَا صَبَاحَاهُ يَا صَبَاحَاهُ أَتَيْتُمْ أَتَيْتُمْ

হে বণী আবদে মানাফ, আমি তোমাদের সাবধানকারী। প্রকৃতপক্ষে আমার ও তোমাদের দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে শত্রু সেনাদের দেখে আপন কওমকে বাঁচানোর জন্য চলল, অতঃপর আশঙ্কা করল যে, দুশমন তাদের ওপর আগেই এসে আক্রমণ করে বসতে পারে। তাই সে উচ্চ:স্বরে يا صباحاه বলে সতর্ক করতে লাগল। (জামেউল আহাদীস ২৫৮৫১)

অপর একটি হাদীসে আরেকটু বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِه الآيَةُ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ دَعَا رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِى كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى هَاشِمٍ

أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِى نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'যখন وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ 'তুমি তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করো' নাযিল হল, তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদেরকে ডাক দিলেন। তারা সমবেত হলো। তিনি ব্যাপকভাবে এবং বিশেষ বিশেষ গোত্রকে ডাক দিয়ে সতর্কবাণী শুনালেন। তিনি বললেন, 'হে কা'ব ইবনে লুয়াইর বংশধর! তোমরা নিজেদের দোযখের আগুন হতে বাঁচাও। হে মুররা ইবনে কা'বের বংশধর! তোমরা নিজেদের দোযখের আগুন হতে বাঁচাও। হে আবদে শামসের বংশধর! তোমরা নিজেদের দোযখের আগুন হতে বাঁচাও। হে আবদে মানাফের বংশধর! তোমরা নিজেদের দোযখের আগুন হতে বাঁচাও। হে হাশেমের বংশধর! তোমরা নিজেদের দোযখের আগুন হতে বাঁচাও। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! তোমরা নিজেদের দোযখের আগুন হতে বাঁচাও। হে মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতেমা! তুমি তোমার নিজেকে দোযখের আগুন হতে বাঁচাও। কেননা, আল্লাহর আজাব হতে রক্ষা করার কোনো ক্ষমতা আমার নেই। অবশ্য তোমাদের সঙ্গে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে, তা আমি (দুনিয়াতে) সদ্ব্যবহার দ্বারা সিক্ত করব। (মুসলিম ৫২২, নাসায়ী ৩৬৪৬, মুসনাদে আহমাদ ৮৭২৬, মেশকাত ৫৩৭৩)

তিনি আরও ঘোষণা করেন–

فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ؟ نَعَمْ، كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تُعْطُونِيهَا تَمْلِكُونَ بِهَا الْعَرَبَ، وَتَدِينُ لَكُمْ بِهَا الْعَجَمُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: نَعَمْ وَأَبِيكَ، وَعَشْرَ كَلِمَاتٍ، قَالَ: تَقُولُونَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَتَخْلَعُونَ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِه قَالَ: فَصَفَّقُوا بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ قَالُوا: أَتُرِيدُ مُحَمَّدُ أَنْ تَجْعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا، إِنَّ أَمْرَكَ لَعَجَبٌ

'যদি তোমরা আমাকে একটি কথা মেনে নেওয়ার অঙ্গীকার দাও তাহলে তোমরা সেই একটি কথার মাধ্যমে গোটা আবর বিশ্বের মালিক বনে যাবে এবং অনারব বিশ্ব হয়তো তোমাদের দ্বীন গ্রহণ করবে নতুবা তোমাদের

جِزْيَةٌ (কর) দিয়ে থাকবে।' এ কথা শুনে আবু জাহ্‌ল বললো, 'অবশ্যই! তোমার পিতার কসম, আরো দশটি কথা মানবো।' রাসুলুল্লাহ (স.) বললেন, 'সেই একটি কথা হলো তোমরা বলবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এক আল্লাহর ইবাদত করবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য যা কিছুর ইবাদত করা হয় সবকিছুকে ত্যাগ করবে।' এ কথা শুনামাত্র সকলেই হাতে তালি দিতে শুরু করলো আর বললো, 'হে মুহাম্মাদ তুমি কি আমাদের সকল আল্লাহদের এবং দেব-দেবীদের এক আল্লাহতে কেন্দ্রীভূত করতে চাও। তোমার ব্যাপারটি বড় আশ্চর্যনক। (সীরাত ইবনে হিশাম ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৮০)

মক্কার লোকেরা এই যে কালিমার বিরোধিতা করেছিলো, এটা কিন্তু তারা জেনে বুঝেই করেছিলো। তারা বুঝতে পেরেছিলো যে এই কালিমা গ্রহণ করার অর্থ হলো আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো সার্বভৌমত্ব মেনে নেয়া যাবে না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো ক্ষমতা স্বীকার করা যাবে না। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো আণুগত্য করা যাবে না। আল্লাহ এবং বান্দার মধ্যে কোনো ভায়া মাধ্যম মানা যাবে না। ৩৬০ দেবদেবীসহ কোনো মূর্তি বা প্রতীমার ইবাদত করা যাবে না। আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কোনো নেতা–নেত্রীর আনুগত্য করা যাবে না। আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে মানবরচিত কোনো আইন-বিধান মানা যাবে না। ব্যক্তি জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, আন্তর্জাতিক জীবনে, ব্যাংকে, আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে সকল ক্ষেত্রে এক আল্লাহর হুকুম বাস্তবায়ন করতে হবে। এসবকিছু বুঝে-শুনেই তারা প্রতিবাদ করেছিলো। পবিত্র কুরআনে তাদের বক্তব্যকে সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নের আয়াতে বলা হয়েছে–

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

'তবে কি সে সকল ইলাহগুলোকে এক ইলাহতে কেন্দ্রীভূত করে ফেলল? এতো অত্যন্ত আজব কথা।' (সোয়াদ, ৩৮ঃ ৫)

অর্থাৎ মুহাম্মাদ আমাদের সকল ইলাহকে ধ্বংস করে দিতে চাচ্ছে। সব ইলাহের স্থলে এক আল্লাহকে বসাতে চাচ্ছে। এটা কোনো ভাবেই মেনে নেওয়া যায় না, কেননা এতে আমাদের বাপ-দাদার ধর্ম, আমদের দেব-দেবী, সবকিছুই বর্জন করতে হবে। বুঝা গেলো মক্কার আবু জাহ্‌ল, আবু লাহাব সহ তৎকালীন কাফের মুশরিকরা 'লা ইলাহা ইল্লাহ'-এর যে অর্থ

বুঝেছিলো বর্তমান অধিকাংশ মুসলিমরাও সে অর্থ বুঝতে পারে নাই। মূলতঃ কাফের মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের মূল পার্থক্য এখানেই। ইসলাম বলে এক আল্লাহই সব কিছুর মালিক। কাফিররা বলে আল্লাহও আছেন, আবার অন্য শরীকও আছে। সৃষ্টিকর্তা হিসেবে আল্লাহকে মানবো, আবার আইন প্রণেতা আমরাই থাকবো। আল্লাহর ইবাদত করবো আবার দেব-দেবীরও উপাসনা করবো। মসজিদ কমিটির মেম্বারও থাকবো আবার পূজা কমিটির সদস্যও থাকবো। এটাই ছিলো যুগে যুগে কাফের মুশরিকদের আসল চরিত্র।। সে কারণেই একদিকে আব্দুল মুত্তালিবের এক পুত্রের নাম যেমন ছিলো আব্দুল্লাহ, তেমনিভাবে অপরদিকে আরেক পুত্রের নাম ছিলো আব্দুল উজ্জা। হিন্দুরা আল্লাহকেও মানে আবার ৩৩ কোটি দেব-দেবীও মানে। ইসলাম বলে এটাই কুফর। এটাই হলো মুসলিমদের সাথে অমুসলিমদের পার্থক্য। ইসলাম বলে পূর্ণাঙ্গভাবে এক আল্লাহকেই মানতে হবে। এটাই 'লা ইলাহা ইল্লাহ' এর মর্ম কথা। এটাই ছিলো সকল নবী রাসুলদের দাওয়াতের মূল বক্তব্য। বিস্তারিত দলিল-প্রমাণ ধারাবাহিকভাবে নিম্নে পেশ করা হলো।

সকল নবী-রাসুলগণের সম্মিলিত দাওয়াত ছিল তাওহীদ

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا أَنَا فَاعْبُدُونِ

'আর তোমার পূর্বে এমন কোনো রাসুল আমি পাঠাইনি যার প্রতি আমি এই ওহী নাজিল করিনি যে, 'আমি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই; সুতরাং তোমরা আমার ইবাদাত করো।' (আম্বিয়া, ২১:২৫)

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, সকল নবী রাসুলদের মূল দাওয়াত ছিলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এজন্য যুগে যুগে নবী-রাসুলদের শরীয়াহ্‌ বা শাখা প্রশাখাগত ইবাদতের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য হলেও মূল শরীয়াহ্‌ তথা আল্লাহর দ্বীনের কোনো পার্থক্য ছিলো না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ প্রসঙ্গে বলেন–

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইব্রাহিম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হলো, তোমরা দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না। তুমি মুশরিকদের যেদিকে আহবান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার দিকে নিয়ে আসেন। আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন।' (শুরা, ৪২:১৩)

এ আয়াতে দুটি বিষয় স্পষ্ট করা হয়েছে। প্রথম বিষয়টি হলো, সকল নবীদের দ্বীন তথা মূল দাওয়াহ্ ও শরীয়াহ্ একই ছিলো। নূহ (আ.), ইব্রাহিম (আ;), মূসা (আ.), ঈসা (আ;) ও আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহ সকলেই তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছিলো। এবং তাওহীদ ভিত্তিক দ্বীন কায়েমের জন্য তারা সকলেই আদিষ্ট ছিলেন। বহু ইলাহ্ ও বহু রবের ইবাদত ও আণুগত্য করা নিষেধ ছিলো। দ্বিতীয় বিষয়টি হলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন, 'তুমি মুশরিকদের যেদিকে আহ্বান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়।' এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যুগে যুগে যখনই তাওহীদের বাণী উচ্চারিত হয়েছে তখনই কাফির-মুশরিক, পীর পূজারী, মাজার পূজারী, নেতা-নেত্রীর অনুসারী লোকদের জন্য তা কঠিন মনে হয়েছে। তারা এর বিরুদ্ধে সর্বশক্তি দিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তাওহীদবাদী মুমিনদের উম্মাদ, কবি, মিথ্যাবাদী, জাদুকর ইত্যাদি বলে গালি-গালাজ করেছে। কাউকে চরমভাবে নির্যাতন করেছে, কাউকে হত্যা করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ

'তোমাদের নিকট যখনই কোনো রাসুল এমন কিছু নিয়ে এসেছে, যা তোমাদের মন:পূত নয়, তখন তোমরা অহঙ্কার করেছ, অতঃপর (নবীদের) একদলকে তোমরা মিথ্যাবাদী বলেছ আর একদলকে হত্যা করেছ।' (বাক্বারা, ২:৮৭)

আমরা এখন আরো বিস্তারিতভাবে পবিত্র কুরআন থেকে বড় বড় নয়জন নবী ও রাসুলগণের তাওহীদের ভাষণ ও তাঁদের সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করবো, ইনশাআল্লাহ।

তাওহীদের বিষয়ে ৯ জন নবী-রাসুলগণের ভাষণ

১. নুহ (আ.)

নুহ (আ.) একজন নবী ও রাসুল। তিনি তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

'আমি তো নূহকে তার কওমের নিকট প্রেরণ করেছি। অতঃপর সে বলেছে, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মহা দিনের আজাবের ভয় করছি'।' (আরাফ, ৭:৫৯)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, নুহ (আ.) তার জাতীকে এক আল্লাহর ইবাদত করতে আহ্বান করলেন। আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল কিছুর আনুগত্য ও ইবাদত করা থেকে নিষেধ করলেন।

তাওহীদের এ আহ্বান শুনামাত্র তার জাতির পীর-মুরিদ, মাজার পূজারী, দরগা পূজারী, মূর্তি-প্রতীমা পূজারী, দেব-দেবী পূজারী ও আল্লাহর পরিবর্তে নেতা-নেত্রীর অনুসারী মুশরিক সম্প্রদায় তেলে বেগুনে জ্বলে ওঠলো। প্রতিবাদে ফেটে পড়লো। বিভিন্ন বড় বড় পীর-বুযুর্গদের দোহাই দিতে আরম্ভ করলো। পবিত্র কুরআনে তাদের বক্তব্যকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তুলে ধরেছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

তার কওমের নেতৃবর্গ বললো, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে দেখতে পাচ্ছি'। সে বললো, 'হে আমার কওম, আমার মধ্যে কোনো ভ্রান্তি নেই; কিন্তু আমি সকল সৃষ্টির রবের পক্ষ থেকে রাসুল'। 'আমি তোমাদের

নিকট পৌঁছাচ্ছি আমার রবের রিসালাতসমূহ এবং তোমাদের কল্যাণ কামনা করছি। আর আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি, যা তোমরা জান না'। (আরাফ ৬০-৬২)

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র আরো বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ – قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُبِينٌ – أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُونِ – يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ – قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا – فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا – وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا – ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا – ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا – فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا – يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا – وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا – مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا – وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا – أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا – وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا – وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا – ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا – وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا – لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا – قَالَ نُوحٌ رَبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَنْ لَمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا – وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا – وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا – وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا – مِمَّا خَطِيئَاتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأُدْخِلُوا نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا – وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا – إِنَّكَ إِنْ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا – رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا

নিশ্চয়ই আমি নূহকে পাঠিয়েছিলাম তার কওমের কাছে (এ কথা বলে), 'তোমার কওমকে সতর্ক করো, তাদের নিকট যন্ত্রণাদায়ক আজাব আসার

পূর্বে'। সে বললো, 'হে আমার কওম! নিশ্চয়ই আমি তোমাদের জন্য এক স্পষ্ট সতর্ককারী-যে, তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর, তাঁকে ভয় করো এবং আমার আনুগত্য কর'। 'তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদের নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দেবেন; আল্লাহর নির্ধারিত সময় আসলে কিছুতেই তা বিলম্বিত করা হয় না, যদি তোমরা জানতে'! সে বললো, 'হে আমার রব! আমি তো আমার কওমকে রাত-দিন আহ্বান করেছি। 'অতঃপর আমার আহ্বান কেবল তাদের পলায়নই বাড়িয়ে দিয়েছে'। 'আর যখনই আমি তাদের আহ্বান করেছি 'যেন আপনি তাদের ক্ষমা করেন', তারা নিজদের কানে আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়েছে, নিজদের পোশাকে আবৃত করেছে, (অবাধ্যতায়) অনড় থেকেছে এবং দম্ভভরে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করেছে'। 'তারপর আমি তাদের প্রকাশ্যে আহবান করেছি'। অতঃপর তাদের আমি প্রকাশ্যে এবং অতি গোপনেও আহ্বান করেছি। আর বলেছি, 'তোমাদের রবের কাছে ক্ষমা চাও; নিশ্চয়ই তিনি পরম ক্ষমাশীল'। 'তিনি তোমাদের ওপর মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, 'আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগিচা দেবেন আর দেবেন নদী-নালা'। 'তোমাদের কী হল, তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরোয়া করছ না'? 'অথচ তিনি তোমাদের নানা স্তরে সৃষ্টি করেছেন'। 'তোমরা কি লক্ষ্য করো না যে, কীভাবে আল্লাহ স্তরে স্তরে সপ্তাকাশ সৃষ্টি করেছেন'? আর এগুলোর মধ্যে চাঁদকে সৃষ্টি করেছেন আলো আর সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন প্রদীপরূপে'। 'আর আল্লাহ তোমাদের উদগত করেছেন মাটি থেকে'। 'তারপর তিনি তোমাদের তাতে ফিরিয়ে নেবেন এবং নিশ্চিতভাবে তোমাদের পুনরুত্থিত করবেন'। 'আর আল্লাহ পৃথিবীকে তোমাদের জন্য বিস্তৃত করেছেন, যেন তোমরা সেখানে প্রশস্ত পথে চলতে পার'। নূহ বললো, 'হে আমার রব! তারা আমার অবাধ্য হয়েছে এবং এমন একজনের অনুসরণ করেছে যার ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কেবল তার ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়'। 'আর তারা ভয়ানক ষড়যন্ত্র করেছে'। আর তারা বলে, 'তোমরা তোমাদের উপাস্যদের বর্জন করো না; বর্জন করো না ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগূছ, ইয়া'উক ও নাসরকে'। 'বস্তুত তারা অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে, আর (হে আল্লাহ) আপনি জালিমদের ভ্রষ্টতা ছাড়া আর কিছুই বাড়াবেন না'। তাদের পাপের কারণে তাদের

ডুবিয়ে দেয়া হল অতঃপর আগুনে প্রবেশ করানো হল; তারা নিজদের সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে পায়নি। আর নূহ বললো, 'হে আমার রব! জমিনের ওপর কোনো কাফিরকে অবশিষ্ট রাখবেন না'। 'আপনি যদি তাদের অবশিষ্ট রাখেন তবে তারা আপনার বান্দাদের পথভ্রষ্ট করবে এবং দুরাচারী ও কাফির ছাড়া অন্য কারো জন্ম দেবে না'। 'হে আমার রব! আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যে আমার ঘরে ঈমানদার হয়ে প্রবেশ করবে তাকে এবং মুমিন নারী-পুরুষকে ক্ষমা করুন এবং ধ্বংস ছাড়া আপনি জালিমদের আর কিছুই বাড়িয়ে দেবেন না।' (নুহ, ১-২৮)

এই সুরার ভিতরে কাফির-মুশরিকদের একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। যা সর্বকালের সকল কাফির-মুশরিকদের মধ্যে বিদ্যমাণ। বর্তমানেও যার কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। আর তা হলো, নুহ (আ.) যখন তাওহীদের দাওয়াত পেশ করলেন। বহু ইলাহ ও বহু রবের ইবাদত ও আণুগত্য ত্যাগ করে এক আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের আহ্বান করলেন। তখন তার জাতির নেতৃরা তার এই মায়াবী আহ্বানকে স্বাগত জানানোর পরিবর্তে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তুললো। আর এজন্য মোক্ষম হাতিয়ার হিসেবে তৎকালীন সময়ের সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রখ্যাত কয়েকজন আল্লাহ ওয়ালাদের নাম উল্লেখ করলো। আর জনগণকে তারা বললো, 'তোমরা ওয়াদ, সুওয়া', ইয়াগুছ, ইয়া'উক ও নাসরকে' কখনো ছাড়বে না। মূলত এরা ছিলো ঐ সময়কার কয়েকজন বড় বড় আলেম ও বুযুর্গ। যাদের নামে ওরা মূর্তি তৈরি করেছিলো। এদের আল্লাহ এবং তাদের মধ্যে ভায়া মাধ্যম হিসেবে ইবাদত করতো। এদের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রার্থনা করতো। এ সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا صَارَتْ الْأَوْثَانُ الَّتِي كَانَتْ فِي قَوْمِ نُوحٍ فِي الْعَرَبِ بَعْدُ أَمَّا وَدٌّ كَانَتْ لِكَلْبٍ بِدَوْمَةِ الْجَنْدَلِ وَأَمَّا سُوَاعٌ كَانَتْ لِهُذَيْلٍ وَأَمَّا يَغُوثُ فَكَانَتْ لِمُرَادٍ ثُمَّ لِبَنِي غُطَيْفٍ بِالْجَوْفِ عِنْدَ سَبَإٍ وَأَمَّا يَعُوقُ فَكَانَتْ لِهَمْدَانَ وَأَمَّا نَسْرٌ فَكَانَتْ لِحِمْيَرَ لِآلِ ذِي الْكَلَاعِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نُوحٍ فَلَمَّا هَلَكُوا أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَى قَوْمِهِمْ أَنْ انْصِبُوا إِلَى مَجَالِسِهِمْ الَّتِي كَانُوا يَجْلِسُونَ

أَنْصَابًا وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا فَلَمْ تُعْبَدْ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ وَتَنَسَّخَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ

'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'নুহ (আ.) এর সম্প্রদায়ের প্রতীমাগুলো পরবর্তীতে আরবে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'ওয়াদ' নামক প্রতীমা দওমাতুল জন্দলে কাল্‌ব গোত্রে, 'সুওয়া' নামক প্রতীমা হুযাইল গোত্রে, 'ইয়াগূছ' নামক প্রতীমা প্রথমে মুরাদ গোত্রে পরবর্তীতে ছাবার নিকট জাওফ নামক স্থানে বনু গুতাইফ গোত্রে, 'ইয়া'উক' নামক প্রতীমা হামদান গোত্রে আর 'নাসর' নামক প্রতীমা হিমইয়ার নামক স্থানে যিলকালা গোত্রে স্থাপিত হয়। মূলত এগুলো নুহ (আ.)-এর সম্প্রদায়ের কয়েকজন আল্লাহওয়ালা নেক ও সৎ লোকদের নাম। যখন এরা মারা যায় তখন শয়তান তাদের ভক্ত সম্প্রদায়ের কাছে একটি সুন্দর প্রস্তাব নিয়ে আসে। আর তা হলো, 'এই লোকগুলো যেখানে বসতেন সেখানে তাদের মূর্তি স্থাপন করো এবং তাদের নামে নামকরণ করো।' (অতঃপর তাদের নসিহত ও উপদেশগুলো আলোচনা করো। আর মনে মনে এই ধারণা করো যে যেন তাদের মুখ থেকেই ঐ কথাগুলো বের হচ্ছে। এতে তাছীর বেশি হবে)। লোকেরা শয়তানের পরামর্শ অনুযায়ী তাই করলো। তখন কিন্তু এদের ইবাদত করা হতো না। এভাবে ঐ প্রজন্ম মারা গেলো। অতঃপর নতুন প্রজন্ম আসলো। তারা অজ্ঞতার কারণে ঐ প্রতীমাগুলো ইবাদত ও পূজা করতে লাগলো।' (বুখারী ৪৯২০)

নূহ (আ.) তার জাতিকে পূর্বের আয়াতে শুধু মাত্র এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছে। তিনি কোনো পীর-বুযুর্গের নাম উল্লেখ করেন নাই। অথচ তার জাতি প্রতিউত্তরে পাঁচজন আল্লাহ ওয়ালাদের নাম উল্লেখ করলো। বর্তমানে ও তাওহীদের দাওয়াত দিলে বিভিন্ন পীর-বুজুর্গদের কথা উল্লেখ করা হয়। অমুক অমুক বুজুর্গ তারা কি কম বুঝেছেন। তারা যদি জাহান্নামে যায় তাহলে আমরাও তাদের সাথে জাহান্নামে যেতে রাজি আছি। ইত্যাদি।

২. হুদ (আঃ)

কুরআন মাজীদে যে সকল বড় বড় নবী-রাসুলদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে আরেক জন হলেন হুদ (আ.)। তিনিও তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ

'আর (প্রেরণ করলাম) আদ জাতির নিকট তাদের ভাই হূদকে। সে বললো, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তোমরা কি তাকওয়া অবলম্বন করবে না'?' (আরাফ, ৭:৬৫)

হুদ (আ.)-এর এই আবেগময় তাওহীদের দাওয়াতকে তার জাতি স্বাগত না জানিয়ে খুবই নিন্দনীয়ভাবে প্রত্যাখ্যান করলো। তাদের বক্তব্য পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে–

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ

'তার কওমের কাফির নেতৃরা বললো, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাকে নির্বুদ্ধিতায় দেখতে পাচ্ছি এবং আমরা অবশ্যই তোমাকে মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করি'।' (আরাফ, ৭:৬৬)

এই আয়াতে দেখা গেলো হুদ (আ.)-এর সম্প্রদায় মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু ভুলে গিয়ে তাকে বোকা, নির্বোধ ও মিথ্যাবাদী বলে গালিগালাজ আরম্ভ করে দিলো। শুধু তাই না তারা তাওহীদের দাওয়াত গ্রহণ করার পরিবর্তে বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষের দোহাই দিয়ে তাদের শিরক ও বিদআত যুক্ত বাতিল ধর্ম আকড়ে ধরার দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করলো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

তারা বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছ যে আমরা এক আল্লাহর এবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের পূজা করত, তাদের ছেড়ে দেই? অতএব নিয়ে এসো আমাদের কাছে যাদ্দ্বারা আমাদের ভয় দেখাচ্ছ, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (আরাফ ৭:৭০)

বর্তমানেও যখন কুরআন ও হাদীসের দলিল-প্রমাণ দ্বারা তাওহীদের দাওয়াত পেশ করা হয়, শিরক ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে সাবধান করা হয় তখনও বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষের দোহাই দিয়ে একই ধরনের উত্তর দেওয়া হয়।

৩. সালেহ (আ.)

কুরআনে যে সকল নবী-রাসুলদের নাম উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে আরেকজন হলেন সালেহ (আ.)। তিনিও তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'আর সামূদের নিকট (প্রেরণ করেছি) তাদের ভাই সালিহকে। সে বললো, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। এটি আল্লাহর উষ্ট্রি, তোমাদের জন্য নিদর্শনস্বরূপ। সুতরাং তোমরা তাকে ছেড়ে দাও, সে আল্লাহর জমিনে আহার করুক। আর তোমরা তাকে মন্দ দ্বারা স্পর্শ করো না। তাহলে তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আজাব পাকড়াও করবে'।' (আরাফ, ৭:৭৩)

সালেহ (আ.) কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুজেযা স্বরূপ একটি উট দান করেছিলেন। কিন্তু তার জাতি তার তাওহীদের আহ্বানে সাড়া দেওয়া তো দূরের কথা, উল্টো আল্লাহর পক্ষ থেকে নিদর্শন স্বরূপ দানকৃত উটটির পায়ের রগ কেটে দেয়। যা কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আলোচিত হয়েছে। তারা সরাসরি সালেহ (আ.)-এর দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করলো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ

'যারা অহঙ্কার করেছিল তারা বললো, 'নিশ্চয়ই তোমরা যার প্রতি ঈমান এনেছ, আমরা তার প্রতি অস্বীকারকারী'। অতঃপর তারা উষ্ট্রিকে যবেহ করলো এবং তাদের রবের আদেশ অমান্য করলো। আর তারা বললো, 'হে সালিহ, তুমি আমাদের যে ওয়াদা দিয়েছ, তা আমাদের কাছে নিয়ে এসো, যদি তুমি রাসুলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাক'। ফলে তাদের ভূমিকম্প পাকড়াও করল, তাই সকালে তারা তাদের গৃহে উপুড় হয়ে মরে রইল।' (আরাফ, ৭:৭৬)

৪. ইব্রাহিম (আঃ)

কুরআনে যে সকল নবী-রাসুলদের নাম উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে আরেকজন হলেন ইব্রাহিম (আ.)। তিনিও তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন স্থানে ইব্রাহিম (আ.)-এর দাওয়াতকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। নিম্নে কিছু আয়াত পেশ করা হলো–

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

আর (স্মরণ করো) যখন ইব্রাহিম তার পিতা আযরকে বলেছিল, 'তুমি কি মূর্তিগুলোকে ইলাহরূপে গ্রহণ করছ? নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ও তোমার কওমকে স্পষ্ট গোমরাহীতে দেখছি'। (আনআম, ৬:৭৪)

এই আয়াতে দেখা গেলো যে, ইব্রাহিম (আ.) সর্বপ্রথম নিজের পিতাকে দিয়েই তাওহীদের দাওয়াত শুরু করলেন। আর সেখান থেকেই বাধা প্রাপ্তির সূচনা হলো। সন্তানের আবেগমাখা এই তাওহীদের দাওয়াতকে গ্রহণ না করে পিতা যে ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন পবিত্র কুরআনে তা এভাবে বিবৃত হয়েছে–

قَالَ أَرَاغِبٌ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لارْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا

পিতা বললো– ইব্রাহিম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছো? যদি তুমি বিরত না হও, আমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে তোমার প্রাণনাশ করব। তুমি চিরতরে আমার কাছ থেকে দূর হয়ে যাও। (মারইয়াম ১৯:৪৬)

অপর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ইব্রাহিম (আ.) তার পিতাকে এবং তার সম্প্রদায়কে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, তারা আল্লাহর পরিবর্তে

যাদের ইবাদত করছে তাদের থেকে তিনি বারা'আহ্ বা সম্পর্কচ্ছেদ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ

'আর স্মরণ কর, যখন ইব্রাহিম স্বীয় পিতা ও তার কওমকে বলেছিল, 'তোমরা যেগুলোর ইবাদাত কর, নিশ্চয়ই আমি তাদের থেকে সম্পর্কমুক্ত'।' (যুখরুফ, ৪৩:২৬)

অপর আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে ইব্রাহিম (আ.) তাওহীদের দাওয়াত পেশ করার সাথে সাথে তার জাতির মনগড়া দেব-দেবীদের দুর্বলতাগুলো তুলে ধরলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ – إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

'আর (স্মরণ কর) ইব্রাহিমকে, যখন সে তার কওমকে বলেছিল, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো এবং তাঁর তাকওয়া অবলম্বন কর; এটি তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যদি তোমরা জান'। তোমরা তো আল্লাহকে বাদ দিয়ে মূর্তিগুলোর পূজা করছ এবং মিথ্যা বানাচ্ছ। নিশ্চয়ই তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদের উপাসনা করো তারা তোমাদের জন্য রিয্ক-এর মালিক নয়। তাই আল্লাহর কাছে রিয্ক তালাশ কর, তাঁর ইবাদাত করো এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। তাঁরই কাছে তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।' (আনকাবুত, ২৯:১৬-১৭)

যেহেতু ইব্রাহিম (আ.) নিজ পিতা ও সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার পাশাপাশি তাদের থেকে বারা'আহ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সে কারনেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইব্রাহিম (আ.) ও তার সঙ্গীদের গোটা দুনিয়ার তাওহীদবাদী মুমিনদের জন্য আদর্শ রূপে ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ

'ইব্রাহিম ও তার সাথে যারা ছিল তাদের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। তারা যখন স্বীয় সম্প্রদায়কে বলছিল, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর ইবাদত করো তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত। আমরা তোমাদের অস্বীকার করি; এবং উদ্রেক হল আমাদের-তোমাদের মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ চিরকালের জন্য; যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আন। (মুমতাহিনা, ৬০:০৪)

এই আয়াতে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রয়েছে। আর তা হলো ইব্রাহিম (আ.) বললেন, 'তোমাদের সাথে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যা কিছুর ইবাদত করো তা হতে আমরা সম্পর্কমুক্ত।' এতে বুঝা যায় মূর্তি-প্রতিমা ও দেব-দেবীদের বর্জন করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো মূর্তি পূজারীদের বর্জন করা। তাই ইব্রাহিম (আ.) প্রথমে মূর্তি পূজারীদের থেকে বারা'আহ ঘোষণা করলেন। তারপরে আল্লাহর পরিবর্তে যা কিছুর ইবাদত করা হয় তার থেকে বারা'আহ ঘোষণা করলেন। আর এভাবে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করলে অবশ্যই জুলুম-নির্যাতন ও চরম দুর্দশার সম্মুখীন হতে হবে। ইব্রাহিম (আ.) কেও সেই কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হলো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ

'তারা বললো, 'তাকে আগুনে পুড়িয়ে দাও এবং তোমাদের দেবদেবীদের সাহায্য করো, যদি তোমরা কিছু করতে চাও' (আম্বিয়া, ২১:৬৮)

আর বাস্তবে ইব্রাহিম (আ.) কে তারা আগুনে নিক্ষেপ করেই ছেড়েছিলো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে হিফাজত করেছেন।

৫. শুয়াইব (আঃ)

পবিত্র কুরআনে যে সকল নবী-রাসুলদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে তাদের মধ্যে আরেকজন হলেন শুয়াইব (আ.)। তিনিও তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

'আর মাদইয়ানে (প্রেরণ করেছিলাম) তাদের ভাই শু'আইবকে। সে বললো, 'হে আমার কওম, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত করো। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তোমাদের রবের পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। সুতরাং তোমরা পরিমাণে ও ওজনে পরিপূর্ণ দাও এবং মানুষকে তাদের পণ্যে কম দেবে না; আর তোমরা জমিনে ফাসাদ করবে না তা সংশোধনের পর। এগুলো তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা মুমিন হও'। (আরাফ, ৭:৮৫)

এই আয়াতে দেখা যাচ্ছে যে, শুয়াইব (আ.) তার জাতিকে খুব সুন্দরভাবে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করলেন। তার জাতির উচিত ছিলো এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাওহীদের সাহায্যকারী হিসেবে দাড়িয়ে যাওয়া। কিন্তু না, তারা তা করলো না। বরং তারা তার বিরোধিতা করলো। তাকে নানা রকম হুমকি দেওয়া হলো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ

'তার কওম থেকে যে নেতৃবৃন্দ অহঙ্কার করেছিল তারা বললো, 'হে শু'আইব, আমরা তোমাকে ও তোমার সাথে যারা ঈমান এনেছে তাদের অবশ্যই আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তোমরা আমাদের ধর্মে ফিরে আসবে।' সে বললো, 'যদিও আমরা অপছন্দ করি তবুও?' (আরাফ, ৭:৮৮)

এখানে দেখা গেলো যে, শুয়াইব (আ.)-কে এবং তার প্রতি যারা ঈমান এনেছে তাদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে দেখা যায় যে, শুয়াইব (আ.) এর জাতির নেতৃবর্গ জনগণকেও শুয়াইব (আ.)-এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলার চেষ্ঠা করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ

'আর তার কওম থেকে যে নেতৃবৃন্দ কুফরি করেছিল তারা বললো, 'যদি তোমরা শু'আইবকে অনুসরণ করো তাহলে নিশ্চয়ই তোমরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে।' (আরাফ, ৭:৯০)

বর্তমানেও যারা তাওহীদের দাওয়াত পেশ করে তাদের বিরুদ্ধেও একই ধরনেরবক্তব্য প্রদাণ করা হয়। দেশ থেকে বের করে দেওয়া অথবা জেল-জুলুম ও নির্যাতনের ভীতি প্রদর্শন করা, জনগণকে তাদের থেকে সতর্ক করে দেওয়া।

৬. ইয়াকুব (আ.)

পবিত্র কুরআনে যে সকল নবী-রাসুলদের নাম উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে আরেকজন হলেন ইয়াকুব(আ.)। তিনিও তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ

'তোমরা কি উপস্থিত ছিলে, যখন ইয়াকুবের মৃত্যু নিকটবর্তী হয়? যখন সে সন্তানদের বললো, আমার পর তোমরা কার এবাদত করবে? তারা বললো, আমরা তোমার পিতৃ-পুরুষ ইব্রাহিম, ইসমাঈল ও ইসহাকের উপাস্যের এবাদত করব। তিনি একক উপাস্য। (বাক্বারা ২:১৩৩)

৭. ইউসুফ (আ.)

কুরআনে যে সকল নবী-রাসুলদের নাম উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে আরেকজন হলেন ইউসুফ (আ.)। তিনিও তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'হে আমার কারা সঙ্গীদ্বয়, বহু সংখ্যক ভিন্ন ভিন্ন রব ভালো নাকি মহাপরাক্রমশালী এক আল্লাহ'? 'তোমরা তাকে বাদ দিয়ে নিছক কতগুলো নামের ইবাদাত করছ, যাদের নামকরণ তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা করেছ, যাদের ব্যাপারে আল্লাহ প্রমাণ নাযিল করেননি। বিধান একমাত্র আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'তাঁকে ছাড়া আর করো ইবাদাত

করো না'। এটিই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না'। (ইউসুফ, ১২:৩৯-৪০)

এই আয়াতদ্বয়ে দেখা গেলো যে, ইউসুফ (আ.) জেলখানায় বসেও তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছেন। এভাবেই মুমিনরা যেখানে থাকবে সুযোগ পেলেই সেখানে বসে তারা তাওহীদের দাওয়াত ছড়িয়ে দিবে। জেলের অন্ধকার কুঠুরি তাদের দাওয়াতকে বন্ধ করতে পারবে না।

৮. ঈসা (আ.)

কুরআনে যে সকল নবী-রাসুলদের নাম উল্লেখ রয়েছে তাদের মধ্যে ঈসা (আ.) অন্যতম। তিনিও তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ

'(তিনি ঈসা (আ.) আরও বললেন) আর নিশ্চয়ই আল্লাহ আমার রব এবং তোমাদের রব। সুতরাং তোমরা তার ইবাদাত করো। এটাই সরল পথ।' (মারইয়াম, ১৯:৩৬)

এই আয়াতে দেখা গেলো ঈসা (আ.) তাঁর জাতিকে আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছিলেন। তাঁর নিজের নয়। এজন্য কিয়ামতে মাঠে যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তুমি কি আমার বান্দাদের তোমার ইবাদত করার জন্য হুকুম করেছিলে। এই প্রশ্ন করা হলে তিনি কি উত্তর দিবেন তা পবিত্র কুরআন থেকেই দেখা যাক। ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ – مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

'আর আল্লাহ যখন বলবেন, 'হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তুমি কি মানুষদের বলেছিলে যে, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে ইলাহরূপে গ্রহণ করো?' সে বলবে, 'আপনি পবিত্র মহান, যার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য সম্ভব নয়। যদি আমি তা বলতাম তাহলে অবশ্যই

আপনি তা জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন, আর আপনার অন্তরে যা আছে তা আমি জানি না; নিশ্চয়ই আপনি গায়েবী বিষয়সমূহে সর্বজ্ঞাত'। 'আমি তাদের কেবল তাই বলেছি, যা আপনি আমাকে আদেশ করেছেন যে, তোমরা আমার রব ও তোমাদের রব আল্ল-াহর ইবাদাত করো। আর যতদিন আমি তাদের মধ্যে ছিলাম ততদিন আমি তাদের ওপর সাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন আপনি আমাকে উঠিয়ে নিলেন তখন আপনি ছিলেন তাদের পর্যবেক্ষণকারী। আর আপনি সব কিছুর ওপর সাক্ষী।' (মায়েদা, ৫:১১৬-১১৭)

এই আয়াতে দেখা গেলো ঈসা (আ.) এক আল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছেন। নিজেকে কখনোই আল্লাহর পুত্র অথবা অবতার অথবা অংশ বলে দাবি করেননি। বরং তিনি যেদিন জন্মগ্রহণ করেছিলেন সেদিনই তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি আল্লাহর বান্দা ও নবী। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّه آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

'শিশুটি বললো, 'আমি তো আল্লাহর বান্দা; তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন এবং আমাকে নবী বানিয়েছেন'। 'আর যেখানেই আমি থাকি না কেন তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি তিনি আমাকে সালাত ও যাকাত আদায় করতে আদেশ করেছেন'। (মারইয়াম, ১৯:৩০-৩১)

৯. মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনিও এ তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছেন, বরং মেরাজের পূর্ব পর্যন্ত শুধু তাওহীদের দাওয়াতই দিয়েছেন। কারণ মেরাজের পূর্ব পর্যন্ত সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত এর বিধান নাযিল হয়নি। অপর দিকে আল্লাহ আছেন, তিনি সৃষ্টিকর্তা, রিজিকদাতা, বৃষ্টিদাতা, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র, সহ সকল কিছুর পরিচালক আল্লাহ (সুব.) এ সকল বিষয়গুলোকে মক্কার কাফেররা পূর্ব থেকেই বিশ্বাস করতো, যা শুরুতে প্রমাণসহ বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। সুতরাং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কায় নবুয়্যাত প্রাপ্তির পরে

মূলতঃ তাওহীদের দাওয়াত পেশ করেছিলেন। তারপর আস্তে আস্তে পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিধান নাযিল হতে থাকে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মু'আজ বিন জাবাল (রা.)-কে ইয়ামানের গভর্নর করে প্রেরণ করছিলেন তখনও তাকে সর্বপ্রথম তৌহিদের দাওয়াত পেশ করার জন্য উপদেশ দিয়েছিলেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ لمُعَاذ بْن جَبَلٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كتَاب فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ

'আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন মু'আজ বিন জাবালকে ইয়ামানে পাঠাচ্ছিলেন তখন বললেন, তুমি যাচ্ছো এমন একটি জাতির নিকট যারা আহলে কিতাব। অর্থাৎ পূর্ব থেকেই তারা আসমানী কিতাবের অনুসারী। তাই তুমি যখন তাদের কাছে পৌছে যাবে তখন তাদের সর্বপ্রথম এই স্বাক্ষী প্রদানের জন্য আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোনো সত্য ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর প্রেরিত রাসুল। যদি তারা এটা মেনে নেয় তাহলে তাদের জানাবে যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ওপর দিবা রাত্রে ৫ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করে দিয়েছেন।.....' (বুখারী ১৩৯৫, মুসলিম ১৩০, তিরমিযী ৬২৫, ইবনে মাজাহ ১৭৮৩)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গোটা জীবন মূলত এই তাওহীদকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক সংগ্রাম করেছেন। পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আয়াতে তাওহীদের ঘোষণা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لا إِلَهَ إِلا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

'আর তোমাদের ইলাহ এক ইলাহ। তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই। তিনি অতি দয়াময়, পরম দয়ালু।' (বাক্বারা ২:১৬৩)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

'বলো, 'আমার প্রতি ওহী প্রেরণ করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ একক ইলাহ। সুতরাং তোমরা কি আত্মসমর্পণকারী হবে'?' (আম্বিয়া, ২১:১০৮)

এধরনের অসংখ্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় নবী মুহাম্মাদ (স.) এর মাধ্যমে তাঁর এককত্বের ঘোষণা দিয়েছেন। সকল ক্ষেত্রে একজন ইলাহ এর আনুগত্য করতে বলা হয়েছে। মসজিদে যে আল্লাহর হুকুমে ৫ ওয়াক্ত সলাত, জুম্মার সলাত আদায় করা হয়, রমজান মাসে যে আল্লাহর হুকুমে সিয়াম পালন করা হয় সেই একই আল্লাহর হুকুমে সংসদে তাঁর আইনের বিরুদ্ধে কোনো আইন তৈরি করা যাবে না। আদালতে মানবরচিত আইনে বিচার ফায়সালা করা যাবে না। ব্যংকে সুদের বৈধতা দেওয়া যবে না। এগুলো করলে দুই আল্লাহর আনুগত্য করা হয়। মসজিদে এক আল্লাহর আনুগত্য আর বাহিরে অন্য আল্লাহর আনুগত্য। মসজিদের আল্লাহ আরশে সমাসীন, আর বাহিরের আল্লাহ সংসদে ও মন্ত্রণালয়ে সমাসীন। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন–

وَقَالَ اللَّهُ لا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ

'আর আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনি তো কেবল এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো।' (নাহল, ১৬:৫১)

বুঝা গেলো মক্কার তৎকালীন কাফির মুশরিকরাও একই রোগে আক্রান্ত ছিলো। তারাও বহু ইলাহ ও বহু রবের ইবাদত করতো। সে কারণেই যখন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন তারা এই বলে আপত্তি করেছিলো যে, তিনি কি সকল ইলাহগুলোকে হক ইলাহে কেন্দ্রীভূত করে ফেলল। তারা আল্লাহকে অস্বীকার করে নাই। এক আল্লাহকে অস্বীকার করেছে। সেকারণেই তাদের যখন তাওহীদের দাওয়াত দেওয়া হয় তখন তারা বলেছিলো–

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ

'আর আল্লাহ বলেছেন, 'তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করো না। তিনি তো কেবল এক ইলাহ। সুতরাং তোমরা আমাকেই ভয় করো।' (সাদ ৩৮:৫)

বুঝা গেল মক্কার তৎকালীন কাফিরগণ لا اله الا الله এর ঘোষণা শুনেই বুঝতে পেরে ছিল যে, এই কালিমার মানে কি? তারা বুঝতে পেরেছিল لا اله الا الله ঘোষণার মূল দাবি ও মর্ম কি?

لَا اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ ঘোষণার সারমর্ম/মূলকথা

পূর্বের আলোচনায় স্পষ্ট হলো যে, ইসলামের মূল ভিত্তি হচ্ছে তাওহীদ। আর তাওহীদের চূড়ান্ত ঘোষণা হচ্ছে 'لَا اِلَهَ اِلاَّ اللَّهُ'। এ কালেমাকে স্বীকার করার অর্থ হচ্ছে নিম্ন বর্ণিত বিষয়গুলোকে মেনে নেয়া:

- আল্লাহ এক, একক, অনন্য, অদ্বিতীয় বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক, রিয্‌ক-দাতা, জীবন-মৃত্যুর মালিক এবং রক্ষাকারীরূপে বিশ্বাস না করা।
- একমাত্র আল্লাহকেই সর্বজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান, গায়েবের ব্যাপারে ওয়াকিফহাল বলে বিশ্বাস করা। আর কাউকে এরূপ বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে উপকার-অপকার/লাভ-ক্ষতির মালিক বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহ তা'আলাকেই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে বিশ্বাস করা। এবং আর কেউ তার এ একচ্ছত্র ক্ষমতার শরীক নেই বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে রব, আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস না করা। একমাত্র আল্লাহকেই রব, আইন-বিধানদাতা বলে বিশ্বাস করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে ইবাদত-বন্দেগীর অধিকারী, সাহায্যকারী, বিপদ হতে উদ্ধারকারী, মুক্তিদাতা বলে বিশ্বাস না করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারও দাস বা বান্দা হয়ে না থাকা। নিজের প্রবৃত্তি ও দেশে প্রচলিত প্রথার অন্ধ অনুসরণ না করা।
- জীবনের প্রত্যেক ব্যাপারে আল্লাহর বিধানকে একমাত্র ভিত্তি বলে মানা এবং সে অনুযায়ী প্রত্যেকটি কাজ করা।
- আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নিকট দোয়া এবং সাহায্য প্রার্থনা না করা।
- আল্লাহ ছাড়া আর কারও ওপর নির্ভর এবং কারও নিকট আশা পোষণ না করা এবং কাউকে ভয় না করা।
- আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে সবচেয়ে বেশি প্রিয় না জানা এবং তাকেই অসীম প্রেমময় এবং অসীম করুনার অধিকারী বলে বিশ্বাস করা।

● কোনো মানুষ, দল, সমাজ বা শাসন কর্তৃপক্ষকে আল্লাহর আইন, বিধান, শরীয়তের পরিবর্তন বা সংশোধনের অধিকারী বলে স্বীকার না করা ।

● জীবনের প্রত্যেক কাজের জবাবদিহি শুধু আল্লাহর নিকট করতে হবে এ বিশ্বাস হৃদয়ে-মনে সবসময় জাগ্রত রাখা এবং যে কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন সে কাজ করতে এবং যে কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন সে কাজ থেকে বিরত থাকতে সর্বদা চেষ্টা করা ।

● আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে সকল প্রয়োজন পূরণকারী, ক্ষমার অধিকারী এবং হেদায়েত দানকারীরূপে বিশ্বাস না করা ।

● নবী-রাসুল, জ্বীন-ফেরেশতা, ওলী-আউলিয়া, পীর-বুযুর্গ ও সাধু-সৃজনকে ইলাহী ব্যবস্থাপনার মধ্যে পরিবর্তন ও সংযোজন করবার এবং আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার অধিকারী বলে বিশ্বাস না করা । তবে সুপারিশ করার ক্ষেত্রে পরকালে শুধু যার অনুমতি হবে (যেমন নবী এবং ঈমানদাররা) তারাই শুধু সুপারিশ করতে পারবে ।

● কাউকে আল্লাহর সন্তান, আত্মীয়, অংশীদার বা শরীক বিশ্বাস না করা । এই বিশ্বাস থাকতে হবে যে, এসব থেকে নিশ্চয়ই আল্লাহ মুক্ত এবং পবিত্র । যিনি এক, একক, তার কোনো শরীক নেই ।

● কোনো বস্তু বা প্রাণীর মধ্যে মিশ্র বা অবিমিশ্র ভাবে আল্লাহর অস্তিত্ব বা অবতারত্ব স্বীকার না করা । যেমন হিন্দুরা রামকে ভগবানের অবতার মনে করে ।

● আল্লাহ প্রতি মুহুর্তে জীবন্ত, জাগ্রত এবং সৃষ্টিজগতের সব অবস্থা সম্পর্কে অবগত, তাকে সবচেয়ে নিকটবর্তী বলে বিশ্বাস করা । ছোট বড় সকল কাজই আল্লাহর ইচ্ছায় সংঘটিত হয় বলে বিশ্বাস করা ।

● নিজেকে কোনো বস্তুর মালিক বা অধিকারী বলে না জানা । এমনকি স্বীয় প্রাণ, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, দৈহিক এবং মানসিক শক্তিকেও আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত গচ্ছিত বস্তু মনে করা ।

মোট কথাঃ ব্যক্তি জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্র জীবন- সর্বক্ষেত্রে এক আল্লাহর সার্বভৌমত্ব এবং তার কমান্ড মেনে নেওয়াই হচ্ছে لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) এর মর্ম কথা ।

তাওহীদের মর্মবাণী لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ (লা-ইলাহা ইল্লাহ) এর দুটি অংশ ঃ

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা তাওহীদের মর্মবাণী لَا اِلَهَ اِلَّا اللَّهُ (লা ইলাহা ইল্লাহ) নিয়ে আলোচনা করেছি। এই কালিমার দুটো অংশ রয়েছে। একটি আরেকটির সম্পূরক। দ্বিতীয় অংশ ব্যতীত শুধু প্রথম অংশ বিশ্বাস করলে কাফির হয়ে যায়। আর প্রথম অংশ ব্যতীত দ্বিতীয় অংশ নিরর্থক হয়।

● প্রথম অংশ لَا اِلَهَ (লা-ইলাহা) যার অর্থ হলো কোনো আল্লাহ নেই। দ্বিতীয় অংশ اِلَّا اللَّهُ (ইল্লাল্লাহ) অর্থ হলো আল্লাহ ব্যতীত বা আল্লাহ ছাড়া। প্রথম অংশে রয়েছে বর্জন। আর দ্বিতীয় অংশে রয়েছে গ্রহণ। প্রথম অংশে আল্লাহর পরিবর্তে যত কিছুর ইবাদত করা হয় সবকিছুকে বর্জন করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় অংশে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-কে গ্রহণ করা হয়েছে। এজন্যই বলা হয় তাওহীদের রুকন দুইটি। কুফর বিত ত্বাগুত ও ঈমান বিল্লাহ। এই দুইটি অংশ যারা একত্রে ধারণ করবে তারাই কেবলমাত্র ইসলামের শক্ত রজ্জুকে ধারণ করলো যা কখনো ছিড়ে যাবার নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (বাকারা, ২:২৫৬)

● لَا اِلَهَ (লা-ইলাহা) মানে সকল বাতিল ইলাহ কে বর্জন, الا الله (ইল্লাল্লাহ) মানে শুধু আল্লাহকে গ্রহণ।

● لَا اِلَهَ (লা-ইলাহা) মানে تَخْلِيَةٌ (তাখলিয়াহ্) সকল غَيْرُ الله (গায়রুল্লাহ) থেকে নিজেকে মুক্ত করা, আর اِلَّا اللهُ (ইল্লাল্লাহ) মানে تَحْلِيَةٌ (তাহলিয়াহ) শুধুমাত্র আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা। পুরাতন বিল্ডিং-এ রঙ করতে হলে পুরাতন রং ঘঁষে-মেজে, ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে নতুন রঙ করলে তাতে স্থায়ী হয়। আর পুরাতন ময়লা রঙের ওপর রঙ করলে যেকোনো মুহূর্তে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ঠিক তেমনিভাবে لَا اِلَهَ (লা-ইলাহা) এর মাধ্যমে

অন্তরটাকে সমস্ত গাইরুল্লাহ থেকে খালি করা হয়। যাকে বলা হয় 'তাখলিয়া'। আর إِلَّا اللهُ (ইল্লাল্লাহ) নতুন রঙ তথা আল্লাহর রঙে রঙিন করা হয়। যাকে বলা হয় 'তাহলিয়া' অঙ্কৃতকরণ বা পরিপূর্ণকরণ। পবিত্র কুরআনে এটাকেই বলা হয়েছে আল্লাহর রঙে রঙিন হয়ে যাওয়া। ইরশাদ হয়েছে–

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ

'বলো, আমরা আল্লাহর রং গ্রহণ করলাম। আর রং এর দিক দিয়ে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সুন্দর? আর আমরা তাঁরই ইবাদাতকারী।' (বাকারা, ২:১৩৮)

● لَا اِلَهَ (লা-ইলাহা) সকল غَيْرُ اللهِ (গায়রুল্লাহ) এর نَفِىْ (নাফি) আর إِلَّا اللهُ (ইল্লাল্লাহ) মানে শুধু আল্লাহর اِثْبَاتٌ (ইছবাত)।

এখানেই কাফির/মুশরিকদের সাথে মুসলিমদের মূল পার্থক্য। কাফিররা আল্লাহকে ও মানে আবার মূর্তিও মানে। তাই একদিকে আল্লাহর ইবাদত করতো আবার অপর দিকে খানায়ে কাবা ও তার আশ-পাশে তিনশত ষাটটি মূর্তি স্থাপন করে ছিল। এজন্য কাফিরদের সঙ্গে আমাদের إِلَّا اللهُ (ইল্লাল্লাহ) নিয়ে কোনো বিরোধ নাই, বিরোধ হচ্ছে لَا اِلَهَ (লা-ইলাহা) নিয়ে।

এ জন্যই বোধ হয় আমাদের দেশের অনেক পীর সাহেবদের দেখা যায়, যারা মুরীদদের কে শুধু إلا الله (ইল্লাল্লাহ) যিকির করায়। আবার কেউ لَا اِلَهَ (লা-ইলাহা) আস্তে إِلَّا اللهُ (ইল্লাল্লাহ) জোরে যিকির করায়, আবার কেউ إِلَّا اللهُ (ইল্লাল্লাহ) আগে لَا اِلَهَ (লা-ইলাহা) পরে যিকির করায় যাতে কাফির, মুশরিক এবং শয়তানরা শুনে ক্ষেপে না যায়।

'لَا اِلَهَ' অংশটিই মূল সমস্যা , إِلَّا اللهُ নয়

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে মক্কার মুশরিকদের ' 'لَا اِلَـهَ' (লা-ইলাহা) -নিয়েই বিরোধ ছিল, اِلَّــا اللهُ (ইল্লাল্লাহ) নিয়ে নয়। কেননা ইতিপূর্বে দলিল প্রমাণসহ আলোচনা করা হয়েছে যে, মক্কার তৎকালীন কাফির-মুশরিকরাও আল্লাহ আছেন একথা বিশ্বাস করতো। তিনি

রিয্ক দাতা, বৃষ্টি দাতা, আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য সবকিছুর পরিচালক। এসব কিছুই তারা বিশ্বাস করতো। তারা হজ্জ-ওমরা পালন করতো। বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করতো। হাজীদের পানি পান করাতো। কিন্তু তারা 'লা-ইলাহা'-এর পরে 'ইল্লাল্লাহ' বিশ্বাস করতো না। অর্থাৎ প্রথমে 'লা-ইলাহা'-এর মাধ্যমে সকল গায়রুল্লাহকে বর্জনের ঘোষণা দিয়ে 'ইল্লাল্লাহ' বলে শুধু আল্লাহকে গ্রহণ করায় তারা বিশ্বাসী ছিলো না। তারা আল্লাহকেও মানতো আবার 'মিন-দুনিল্লাহ' বা গায়রুল্লাহতেও বিশ্বাসী ছিলো। এ কারণে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর ঘোষণা শুনলে তাদের মাথা গরম হয়ে যেতো। এ সম্পর্কে কুরআনে সুস্পষ্ট আয়াত রয়েছে। নিম্নে কয়েকটি আয়াত সাক্ষী হিসেবে পেশ করা হলো–

প্রথম দলিল, আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ

'তাদের যখন বলা হত, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই', তখন নিশ্চয়ই তারা অহঙ্কার করত।' (ছফফাত, ৩৭:৩৫)

মক্কার মুশরিকরা إِلَّا اللهُ (ইল্লাল্লাহ)-র ক্ষেত্রে কোনো বিরোধিতা করেনি। তারা বিরোধিতা করেছিলো শুধুমাত্র لَا اِلَهَ (লা ইলাহা)-র ক্ষেত্রে। তারা বলতো–

আল্লাহর অস্তিত্ব আছে	আমরাও মানি
আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলী	আমরাও মানি
আল্লাহর কুদরত বা ক্ষমতা	আমরাও মানি
আল্লাহর ইলম বা জ্ঞান	আমরাও মানি
আল্লাহর ইন্তেজাম বা ব্যবস্থাপনা	আমরাও মানি
তিনি আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা	আমরাও মানি
তিনি চন্দ্র-সূর্যের পরিচালক	আমরাও মানি
তিনি খাদ্য ও রিয্ক দাতা	আমরাও মানি
তিনি বৃষ্টি দাতা, ফসল দাতা	আমরাও মানি

তাহলে বিরোধ কোথায়?

উপরোক্ত বিষয়গুলো যদি তারা বিশ্বাস করে তাহলে আমাদের মুসলিমদের সাথে তাদের পার্থক্য কোথায়? তখন থলের বিড়াল বের হয়ে আসবে।

তারা বলবে আমরা আল্লাহকে মানি। তবে আল্লাহকে পেতে হলে অবশ্যই কিছু ভায়া মাধ্যম লাগবে। প্রধানমন্ত্রীর নিকট কোনো আবেদন করতে হলে কোনো মন্ত্রী-এমপির সুপারিশ ছাড়া গৃহীত হয় না। জজের নিকট আবেদন করতে হলে কোনো উকিল ছাড়া হয় না। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর কাছেও কোনো কিছুর আবেদন করতে হলে দেব-দেবী ও পীর-মাশায়েখদের সুপারিশ প্রয়োজন। বিনা সুপারিশে আল্লাহর দরবারেও কোনো কিছু গৃহীত হয় না। তাদের দেব-দেবী আর মূর্তি পূজার মূল উদ্দেশ্য ছিলো এটাই। তারা কোনো দেব-দেবী বা প্রতীমাকে স্বয়ং আল্লাহ মনে করে ইবাদত করতো না। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে−

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

'আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদত করছে, যা তাদের ক্ষতি করতে পারে না এবং উপকারও করতে পারে না। আর তারা বলে, 'এরা আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী'। বলো, 'তোমরা কি আল্লাহকে আসমানসমূহ ও জমিনে থাকা এমন বিষয়ে সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন'? তিনি পবিত্র মহান এবং তারা যা শরীক করে, তা থেকে তিনি অনেক ঊর্ধ্বে।' (ইউনুস, ১০:১৮)

পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে−

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى

'আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের অভিভাবক হিসেবে গ্রহণ করে তারা বলে, 'আমরা কেবল এজন্যই তাদের 'ইবাদাত করি যে, তারা আমাদের আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে।' (যুমার, ৩৯:০৩)

এ আয়াতদুটিতে দেখা যাচ্ছে যে, কাফির-মুশরিকরা তাদের দেব-দেবী ও প্রতিমাগুলোকে আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী বিশ্বাস করে তাদের পূজা করতো। সরাসরি আল্লাহ হিসেবে নয়। বর্তমানেও যারা পীর-ফকির ও মাজার-দর্গা পূজায় লিপ্ত তারাও একই কথা বলে। পীর ছাড়া আল্লাহকে পাওয়া যাবে না। পীর সাহেব তার মুরীদদের আল্লাহর নিকটে পৌছে দেয়।

পীর সাহেব তার মুরীদদের সুপারিশ করে জান্নাতে নিয়ে যাবে, ইত্যাদি। মূলত তাদের এসব ধারণার পিছনে মুখ্য ভূমিকা পালন করে আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মন্দ ধারণা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সরাসরি বললে শুনেন না। তাই পীর সাহেবরা আল্লাহর কাছে সুপারিশ করে পরকালীন মুক্তির ব্যবস্থা করেন। তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে একজন সাধারণ জজের সঙ্গে তুলনা করে। অথচ জজ হলেন একজন জনগণের চাকর। ন্যায় বিচারের ব্যাপারে জনগণের কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য। জজের অনেক কিছু অজানা থাকে। উকিলগণ আইনি তর্ক-বিতর্ক ও বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শনের মাধ্যমে সত্যকে উদঘাটন করার চেষ্টা করে। পক্ষান্তরে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বিচারের ক্ষেত্রে কারো কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য নন। তিনি আহকামুল হাকীমিন। যুক্তি তর্কের মাধ্যমে তাকে অজানা কিছু জানানোরও প্রয়োজন নেই। তিনি সবকিছু জানেন। তিনি অন্তর্যামী। তারপর প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদনের ক্ষেত্রে মন্ত্রী-এমপির সুপারিশের যুক্তি? তাতো ঐ সকল লোকদের জন্য প্রয়োজন যাদের প্রধানমন্ত্রী চিনেন না। যাদের সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। আর যারা প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী ও পরিচিত জন তাদের কোনো সুপারিশের প্রয়োজন হয় না। বরং অনেক ক্ষেত্রে মন্ত্রী-এমপিরা পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রীর আপনজনদের কাছে ধর্না দেয়। আল্লাহর কাছে তো সকলেই সমান। সকলকেই তিনি চিনেন। সকলের অন্তরের খবর পর্যন্ত তিনি জানেন। কে আছে এমন যাকে তিনি চিনেন না? কে আছে এমন যে আল্লাহর কাছে পরিচিত নয়? না, কেউ নেই। আল্লাহর কাছে কেউ অপরিচিত নয়। দুনিয়াতে আল্লাহর বান্দা হিসেবে আল্লাহর কাছে সকলে সমান। সকলের ডাকেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাড়া দেন। সকলেই আল্লাহর দরবারের ফকির। কেউ নিজের ব্যাপারে গ্যারান্টি দিতে পারে না যে সে নিজে মুক্তি পাবে। তাহলে মুরীদদের সুপারিশ করার দায়িত্ব নেয় কিভাবে? হাঁ, কিয়ামতের মাঠে যারা নিজেরা আল্লাহর নিকটে মুক্তি পাবে তাদের কিছু লোককে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিয়ামতে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন। সেটা ভিন্ন বিষয়। তাই মূর্তি পূজকেরা যে ধরনের ভায়া-মাধ্যম গ্রহণ করার কারণে শির্কে লিপ্ত ছিলো, বর্তমান আধুনিক যুগে মুসলিম নামধারী পীর-ফকির ও দরগা-

মাজার পূজারী লোকগুলো সেই একই ধরনের শির্কে লিপ্ত। একারণেই মক্কার তৎকালীন কাফির-মুশরিকরা যেভাবে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর বিরোধিতা করেছে। বর্তমান পীরের মুরিদরাও ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ এর কার্যত বিরোধিতা করে থাকে। যদিও তারা মুখে স্বীকার করে না। কেউ শুধু ‘ইল্লাল্লাহ’ যিকির করার মাধ্যমে আবার কেউ আগে ‘ইল্লাল্লাহ’ পরে ‘লা ইলাহা’ বলার মাধ্যমে। অথচ এরকম যিকির কুরআনে নেই, হাদীসে নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও সালফে সালেহীনরা কেউ এ ধরনেরযিকির করেছেন বলে কোনো প্রমাণ নেই। যাই হোক যুগে যুগে মুশরিকদের সঙ্গে তাওহীদবাদী মুমিনদের পার্থক্য ছিলো ‘ও’ আর ‘ই’ এর পার্থক্য। মুশরিকরা আল্লাহকেও বিশ্বাস করতো এবং দেব-দেবীদেরও বিশ্বাস করতো। لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ ‘লা ইলাহা ইল্লাহ’ নয়, বরং الا الله (ইল্লাল্লাহ) ও আছে আবার من دون الله (মিন দুনিল্লাহ)ও আছে। আল্লাহও আছেন, ভায়া-মাধ্যমও আছে। আল্লাহও আছেন; আর পীর-বুযুর্গ, মাজার ওয়ালা, দর্গা ওয়ালাও আছেন। তাওহীদবাদী মুমিন বিশ্বাস করে আল্লাহই আছেন; কোনো গায়রুল্লাহ নেই। আল্লহই আছেন; কোনো পীর-বুযুর্গ নেই। এটাই হলো ‘ই’ আর ‘ও’ এর পার্থক্য।

‘লা ইলাহা’র ঝগড়া’

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই।

মুশরিকরা বলতো, আল্লাহ ছাড়া আরও মাবুদ আছে।

আল্লাহর রাসুল মুশরিকদের দেব-দেবীদের অস্বীকার করতেন! আর মুশরিকরা তাঁর বিরোধিতা করতো!

বুঝা গেল, আগে না, পরে হাঁ। আল্লাহ তা‘আলা ইরশাদ করেন-

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ

‘তাদের যখন বলা হত, আল্লাহ্ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই, তখন তারা ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করত।’ (ছফফাত, ৩৭:৩৫)

পেশী শক্তির অহঙ্কার

আয়াতে বর্ণিত يَسْتَكْبِرُوْنَ শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় আমাদের মুকাবিলা করতে পারে এমন কে আছে? আমাদের শক্তি আছে, জনবল আছে, আমরা

গদ্দীনাশীন, আমাদের মাজার আছে, পীর আছে, পার্টি আছে, মন্ত্রী-এমপি আছে, হাজার-হাজার মুরীদ আছে। তারা মারমুখী হয়ে তাওহীদবাদীদের কণ্ঠ রোধ করতে চায়। কেননা لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ (লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ) তথা তাওহীদের কথা শুনে ওদের ব্লাড প্রেসার শুরু হয়ে যেত, চক্ষু লাল হয়ে যেত, রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়তো। দাঁত কড়-মড় করতো, আর চিৎকার করে বলতো আমরা কি আমাদের পীর-মাশায়েখ, কবর-মাজার, খানকাহ্-দরগা সবকিছু কোনো পাগল, মিথ্যাবদী, জাদুকর ও কবির কথায় ত্যাগ করবো? পবিত্র কুরআনে তাদের এই চিত্র তুলে ধরে ইরশাদ হয়েছে-

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ

‘এবং তারা বলতো, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের ইলাহদের পরিত্যাগ করব।’ (ছফফাত, ৩৭: ৩৬)

বুঝা গেল, তারা لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ র অর্থ ঠিকমতোই বুঝেছিল। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন। ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর’ ঘোষণা দিয়েছেন। স্বতন্ত্রভাবে দেব-দেবী, মূর্তি-প্রতিমা ইত্যাদি ত্যাগ করার কথা বলেন নাই। অথচ তারা বললো আমরা কি আমাদের দেব-দেবীদের এক পাগল কবির কথায় পরিত্যাগ করবো। বুঝা গেলো ‘লা-ইলাহা’-এর ভিতরে যে ত্যাগ করার কথা রয়েছে তা তারা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলো। নতুবা أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا (আমাদের ইলাহদের পরিত্যাগ করব?) এ কথা কেন বললো? হ্যাঁ, لَا إِلَهَ إِلا اللَّهُ র অর্থ তাই। এজন্য মুশরিকরা বুঝে-শুনেই প্রতিবাদ করেছে।

এক শ্বাসে দুই গালি : কবি ও উম্মাদ

وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ

‘আর তারা বলত, ‘আমরা কি এক পাগল কবির জন্য আমাদের আল্লাহদের ছেড়ে দেব?’ (সফ্‌ফাত, ৩৭:৩৬)

شَاعِرٌ (কবি) তাদের ভাষায় ‘বেহুদা প্রলাপকারী’।

مَجْنُوْنٌ (উন্মাদ) বিবেক-বুদ্ধি ও কাণ্ড জ্ঞানহীন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আবেগময় তাওহীদের দাওয়াত এবং ঈমানদীপ্ত আহ্বানে তাদের উচিত ছিল لبيك (লাব্বাইক) বলে সাড়া দেওয়া এবং রাসুলের আহ্বানকে অন্তরের গভীরে স্থান দেওয়া। কিন্তু হতভাগা মুশরিকরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর এই আবেগময় আবেদনে সাড়া দেওয়াতো দূরের কথা। উল্টো গালি-গালাজ করতে আরম্ভ করলো। 'শায়ের মাজনুন' (উম্মাদ কবি) বলে এক শ্বাসে দুই গালি দিয়ে ফেললো।

কাফির-মুশরিকদের এই গালি গালাজ ও মিথ্যা অপবাদের জবাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসুলের স্বপক্ষে ঘোষণা করছেন যে, তিনি কোনো কবি নন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

'আমি রসূলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্যে শোভনীয়ও নয়।' (ইয়াসীন, ৩৬: ৬৯)

পবিত্র কুরআনের অপর একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের দ্বিতীয় গালির জবাব দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ـــ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ

'নূন! শপথ কলমের এবং সেই বিষয়ের যা তারা লিপিবদ্ধ করে। আপনার পালনকর্তার অনুগ্রহে আপনি উম্মাদ নন।' (কলম, ৬৮: ১-২)

বুঝা গেল, তাওহীদের বক্তব্য শুনে গালি, গালাজ করা ও মিথ্যা অপবাদ দেওয়া মুশরিকদের পুরাতন অভ্যাস। বর্তমানেও তার ব্যতিক্রম নয়। বর্তমানেও যখন কেউ তাওহীদের বাণী উচ্চারণ করে তখন তার বিরুদ্ধেও বর্তমান সময়ের পীর-মাশায়েখ ও তাদের মুরীদেরা নানা রকম গালি-গালাজ ও মিথ্যা অপবাদ প্রচার করে থাকে। যা প্রতিটি তাওহীদবাদী মুমিনকে কেবল উৎসাহই জোগায়।

গালির সংখ্যায় আরও সংযোজন : জাদুকর ও মিথ্যাবাদী

سَاحِرٌ (জাদুকর)।

كَذَّابٌ (মিথ্যাবাদী)।

وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَانْطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادُ

'আর কাফেররা বললো, এ-তো এক মিথ্যাচারী, জাদুকর। সে কি বহু ইলাহকে এক ইলাহ তে কেন্দ্রীভূত করে ফেললো? নিশ্চয়ই এটা এক বিস্ময়কর ব্যাপার। তাদের কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তি একথা বলে প্রস্থান করে যে, তোমরা চলে যাও এবং তোমাদের ইলাহদের ইবাদতে দৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই এ বক্তব্য কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে প্রণোদিত। (ছোয়াদ, ৩৮: ৫)

তাওহীদের দাওয়াতের গতি যত বাড়বে কাফির-মুশরিক ও তাদের নব্য অনুসারী পীর-মাশায়েখদের বিরোধিতার গতিও তত বাড়বে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে প্রথমে তারা 'শায়ের, মাজনুন' বলে একশ্বাসে দুই গালি দিয়েছিলো। পরবর্তীতে তাওহীদের দাওয়াত আরো বৃদ্ধি পাওয়ায় তাদের গালির সংখ্যায় আরো দুটি গালি সংযোজন করলো। আর তা হলো سَاحِرٌ (জাদুকর), كَذَّابٌ (মিথ্যাবাদী)।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার কারণে জুলুম-অত্যাচার, নির্যাতন-নিপীড়ন, ও চরম গালি-গালাজের লক্ষবস্তুতে পরিণত করলো। কখনও 'কবি', 'উন্মাদ' আবার কখনও 'জাদুকর', 'মিথ্যাবাদী' আবার কখনও 'স্বার্থবাদী' ও 'ক্ষমতা দখল করার পায়তারাকারী' বলে অপবাদ দিতে লাগলো।

ওদের এত বিরোধিতার কারণ ছিল একটাই, কেন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের বহু ইলাহ ও বহু রবের বিরোধিতা করে এক ইলাহের ইবাদতের দিকে আহ্বান করছে? তারা চরমভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে বললো, চলো, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি আমাদের আলেহা'দের মূলোৎপাটন করতে চায় তাহলে আমরাও দীপ্তপায়ে আমাদের আলেহা'দের সাহায্যে অবিচল থাকবো। তাদের স্লোগান ছিলো–

- তোমরা আমাদের বহু ইলাহ ও বহু রবদের (আলিহা'দের) বর্জন করো না।
- তোমরা আমাদের আলিহাদের চ্যালেঞ্জ করো না।
- তোমরা আমাদের আলিহাদের ক্ষমতাকে অস্বীকার করো না।

এখানে আরো একটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, যেভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এর সমস্ত ছিফত বা গুণাবলীকে স্বীকার করার নাম তাওহীদ। তেমনিভাবে গায়রুল্লাহর ইবাদতের সমস্ত কিছুকে অস্বীকার করার নামও তাওহীদ।

মুশরিকরা তাওহীদের বক্তব্য যতবেশি শুনবে, শিরকের আগুন তাদের কলিজায় ততবেশি জ্বলবে। অতএব, শিরকের গতি বুঝতে হলে তাওহীদের দাওয়াত বেশি বেশি শুনাতে হবে।

কুরআনের দ্বিতীয় সাক্ষী : وَحْدَهُ 'ওয়াহদাহু'-এর নতুন বুলেট

وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَى أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا

'যখন আপনি কোরআনে আপনার রবের এককত্ব (তাওহীদ) বর্ণনা করেন, তখন অনীহাবশতঃ ওরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে যায়।' (বণী ইসরাঈল : ৪৬)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (লা ইলাহা ইল্লাহ) এর মাধ্যমে তাওহীদের ঘোষণা দেওয়ার পরেও যাদের তাওহীদ পরিষ্কার হয়নি তাদের কর্ণকুহরে তাওহীদের বাণী পৌঁছে দেওয়ার জন্য আরো স্পষ্টভাবে وَحْدَهُ (ওয়াহদাহু) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটি একটি কার্যকর বুলেট। যা ব্যবহার করার সঙ্গে সঙ্গে ওরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালাতে শুরু করে। ওদের হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন বহুগুণে বেড়ে যায়। অন্তরের জ্বালা বেড়ে যায়। তাদের মনের ভিতরে প্রশ্নের বাণ ছুটে যায়। একের পর এক প্রশ্ন মাথায় আসতে শুরু করে।

আমাদের লাত' কোথায় গেল? উয্যা' কোথায় গেল? মানাত' কোথায় গেল? হোবাল' কোথায় গেল? পীর' কোথায় গেল? খাজা বাবা' গাজা বাবা' ল্যাংটা বাবা' কোথায় গেল? দরগা ওয়ালা' দুর্গা ওয়ালা কোথায় গেলো?

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا

'সে কি সব ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে ফেললো।' (সোয়াদ : ৫)

তারা বিশ্বাস করে আল্লাহও আছেন, খাজা বাবাও আছেন। আল্লাহও আছেন, গাজা বাবাও আছেন। আল্লাহও আছেন, কবর ওয়ালাও আছেন। আল্লাহও আছেন, পীর সাহেবও আছেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহ-ই আছেন, খাজা বাবা নাই। আল্লাহ-ই আছেন, গাজা বাবা নাই। আল্লাহ-ই আছেন, কবর ওয়ালা নাই। আল্লাহ-ই আছেন,

দরগা ওয়ালা' দুর্গা ওয়ালা নাই। আল্লাহ-ই আছেন, পীর সাহেব নাই। ও' এবং ই'-র পার্থক্য। একারণেই সুরা ফাতিহাতে বলতে হয়–

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

'আপনার-ই আমরা ইবাদাত করি এবং আপনার-ই নিকট সাহায্য চাই।' (ফাতিহা, ১:৪)

কুরআনের তৃতীয় সাক্ষী :

وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

'যখন আল্লাহ্‌র এককত্ব আলোচনা করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাস করে না, তাদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায়, আর যখন আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য ইলাহদের আলোচনা করা হয়, তখন তারা আনন্দে উল্লসিত হয়ে উঠে।' (যুমার, ৩৯: ৪৫)

আল্লাহ তা'আলা এখানে মক্কার কাফের-মুশরিকদের আজব চিত্র তুলে ধরেছেন, যখন এক আল্লাহ তথা তাওহীদের আলোচনা করা হয়, তখন তাদের মনটা খারাপ হয়ে যায়। রাগে-ক্ষোভে অন্তরটা ফেটে যেতে চায়। শরীরের পশমগুলো দাঁড়িয়ে যায়, চেহারাটা মলিন হয়ে যায়। যারা তাওহীদের আলোচনা করে তাদের ওপর পাথর বৃষ্টি বর্ষণ করে, গালি-গালাজের তুফান ছেড়ে দেয়, ভর্ৎসনা ও তিরষ্কারের বাজার গরম করে ফেলে, শোর-গোল শুরু করে দেয়।

আর যদি আল্লাহর সাথে তাদের দেব-দেবী, পীর-মুর্শিদ তথা গায়রুল্লাহর আলোচনা করা হয়, ঘোড়া শাহ্, গাধা শাহ, ইঁদুর শাহ, বাঁদর শাহ, লেচু শাহ, গোলাপ শাহ ইত্যাদি যোগ করা হয়, তাহলে আনন্দ ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে ফেলে, বাহ্ বাহ পাওয়া যায়। হাদিয়া-তুহফাতে পকেট ভরে যায়। হালুয়া-মিষ্টি স্তূপ লেগে যায়। খাদেম-খুদ্দামের লাইন লেগে যায়। আলীশান ইমারত নির্মাণ করা যায়। সকল ভক্ত-বৃন্দের মনটা আনন্দে উদ্ভাসিত হয়। খুশিতে বাগ বাগ হয়ে যায়। চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যায়।

এটা বহু পরীক্ষিত একটি টনিক। এদেশের তরিকতপন্থী পীর-মুর্শিদ ও তাদের মুরীদদের কাছে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে তাওহীদের

আলোচনা করা হয় তখন তারা বিরক্তিবোধ করে। মন ভরে না। আর যখন তাদের মৃত পীর, বাবা পীর, দাদা পীর, নানা পীর ও বিভিন্ন তরীকার পীরদের নামে তৈরি করা মনগড়া কিচ্ছা-কাহানী আলোচনা করা হয়। তখন তারা খুশিতে নাচতে শুরু করে। আহ্ ও ফাগা করতে থাকে (সুফিদের বিশেষ পদ্ধতির আওয়াজ)। লাফ দিয়ে মাহফিলের প্যান্ডেলের বাঁশের উপরে উঠে যায়। আবার কাউকে বাঁদরের মতো লাফা-লাফি করতে ও বাঁশে বাঁশে ঝুলতে দেখা যায়। এ জাতীয় লোকদের চরিত্রটাকে উপরের আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে।

কুরআনের চতুর্থ সাক্ষী :

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

‘(তাদের বলা হবে) ‘এটা তো এজন্য যে, যখন আল্লাহকে এককভাবে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে আর যখন তাঁর সাথে শরীক করা হত তখন তোমরা বিশ্বাস করতে। সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আল্লাহর’।’ (মুমিনুন, ৪০:১২)

এ আয়াতে কাফির-মুশরিক, পীর-মুর্শিদ ও তাদের ভক্ত-বৃন্দের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো বিপদে-আপদে ও বিভিন্ন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে সরাসরি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা ও দোয়া করার পরিবর্তে বিভিন্ন পীর-ফকির, ওলী-আওলিয়াকে মাধ্যম বানিয়ে তারপরে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা। অথবা সরাসরি পীর-বুযুর্গ ও ওলী-আওলিয়াদের কাছে প্রার্থনা করা। এজন্য তারা পীর বুজুর্গদের বিভিন্ন স্তরে ভাগ করে থাকে। গাউছ, কুতুব, গাউছুল আজম (সবচেয়ে বড় ত্রাণকর্তা), কুতুবুল আকতাব, মুশকিল কুশাঁ (সমস্যা সমাধানকারী), হাজত রাওয়াঁ (প্রয়োজন পূরণকারী), গরীবনেওয়াজ (গরিবের দাতা), বান্দানেওয়াজ (বান্দাদের দাতা)। তাদের বিভিন্ন কিতাবে, মাজারে, দর্গায়, খানকায় লেখা থাকে ‘ইয়া খাঁজা বাবা আল মদদ’ (হে খাঁজা বাবা সাহায্য করো, ‘ইয়া গাউসুল আজম! আল মদদ (হে গাউসুল আজম সাহায্য করো)’। তাদের বিভিন্ন কিতাবে লিখা রয়েছে–

یہ آسما ہے تیرا یہ زمیں ہے تری

مقصود میرا پورا کردے اے خواجہ اجمیری

‘এই আসমান তোমার, জমিন তোমার
ওহে বাবা আজমিরী
আমার দিলের মকসুদ পূরণ করে দাও
তুমি-ই বাবা আজমিরী।

এদেশের মাজারপন্থী, পীর-মুর্শিদ ও তাদের মুরীদদের প্রায়ই বলতে শুনা যায়, ‘কেউ ফিরে না খালি হাতে, খাঁজা বাবার দরবার হতে’। এভাবে তারা আল্লাহর সাথে ওলী-আওলিয়া, পীর-বুযুর্গ ইত্যাদিকে শরীক করে ডাকে। পক্ষান্তরে যদি সরাসরি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলাকে ডাকতে বলা হয় এবং সরাসরি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে বলা হয় তাহলে তারা বিরোধিতা করে। বিভিন্ন যুক্তি-তর্ক দিয়ে সাধারণ জণগণকে বিভ্রান্ত করে যা ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করেছি। যেমন, জজের কাছে কিছু বলতে হলে উকিল ধরতে হয়। প্রধানমন্ত্রীর কাছে কিছু আবেদন করতে হলে মন্ত্রী-এমপিদের সুপারিশ নিতে হয়। তাই আল্লাহর কাছে কিছু আবেদন করতে হলেও পীর-মুর্শিদ, ওলী-আওলিয়াদের সুপারিশের প্রয়োজন হয়। অথচ এসব কিছুই আশ শির্‌কুল আকবার বা বড় শির্‌ক এর অন্তর্ভুক্ত। যা একজন মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।

ইসলামের মূল বক্তব্য হলো সকল গায়রুল্লাহ’কে বর্জন করতে হবে, তারা বলে গাইরুল্লাহ’কে বর্জন করা যাবে না। ইসলাম বলে কোনো গায়রুল্লাহ’র নামে নজর-নাওয়াজ ও মান্নত করা যাবে না, তারা বলে গায়রুল্লাহর নামে এসব কিছু করা থেকে বিরত থাকা যাবে না। ইসলাম বলে কোনো পীর বুযুর্গ ও ওলী-আওলিয়াকে হাজত রাওয়াঁ, মুশকিল কুশাঁ, গাউসুল আজম, গরীবনেওয়াজ, বান্দানেওয়াজ, ইত্যাদি বলা যাবে না, তারা বলে এগুলো বলতে হবে, ছাড়া যাবে না। ইসলাম বলে কোনো নবী-রাসুল, ওলী-আওলিয়া ও পীর-মুর্শিদকে কাশফ খোলা, হাজের-নাজের, আলিমুল-গায়েব ইত্যাদি বলা যাবে না, তারা বলে অবশ্যই বলতে হবে, এ আক্বিদার কোনো বিরোধিতা করা যাবে না।

রোগ একই কিন্তু ডাক্তার ভিন্ন

পূর্ববর্তী উম্মতের মুশরিকরাও এ রোগে আক্রান্ত ছিল। কুরআন মাজীদ বলছে, আল্লাহর সঙ্গে গাইরুল্লাহ' (তথা পীর, বুযুর্গ, অলী-আউলিয়াদের) কে যোগ করার এ রোগ শুধু মক্কার মুশরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না বরং পূর্ববর্তী উম্মতের মুশরিকরাও এ রোগে আক্রান্ত ছিল। সুতরাং এ কথা বলা যায় যে, রোগ একটাই কিন্তু ডাক্তার পরিবর্তন হচ্ছিল।

কুরআনের পঞ্চম সাক্ষী :

أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لا يَعْلَمُهُمْ إِلا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ

'তোমাদের কাছে কি তোমাদের পূর্ববর্তী কওমে-নুহ, আদ ও সামুদের এবং তাদের পরবর্তীদের খবর পৌছেনি? তাদের বিষয়ে আল্লাহ্ ছাড়া আর কেউ জানে না। তাদের কাছে তাদের পয়গম্বরগণ প্রমানাদি নিয়ে আগমন করেন। (ইব্রাহিম ১৪:৯)

যখনই নবী-রাসুলগণ মুশরিক সম্প্রদায়কে তাওহীদের কথা বলেছেন এবং তাদের কাছে দলিল-প্রমাণের ভিত্তিতে 'লা ইলাহা ইল্লাহ'র মূল দাবি পেশ করেছেন, তখনই তারা (কাফেররা) জবাবে বলেছে–

إِنْ أَنْتُمْ إِلا بَشَرٌ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَأْتُونَا بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ

'তোমরা তো আমাদের মতোই মানুষ! তোমরা আমাদের ঐ মাবুদ থেকে বিরত রাখতে চাও, যার ইবাদত আমাদের পিতৃপুরুষগণ করত। অতএব তোমরা কোনো সুস্পষ্ট প্রমাণ আনয়ন করো।' (ইব্রাহিম ১৪:১০)

এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, পূর্ববর্তী উম্মতের মুশরিকরা ও নবী-রাসুলদের দাওয়াতকে অস্বীকার করেছিল এ কারণে যে তারা বুঝতে পেরেছিল আমাদের আল্লাহ ছাড়া অন্য মাবুদদের ইবাদত করা থেকে বাধা প্রদান করা হচ্ছে।

কুরআন মাজীদে অনক মুশরিক সম্প্রদায়ের নাম উল্লেখ করে তাদের রোগের কথা বর্ণনা করেছেন। তাহলে দেখুন তারা নবী-রাসুলদের কি উত্তর দিয়েছিল-

কওমে নূহ :

নূহ (আ.) যখন তার কওমকে বা তার সম্প্রদায়কে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন তারা তাঁর দাওয়াত গ্রহণ না করে উল্টো তারা জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলার জন্য তৎকালীন সময়ের কিছু প্রসিদ্ধ আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তিবর্গের নাম উল্লেখ করলো। যাদের নামে ওরা পরবর্তীতে মূর্তি ও প্রতীমা তৈরি করেছিলো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

'তারা বললো, 'তোমরা তোমাদের ইলাহদের ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে।' (নূহ, ৭১: ২৩)

নূহ (আ.) তার জাতিকে শুধু মাত্র এক ইলাহের ইবাদতের দিকে আহ্বান করেছিলেন। তিনি কোনো পীর-বুযুর্গের নাম উল্লেখ করেননি। তাদের বিরুদ্ধে কোনো কথাও বলেননি। অথচ তার জাতি প্রতিউত্তরে পাঁচজন আল্লাহ ওয়ালা'দের নাম উল্লেখ করলো। বর্তমানেও তাওহীদের দাওয়াত দিলে বিভিন্ন পীর-বুজুর্গদের কথা উল্লেখ করা হয়। যাদের নামে মাজার তৈরি হয়েছে, বিভিন্ন তরীকা তৈরি করা হয়েছে। এদেশে যখন পীর-মুরীদি ও বহু তরিকা এবং কবর-মাজার পূজার বিরুদ্ধে কথা বলা হয় তখন নূহ (আ.) এর সম্প্রদায়ের মতো বর্তমান সময়ের পীর পূজারী, কবর-মাজার পূজারী, বহু তরীকার অনুসারী লোকেরা শাহ জালাল, শাহ পরাণ, খানজাহান আলী, চরমোনাইর পীর, শর্ষিণার পীর, জৈনপুরীর পীর, ফুরফুরার পীর ইত্যাদী লোকদের নাম উল্লেখ করে। এরা সকলেই কি গোমরাহ ছিলো? তারা কি কুরআন হাদীস বুঝে নাই? শুধু আপনারাই বুঝলেন? উনারা যদি জাহান্নামে যায় তাহলে উনাদের সঙ্গে আমরাও জাহান্নামে যেতে রাজি আছি। এমনকি কোনো পীর ভক্ত ইমাম তার মুসল্লীদের এভাবে ক্ষেপিয়ে তোলে জিজ্ঞাসা করেন উনারা যদি জাহান্নামে যায় তাহলে উনাদের সাথে জাহান্নামে যেতে আপনারা কে কে রাজি আছেন, হাত তুলুন। আর জনগণ তখন হাত তুলে সমর্থন দেয় এবং তাওহীদবাদী আলেমদের বিরুদ্ধে নানা রকম অপমানজনক স্লোগান দিতে থাকে।

কওমে আ'দ :

قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

'তারা বললো, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্যে এসেছ যে আমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত করি এবং আমাদের বাপ-দাদা যাদের ইবাদত করত, তাদের ছেড়ে দেই?' (আরাফ, ৭:৭০)

অর্থাৎ তারা আল্লাহর ইবাদত করতে আপত্তি করে নাই, শুধু তাওহীদ তথা এক আল্লাহর ইবাদত করতেই তাদের আপত্তি ছিল।

কওমে হুদ :

হুদ (আ.) এর জাতি অহঙ্কার এবং দাম্ভিকতা প্রকাশ করে হুদ (আ.) কে বললো–

قَالُوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ

'তারা বললো-হে হুদ, তুমি আমাদের কাছে কোনো প্রমাণ নিয়ে আস নাই, আমরা তোমার কথায় আমাদের দেব-দেবীদের বর্জন করতে পারি না আর আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনয়নকারীও নই। (হুদ, ১১: ৫৩)

এই আয়াতেও প্রমাণিত হলো হুদ (আ.) গাইরুল্লাহর ইবাদতের অনুমতি দিতে পারেননি, আর তাঁর জাতি গাইরুল্লাহর ইবাদত ছাড়তে পারেনি।

কওমে সামুদ :

قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ

'তারা বললো-হে সালেহ, ইতিপূর্বে তোমার কাছে আমাদের বড় আশা ছিল। আমাদের বাপ-দাদা যার ইবাদত করত তুমি কি আমাদের তার ইবাদত করতে নিষেধ কর? কিন্তু যার প্রতি তুমি আমাদের আহ্বান জানাচ্ছ আমাদের তাতে এমন সন্দেহ রয়েছে যে, মন মোটেই সায় দিচ্ছে না। (হুদ, ১১: ৬২)

আহলে মাদয়ান :

শুআইব (আ.) তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দেওয়ার পরে তার জাতি তাকে উত্তর দিলো–

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

'তারা বললো, হে শুআইব (আ.) তোমার সালাত কি তোমাকে ইহাই শিক্ষা দেয় যে, আমরা ঐসব ইলাহদের পরিত্যাগ করব আমাদের বাপ-দাদারা যাদের ইবাদত করত?' (হুদ, ১১: ৮৭)

উল্লিখিত আয়াতগুলো দ্বারা বুঝা যায় যে, সর্বকালে মুশরিকরা আল্লাহ তাআলার একত্ববাদকে অস্বীকার করতো, এবং তারা সর্বশক্তি দিয়ে তাওহীদবাদী লোকদের প্রতিহত করার চেষ্টা করতো। বর্তমানে তার ব্যতিক্রম নয়। আল্লাহ (সুব.) যথার্থই বলেছেন–

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ

'তাদের অধিকাংশ লোক ঈমান আনা স্বত্ত্বেও মুশরিক।' (ইউসূফ ১২:১০৬)

তাওহীদের শর্তাবলী বনাম لَاالٰهَ الَّا اللّٰهُ এর শর্তাবলী :

শর্ত এমন একটি বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্যের অনুপস্থিতি অপরিহার্য এবং যার অস্তিত্বে অন্যের অস্তিত্ব অপরিহার্য নয়। আর এটা হয়ে থাকে জিনিসের বাইরে এবং তা শুরু করার পূর্বে। যেমন, সলাতের জন্য অজু করা শর্ত। অজু না হলে সালাত হবে না। কিন্তু অজু হলেই সালাত আদায় হয়ে যায় না। বরং অজু সলাতের বাহিরের অংশ। যা সালাত শুরু করার পূর্বেই পুরণ করতে হবে। ঠিক তেমনিভাবে তাওহীদের অনেকগুলো শর্ত আছে। এর গুরুত্ব অপরিসীম। এ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং এর শর্তগুলো পূরণ করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ওয়াজিব। এটা এজন্য যে, কারো মাঝে তাওহীদের কোনো শর্ত না পাওয়া গেলে তার মধ্যে ঈমান ও ইসলামের মূল ভিত্তি-ই পাওয়া গেলো না বলে বিবেচিত হবে। যেমন সালাত সহীহ হওয়ার শর্তাবলীর মধ্যে যদি কোনো একটি শর্ত যেমন ওজু করা, কিবলামুখী হওয়া অথবা ছতর ঢাকা না পাওয়া যায় তাহলে সালাত বাতিল বলে গণ্য হবে।

তাওহীদের শর্ত ৭ (সাত) টি

প্রথম শর্ত : اَلْعِلْمُ (জ্ঞান)

তাওহীদের প্রথম শর্ত হলো তাওহীদের কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর জ্ঞান অর্জন করা। 'লা ইলাহা' বলে কাকে বর্জন করা হলো? কেনো বর্জন করা হলো? কিভাবে বর্জন করতে হবে? 'ইল্লাল্লাহ' বলে কাকে গ্রহণ করা হলো? কেনো গ্রহণ করা হলো? কিভাবে গ্রহণ করতে হবে? ইত্যাদি

সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ

'তুমি জেনে রাখো, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।' (মুহাম্মদ, ১৯)

এটা এ জন্য যে, আল্লাহ এক এবং একমাত্র তিনিই ইবাদতের হকদার'- এ কথা না জানা, বান্দার ইসলাম গ্রহণযোগ্য হওয়ার পথে বিরাট অন্তরায়। এ কারণেই (তাওহীদের) ইলম বা জ্ঞান অর্জন করা বান্দার ইসলাম কবুলের জন্য শর্ত নির্ধারণ করা হয়েছে। হাদীসে বর্নিত হয়েছে–

عَنْ عُثْمَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

'উসমান (রা.) বর্ণিত তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই' একথা জানা অবস্থায় যে ব্যক্তি মৃত্যু বরণ করলো সে জান্নাতে যাবে।' (মুসলিম ১৪৫, মুসনাদে আহমাদ ৪৯৮, মেশকাত ৩৭)

আল্লামা শায়খ আব্দুর রহমান বিন হাসান আল শায়খ (রহ.) বলেছেন, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কেরাম 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ এবং এর দ্বারা কি অস্বীকার করা হয়, আর কি সাব্যস্ত করা হয় তা বর্ণনা করতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন– 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র উপকারিতা হচ্ছে এর অর্থসহ সেই ইলমে ইয়াকীন বা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা যা نَفِىْ اِثْبَاتْ (কি অস্বীকার করা হয় আর কি সাব্যস্ত করা হয় তা) সহ জানা আল্লাহ ওয়াজিব করে দিয়েছেন। ওয়াজির আবুল মুজাফফর 'আল ইফছাহ' নামক গ্রন্থে বলেছেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাক্ষ্য দানের দাবি হচ্ছে, সাক্ষ্যদানকারীর অবশ্যই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই) সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। যেমনটি পূর্বের আয়াতে বলা হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, আরবী গ্রামারের দৃষ্টিতে اِلا শব্দের পরে আল্লাহ শব্দের পেশ হওয়ার দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে যে, উলুহিয়্যাত (ইলাহ হওয়ার যোগ্যতা) একমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। অতএব, আল্লাহ তা'আলা ছাড়া

অন্য কেউ উলুহিয়্যাতের হকদার হতে পারে না। তিনি বলেন, এখানে সার কথা হচ্ছে, তাগূতকে অস্বীকার করা এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান পোষণ করা উভয় বিষয়ই এ কালেমার অন্তর্ভুক্ত এ কথাটি জেনে নেয়া। তাগূতের ক্ষেত্রে আপনার উলুহিয়্যাতের অস্বীকৃতি আর আল্লাহর জন্য উলুহিয়্যাতের স্বীকৃতি দ্বারা আপনি তাদের অন্তর্ভুক্ত হলেন, যারা তাগূতকে প্রত্যাখ্যান করেছে আর আল্লাহর প্রতি (ইলাহ হিসেবে) ঈমান এনেছে। (আদ দুরার আস সানিয়াহ)

শায়খ আব্দুল্লাহ বিন আবদির রাহমান আবা বাতিন (রহ.) বলেন, আল্লাহ তা'আলা বলেছেন–

هَذَا بَلاَغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ

'বস্তুত: সকল মানুষের জন্য এটা একটা পয়গাম (বার্তা)। আর এটা পাঠানো হয়েছে এ জন্য যে, এর দ্বারা তাদের সাবধান করা হবে এবং তারা জেনে নিবে যে, প্রকৃতপক্ষে ইলাহ শুধু একজনই, আর বুদ্ধিমান লোকেরা যেন চিন্তা-ভাবনা করে।' (ইব্রাহিম ১৪: ৫২)

উপরোক্ত আয়াতে ليقولوا أنما هو إله واحد (যাতে তারা বলে, প্রকৃত পক্ষে ইলাহ একজনই) বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে যাতে তারা জেনে নেয়....।

অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেছেন–

إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

'তবে যারা জেনে–শুনে সত্য সাক্ষ্য দেয়।' (যুখরুফ, ৪৩:৮৬)

এখানে 'যারা জেনে-বুঝে সাক্ষ্য দেয়' বলে জানার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এসব আয়াত দ্বারা ওলামায়ে কেরাম এটাই প্রমাণ করেছেন যে, মানুষের ওপরে সর্বপ্রথম ওয়াজিব হচ্ছে আল্লাহকে জানা। উপরোক্ত আয়াত দ্বারা আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, সবচেয়ে বড় ফরজ হচ্ছে 'অর্থসহ 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ'র জ্ঞানার্জন করা, আর সবচেয়ে বড় মূর্খতা হচ্ছে অর্থসহ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র জ্ঞান না থাকা।' অতএব, অর্থসহ কালেমার জ্ঞান লাভ যেমনি ভাবে সবচেয়ে বড় ওয়াজিব, তেমনিভাবে কালিমার অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞতা হচ্ছে বড় মূর্খতা।

শায়খ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব বলেছেন, অর্থ জানা ব্যতীত এবং কালেমা (লা-ইলাহা- ইল্লাল্লাহ) এর দাবি মোতাবেক কর্ম সম্পাদন ব্যতীত শুধুমাত্র শাব্দিক স্বাক্ষ্য প্রদানকারী ব্যক্তি মুসলমান হতে পারে না, বরং এ মৌখিক

সাক্ষ্য আদম সন্তানের বিরুদ্ধে কিয়ামতের দিবসে একটি দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। অবশ্য যারা শুধু মৌখিক স্বীকৃতিকে ঈমান বলে থাকে যেমন কাররামিয়া সম্প্রদায় এবং যারা আন্তরিক স্বীকৃতি ও বিশ্বাসকে ঈমান বলে যেমন জাহামিয়া সম্প্রদায়, তারা এ মতের বিরোধিতা করে।

আল্লাহ তা'আলা মুনাফিকদের কর্ম ও দাবির ব্যাপারে তাদের মৌখিক সাক্ষ্য প্রদানকে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছেন। অথচ সাক্ষ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বাক্যের মধ্যে তারা কয়েক ধরনের'তাগিদ' (emphasis) ব্যবহার করেছেন। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন–

إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

'যখন তোমার কাছে মুনাফিকরা আসে, তখন বলে, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, নিশ্চয়ই আপনি আল্লাহর রাসুল এবং আল্লাহ জানেন যে, অবশ্যই তুমি তাঁর রাসুল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, অবশ্যই মুনাফিকরা মিথ্যাবাদী।' (মুনাফিকূন, ৬৩:১)

মুনাফিকরা তাদের মৌখিক সাক্ষ্যকে আরবী গ্রামারের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনটি- أَنَّ (নিশ্চয়ই) لَ (অবশ্যই) এবং **جُمْلَةٌ اِسْمِيَّةٌ** (বিশেষ্য প্রধান বাক্য) এর মাধ্যমে তাগিদ (emphasis) ব্যবহার করেছে। আল্লাহ তা'আলাও তাদের সাক্ষ্যকে মিথ্যা আখ্যায়িত করার জন্য যে বাক্য ব্যবহার করেছেন সে ক্ষেত্রেও অনুরূপ তাগিদ (emphasis) ব্যবহার করেছেন। এর সাথে সাথে তাদের একটি বিশ্রী (মুনাফিক) উপাধিতে ভূষিত করার ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাদের ভয়ঙ্কর ও বীভৎস জ্ঞানের কথা বলেছেন। এ তথ্যের মাধ্যমে আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, ঈমান নামটির মধ্যে অবশ্যই আন্তরিক স্বীকৃতি এবং তদানুযায়ী আমল (কর্ম) পাওয়া যেতে হবে।

যে ব্যক্তি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র সাক্ষ্য দিলো আবার গাইরুল্লাহর (আল্লাহ ছাড়া অন্যকিছু) ইবাদত করলো, তার এ সাক্ষ্যের কোনো মূল্য নেই, যদিও সে সালাত আদায় করে, সিয়াম পালন করে এবং ইসলামের কিছু কাজ কর্ম করে। যে ব্যক্তি কিতাবের (ইসলামের) কিছু মানবে আর কিছু মানবে না তার উদ্দেশ্যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

'তোমরা কি কিতাবের কিছুঅংশ বিশ্বাস করো আর কিছু অংশ অবিশ্বাস করো?' (বাক্বারা,২: ৮৫)

দ্বিতীয় শর্ত: اَلْيَقِيْنُ (দৃঢ় বিশ্বাস)

তাওহীদ (আল্লাহর একাত্ববাদ) জানার পর এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ জানার পর এ কালেমার প্রতি বান্দার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে এবং এর দ্বারা সব ধরনের ইবাদত যে একমাত্র আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদন করতে হবে এ কথার প্রতিও তার দৃঢ় বিশ্বাস থাকতে হবে। এ কালেমা দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে সে ক্ষেত্রে বান্দার অন্তরে কোনো ধরনের দ্বিধা ও সন্দেহ থাকতে পারবে না। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

'মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজদের সম্পদ ও নিজদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যনিষ্ঠ।' (হুজরাত, ৪৯:১৫)

এই আয়াতে বলা হয়েছে 'অতঃপর তাতে কোনো সন্দেহ পোষণ করেনি। এর দ্বারা বুঝা গেলো কোনো প্রকার দ্বিধা-দন্দ বা সন্দেহ থাকলে সে প্রকৃত মুমিন নয়। সন্দেহযুক্ত ঈমান কোনো কাজে আসে না। এজন্য জান্নাতে প্রবেশ করার জন্য শর্ত হলো সন্দেহমুক্ত ঈমান থাকতে হবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ لاَ يَلْقَى اللَّهَ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكٍّ فِيهِمَا إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ

'যে ব্যক্তি এই সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই, আর আমি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর রাসুল এবং এই দুটি বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ বা দ্বিধাদন্দ নেই। তবে সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে।' (মুসলিম ১৪৭, জামেউল হাদীস ৩৫১৬)

তৃতীয় শর্ত: اَلْقَبُوْلُ (গ্রহণ করা)

তাওহীদ জানার পর 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ জানা এবং তাঁর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করার পর কালেমাকে মনে-প্রাণে গ্রহণ করতে হবে। কোনো প্রকার ইবাদতের মাধ্যমে যেনো তার ব্যতিক্রম না ঘটে। 'লা ইলাহা ইল্লাহ'র অর্থ জানলো, দৃঢ় ভাবে বিশ্বাসও করলো। কিন্তু গ্রহণ করে নাই। তাহলে সে মুমিন বলে বিবেচিত হবে না। মক্কার কাফির-মুশরিকরা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ ভালো করেই জানতো। আন্তরিকভাবে বিশ্বাসও করতো। কিন্তু অহঙ্কার বশত: গ্রহণ করতে পারেনি। সেজন্য কাফির-মুশরিক-ই রয়ে গেলো। তারা যে 'লা ইলাহা ইল্লাহ'র অর্থ জেনে বুঝে প্রত্যাখ্যান করেছে তার প্রমাণ নিম্নের আয়াতটি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّهُمْ كَانُوا إِذَا قِيلَ لَهُمْ لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ يَسْتَكْبِرُونَ وَيَقُولُونَ أَئِنَّا لَتَارِكُوا آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ

'তাদের যখন বলা হত, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই', তখন নিশ্চয়ই তারা অহঙ্কার করত। আর বলত, 'আমরা কি এক পাগল কবির জন্য আমাদের উপাস্যদের ছেড়ে দেব?' (সফফাত, ৩৭: ৩৫-৩৬)

এই আয়াতে বলা হয়েছে যে, যখন তাদের বলা হয় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তখন তারা বলে আমরা কি এক পাগল কবির কথায় আমাদের ইলাহদের ছেড়ে দিবো। অথচ তাদের তাদের দেব-দেবী, মূর্তি-প্রতীমা ছেড়ে দেওয়ার কথা বলা হয়নি। কিন্তু তারা 'লা ইলাহা' থেকে ভালো করেই বুঝতে পেরেছে যে, এর মাধ্যমে আমাদের তিনশত ষাট টি মূর্তিসহ সকল দেব-দেবীকে বর্জন করে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে গ্রহণ করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেলো বর্তমানেও যারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর' অর্থ জানে এবং আন্তরিকভাবে বিশ্বাসও করে কিন্তু বাস্তব আমলের ক্ষেত্রে গ্রহণ করে না। তাদের মধ্যে আর মক্কার তৎকালীন কাফির-মুশরিকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

চতুর্থ শর্ত: اَلْاِنْقِيَادُ (সমর্পণ করা)

তাওহীদ জানার পর 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ জানা, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা এবং বাস্তবে ইবাদতের মাধ্যমে তা গ্রহণ করার পর অবশ্যই 'লা

ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র কাছে নিজেকে সমর্পণ করতে হবে। এ সমর্পণ হবে সকল প্রকার তাগূতের সাথে কুফরি করার মাধ্যমে এবং তাগূত থেকে নিজেকে মুক্ত করার মাধ্যমে। আর এটার বাস্তব পরীক্ষা হবে তখন, যখন কুরআন ও সুন্নাহ-এর কোনো বিষয় তার পার্থিব স্বার্থের বিরুদ্ধে যায়। সে মুহূর্তে যদি নিজের স্বার্থকে ত্যাগ করে কুরআন–সুন্নাহ-এর নির্দেশের কাছে আত্মসমর্পণ করে তাহলে সে মুমিন। আর যদি পার্থিব স্বার্থ রক্ষার জন্য কুরআন–সুন্নাহ-এর নির্দেশকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করে তাহলে সে মুমিন নয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।' (নিসা, ৪:৬৫)

এই আয়াতে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, যেকোনো বিষয়ে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত হিসেবে মেনে নেওয়া। অতঃপর কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ না করে তার সামনে সঁপে দেওয়া না হলে সে মুমিন নয়।

তৃতীয় শর্ত 'গ্রহণ করা' ও চতুর্থ শর্ত 'সমর্পণ করা' এর মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে এই যে, তৃতীয় শর্ত (কবুল) কথার মাধ্যমে, আর চতুর্থ শর্ত (ইনকিয়াদ) হচ্ছে কর্মের মাধ্যমে।

আল্লামা আবদুর রহমান বিন হাসান আল শায়খ (রহ.) বলেছেন, 'ইসলাম শুধুমাত্র একটি দাবি এবং মৌখিক উচ্চারণের নাম নয়। বরং ইসলামের অর্থ হচ্ছে আল্লাহর একত্বকে মেনে নেয়ার মাধ্যমে আল্লাহর কাছে নিজেকে সমর্পণ ও সোপর্দ করা। একমাত্র আল্লাহর রবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতের কাছে আত্মসমর্পণ করা' (আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর রবুবিয়্যাত ও উলুহিয়্যাতকে অস্বীকার করা)। যেমনটি আল্লাহ তায়ালা ঘোষণা করেছেন–

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। (বাক্বারাহ ২:২৫৬)

এ আয়াতে ঈমান বিল্লাহ-এর পূর্বে কুফর বিত তাগূতকে শর্তাকারে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং তাগূতকে কুফর করা বা প্রত্যাখ্যান করা ব্যতীত কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারে না। একজন পাক্কা মুমিন মানেই হলো তাগূতের পাক্কা কাফির। তাগূত ও তাগূতের আইন-বিধান প্রত্যাখ্যান করাই হলো দ্বীন ইসলাম। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ أَمَرَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ

'বিধান একমাত্র আল্লাহর-ই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'তাঁকে ছাড়া আর কারো ইবাদাত করো না'। এটিই সঠিক দীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।' (ইউসুফ ১২: ৪০)

পঞ্চম শর্ত: اَلصِّدْقُ (সত্যতা)

তাওহীদ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ জানার পর এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস, তা মনে প্রাণে কবুল করা, এর প্রতি নিজেকে সমর্পণ করার পর অবশ্যই বান্দাকে কালেমার ক্ষেত্রে স্বীয় সত্যতাকে প্রমাণ করতে হবে।

عَنْ قَتَادَةَ قَالَ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِك أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ وَمُعَاذٌ رَدِيفُهُ عَلَى الرَّحْلِ قَالَ يَا مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه وَسَعْدَيْكَ قَالَ يَا مُعَاذُ قَالَ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّه وَسَعْدَيْكَ ثَلَاثًا قَالَ مَا منْ أَحَد يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّه صدْقًا منْ قَلْبه إِلَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ

....রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– যে ব্যক্তিই সত্যনিষ্ঠ অন্তরে সাক্ষ্য দিবে যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসুল। আল্লাহ তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন। (বুখারী ১২৮, মুসনাদে আহমাদ ১৬২১৫, মেশকাত ২৫)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো ইরশাদ করেছেন–

لَا يَمُوتُ عَبْدٌ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه صدْقًا منْ قَلْبِه ثُمَّ يُسَدِّدُ إِلَّا سُلكَ فِي الْجَنَّةِ

যে ব্যক্তি সত্যতার সাথে খাঁটি অন্তরে সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসুল। অতঃপর তার ওপর অটল থাকবে। সে অবশ্যই জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মুসনাদে *আহমদ* ১৬২১৫)

যে ব্যক্তি এ কালেমা শুধু মুখে উচ্চারণ করবে কিন্তু এ কালেমা দ্বারা যা বুঝানো হয় তা অন্তরে অস্বীকার করে তবে সে নাজাত (মুক্তি) লাভ করতে পারবে না, যেমনটি আল্লাহর বর্ণনা অনুযায়ী মুনাফিকরা লাভ করতে পারবে না। মুনাফিকরা শুধু মুখে বলেছিলো–نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি অবশ্যই আল্লাহর রাসুল' (মুনাফিকুন ৬৩:১)

মুনাফিকদের এই মৌখিক দাবির জবাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বললেন–

وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ

'আল্লাহও জানেন, আপনি অবশ্যই তাঁর রাসুল। আর আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে মুনাফিকরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী।' (মুনাফিকুন, ৬৩: ১)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুনাফিকদের মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করলেন। অথচ তাদের কথাটা সত্য ছিলো। কিন্তু তারা এখানে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি শব্দ ব্যবহার করেছে। আর সাক্ষ্য বলা হয় আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে কোনো কথা বলাকে। যেহেতু তারা আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে কথাটি বলেনি, এ কারণে তাদের 'আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি' এ কথাটি বলা মিথ্যা হয়েছে। অত:এব বর্তমানেও কোনো ব্যক্তি যদি নিজেকে মুসলিম দাবি করে, আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী বলে দাবি করে, কিন্তু বাস্তবে এর সত্যতা প্রমাণ করে না। তাহলে সে ব্যক্তিও মুনাফিক বলে বিবেচিত হবে। এ জাতীয় লোকদের চরিত্রকে পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

'আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি', অথচ তারা মুমিন নয়।' (বাক্বারা, ২: ৮)

৬ষ্ঠ শর্ত: اَلْاِخْلَاصُ (সততা ও একনিষ্ঠতা)

তাওহীদ, লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহর অর্থ জানা, তার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা, অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ করা, এর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা এবং নিজ ঈমানের সত্যতা যাচাই-বাছাই করার পর বান্দাকে অবশ্যই কালেমার ব্যাপারে মুখলিস বা একনিষ্ঠ হতে হবে। আর ইখলাস হচ্ছে বান্দার ইবাদতকে একমাত্র আল্লাহর জন্যই নিবেদিত করা। গায়রুল্লাহর জন্য ইবাদতের বিন্দুমাত্র অংশও নিবেদিত হবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَا أُمِرُوا إِلا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

'আর তাদের কেবল এই নির্দেশ দেয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর 'ইবাদাত করে তাঁরই জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করে।' (বাইয়্যিনাহ, ৯৮:৫)

তাছাড়া আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তার বান্দার মাঝে কোনো ভায়া মাধ্যম স্থির করাও ইখলাসের পরিপন্থী। এজন্য হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এমনভাবে যেনো তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছো। কেননা যদিও তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছো না কিন্তু তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখেন। (বুখারী ৫০, মুসলিম ১০২, তিরমিযী ২৬১০, আবু দাউদ ৪৬৯৭, নাসায়ী ৫০০৫, ইবনে মাজাহ ৬৩, ৬৪)

ইখলাসের মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত যে, বান্দা এ কালেমা কোনো ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কিংবা কোনো ব্যক্তির সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বলবেও না আকড়েও ধরবে না। অনেক সময় মানুষকে শুনানোর জন্য জোরে জোরে যিকির করে। কেউ মানুষকে দেখানোর উদ্দেশ্যে সবসময় ঠোঁট নাড়া-চাড়া করে। আবার কেউ হাতে লম্বা তসবীহ দানা নিয়ে গুণতে থাকে। এগুলো সবই ইখলাসের পরিপন্থী বিষয়। প্রকৃত ইখলাস কখনো প্রকাশ করা হয় না। আর যদি ইখলাস প্রকাশ করা হয়। তাহলে সেই ইখলাসকেও ইখলাস করা প্রয়োজন। কুরআনের প্রায় সব সুরা গুলোর নাম ঐ সুরার ভিতরের গুরুত্বপূর্ণ কোনো শব্দ দিয়ে নির্বাচন করা হয়েছে। কিন্তু সুরায়ে ইখলাসের নাম ইখলাস শব্দটি ঐ সুরার ভিতরে নেই। এর মাধ্যমেও প্রমাণিত হলো

যে, ইখলাস উল্লেখ করার বিষয় নয়। ইখলাস উল্লেখ থাকে না, গোপন থাকে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَبْتَغِي بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّه

'আল্লাহ তায়ালা ঐ ব্যক্তির জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ উচ্চারণ করেছে।' (বুখারী ১১৮৬, মুসলিম ১৫২৮ মুসনাদে আহমাদ ১৬৪৮২, বায়হাকী ২০৮৯৩)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো বলেছেন–

أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِه

'যে ব্যক্তি একনিষ্ঠ অন্তরে বললো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সেই হচ্ছে কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ লাভের জন্য সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবান।' (বুখারী ৯৯, মুসনাদে আহমাদ ৮৮৫৮, মেশকাত ৫৫৭৪)

সপ্তম শর্ত: اَلْمَحَبَّةُ (ভালোবাসা)

তাওহীদ জানার পর লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর অর্থ জানা, এর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা, অন্তর দিয়ে তা গ্রহণ করা, এর কাছে নিজেকে সমর্পণ করা, ঈমানের সত্যতার যাচাই-বাছাই করা, কালিমার ব্যাপারে একনিষ্ঠ হওয়ার পর বান্দাকে অবশ্যই কালিমাকে মুহাব্বত করতে হবে। অন্তর দিয়ে কালিমাকে মুহাব্বত করতে হবে, আর মুখে কালিমার প্রতি মুহব্বতকে প্রকাশ করতে হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ

'আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষরূপে গ্রহণ করে, তাদের আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালোবাসে। আর যারা ঈমান এনেছে, তারা আল্লাহর জন্য ভালোবাসায় দৃঢ়তর। আর যদি জালিমরা দেখে– যখন তারা আজাব দেখবে যে, নিশ্চয়ই সকল শক্তি আল্লাহর জন্য এবং নিশ্চয়ই আল্লাহ আজাব দানে কঠোর।' (বাক্বারা, ২:১৬৫)

শায়খ সুলাইমান বিন সামহান (রহ.) বলেন, এ সব বিষয়ে কথা বলা এবং জবাব দেয়ার পূর্বে আমি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র অর্থ এবং উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে যা বলেছেন তা উল্লেখ করতে চাই। কালিমার সেই শর্তাবলীর কথাও উল্লেখ করতে চাই যেসব শর্তাবলী পূরণ করা ব্যতীত কোনো মানুষের ইসলাম সঠিক হবে না। একজন মানুষের মধ্যে যখনই এ শর্তগুলোর সমাবেশ ঘটবে এর জ্ঞান, আমল ও ধ্যান ধারণার মধ্যে সমন্বয় ঘটিয়ে এ কালেমাকে উচ্চারণ করবে, সাথে সাথে শায়খুল ইসলাম মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (রহ.) এর উল্লেখকৃত ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক দশটি বিষয় থেকে সে মুক্ত থাকবে, তখনই তার ইসলাম সঠিক বলে বিবেচিত হবে। কারণ, এটাই হচ্ছে কালিমার মূল, যার ওপর ভিত্তি করে এসব মাসআলার বিভিন্ন শাখা প্রশাখা এবং হুকুমের উদ্ভব হয়েছে। (আদ্ দুরার আস সানিয়াহ্ কিতাবুত তাওহীদ)

আল্লামা শায়খ আবদুর রহমান বিন হাসান আল শায়খ বলেন, অধিকাংশ লোকই 'লা-ইলাহা ইল্লাহ'র অর্থ সম্পর্কে অজ্ঞ। তাদের অবস্থা এই যে, যদি মুখে কালেমার কথা উচ্চারণ করে, তাহলে অর্থের দিকটা অস্বীকার করে। তাই ছয়টি অথবা সাতটি বিষয়ে তোমাকে খুবই সতর্ক থাকতে হবে। এ ছয়টি বিষয়ের সমাবেশ ব্যতীত একজন বান্দা কুফরি ও মুনাফেকী থেকে মুক্ত থাকতে পারেনা। একজন বান্দার মধ্যে ছয়টি বিষয়ের সমাহার এবং তদানুযায়ী আমল করার মাধ্যমেই সত্যিকারে মুসলিম হওয়া সম্ভব। তাই জ্ঞান, আমল, বিশ্বাস, গ্রহণ, মুহাব্বত ও আনুগত্যের দিক থেকে বান্দার অন্তর ও জবানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

অতএব, একজন মুসলিমের জ্ঞান এমন হতে হবে, যেখানে মূর্খতার অবকাশ নেই। তার ইখলাস হবে শিরক মুক্ত, সত্যতা হবে মিথ্যাচার মুক্ত, তার চরিত্র হতে হবে শিরক এবং নিফাক মুক্ত। তার বিশ্বাস হতে হবে সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত। সে কালিমা উচ্চারণ করবে অথচ তার মনে কালিমা দ্বারা যা বুঝায় তার ব্যাপারে এবং এর দাবিগুলোর ব্যাপারে কোনো প্রকার সংশয় থাকবে না। তার মনে থাকবে সেই ভালোবাসা, যার মধ্যে থাকবে না কোনো ঘৃণা, থাকবে এমন গ্রহণযোগ্যতা যার মধ্যে থাকবে না কোনো অস্বীকৃতি। সেই আরব মুশরিকদের মতো তার অবস্থা হবে না যারা কালিমার অর্থ বুঝতো অথচ তা গ্রহন করেনি।

একজন মুসলিমের মধ্যে থাকা চাই সেই আনুগত্য, যার মধ্যে থাকবে না শিরকের অস্তিত্ব, যে শিরকের উদ্ভব হয়েছে কালেমার দাবি, অপরিহার্য বিষয় ও অধিকার পরিত্যাগ করার কারণে। কালেমার এসব দাবি ও অপরিহার্য বিষয়গুলোর মাধ্যমেই বান্দার ইসলাম ও ঈমান পরিশুদ্ধ হয়।

উল্লিখিত বিষয়গুলোর প্রতিফলন যথার্থ ভাবে যার জীবনে ঘটবে, সে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ শিক্ষার ক্ষেত্রে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে। সাথে সাথে সে তার জ্ঞান 'প্রজ্ঞা' ভালো-মন্দের বিচার বুদ্ধি, হেদায়াত ও স্থিরতার সাহায্যে তার দ্বীনকে উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে।

তাওহীদের দুই রুকন

তাওহীদের রুকন তথা لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ 'র রুকন :

রুকন (মৌলিক উপাদান) হচ্ছে এমন বিষয়, যার অনুপস্থিতিতে অন্য একটি বিষয়ের অনুপস্থিতি অপরিহার্য হয়ে উঠে। রুকন অবশ্যই মূল বিষয়টির অন্তর্গত হওয়া চাই। যেহেতু রুকন কোনো জিনিসের অভ্যন্তরীণ বা ভেতরের বিষয়, সেহেতু শুদ্ধ হওয়ার বিষয়টি এর ওপর নির্ভরশীল। অতএব কোনো জিনিসের রুকন ব্যতীত তা সহীহ বা শুদ্ধ হয় না।

রুকন কি জিনিস, এটা জানার পর আপনাকে অবশ্যই জানতে হবে যে, যে তাওহীদ আল্লাহ তা'আলা আপনার ওপর ওয়াজিব করে দিয়েছেন, সে তাওহীদেরও সালাতের মতোই রুকন আছে। সালাত যেমন তার রুকন যথা- তাকবীরে তাহরিমা, রুকু, সেজদা, শেষ বৈঠক ইত্যাদি আদায় করা ব্যতীত শুদ্ধ হয় না, কোনো ব্যক্তি যদি সালাতের কোনো রুকন বাদ দেয় তাহলে তার সালাত যেমনি ভাবে বাতিল হয়ে যায়, তেমনিভাবে কোনো ব্যক্তি যদি তাওহীদের কোনো একটি রুকন বাদ দেয়, তাহলে সে ব্যক্তিও আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসী ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারবে না। এমতাবস্থায় কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তার কোনো কাজে আসবে না, সে আর মুসলিম থাকবে না বরং সে কাফেরে পরিণত হয়ে যাবে।

তাওহীদের দুটি রুকন (মৌলিক উপাদান) :

তাওহীদের প্রথম রুকন বা মৌলিক বিষয় হচ্ছে 'কুফর বিত্তাগূত (كُفْرٌ بِالطَّاغُوْتِ) বা তাগূতকে অস্বীকার করা'।

আর দ্বিতীয় রুকন বা মৌলিক বিষয় হচ্ছে 'ঈমান বিল্লাহ (اِيْمَانٌ بِاللهِ) বা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা'।

এর দলিল হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার নিম্নোক্ত বাণী :

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

'অতএব, যে ব্যক্তি তাগূতকে অস্বীকার করে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে, অবশ্যই সে মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (বাক্বারা, ২:২৫৬)

উপরোক্ত আয়াতে **فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ** (তাগূতকে অস্বীকার করে) এটা হলো ১ম রুকন, আর **وَيُؤْمِنْ بِاللَّه** (আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে) এটা হলো ২য় রুকন, এবং **اَلْعُرْوَةُ الْوُثْقىٰ** (শক্ত রজ্জু) বলতে কালিমা **لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ** কে বুঝানো হয়েছে। আর এটাই মূলত তাওহীদের কালিমা।

তা ছাড়া অন্য জায়গায় আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى –

'আর যারা তাগূতের উপাসনা পরিহার করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ; অতএব আমার বান্দাদের সুসংবাদ দাও।' (যুমার, ৩৯:১৭)

যুগে যুগে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যত রাসুল প্রেরণ করেছেন তারা সকলেই তাগূতকে প্রত্যাখ্যান করার নির্দেশ দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

'আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো এবং তাগূত থেকে দূরে থাক।' (নাহল, ১৬ : ৩৬)

طاغوت (তাগূত) শব্দের আভিধানিক অর্থ

طَاغُوْتٌ (তাগূত) শব্দের আভিধানিক অর্থের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 'লিসানুল আরাব' (**لِسَانُ الْعَرَبِ**) গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন–

قَالَ اللَّيْثُ : اَلطَّاغُوْتُ تَاؤُهَا زَائِدَةٌ وَهِيَ مُشْتَقَّةٌ مِنْ طَغَى

আরবী ভাষাবিদ লাইছ বলেন **اَلطَّاغُوْتُ** (তাগূত) শব্দের **ت** (তা) বর্ণটি অতিরিক্ত এবং শব্দটি **طَغَى** (ত্বগা) বা সীমালঙ্ঘন করা শব্দ থেকে উৎপন্ন হয়েছে।

اَلطَّاغُوْتُ يَقَعُ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمْعِ وَالْمُذَّكَرُ وَالْمُؤَنَّثُ –

'তাগূত একবচন হতে পারে বহুবচনও হতে পারে, পুরুষ ও হতে পারে মহিলাও হতে পারে।'

وَقَالَ اَبُو اِسْحَاقَ : كُلُّ مَعْبُوْدٍ مِنْ دُوْنِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ جِبْتٌ وَطَاغُوْتٌ

'আবু ইসহাক বলেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ব্যতীত অন্য সব মাবুদকেই **جِبْتٌ** (জিব্‌ত) এবং **طَاغُوْتٌ** (তাগূত) বলে।

وَقَالَ اَهْلُ الْلُغَةِ : لِاَنَّهُمْ اِذَا اتَّبَعُوْا اَمْرَهُمَا مِنْ دُوْنِ اللهِ فَقَدْ اَطْغَوْا

শব্দ বিশেষজ্ঞরা বলেন, যখন কেউ উপরোক্ত **جِبْتٌ** (জিব্‌ত) এবং **طَاغُوْتٌ** (তাগূত) এর অনুসরণ করে তখনই তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাগূতের অনুসারী হয় এবং আল্লাহর ইবাদতের সীমালঙ্ঘন করে।

طَغَى (ত্বগা) শব্দটি ক্রিয়া। এর **مَصْدَرٌ** (মাসদার) (বা ক্রিয়ার মূল ধাতু) হলো **طُغْيَانٌ** (তুগইয়ান); আর **طُغْيَانٌ** (তুগইয়ান) শব্দের অর্থ বন্যা। নদীর পানি প্রবাহ নদীর দুই তীর দ্বারা সীমাবদ্ধ থাকাই নিয়ম কিন্তু পানি যখনই তার তীরের সীমালঙ্ঘন করে উপচে উঠে দু'কূল ভাসিয়ে নিয়ে যায় তখনই তাকে আমরা বন্যা বলি। তদ্রুপ মানুষ আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে কেবল তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁরই আইন মেনে চলবে– এটিই আল্লাহর বিধান। কিন্তু ঐ মানুষ যখন আল্লাহর দ্বীনের পথ থেকে সরে পড়বে এবং অন্য পথের বিশ্বাস করবে, অনুসরণ করবে তখনই সে সীমালঙ্ঘন করবে। তাই **لِسَانُ الْعَرَبِ** (লিসানুল আরব) এ বলা হয়েছে **كُلُّ مُجَاوِزٍ حَدَّه فِى الْعِصْيَانِ طَاغٍ** অর্থাৎ যে বা যারা আনুগত্যের ক্ষেত্রে সীমালঙ্ঘন করে তারাই তাগূত। সুতরাং যে কোনো মানুষের ক্ষেত্রেই আল্লাহর আইন ব্যতীত অন্য আইনের প্রণয়ন ও অনুসরণ করাই হবে তাগূতের অন্তর্ভুক্ত।

طَاغُوْتٌ (তাগূত) এর পারিভাষিক অর্থ

'তাগূত' কুরআনের একটি পরিভাষা। যাকে বর্জন করা ঈমানের মূল ভিত্তি তাওহীদের গুরুত্বপূর্ণ একটি রুকন। অথচ বেশিরভাগ মানুষ তাগূত সম্পর্কে কোনো ধারণাই রাখে না। মাদ্রাসাগুলোতে কুরআনের তরজমা পড়ানোর সময় তাগূতের তরজমা করা হয় শয়তান দ্বারা। অথচ শয়তান যদিও তাগূত তথাপিও তাগূতের অর্থ শয়তান নয় বা শয়তান একমাত্র তাগূত নয়। শয়তান ছাড়াও অনেক তাগূত আছে। যে তাগূতকে বর্জন করার জন্য এত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, সে তাগূতকে না চিনলে কিভাবে বর্জন করা যাবে? তাই বিষয়টির গুরুত্ব বিবেচনা করে এখানে তাফসীরের গুরুত্বপূর্ণ কিতাব থেকে তাগূতের পারিভাষিক অর্থ অতঃপর প্রধান প্রধান তাগূতদের পরিচয় তুলে ধরা হলো–

ইমাম ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন–

اَلْأَنْدَادُ وَالْأَوْثَانُ وَمَا يَدْعُوْ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ مِنْ عِبَادَةِ كُلِّ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ

'আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে আনদাদ, আওসানসহ আরো যাদের ইবাদতের জন্য শয়তান আহ্বান করে, তারা সকলেই তাগূত।' (তাফসীর ইবনে কাসীর, বাক্বারা ২৫৬ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

ইমাম ইবনে জারীর তাবারী বলেন–

وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ عِنْدِىْ فِىْ الطَّاغُوْتِ، أَنَّهُ كُلُّ ذِىْ طُغْيَانٍ عَلَى اللهِ، فَعَبَدَ مِنْ دُوْنِه، إِمَّا بِقَهْرٍ مِنْهُ لِمَنْ عَبَدَهُ، وَإِمَّا بِطَاعَةٍ مِمَّنْ عَبَدَهُ لَهُ، إِنْسَانًا كَانَ ذَلِكَ الْمَعْبُوْدُ، أَوْ شَيْطَانًا، أَوْ وَثَنًا، أَوْ صَنَمًا، أَوْ كَائِنًا مَا كَانَ مِنْ شَىْءٍ

ঐ সকল আল্লাহদ্রোহী যারা আল্লাহর নাফরমানীতে সীমালঙ্ঘন করেছে এবং মানুষ যাদের আল্লাহর পরিবর্তে স্বেচ্ছায় অথবা জোর পূর্বক আনুগত্য করে সে-ই তাগূত। চাই সে মানুষ, জ্বীন, শয়তান, প্রতীমা বা অন্য কিছু যাই হোক। (তাফসীরে তাবারী : ৩/২১)

ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন–

فَالْمَعْبُوْدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ كَارِهًا لِذَلِكَ طَاغُوْتٌ، وَلِهَذَا سَمَّى النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَصْنَامَ طَوَاغِيْتُ فِى الْحَدِيْثِ الصَّحِيْحِ

তাগূত 'তুগইয়ান' শব্দ থেকে নির্গত যার অর্থ সীমা অতিক্রম করা, জুলুম করা, বিদ্রোহ করা। আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করা হয় তারাই তাগূত। যদি তারা আল্লাহর পরিবর্তে তাদের আনুগত্য করাকে অপছন্দ না করে। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মূর্তিকে তাগূত বলেছেন। (আল ফাতাওয়া : ২৮/২০০)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম বলেন–

اَلطَّاغُوْتُ كُلُّ مَا تُجَاوِزُ بِه الْعَبْدُ حَدَّهُ مِنْ مَعْبُوْدٍ أَوْ مَتْبُوْعٍ أَوْ مُطَاعٍ، فَطَاغُوْتُ كُلِّ قَوْمٍ مَنْ يَتَحَاكَمُوْنَ إِلَيْه غَيْرَ اللهِ وَرَسُوْلِه، أَوْ يَعْبُدُوْنَهُ مِنْ دُوْنِ اللهِ، أَوْ يَعْبُدُوْنَهُ عَلَىْ غَيْرِ بَصِيْرَةٍ مِنَ اللهِ، أَوْ يُطِيْعُوْنَهُ فِيْمَا لَا يَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ طَاعَةٌ لله، فَهَذِه طَوَاغِيْتُ الْعَالَمِ إِذَا تَأَمَّلْتَهَا وَتَأَمَّلْتَ أَحْوَالَ النَّاسِ مَعَهَا رَأَيْتَ أَكْثَرَهُمْ عَدَلُوْا مِنْ عِبَادَةِ اللهِ إِلَىْ عِبَادَةِ الطَّاغُوْتِ، وَعَنِ التَّحَاكُمِ إِلَى اللهِ وَإِلَى الرَّسُوْلِ إِلَى التَّحَاكُمِ إِلَىْ طَاغُوْتٍ، وَعَنْ طَاعَتِه وَمُتَابَعَةِ رَسُوْلِه إِلَىْ طَاعَةِ الطَّاغُوْتِ وَمُتَابَعَتِه

'তাগূত হচ্ছে ঐ সকল মা'বুদ, লিডার, নেতা-নেত্রী, মুরুব্বী, পীর-বুযুর্গ যাদের আনুগত্য করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করা হয়। আল্লাহ এবং তার রাসুলকে বাদ দিয়ে যাদের কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয় অথবা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয়। অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো দলিল-প্রমাণ ছাড়া যাদের আনুগত্য করা হয়। অথবা আল্লাহর আনুগত্য মনে করে যে সকল গাইরুল্লাহর ইবাদত করা হয়। এরাই হল পৃথিবীর বড় বড় তাগূত। তুমি যদি এই তাগূতগুলো এবং মানুষের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করো তবে বেশির ভাগ মানুষকেই পাবে, যারা আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে তাগূতের ইবাদত করে। আল্লাহ এবং তার রাসুলের কাছে (কুরআন ও সুন্নাহ-এর কাছে) বিচার-ফয়সালা চাওয়ার পরিবর্তে তাগূতের কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যায়। আল্লাহ এবং রাসুলের আনুগত্য করার পরিবর্তে তাগূতের আনুগত্য করে। আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে তাগূতের নির্দেশ পালন করে।' (এ'লামুল মুওয়াক্কেঈ'ন : ১/৫০)

ইমাম কুরতুবী (রহ.) বলেন–

اَلطَّاغُوْتُ اَلْكَاهِنُ، وَالشَّيْطَانُ، وَكُلُّ رَأْسٍ فِى الضَّلَالِ

তাগূত হচ্ছে গণক, জাদুকর, শয়তান এবং পথভ্রষ্ট সকল নেতা, যারা মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের পরিবর্তে নিজেদের বা অন্য কোনো গায়রুল্লাহ-র আনুগত্যের দিকে আহ্বান করে। (আল জামে লি আহকামিল কুরআন : ৩/২৮২)

ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহ্হাব–

اَلطَّاغُوْتُ عَامٌّ فِىْ كُلِّ مَا عُبِدَ مِنْ دُوْنِ اللهِ رَضِىَ بِالْعِبَادَةِ مِنْ مَعْبُوْدٍ أَوْ مَتْبُوْعٍ أَوْ مُطَاعٍ فِىْ غَيْرِ طَاعَةِ اللهِ وَرَسُوْله فَهُوَ طَاغُوْتٌ

তাগূত হচ্ছে ঐ সকল মা'বুদ, লিডার, মুরুব্বী, আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করা হয় এবং তারা এতে সন্তুষ্ট। (মাজমুআতুত তাওহীদ : পৃ:৯)

ইমাম শানকিত্বী বলেন–

وَالتَّحْقِيْقُ أَنَّ كُلَّ مَا عُبِدَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَهُوَ طَاغُوْتٌ، وَالْحَظُّ الْأَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ لِلشَّيْطَانِ كَمَا قَالَ تَعَالَىْ : أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِىْ آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوْا الشَّيْطَانَ

আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তারাই তাগূত। আর এই গায়রুল্লাহর ইবাদতের বড় অংশটাই হচ্ছে শয়তানের জন্য। কেননা শয়তানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে কোনো গায়রুল্লাহর ইবাদত করা পরোক্ষভাবে শয়তানের-ই ইবাদত করার শামিল। এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন, 'হে বণী-আদম! আমি কি তোমাদের বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করো না।' (ইয়াসীন, ৩৬: ৬০) (তাফসীরে আদওয়াউল বয়ান : ১/২২৮)

ইমাম আব্দুর রহমান বলেন–

اَلطَّاغُوْتُ يَشْمَلُ كُلَّ مَعْبُوْدٍ مِنْ دُوْنِ اللهِ، وَكُلَّ رَأْسٍ فِى الضَّلَالِ يَدْعُوْ إِلَى الْبَاطِلِ وَيُحْسِنُهُ، وَيَشْمَلُ أَيْضًا : كُلَّ مَنْ نَصَبَهُ النَّاسُ لِلْحُكْمِ بَيْنَهُمْ بِأَحْكَامِ الْجَاهِلِيَّةِ الْمُضَادَّةِ لِحُكْمِ اللهِ وَرَسُوْلِه، وَيَشْمَلُ أَيْضًا : اَلْكَاهِنُ، وَالسَّاحِرُ، وَسُدَنَةُ الْأَوْثَانِ الدَّاعِيْنَ إِلَىْ عِبَادَةِ الْمَقْبُوْرِيْنَ وَغَيْرِهِمْ، بِمَايَكْذِبُوْنَ مِنَ الْحِكَايَاتِ الْمُضِلَّةِ لِلْجُهَّالِ وَأَصْلُ هَذِه الْأَنْوَاعِ كُلِّه وَأَعْظَمُهَا : اَلشَّيْطَانُ، فَهُوَ الطَّاغُوْتُ الْأَكْبَرُ، وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত করা হয়, যেসকল নেতা-নেত্রী মানুষকে বাতিলের দিকে আহ্বান করে এবং বাতিলকে সজ্জিত-মণ্ডিত করে উপস্থাপন

করে, যারা আল্লাহ এবং তার রাসুলের আইন বাদ দিয়ে মনগড়া আইন তৈরি করে এবং যারা সেই মানব রচিত আইন দ্বারা বিচার-ফায়সালা করে। এমনিভাবে গণক, জাদুকর, মূর্তিপূজকদের নেতা যারা কবরপূজার দিকে মানুষকে আহ্বান করে, যারা তাদের জীবিত-মৃত পীর-বুযুর্গদের নামে মিথ্যা কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করে সাধারণ মূর্খ মানুষদের মাজারের দিকে আকৃষ্ট করে। এরা সকলেই তাগূত। এদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হলো শয়তান। (আদ দুরারুস সানিয়্যাহ্ : ২/১০৩)

ইমাম আন নববী (রহ.) বলেন–

قَالَ النَّوَوِىْ قَالَ الْلَيْثُ، وَأَبُوْ عُبَيْدَةَ،وَ الْكَسَائِىْ، وَجَمَاهِيْرُ أَهْلِ الْلُغَةِ : اَلطَّاغُوْتُ كُلُّ مَا عُبِدَ مِنْ دُوْنِ اللهِ تَعَالَى

আল্লাহ ছাড়া যাদের ইবাদত করা হয় তারাই তাগূত। এটাই লাইছ, আবু উবাইদা, কেসায়ী এবং বেশির ভাগ আরবী ভাষাবিদদের অভিমত। (শরহে মুসলিম : ৩/১৮)

সাইয়্যেদ কুতুব বলেন–

قَالَ سَيِّدُ قُطُب: كُلُّ مَا يَطْغِىْ عَلَى الْوَعْىِ وَيَجُوْزُ عَلَى الْحَقِّ، وَيَتَجَاوَزُ الْحُدُوْدَ الَّتِىْ رَسَمَهَا اللهُ لِلْعِبَادَةِ، وَلَا يَكُوْنُ لَهُ ضَابِطٌ مِنَ الْعَقِيْدَةِ فِىْ اللهِ، مِنَ الشَّرِيْعَةِ الَّتِىْ يَسُنُّهَا اللهُ وَمِنْهُ كُلُّ مَنْهَجٍ غَيرِ مُسْتَمِدٌ مِنَ اللهِ، وَكُلُّ تَصَوُّرٍ أَوْ وَضْعٍ أَوْ أَدْبٍ أَوْ تَقْلِيْدِ لَايَسْتَمِدُّ مِنَ اللهِ

যারা সত্যকে অমান্য করে, ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর দেওয়া সীমারেখা অতিক্রম করে, আল্লাহর দেওয়া শরীআহ'র কোনো তোয়াক্কা করে না। ইসলামী আক্বিদাহ-বিশ্বাসের কোনো গুরুত্ব রাখে না। যারা ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্ধারিত পদ্ধতি বাদ দিয়ে অথবা আল্লাহর পক্ষ থেকে অনুমোদন ছাড়া ইবাদতের পদ্ধতি তৈরি করে। যারা বিশেষ প্রকারের ধ্যান করা অথবা বিশেষ ভঙ্গিমা অথবা কোনো ইবাদতের বিশেষ আদব তৈরি করে তারা সকলেই তাগূত। এমনিভাবে যারা বিশেষ কোনো ব্যক্তির তাক্বলীদ বা অন্ধ অনুকরণে জণসাধারণকে বাধ্য করে তারাও তাগূত। (ফি যিলালিল কুরআন: ১/২৯২)

(বর্তমানে সুফিদের বিভিন্ন তরীকার যিকির, অঙ্গ ভঙ্গিমা ও ধ্যান করা ইত্যাদী যা কুরআন ও সুন্নাহর কোনো সহীহ দলিলভিত্তিক প্রমাণিত নয়।

যারা এগুলো তৈরি করেছে আর যারা এগুলো মানার জন্য অজ্ঞ মূর্খ ও সাধারণ জনগণকে আহ্বান করে তারা সকলেই তাগূত)

মুহাম্মাদ হামেদ আল-ফক্বী বলেন–

وَالَّذِىْ يُسْتَخْلَصُ مِنْ كَلَامِ السَّلَفِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ : أَنَّ الطَّاغُوْتَ كُلُّ مَا صَرَفَ الْعَبْدُ وَصَدَّهُ عَنْ عِبَادَةِ اللهِ وَإِخْلَاصِ الدِّيْنِ وَالطَّاعَةِ لِلّٰهِ وَلِرَسُوْلِهِ سَوَاءٌ فِىْ ذَلِكَ الشَّيْطَانُ مِنَ الْجِنِّ وَالشَّيْطَانُ مِنَ الْإِنْسِ، وَالْأَشْجَارُ وَالْأَحْجَارُ وَغَيْرُهَا وَيَدْخُلُ فِىْ ذَلِكَ بِلَا شَكٍّ اَلْحُكْمُ بِالْقَوَانِيْنِ الْأَجْنَبِيَّةِ عَنِ الْإِسْلَامِ وَشَرَائِعِهِ وَغَيْرِهَا مِنْ كُلِّ مَا وَضَعَهُ الْإِنْسَانُ لِيَحْكُمَ بِهِ فِى الدِّمَاءِ وَالْفُرُوْجِ وَالْأَمْوَالِ، وَلْيَبْطُلْ بِهَا شَرَائِعُ اللهِ مِنْ إِقَامَةِ الْحُدُوْدِ وَتَحْرِيْمِ الرِّبَا وَالزِّنَا وَالْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، مِمَّا أَخَذَتْ هَذِهِ الْقَوَانِيْنُ تَحَلُّلَهَا وَتَحَمِّيْهَا بِنُفُوْذِهَا وَمَنْفَذِهَا وَالْقَوَانِيْنُ نَفْسُهَا طَوَاغِيْتُ، وَوَاضِعُوْهَا وَمُرَوِّجُوْهَا طَوَاغِيْتُ، أَمْثَالُهَا مِنْ كُلِّ كِتَابٍ وَضَعَهُ الْعَقْلُ الْبُشْرَىْ لِيَصْرِفَ عَنِ الْحَقِّ الَّذِىْ جَاءَ بِهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِمَّا قَصْدًا أَوْ عَنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْ وَاضِعِهِ، فَهُوْ طَاغُوْتٌ

তাগূত সম্পর্কে সালাফদের বিভিন্ন বক্তব্য থেকে যা জানা যায় তার সারমর্ম হলো, আল্লাহর আনুগত্য, আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য ও ইবাদত এবং আল্লাহর জন্য দ্বীনকে একনিষ্ঠ করার পরিবর্তে যাদের আনুগত্য ও ইবাদত করা হয় অথবা আল্লাহর ইবাদতের সঙ্গে যাদের ভায়া-মাধ্যম হিসেবে অথবা আল্লাহর অংশীদার হিসেবে আনুগত্য করা হয় তারা সকলেই তাগূত। এই তাগূত জ্বীন শয়তান, মানুষ শয়তান, গাছ-পাথর, মাজার, কচ্ছপ, কুমীর, গজার মাছ ইত্যাদি সবই হতে পারে। এমনিভাবে আল্লাহর আইন বাতিল করে মানবরচিত সকল আইন-কানুন ও সংবিধান এই তাগূতের অন্তর্ভুক্ত। যেমন আল্লাহর হুদুদ, হাদ্দুল ক্বিসাস (খুনের বদলে খুন), হাদ্দুস সারাক্বা (চোরের হাত কাটার বিধান), হাদ্দুল খাম্‌র (মদ পানের শাস্তি), হাদ্দুয যিনা (যিনা-ব্যভিচারের শাস্তি)। এমনিভাবে আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হালাল করা। যেমন, সুদী ব্যাংকের লাইসেন্স দিয়ে সুদকে হালাল (বৈধ) করে দেওয়া। পতিতালয়ের লাইসেন্স দিয়ে বেশ্যাবৃত্তি ও যিনা-ব্যভিচারকে হালাল (বৈধ) করে দেওয়া। পর্দার বিধানকে বাতিল

করে বেপর্দা ও বেহায়াপনাকে বৈধ করে দেওয়া। সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে আল্লাহর নাযিলকৃত বণ্টন পদ্ধতি বাতিল করে নারী পুরুষকে সমান করা সহ মানব রচিত সকল আইন-কানুন যেমন তাগূত তেমনিভাবে যেসকল মন্ত্রী-এমপি এগুলো তৈরি করেছে, যারা এসকল মানবরচিত আইনে বিচার ফয়সালা করে সেকল বিচারক ও আইনজীবী এবং যারা মানব রচিত আইনের বিচার ফয়সালাকে বাস্তবায়ন করে সে সকল পুলিশ, সেনা বাহিনী এবং যারা এই মানব রচিত সংবিধান দ্বারা পরিচালিত সরকার পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে জড়িত যেমন, সচিবালয় ও মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা। আর যারা এদের জন্য রাজস্ব আদায় করে তারা সকলেই তাগূতের অন্তর্ভূক্ত। এমনিভাবে আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের পরিবর্তে যেসকল আইনের বই রচনা করা হয়েছে সে বইগুলো এবং যারা এগুলো রচনা করেছে চাই তারা জেনে বুঝে রচনা করুক বা না বুঝে করুক তারা সকলেই মানুষকে আল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্য থেকে ফিরিয়ে গায়রুল্লাহর ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে আহ্বান করার কারণে তাগূত বলে বিবেচিত হবে। কেননা পরোক্ষভাবে তারা নিজেরাই এই আনুগত্য নিচ্ছে। (হাশিয়া ফতহুল মুজিদ : পৃ: ২৮২)

কিছু উলামায়ে কেরাম বলেন–

اَلْمُرَادُ مِنَ الطَّوَاغِيْتِ كُلُّ فَرْدٍ أَوْ طَائِفَةٍ أَوْ إِدَارَةٍ تَبْغِىْ وَتَتَمَرَّدَ عَلَى اللهِ، وَتَجَاوَزَ حُدُوْدَ الْعُبُوْدِيَّةِ وَتَدْعِىْ لِنَفْسِهَا الْأُلُوْهِيَّةَ وَالرُّبُوْبِيَّةَ

তাগূত বলতে ঐ সকল ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও প্রতিষ্ঠানকে বুঝায়, যারা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে, যারা আল্লাহর গোলামী করার সীমানা অতিক্রম করে নিজেরা ইলাহ এবং রবের আসন দখল করেছে। (আল-মুসতালাহাত আল-আরবাআ'হ : পৃ: ৭৯ ও ১০১)

কেউ বলেছেন–

الطاغوت الذى ضلّ واضلّ

'তাগূত ঐ ব্যক্তি যে নিজে পথভ্রষ্ট হয় এবং অপরকে পথভ্রষ্ট করে।'

আরো কেউ বলেছেন–

اَلطَّاغُوْتُ الَّذِىْ مَا تَجَاوَزَ بِهِ الْعَبْدُ عَنْ مَعْبُوْدِهِ

তাগূত ঐ ব্যক্তি যে আবদিয়াত বা দাসত্বের সীমানা অতিক্রম করে মা'বুদ বা মনিবের আসনে সমাসীন হয়েছে।

মোটকথা : এতক্ষণ পর্যন্ত তাগূতের যেসকল সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তার সারমর্ম হলো এই যে, তাগূত বলা হয় আল্লাহর পরিবর্তে যার আনুত্য করা হয় এবং সে এটা পছন্দ করে। চাই সেটা ইবাদতের কোনো অংশ বিশেষ হোক অথবা ইবাদতের বিশেষ কোনো ক্ষেত্রে হোক। সুতরাং আল্লাহর ভালোবাসার মতো বা তার চেয়ে বেশি কাউকে ভালোবেসে যার আনুগত্য করা হয় সে তাগূত। আল্লাহর আনুগত্য ও বিচার ফায়সালা মেনে নেওয়ার পরিবর্তে যাদের বিচার ফায়সালা মেনে নেওয়া হয় তারা তাগূত। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, তাকে ভয় করা, তার নামে মান্নত করা, কোরবাণী করা ও পশু জবাই করা ইত্যাদির পরিবর্তে যাদের নামে এগুলো করা হয় (পীর-ফকির, মাজার, দর্গা-দুর্গা, মূর্তি-প্রতীমা ইত্যাদি) তারা তাগূত। আল্লাহর বিশেষ ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর ক্ষেত্রে যাদের আল্লাহর সমকক্ষ স্বীকার করা হয়, অথবা আল্লাহর ক্ষমতা, বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর আংশিক অধিকারী স্বীকার করা হয় তারা তাগূত (গণক, জ্যোতিষী, অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবিদার পীর-ফকির)। এমনিভাবে মানব রচিত সংবিধান, আইন-কানুন ও আল্লাহ প্রদত্ত শরীআ'তের সাদৃশ্য মানব রচিত মানহায ও ইবাদতের পদ্ধতিও তাগূত। এমনিভাবে সকল প্রকার ফিৎনা-ফ্যাসাদ, গোমরাহী ও পথভ্রষ্টতার নেতৃত্ব দানকারী নেতা-নেত্রী তাগূত। শিরক্ ও বিদআ'ত ও কুরআন-সুন্নাহ বিবর্জিত বিভিন্ন রসুম ও রেওয়াজের উদ্ভাবক ও পৃষ্ঠ পোষক পীর-মুর্শিদ তাগূত।

পবিত্র কুরআনের চারটি আয়াতে তা-গুতের বৈশিষ্ট্য

প্রথম আয়াত :

وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَى

'আর যারা তাগূতের উপাসনা পরিহার করে এবং আল্লাহ অভিমুখী হয় তাদের জন্য আছে সুসংবাদ; অতএব আমার বান্দাদের সুসংবাদ দাও।' (যুমার, ৩৯:১৭)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, তাগূত হল সেই غير الله (গায়রুল্লাহ) যার ইবাদত করা হয়ে থাকে, যাকে মান্য করা হয়, এবং যার একনিষ্ঠ অনুসরণ করা হয়, অথচ তা হারাম এবং নিষিদ্ধ।

দ্বিতীয় আয়াত :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا

'তুমি কি তাদের দেখনি, যারা কিতাবের কিছু অংশ প্রাপ্ত হয়েছে, যারা মান্য করে প্রতিমা ও তাগূতকে এবং কাফেরদের বলে যে, এরা মুসলিমদের তুলনায় অধিকতর সরল সঠিক পথে রয়েছে।' (নিসা ৪:৫১)

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, তাগূত হল এমন غير الله (গায়রুল্লাহ) যার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা হয়।

তৃতীয় আয়াত :

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

'তুমি কি তাদের দেখনি, যারা দাবি করে যে, নিশ্চয়ই তারা ঈমান এনেছে তার ওপর, যা নাযিল করা হয়েছে তোমার প্রতি এবং যা নাযিল করা হয়েছে তোমার পূর্বে। তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদের ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে।' (নিসা, ৪:৬০)

এ আয়াতে দেখা যায় যে, তাগূত হল এমন غَيْرُ الله (গায়রুল্লাহ) যার নিকট বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয়। অর্থাৎ মানব রচিত সংবিধানে বিচার ফয়সালাকারী বিচারকগণ। যারা তাগূতের অর্থ শয়তান বলে থাকেন তাদের জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, এ আয়াতেও কি তাগূত অর্থ শয়তান করবেন? শয়তানের এমন কোনো এজলাস আছে কি যেখানে মানুষ দলে দলে তার কাছে বিচার-ফয়সালা নিয়ে যায়?

চতুর্থ আয়াত :

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا

'যারা ঈমান এনেছে তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাস্তায়, আর যারা কুফরি করেছে তারা যুদ্ধ করে তাগূতের পথে। সুতরাং তোমরা যুদ্ধ করো শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে। নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল।' (নিসা, ৪:৭৬)

এ আয়াতে দেখা যায় যে, তাগূত হলো সেই غَيْرُ الله (গায়রুল্লাহ) বা শক্তি যাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য একদল লোক প্রাণন্তকর সংগ্রাম করে।

সুতরাং পবিত্র কোরআনের দৃষ্টিতে তাগূত সেই غَيْرُ الله (গায়রুল্লাহ) শক্তি, যার ইবাদত করা হয়, যার প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা হয়, যার কাছে বিচার-ফয়সালা চাওয়া হয় এবং যাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়, যাকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য প্রাণান্তকর সংগ্রাম করা হয়। আর একমাত্র কাফিররাই এই তাগূতের ইবাদত করে।

প্রধান প্রধান তাগূত

১. শয়তান : গায়রুল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বানকারী শয়তান। যে পরোক্ষভাবে নিজেই ইবাদত নেয়।

২. শাসক : ঐ সকল শাসক যারা নিজেরা সার্বভৌমত্বের দাবি করে এবং আল্লাহর আইন বাতিল করে মনগড়া আইন তৈরি করে। যেমন, তাগূতী রাষ্ট্রের মন্ত্রী-এমপি ও আমলাগণ।

৩. বিচারক : আল্লাহর নাযিলকৃত আইন-বিধান বাদ দিয়ে মানব রচিত আইন দিয়ে বিচার-ফয়সালাকারী বিচারক।

৪. পীর-ফকির : আল্লাহর ইবাদতের সাথে ভায়া-মাধ্যম ও অংশীদার হিসেবে ইবাদত গ্রহণকারী পীর-ফকির, কবর-মাজার, দরগা-খানকাহ্ যাদের ইবাদত করা হয় এবং তাদের ইবাদতের দিকে আহ্বানকারী মুরীদ ও ভক্তবৃন্দ।

৫. গণক, জ্যোতিষী, জাদুকর : ইলমূল গাইব বা ভবিষ্যৎ জ্ঞানের অধিকারী দাবিদার গণক, জ্যেতিষী, জাদুকর ও তাদের দিকে আহ্বানকারী ভক্তবৃন্দ।

৬. আল-হাওয়া : আল্লাহর হুকুম পালনের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণকারী আল-হাওয়া ওয়ান নাফস্ (প্রবৃত্তি)।

৭. তাক্বলিদে-আবা : কুরআন-সুন্নাহ বাদ দিয়ে যেসকল বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়ে গায়রুল্লাহর ইবাদত করা হয় সেকল বাপ-দাদা ও পূর্বপুরুষরাও তাগূত। যদি তারা এটা পছন্দ করে থাকেন।

প্রথম প্রধান তাগূত : শয়তান

প্রধান প্রধান তাগূতদের সর্ব প্রধান তাগূত হলো গায়রুল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বানকারী শয়তান। যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিজেই ইবাদত নেয়। শয়তান অনেক কারণে তাগূত। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কারণ নিম্নে তুলে ধারা হলো।

ক. সে নিজের ইবাদতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে। যেহেতু শয়তান নিজের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে, সে জন্য আল্লাহ তা'আলা শয়তানের ইবাদত করা থেকে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

'হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদের বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করোনা, কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।' (ইয়াসীন ৩৬: ৬০)

খ. সে গাইরুল্লাহর ইবাদতের দিকে আহ্বান করে। যা মূলত নিজের ইবাদতের দিকেই আহ্বান করা হয় যদিও পরোক্ষভাবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنْفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِخِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'যখন সব কাজের ফায়সালা হয়ে যাবে, তখন শয়তান বলবে- নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের সত্য ওয়াদা দিয়েছিলেন এবং আমি তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছি, অতঃপর তা ভঙ্গ করেছি। তোমাদের ওপর তো আমার কোনো ক্ষমতা ছিল না, কিন্তু এতটুকু যে, আমি তোমাদের ডেকেছি, অতঃপর তোমরা আমার কথা মেনে নিয়েছ। অতএব তোমরা আমাকে ভৎর্সনা করো না এবং নিজেদেরই ভৎর্সনা করো। আমি তোমাদের উদ্ধারে সাহায্যকারী নই এবং তোমরাও আমার উদ্ধারে সাহায্যকারী নও। ইতিপূর্বে

তোমরা আমাকে যে আল্লাহ্র শরীক করেছিলে, আমি তা অস্বীকার করি। নিশ্চয়ই যারা জালেম তাদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (ইব্রাহিম ১৪:২২)

এ আয়াতে দেখা গেলো যে, ইবলিস নিজেই স্বীকার করলো যে, 'আমি তোমাদের দাওয়াত দিয়েছি।

গ. শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয়। শয়তান মানুষের সামনে মিথ্যাকে সজ্জিত-মণ্ডিত করে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে। ফলে সরলমনা মানুষ তার প্রতারণার ফাঁদে পড়ে যায়। প্রথম মানুষ আদম-হাওয়াকে দিয়েই তার মিথ্যা প্রতারণার শুরু। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لا يَبْلَى — فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى

'অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রণা দিল, বললো: হে আদম! আমি কি তোমাকে বলে দিব অনন্তকাল জীবিত থাকার বৃক্ষের কথা এবং অবিনশ্বর রাজত্বের কথা? অতঃপর তারা উভয়েই সে গাছ থেকে খেলো। তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান খুলে গেল এবং তারা জান্নাতের বৃক্ষ-পত্র দ্বারা নিজেদের আবৃত করতে লাগলো। আদম তার রবের হুকুম অমান্য করল; ফলে সে বিভ্রান্ত হল।' (ত্বহা, ২০:১২০-১২১)

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে-

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ

'অনন্তর শয়তান তাদের উভয়কে ওখান থেকে পদস্খলিত করেছিল। পরে তারা যে সুখ-স্বাচ্ছন্দে ছিল তা থেকে তাদের বের করে দিল এবং আমি বললাম, তোমরা নেমে যাও। তোমরা পরস্পর একে অপরের শত্রু হবে এবং তোমাদের সেখানে কিছুকাল অবস্থান করতে হবে ও লাভ সংগ্রহ করতে হবে। (বাক্বারা, ২: ৩৬)

মক্কার আবু জাহ্ল, আবু লাহাবরাও শয়তানের চক্রান্তে পড়েছিলো। বদরের যুদ্ধে যখন আবু জাহ্ল তার সঙ্গীদের নিয়ে পরামর্শে বসলো তখন অনেকেই যুদ্ধ না করে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলো। তখন শয়তান তাদের যুদ্ধ

করার জন্য উৎসাহীত করলো এবং বিষয়টিকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে উপস্থাপন করলো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَى عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ

'আর যখন সুদৃশ্য করে দিল শয়তান তাদের দৃষ্টিতে তাদের কার্যকলাপকে এবং বললো যে, আজকের দিনে কোনো মানুষই তোমাদের ওপর বিজয়ী হতে পারবে না আর আমি হলাম তোমাদের সমর্থক। অতঃপর যখন সামনাসামনি হলো উভয় বাহিনী তখন সে অতি দ্রুত পায়ে পেছনে দিকে পালিয়ে গেল এবং বললো, আমি তোমাদের সাথে না– আমি দেখছি, যা তোমরা দেখছ না; আমি ভয় করি আল্লাহকে। আর আল্লাহর আজাব অত্যন্ত কঠিন। (আনফাল ৮:৪৮)

শয়তান যুগে যুগে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করেছে। পূর্বেকার নবী-রাসুলদের উম্মতদেরও সে অন্যায় কাজকে সুশোভিত করে দেখিয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ — فَلَوْلا إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا تَضَرَّعُوا وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'আর আমি আপনার পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রতিও পয়গম্বর প্রেরণ করেছিলাম। অতঃপর আমি তাদের অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম যাতে তারা কাকুতি মিনতি করে। অতঃপর তাদের কাছে যখন আমার আজাব আসল, তখন কেন কাকুতি-মিনতি করল না? বস্তুত তাদের অন্তর কঠোর হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাছে সুশোভিত করে দেখাল, যে কাজ তারা করছিল।' (আনআম ৬:৪২-৪৩)

এই আয়াতেও দেখা গেলো যে, আগের যুগের উম্মতদেরও শয়তান একই কৌশলে ধোঁকা দিয়েছে। আর সে এটা করবে না কেন? সে তো এ ব্যাপারে আল্লাহর সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لأزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلأغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ — إِلا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ

'সে বললো, 'হে আমার রব! যেহেতু আপনি আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তাই জমিনে আমি তাদের জন্য (পাপকে) শোভিত করব এবং নিশ্চয়ই তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব'। তাদের মধ্য থেকে আপনার একান্ত বান্দারা ছাড়া। (হিজর, ১৬: ৩৯-৪০)

ঘ. শয়তান মানুষের সাথে মিথ্যা ওয়াদা করে, ধোঁকা দেয়, বিভ্রান্ত করে। ইরশাদ হচ্ছে-

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ — ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

'সে (শয়তান) বললো, আপনি আমাকে যেমন উদভ্রান্ত করেছেন, আমিও অবশ্য তাদের জন্যে আপনার সরল পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকবো। এরপর তাদের কাছে আসব তাদের সামনের দিক থেকে, পেছন দিক থেকে, ডান দিক থেকে এবং বাম দিক থেকে। আপনি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবেন না।' (আরাফ ৭: ১৬-১৭)

এ আয়াতে দেখা গেলো যে, শয়তান আল্লাহর সরল পথে ওঁৎ পেতে বসে থাকবে বলে ঘোষণা দিয়েছে এবং চতুর্মুখী হামলা চালাবে। বাস্তবেও তাই দেখা যায়। যদি কোনো ব্যক্তি সরাসরি আল্লাহর পথে চলতে চায় তখন নানার রকম লোকেরা এসে তাকে বোঝায় তুমি এভাবে আল্লাহকে পাবে না। আল্লাহকে পেতে হলে একজন পীর ধরতে হবে যেভাবে জজের কাছে কথা বলতে হলে উকিলের মাধ্যমে বলতে হয়। আবার প্রধানমন্ত্রীর কাছে কোনো আবেদন করতে হলে মন্ত্রী-এমপিদের সুপারিশ লাগে। ঠিক তেমনিভাবে আল্লাহর কাছে কোনো কথা বলতে হলে বা কোনো আবেদন করতে হলে আল্লাহর নেক বান্দাদের মাধ্যমে দোয়া করতে হবে এবং তাদের সুপারিশ লাগবে। নতুবা আল্লাহর কাছে কোনো কিছু গ্রহণযোগ্য হবে না। এভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে বুঝানোর মাধ্যমে একজন পীর ধরিয়ে দেয়। আর পীর তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে পাওয়ার সোজা রাস্তা বাদ দিয়ে চিশতিয়া, কাদরীয়া, নকশা বন্দিয়া, মোজাদ্দেদীয়সহ বিভিন্ন তরিকার সবক দিয়ে থাকে। এভাবেই শয়তান মানুষকে সিরাতে মুস্তাকিম

থেকে সরিয়ে নেয়। এ আয়াতে একটি মজার বিষয় হলো শয়তান বলেছে আমি তার সামনের দিক থেকে, পিছনের দিক থেকে, ডান দিক থেকে, বাম দিক থেকে হামলা চালাবো। কিন্তু উপরের দিকের কথা সে বলে নাই। কেননা যারা সত্যিকারভাবে আল্লাহর বান্দা তাদের প্রতি উপরের দিক থেকে আল্লাহর রহমত বর্ষণ হয়ে থাকে। এ কারণে শয়তান তাদের কোনো প্রকার ক্ষতি করতে পারে না। এ কথাই শয়তান সুরা হিজরের ৪০ নং আয়াতের শেষ অংশে বলে দিয়েছে, 'তবে তাদের মধ্য থেকে আপনার একান্ত বান্দারা ছাড়া।' অর্থাৎ আল্লাহর মুখলিস বান্দাদের প্রতি শয়তানের কোনো কর্তৃত্ব চলবে না। এ কারণে শয়তান সব সময় আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশকে পথভ্রষ্ট করতে চায়। সকলকে নয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-

وَقَالَ لأتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا — وَلأضِلَّنَّهُمْ وَلأمَنِّيَنَّهُمْ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا — يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلا غُرُورًا

'সে (শয়তান) বললো, আমি অবশ্যই তোমার বান্দাদের মধ্য থেকে নির্দিষ্ট অংশ গ্রহণ করব। তাদের পথভ্রষ্ট করব, তাদের আশ্বাস দেব; তাদের পশুদের কর্ণ ছেদন করতে বলব এবং তাদের আল্লাহ্‌র সৃষ্ট আকৃতি পরিবর্তন করতে আদেশ দেব। যে কেউ আল্লাহ্‌কে ছেড়ে শয়তানকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে, সে প্রকাশ্য ক্ষতিতে পতিত হয়। সে তাদের প্রতিশ্রুতি দেয় এবং তাদের আশ্বাস দেয়। শয়তান তাদের যে প্রতিশ্রুতি দেয়, তা সব প্রতারণা ছাড়া কিছুই নয়।' (নিসা ৪:১১৮-১২০)

শয়তান মানুষকে বিভিন্নভাবে মিথ্যা ওয়াদা দেয়। দারিদ্রতার ভয় দেখায়। অন্যায় কাজে উদ্বুদ্ধ করে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

'শয়তান তোমাদের অভাব অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদের নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশি অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ।' (বাকারা ২: ২৬৮)

শয়তানের ভীতি প্রদর্শন করা অথবা আশা প্রদান করায় মুমিনদের কিছু আসে যায় না। কেননা, শয়তানের নিজস্ব কোনো ক্ষমতা নাই। কারো উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা নাই। শুধু শয়তান কেন, দুনিয়ার সমস্ত মানব-দানব, জিন-ইনসান, এমনকি সাত-আসমান ও জমিনবাসী একত্র হয়ে কারো ক্ষতি করার জন্য, তবে সকলে মিলে ততটুকু ক্ষতি করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহর পক্ষ থেকে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। পক্ষান্তরে যদি সাত আসমানবাসী ও জমিনবাসী, জিন-ইনসান, ফেরেশতা ও অন্যান্য মাখলুক একত্র হয় কারো ক্ষতি করার জন্য, তবে সকলে মিলে ততটুকুই ক্ষতি করতে পারবে, যতটুকু আল্লাহর পক্ষ থেকে লিপিবদ্ধ করে রাখা হয়েছে। কাজেই এ ব্যাপারে পূর্ণ ঈমান রয়েছে তাদের কোনো ভয় নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلا تَخَافُوهُمْ وَخَافُون إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

'এরাই হলো শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ভয় দেখায়। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় করো।' (আল ইমরান ৩:১৭৫)

এ আয়াতে পরিষ্কারভাবে দেখা গেলো যে, শয়তান শুধুমাত্র তার বন্ধুদেরই ভয় দেখাতে পারে এবং তাদের পথভ্রষ্ট করতে পারে। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالًا بَعِيدًا

'শয়তান তাদের প্রতারিত করে পথভ্রষ্ট করে ফেলতে চায়।' (নিসা ৪:৬০)

ঙ. শয়তান মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে। ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

'শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?' (মায়েদা ৫:৯১)

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا

'শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।' (বণী ইসরাঈল, ১৭: ৫১)

চ. শয়তান মানুষের শত্রু, আল্লাহর অবাধ্য। ইরশাদ হচ্ছে–

يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا

'হে আমার পিতা, শয়তানের ইবাদত করো না। নিশ্চয়ই শয়তান রহমানের অবাধ্য।' (মারইয়াম ১৯: ৪৪)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে–

إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا

'নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (বণি ইসরাঈল ১৭:৫৩)

একই কথা বলা হয়েছে পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে–

قَالَ يَا بُنَيَّ لا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ

'তিনি বললেন, বৎস! তোমার ভাইদের সামনে এ স্বপ্ন বর্ণনা করো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করবে। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।' (ইউছুফ, ১২: ৫)

শয়তান দুই প্রকার : মানুষ শয়তান এবং জিন শয়তান। ইরশাদ হচ্ছে–

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ — مَلِكِ النَّاسِ — إِلَهِ النَّاسِ — مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ — الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ — مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

'বলো, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের রবের, মানুষের মালিকের, মানুষের ইলাহর। আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট হতে। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে। জিনের মধ্য থেকে এবং মানুষের মধ্য থেকে।' (নাস, ১১৪: ১-৬)

এই সুরার শেষ আয়াতে খান্নাসকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে। জ্বীন খান্নাস ও মানুষ খান্নাস। অনেক ক্ষেত্রে মানুষ শয়তানগুলো জিন শয়তানদের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর হয়ে থাকে। এরাও শয়তানের মতো মিথ্যাকে সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুজিয়ে উপস্থাপন করতে পারে। এ জাতীয় মানব শয়তানদের সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ

'আর এমন কিছু লোক রয়েছে যাদের পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে চমৎকৃত করবে। তারা নিজেদের মনের কথার ব্যাপারে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। প্রকৃতপক্ষে তারা কঠিন ঝগড়াটে লোক। যখন ফিরে যায় তখন তারা অকল্যাণ সৃষ্টির চেষ্টা করে যাতে শস্যক্ষেত্র ও প্রাণনাশ করতে পারে। আল্লাহ্ ফাসাদ ও দাঙ্গা-হাঙ্গামা পছন্দ করেন না।' (বাকারা ২: ২০৪-২০৫)

কাফির মুশরিকদের লিডারকেও শয়তান বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে মুনাফিকদের সম্পর্কে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ

'আবার যখন তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে সাক্ষাৎ করে, তখন বলে, আমরা তোমাদের সাথে রয়েছি। আমরা তো (মুসলমানদের সাথে) উপহাস করি মাত্র।' (বাকারা ২:১৪)

আরবী ভাষায় সীমালঙ্ঘনকারী, দাম্ভিক ও স্বৈরাচারীকে শয়তান বলা হয়। মানুষ ও জিন উভয়ের জন্য এ শব্দটি ব্যবহার করা হয়। কুরআনের অধিকাংশ জায়গায় এ শব্দটি জিনদের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হলেও কোনো কোনো জায়গায় আবার শয়তান প্রকৃতির মানুষদের জন্যও ব্যবহার করা হয়েছে। পূর্বাপর আলোচনার প্রেক্ষাপটে এসব ক্ষেত্রে কোথায় শয়তান শব্দটি জিনদের জন্য এবং কোথায় মানুষদের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে তা সহজেই জানা যায়। তবে আমাদের আলোচ্য স্থানে শয়তান শব্দটিকে বহুবচনে 'শায়াতীন' হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে এবং এখানে 'শায়াতীন' বলতে মুশরিকদের বড় বড় সরদারদের বুঝানো হয়েছে। এ সরদাররা তখন ইসলামের বিরোধিতার ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিচ্ছিল।

জিন শয়তান এবং মানুষ শয়তান তাদের কর্মের কারণে এ শ্রেণীর তাগূতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা-বাতীন (রহ.) বলেন, 'আল্লাহ ব্যতীত সকল মা'বুদ (উপাস্য), সব গোমরাহীর প্রধান, যে বাতিলের দিকে আহবান জানায়, বাতিলকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে এরা সকলেই তাগূতের

অন্তর্ভুক্ত। এর সাথে সাথে গণক, জাদুকর ও কবরবাসীসহ অন্যান্য বস্তুর উপাসনার ক্ষেত্রে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে (কবর, মাজার ইত্যাদির খাদেম) তারাও তাগূতের মধ্যে শামিল।' (মাজমুআতুত্ তাওহীদ ১৭৩/১পৃ:)

জিন শয়তান শ্রেণীর তাগূত

জিন শয়তানদের মধ্যে যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে অথবা অন্যের ইবাদত করতে প্রেরণা জোগায় বরং দৃষ্টির অন্তরাল থেকে নিজেই ইবাদত নেয় তারা তাগূতের অন্তর্ভুক্ত। জিন শয়তানেরা যেভাবে অন্যের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে কিংবা প্রেরণা জোগায়। গণকদের গায়েবের (অদৃশ্য) সংবাদ প্রদানের নামে সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত খবর প্রদান করে যার কারণে মানুষ গণকদের কাছে যায় এমন বিষয় (গায়েব) জানার জন্য যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না ।

শয়তান মানুষকে ধোঁকা দেয়, প্ররোচনা দেয়, মানুষের মনে কুহক জাল সৃষ্টি করে মূর্তি, মাজার, পীর-ফকির, গাছ-পাথর ইত্যাদির জন্য মান্নত, সিজদা, দো'আ এসব ইবাদত করার জন্য এবং দৃষ্টির অন্তরাল থেকে শয়তানই এসব ইবাদত গ্রহণ করছে।

বিভিন্ন চরমপন্থী সুফি (মরমী) বিধানের শাইখরা (সর্দাররা)। তাদের অনেকে দেহকে শূন্যে ভাসাতে, মুহূর্তের মধ্যে বহু দূরত্বে অতিক্রম করতে, শূন্য হতে খাদ্য অথবা অর্থ হাজির করতে পারে বলে মনে হয়। তাদের অজ্ঞ অনুসারীরা ঐ সব জাদুর ভেলকিকে স্বর্গীয় অলৌকিক ঘটনা বলে বিশ্বাস করে। তাদের ওপর মানুষ আল্লাহর ক্ষমতা আরোপ করে, পীরদের জন্য তাদের অর্থ ও জীবন স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে। এই সব ঘটনার পেছনে গোপন এবং অশুভ জিন জগৎ লুকিয়ে রয়েছে।

মানুষ শয়তান শ্রেণীর তাগূত

মানুষদের মধ্য থেকে যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের ইবাদতের আহ্বান জানায়, উৎসাহিত করে তারা এ শ্রেণীর তাগূতের অন্তর্ভূক্ত। এরা হচ্ছে-

সেসব পীর এবং মাজারের খাদেমরা যারা মানুষকে পীর ও মাজারকে সিজদা দিতে, মান্নত করতে, মাজারে প্রার্থনা করতে, ভয় করতে আহ্বান জানায় এবং উৎসাহিত করে, এগুলোকে সুন্দর করে মানুষের সামনে উত্থাপন করে তারা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

সেসব নেতা যারা মানুষকে প্রচলিত গনতান্ত্রিক দলের অন্তর্ভুক্ত হতে এবং প্রার্থীকে নির্বাচিত করার জন্য আহবান জানায়, উৎসাহিত করে, চাপ প্রয়োগ করে, বাধ্য করে তারা এ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। কারণ সে নেতা মানুষকে কুফরির এবং শিরকের দিকে আহবান করে এবং বাধ্য করে। যেহেতু আল্লাহই একমাত্র আইন-বিধান দাতা, সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। সে তার দলের নেতাদের সার্বভৌম ক্ষমতায় বা আইন-বিধান রচনাকারীর আসনে বসাবার জন্য আহ্বান করে, চাপ প্রয়োগ করে প্রকারান্তরে সে তার দলীয় নেতাদের রবের আসনে বসাতে আহ্বান করে এবং চাপ প্রয়োগ করে।

মানুষ শয়তানের অন্তর্ভুক্ত অন্যতম শয়তান ঐ সকল নেতানেত্রী, যারা মানুষকে বিপথগামী করে, কিয়ামত দিবসে মানুষ তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلا ـــ رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا

'তারা আরও বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা আমাদের নেতা ও বড়দের কথা মেনেছিলাম, অতঃপর তারা আমাদের পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের পালনকর্তা! তাদের দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং তাদের মহা অভিসম্পাত করুন।' (আহযাব ৩৩: ৬৭-৬৮)

এখানে প্রশ্ন করা হয় তাগূতের সংজ্ঞায় বলা হয়েছিল–

اَنَّ الطَّاغُوْتَ هُوَ الَّذِىْ يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللهِ

'তাগূত হচ্ছে আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয়। কিন্তু শয়তানের তো কেউ ইবাদত করে না। তাহলে শয়তান তাগূত হল কি করে?

এর উত্তর হলে : কুফর এবং শিরকের ক্ষেত্রে শয়তানের আনুগত্য করাই হচ্ছে তার ইবাদত করা। ইরশাদ হচ্ছে-

أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ

'হে আদম সন্তানগণ! আমি কি তোমাদের বলে রাখিনি যে, শয়তানের ইবাদত করোনা, কেননা, সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন।' (ইয়াসীন ৩৬:৬০)

এ আয়াতে শয়তানের ইবাদত করতে নিষেধ করা হয়েছে। অথচ সরাসরি শয়তানের ইবাদত কেউ করে না। তার জবাব হলো শয়তান যে জিনিসের দিকে আহ্বান করে সেই জিনিসে লিপ্ত হওয়াই শয়তানের ইবাদত ও

আনুগত্যে লিপ্ত হওয়ার শামিল। পবিত্র কুরআনে এ বিষয়টিকে সূক্ষ্মভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلا إِنَاثًا وَإِنْ يَدْعُونَ إِلا شَيْطَانًا مَرِيدًا

'তারা আল্লাহকে পরিত্যাগ করে শুধু নারীর আরাধনা করে এবং শুধু অবাধ্য শয়তানের পূজা করে।' (নিসা, ৪: ১১৭)

এ জন্য মুসলিম জাতির পিতা তাওহীদবাদীদের ইমাম ইব্রাহিম (আ.) স্বীয় পিতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন–

يَا أَبَتِ لا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا

'হে আমার পিতা, শয়তানের ইবাদত করো না। নিশ্চয়ই শয়তান দয়াময়ের অবাধ্য।' (মারইয়াম, ১৯: ৪৪)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে শয়তানের সকল প্রকার কুমন্ত্রণা ও প্রতারণা থেকে বাঁচার তাওফিক দান করুন। আমীন।

দ্বিতীয় প্রধান তাগূত : শাসক

মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সৃষ্টি করেছেন তার আব্দ বা গোলাম হয়ে থাকার জন্য। মনিব বা মালিক হওয়ার জন্য নয়। মানুষের অবস্থান হলো গোলাম আর আল্লাহর শান হলো তিনি মনিব। এই মানুষ যখন নিজের মূল পরিচয় ভুলে গিয়ে দাসত্বের সীমানা অতিক্রম করে মনিবের আসন দখল করে বসে তখনই সে লোকটি তাগূত হিসেবে বিবেচিত হয়। এ জাতীয় তাগূত হওয়ার জন্য সর্বময় ক্ষমতার মালিক দাবি করা জরুরি নয়। বরং বিশেষ কোনো এলাকা বা ভূ-খণ্ডের ক্ষমতার মালিক ও আইন-বিধানদাতা দাবি করলেই সে ঐ অঞ্চলের ইলাহ বা রব হয়ে যায়। যুগে যুগে ফিরআউনরা এ জাতীয় ইলাহ ও রব হওয়ার দাবি করেছিলো। আসমান-জমিন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র পাহাড়-পর্বত সকল কিছুর পরিচালনাকারী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ ও রব হওয়ার দাবি আজ পর্যন্ত কেউ করে নাই। করা সম্ভবও নয়। আর এ জাতীয় দাবি করলে কেউ তাকে সমর্থনও করতো না। বরং পাগল বলে উড়িয়ে দিতো। অথচ ফিরআউন নিজে আল্লাহ বলে দাবি করেছে। একদল তা মেনেও নিয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي

'আর ফিরআউন বললো, 'হে পারিষদবর্গ, আমি ছাড়া তোমাদের কোনো ইলাহ আছে বলে আমি জানি না ।' (কাসাস ২৮:৩৮)

এ আয়াতে সে নিজেকে স্পষ্টভাবে আল্লাহ বলে দাবি করেছে। অপর আয়াতে সে তাকে বাদ দিয়ে অন্য ইলাহ গ্রহণ করলে তাদের কারারুদ্ধ করবে বলে ঘোষণা করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ إِلَهًا غَيْرِي لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

'ফিরআউন বললো, 'যদি তুমি আমাকে ছাড়া কাউকে ইলাহরূপে গ্রহণ করো, তাহলে অবশ্যই আমি তোমাকে কয়েদিদের অন্তর্ভুক্ত করব' ।' (শুয়ারা ২৬:২৯)

এমনিভাবে ফিরআউন নিজেকে 'রব' বলে দাবি করেছিলো। তাও আবার ছোট খাটো রব নয়, প্রধান রব। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে;

فَحَشَرَ فَنَادَى - فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى

'অতঃপর সে লোকদের একত্র করে ঘোষণা দিল। আর বললো, 'আমিই তোমাদের সর্বোচ্চ রব' ।' (নাযিয়াত ৭৯:২৩-২৪)

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে ফিরআউন নিজেকে রব ও ইলাহ বলে যে দাবি করলো এর দ্বারা সর্বময় ক্ষমতার মালিক মহান আল্লাহ ও রব হিসেবে দাবি করে নাই। একথার প্রমাণ হলো ফিরআউন নিজেও বহু দেব-দেবী ও প্রতিমার ইবাদত করতো। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَى وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ

'আর ফিরআউনের কওমের সভাসদরা বললো, 'আপনি কি মূসা ও তার কওমকে ছেড়ে দেবেন যাতে তারা জমিনে ফাসাদ করে এবং আপনাকে ও আপনার উপাস্যগুলোকে বর্জন করে?' (আরাফ ৭:১২৭)

এই আয়াতে দেখা গেলো যে, ফিরআউনের মন্ত্রীবর্গ ফিরআউনকে বললো, 'তোমাকে ও তোমার আলিহাদের বর্জন করবে।' তাহলে ফিরআউনের বহু ইলাহ ছিলো যাদের সে উপাসনা করতো। তাহলে ফিরআউন কি অর্থে নিজেকে ইলাহ ও রব হিসেবে দাবি করলো? এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। এই প্রশ্নের উত্তর পরিষ্কারভাবে বুঝা গেলে বর্তমান যুগের ফিরআউনদের চিনতে সুবিধা হবে। ফিরআউন মূলত নিজেকে মিশরের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করেছিলো। সেই হিসেবে ইলাহ দাবি করেছিলো। আর যেহেতু ক্ষমতার মালিক যিনি আইন-বিধান দেওয়ার অধিকারীও তিনি। সে অর্থে নিজেকে রব বলে ঘোষণা করেছিলো। অর্থাৎ মিশর ভূখণ্ডে কেবলমাত্র তার ক্ষমতা ও রাজত্ব চলবে। সকল ক্ষেত্রে কেবল মাত্র তার হুকুম কার্যকর হবে। তার ক্ষমতা ও আদেশকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ

'আর ফিরআউন তার কওমের মধ্যে ঘোষণা দিয়ে বললো, 'হে আমার কওম! মিশরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এ সব নদ–নদী কি আমার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে না, তোমরা কি দেখছ না?' (যুখরুফ ৪৩:৫১)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, ফিরআউন নিজেকে যে ইলাহ ও রব বলে দাবি করেছিলো সেটা গোটা সৃষ্টির ইলাহ ও রব তো নয়ই বরং গোটা পৃথিবীরও নয়, শুধুমাত্র মিশরের।

বর্তমানে যে সকল শাসকবর্গ নিজেদের কোনো দেশ অথবা এলাকার সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলে দাবি করে। এবং তারা তাদের অধীনস্থ জনগণের জন্য আইন প্রণয়ন করে, প্রয়োজনে আল্লাহর আইনকে বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরি করে তারা সকলেই তাগূত। সে মতে সকল গণতান্ত্রিক দেশের মন্ত্রী-এমপিরা তাগূত। কেননা এসকল দেশের সংবিধানে বলা থাকে সমস্ত ক্ষমতার মালিক জনগণ। আমাদের বাংলাদেশের সংবিধানের ৭/১-এ বলা হয়েছে প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ। জনগণের এই ক্ষমতা ভোটের মাধ্যমে এমপিদের হস্তান্তর করে। এমপিরা ঐ ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে সংসদে গিয়ে নিজেরাই সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক (আল্লাহ) হয়ে যায়। অতঃপর তারা আইন রচনা করে। প্রয়োজনে আল্লাহর আইন বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরি করে। এভাবেই তারা নব্য ফিরআউন হয়ে তাদের নিয়ন্ত্রিত এলাকার ইলাহ ও রবে পরিণত হয়। অথচ পবিত্র কুরআনে কোনো মানুষকে রব ও ইলাহ বানাতে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

'বলো, 'হে কিতাবীরা! তোমরা এমন কথার দিকে এসো, যেটি আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান যে, আমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কারো ইবাদাত না করি। আর তার সাথে কোনো কিছুকে শরীক না করি এবং আমাদের কেউ কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসেবে গ্রহণ না করি'। তারপর যদি তারা বিমুখ হয় তবে বলো, 'তোমরা সাক্ষী থাক যে, নিশ্চয়ই আমরা মুসলিম।' (আল ইমরান ৩:৬৪)

এ আয়াতে বলা হয়েছে আমাদের কেও কাউকে আল্লাহ ছাড়া রব হিসেবে গ্রহণ করবো না। আপনি হয়তো মনে মনে ভাবছেন যে, মানুষ আবার মানুষের রব হয় কি করে? ঠিকইতো, মানুষ আবার মানুষের রব হয় কি করে! কিন্তু বাস্তবে তাই হয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বিরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।' (তাওবাহ্ ৯:৩১)

এ আয়াতে বলা হয়েছে ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরা তাদের পণ্ডিত (নেতানেত্রীদের) এবং সংসার বৈরাগী (পীর-বুযুর্গ) দের আল্লাহর পরিবর্তে রব বানিয়েছিলো। কিন্তু কিভাবে বানালো?

তার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নিম্নের হাদীসটিতে–

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَتَيْتُ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– وَفِي عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ (اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَعْبُدُونَهُمْ قَالَ : أَجَلْ وَلَكِنْ يُحِلُّونَ لَهُمْ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيَسْتَحِلُّونَهُ وَيُحَرِّمُونَ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّ اللَّهُ فَيُحَرِّمُونَهُ فَتِلْكَ عِبَادَتُهُمْ لَهُمْ

'আদী ইবনে হাতেম থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এলাম, তখন আমার গলায় স্বর্ণের ক্রুশ ছিলো। (তিনি আমাকে বললেন, তুমি তোমার গর্দান থেকে এই মূর্তিটি ফেলে দাও, তিরমিযীর বর্ণনায়) ঐ সময় আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে পবিত্র কুরআনের এই বাণী পাঠ করতে শুনলাম– 'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিতগণ ও সংসার-বৈরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে'। আদী ইবনে হাতেম বলেন, 'আমি বললাম, ইয়া রাসুলুল্লাহ! তারা (ইয়াহুদি-খ্রিস্টারা তো তাদের পণ্ডিত ও সংসার বৈরাগীদের ইবাদত করে না। তাহলে তাদের রব বানালো কি করে?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'অবশ্যই তারা তাদের পণ্ডিত ও সংসার বৈরাগীদের রব বানিয়েছে। কেননা তারা যখন আল্লাহর হারামকৃত কোনো কিছুকে হালাল করে দেয় তখন লোকেরা সেটাকে হালাল হিসেবে মেনে নেয়। আবার তারা যদি আল্লাহর হালালকৃত কোনো কিছুকে হারাম করে দেয় তখন তারা ওটাকে হারাম হিসেবে মেনে নেয়। সেক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানের কোনো তোয়াক্কা করে না। এটাই হচ্ছে তাদের ইবাদত বা আনুগত্য। আর আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয় তাকেই তো ইলাহ ও রব বলা হয়।' (বায়হাকী ২০৮৪৭, তিরমিযী ৩০৯৫)

এই আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে ইমাম আলুসী (রহ.) বলেন–

وَالْأَكْثَرُوْنَ مِنَ الْمُفَسِّرِيْنَ قَالُوْا: لَيْسَ الْمُرَادُ مِنَ الْأَرْبَابِ أَنَّهُمْ اعْتَقَدُوْا أَنَّهُمْ آلِهَةُ الْعَالَمِ، بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُمْ أَطَاعُوْهُمْ فِيْ أَوَامِرِهِمْ وَنَوَاهِيْهِمْ

'অধিকাংশ মুফাস্সীরদের বক্তব্য হলো : ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরা তাদের ধর্মীয় নেতা এবং পীর-বুযুর্গদের গোটা সৃষ্টির রব বলে বিশ্বাস করতো না। বরং তারা তাদের নিজ এলাকার সর্বময় ক্ষমতার মালিক এবং আদেশ-নিষেধের মালিক জ্ঞান করতো।' (যিলালিল কুরআন সাইয়েদ কুতুব (রহ.) ৪র্থ খন্ড, ২০ পৃ:)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের আলোকে যেসকল শাসকবর্গ আল্লাহর হারামকৃত সুদকে লাইসেন্স দিয়ে হালাল করে দিয়েছে অথবা আল্লাহর হালালকৃত একজন পুরুষ চারটি স্ত্রী বিয়ে করতে পারবে এই বিধানকে হারাম (নিষেধ) করলো তারা কি ফিরআউনের মতো নিজেরা আল্লাহ ও রবের আসনে বসে নাই? হ্যাঁ অবশ্যই বসেছে।

'লা ইলাহা' বলে এ সকল ইলাহদেরই বর্জন করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। অতঃপর 'ইল্লাল্লাহ'-এর মাধ্যমে শুধুমাত্র আল্লাহকে গ্রহণ করা হয়েছে। এ কারণেই সকল নবী-রাসুলদের মূল দাওয়াত ছিলো 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং এই 'লা ইলাহা ইল্লাহ'র ঘোষণার প্রধান বাধা ছিলো সমকালীন শাসকবর্গ। মূসা (আ.) এর বিরুদ্ধে ফিরআউন বাধার সৃষ্টি করেছিলো। ইব্রাহিম (আ.) এর বিরুদ্ধে নমরূদ, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে আবু জাহ্ল, আবু লাহাব ইত্যাদি। এরা সকলেই ছিলো শাসক। 'লা ইলাহা' বলে সর্বপ্রথম এই শাসক নামক তাগূতের মসনদে আঘাত হানতে হবে। কেননা এরা ভিআইপি তাগূত। অন্যান্য তাগূতগুলো এদের ছত্র-ছায়ায় লালিত-পালিত হয়। এরা সকল প্রকার শির্কের হয়তো উদ্ভাবক, নয়তো সংরক্ষক নতুবা পৃষ্ঠপোষক। যুগে যুগে দুই শ্রেণীর লোকেরা ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেছে– শাসক ও যাজক।

ইসলামের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর দুই শ্রেণীর লোক

প্রথম প্রকার : মানব রচিত আইনে পরিচালিত দেশের শাসক, ধনী ও প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ।

দ্বিতীয় প্রকার : ওলামায়ে 'ছু' (সর্ব নিকৃষ্ট দুনিয়াদার আলেম বা দরবারী আলেম) প্রসিদ্ধ আলেম আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক বলেন:

وَهَلْ بَدَّلَ الدِّيْنَ اِلَّا الْمُلُوْكُ * وَاَحْبَارُ سُوْءٍ وَرُهْبَانُهَا

'যুগে যুগে ইসলামের ধ্বংস ও ক্ষতিসাধন দুই শ্রেণীর লোক ছাড়া অন্য কেউ করেছে কি? এক শ্রেণী হলো শাসক গোষ্ঠী অপর শ্রেণী হলো পণ্ডিত আলেম, ও সংসার বৈরাগী পীর-পুরোহিত।' (কিতাবুল জিহাদ আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক ১ম খন্ড, ২৭ পৃষ্ঠা)

যেকোনো শাসকের জন্য তার নিজস্ব ক্ষমতা ও প্রভাব থাকতে হবে। তার শাসনাধীন নির্দিষ্ট কিছু এলাকা থাকতে হবে। সেই এলাকায় নির্দিষ্ট কিছু জনগণ থাকবে। সেই জনগণের জন্য নির্দিষ্ট আইন-কানুন থাকবে। এগুলো না থাকলে কেউ শাসক হতে পারে না। একজন খলিফাতুল মুসলিমীন বা আমিরুল মুমিনীন এর জন্যও এগুলো থাকতে হবে। তবে মুমিনদের ভৌগলিক সীমানা বলতে কিছু নাই। গোটা পৃথিবীটাই তাদের জন্য একটি ভূ-খণ্ড। সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বলতে শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তা'আলা-কেই মেনে নিতে হবে। সংবিধান হিসেবে আল্লাহর কালাম ও রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সহীহ হাদীস-ই যথেষ্ট। কিন্তু তাগূতী রাষ্ট্রে তা ব্যতিক্রম। আমরা এখন তাগূতী রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদানগুলোকে কুরআন-সুন্নাহর কষ্ঠি পাথরে যাচাই-বাছাই করে দেখতে চাই যে, সেগুলো কুরআন-সুন্নাহ সমর্থন করে না বিরোধিতা করে।

তাগূতী রাষ্ট্রের মৌলিক চার উপাদান

১. সার্বভৌমত্ব ২. সংবিধান ৩. ভৌগলিক সীমারেখা ৪. জনসংখ্যা

যে কোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের জন্য এই চারটি মৌলিক উপাদান অত্যাবশ্যকীয় বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। তারও আছে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব, নিজস্ব সংবিধান, ভৌগলিক সীমারেখা ও নির্দিষ্ট জনসংখ্যা। আমরা এখন প্রতিটি বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো ইনশা-আল্লাহ।

তাগূতী রাষ্ট্রের প্রথম মৌলিক উপাদান : সার্বভৌমত্ব

তাগূতী রাষ্ট্রে সাংবিধানিকভাবে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক জণগণ। সংবিধান কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে তারা ভোটদান করে সংসদ সদস্য নির্বাচন করে। এভাবে ভোটের মাধ্যমে গোটা দেশের জণগণের ক্ষমতা নির্দিষ্ট সংখ্যক সংসদ সদস্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। অতঃপর সংসদ সদস্যগণ জণগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক বনে যান। এভাবেই সংসদ গোটা দেশের ক্ষমতার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হয়। বাংলাদেশ সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭এর ১ এ বলা হয়েছে: 'প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ এবং জনগণের পক্ষে এই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে।'

ইসলামের দৃষ্টিতে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কেবল মাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জনগণ নয়। জনগণকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যতটুকু ক্ষমতা দান করেন ততটুকুই তারা ব্যবহার করতে পারে। তাও আবার যেকোনো সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ছিনিয়ে নিতে পারেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

বলো, 'হে আল্লাহ, সকল ক্ষমতার মালিক, আপনি যাকে চান ক্ষমতা দান করেন, আর যার থেকে চান রাজত্ব কেড়ে নেন এবং আপনি যাকে চান সম্মান দান করেন। আর যাকে চান অপমানিত করেন, আপনার হাতেই কল্যাণ। নিশ্চয়ই আপনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান'। (আল ইমরান, ৩:২৬)

পবিত্র কুরআনের আরো একটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

বরকতময় তিনি যার হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব (ক্ষমতা)। আর তিনি সব কিছুর ওপর সর্বশক্তিমান। (মূলক, ৬৭:১)

এ আয়াত দুটো থেকে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকল ক্ষমতা ও সর্বময় কর্তৃত্বের একমাত্র মালিক। তিনি স্রষ্টা, বাকি সকলেই সৃষ্টি। সৃষ্টিকুলের সকল কিছুই স্রষ্টার অধীনে। আর যারা কারো অধীনে থাকে তারা সর্বময় ক্ষমতার মালিক হতে পারে না। বিষয়টি আরো ভালোভাবে জানতে হলে সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ কি? সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে কী কী বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে তা জানা আবশ্যক।

সার্বভৌম ক্ষমতার অর্থ কী?

রাষ্ট্র বিজ্ঞানীগণ সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যা বলেছেন তা নিম্নরূপ–

ক. অষ্টিনের মতে, 'চূড়ান্ত' 'চরম' 'অসীম' 'অবাধ' 'অবিভাজ্য' 'হস্তান্তর যোগ্যহীন' 'শাস্তি প্রয়োগে পূর্ণ ক্ষমতাবান' এরূপ ক্ষমতা।

খ. গ্রাটিয়াসের মতে, সার্বভৌম হল, 'চূড়ান্ত রাজনৈতিক ক্ষমতা।'

গ. বার্জেসের মতে 'মৌলিক' 'চরম' ও 'অসীম' ক্ষমতা।

ঘ. টমাস হবস-এর মতে, 'চরম' 'অবিভাজ্য' 'হস্তান্তরবিহীন' ক্ষমতা।

ঙ. রুশোর মতে, 'চরম' 'অবিভাজ্য' 'হস্তান্তরযোগ্যহীন' 'ঐক্যবদ্ধ' 'স্থায়ী' ক্ষমতা।

চ. জাঁ-বোদার মতে, 'সার্বভৌম ক্ষমতা 'চূড়ান্ত' ও 'চিরন্তন' ক্ষমতা, কোনোভাবেই আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়।

এরূপ সার্বভৌম ক্ষমতা 'বাস্তবেই আছে কিনা, থাকলে এই ক্ষমতা কার বা কিসের, সেই তর্কে না গিয়েও আপাতত এ কথা অধিকতর যুক্তিসঙ্গতভাবে বলা সম্ভব যে, 'সার্বজনীন, দেশ-কাল-বর্ণ নিরপেক্ষ সকলের সকল স্থানের সকল মানুষের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সহজাত কল্যাণমুখী গুণাবলীর ক্রমাগত বিকাশ সাধনের আইন কেবল উল্লিখিত গুণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কিংবা তার চাইতে উচ্চতর ও মহান গুণাবলী সংবলিত সার্বভৌম ক্ষমতার পক্ষেই সম্ভব।

সার্বভৌমত্বের কমান্ড বা আদেশই হচ্ছে আইন

ক্ষমতা না থাকলে আদেশ দেয়া যায় না। মনে করুন একটি বিশাল কারখানায় লক্ষাধিক কর্মকর্তা-কর্মচারী রয়েছে। তারা মালিকের কেবল নাম শুনেছে, চেহারায় চিনে না। কোনো এক দিন মালিক তার কারখানায় গিয়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন নির্দেশ দিতে লাগলো। কিন্তু কেউই তার কথায় কর্ণপাত করলো না। বরং সকলেই তাকে পাগল বলে উড়িয়ে দিলো। ইতিমধ্যে কারখানার ম্যানেজার এসে সকলের সামনে মালিকের পরিচয় দিলো। সঙ্গে সঙ্গেই সকলে তার কথার গুরুত্ব দিলো এবং যেসকল নির্দেশ দিয়েছিলো সেগুলো সকলেই বাস্তবায়ন করতে লেগে গেলো। বুঝা গেলো ক্ষমতা না থাকলে নির্দেশ দেওয়ার অধিকার থাকে না। আর ক্ষমতার মালিক হওয়ার পর যদি কোনো আদেশ করে সেটাই আইন। এ কারণে বিরাট সংখ্যক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী আইনের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে কিংবা স্বরূপ চিহ্নিত করতে গিয়ে বলেছেন, **'সার্বভৌম-এর আদেশই আইন'** (অস্টিন); **'সার্বভৌমত্বের দায়িত্ব হলো আইন প্রণয়ন করা'** (জ্যাঁ বোদা)। বস্তুত সহজাত বিবেকের রায়ও তাই যে, আইনকে নিরপেক্ষ হতে হলে ব্যক্তি, গোষ্ঠী, বর্ণ, স্থান, কাল-এর ঊর্ধ্বে উঠতে হলে, দুটি শর্ত পূরণ প্রয়োজন।

প্রথমত : আইন প্রণয়নকারী সংস্থা বা সত্তা এবং আইন পালনকারী বা অনুসারী বলে দুটি ভিন্ন গোষ্ঠীর ধারণা।

দ্বিতীয়ত : আইন পালনকারী সংস্থা বা সত্তার চাইতে আইন প্রণয়নকারী সংস্থা বা সত্তার শ্রেষ্ঠত্ব সবদিক দিয়ে প্রমাণিত হতে হবে।

আইন প্রণয়নকারী এবং আইন পালনকারী যদি একই মর্যাদার একই ক্ষমতার ধরে নেয়া হয় তাহলে যারা প্রণয়ন করবে তারা তাদের স্বার্থের

ঊর্ধ্বে উঠতে অপারগ হতে বাধ্য। অপরদিকে সকলে মিলে একত্রে সকলের সমান স্বার্থ সংরক্ষণ করে কোথাও কোনো আইন প্রণয়ন প্রায় অবাস্তব ধারণার শামিল। এমতাবস্থায় যুক্তির খাতিরে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাধর, অপেক্ষাকৃত মর্যাদাবান, অপেক্ষাকৃত শ্রেষ্ঠ আইন প্রণয়নকারী সংস্থার বিমূর্ত ধারণাই হলো সার্বভৌমত্বের ধারণা। এরূপ ধারণার প্রেক্ষিতে সার্বভৌমের আদেশই আইন বা সার্বভৌমের দায়িত্ব হলো আইন প্রণয়ন।

আমাদের বিবেচনায় উল্লিখিত আইন-প্রণয়নে সক্ষম হওয়ার জন্য সার্বভৌম ক্ষমতার আরও কিছু অত্যাবশ্যকীয় গুণের দরকার। যেমন :

ক. সেই 'সার্বভৌম ক্ষমতাকে' অবশ্যই 'সর্বজ্ঞ' হতে হবে। অর্থাৎ সার্বভৌম ক্ষমতাকে সকলের সার্বিক প্রয়োজন ও স্বার্থকে তার স্থান-কাল-বয়সের আলোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানতে হবে। এসব স্বার্থ ও প্রয়োজন পূরণের সকল সামগ্রী প্রয়োজনানুপাতে সদা সর্বদা সরবরাহ করতে সক্ষম হতে হবে।

খ. স্থান-কাল-পাত্রসহ বস্তুনিচয়ের সৃষ্টি, বিকাশ, পরিচালন, সংরক্ষণ, ধ্বংস-লয় ইত্যাদি সকল ব্যাপারে ক্ষমতাবান হতে হবে। কিন্তু নিজে এসবের দ্বারা কোনোভাবেই প্রভাবিত হবে না এবং এসবের কোনো কিছুর প্রয়োজন তার হবে না। অর্থাৎ সার্বভৌম হবে অমুখাপেক্ষী।

গ. সেই সত্তার অবশ্যই কোনো দোষ-ত্রুটি থাকবেনা এবং কোনো প্রকার দুর্বলতা তাকে স্পর্শ করবে না।

ঘ. তিনি সর্বাবস্থায় সকলের ওপর পূর্ণ ক্ষমতাবান থাকবেন।

ঙ. আইন প্রণয়নই শুধু নয়, বরং প্রণীত আইন পুঙ্খানুপুঙ্খানুরূপে পালিত হচ্ছে কিনা তার তদারক করার ক্ষমতা, পালিত না হলে তার জওয়াবদিহি গ্রহণের ক্ষমতা, এ সব ক্ষেত্রে কার শিথিলতা, গোঁড়ামী, অবহেলা, অবাধ্যতা কতখানি তার বিচার ব্যবস্থার জন্য মানব বংশের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকলকে একত্রে এক ময়দানে একই সময়ে হাজির করার ক্ষমতার উল্লিখিত সার্বভৌম ক্ষমতার থাকতে হবে।

চ. অপরদিকে যারা যতখানি নিষ্ঠার সাথে আন্তরিকতার সাথে প্রণীত আইনের কম-বেশি, ক্ষুদ্র-বৃহৎ অংশ পালন করেছে তাদের প্রচেষ্টা ঐকান্তিকতা একনিষ্ঠতার আলোকে তাদের যথাযথ পুরস্কার দিতেও

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে সক্ষম হতে হবে। এ ছাড়া আরও অনেক বৈশিষ্ট্য আছে যা আমরা এ মুহূর্তে উল্লেখ করা থেকে বিরত থাকলাম।

'বস্তুত ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস কোরআন-সুন্নাহ ও আধুনিক রাষ্ট্র বিজ্ঞানীদের কল্পিত সার্বভৌম ক্ষমতার বৈশিষ্ট্যের কোনোটাকেই বাদ না দিয়ে বরং তার সাথে আমরা ক-থেকে চ পর্যন্ত যে ছয় ধরনের ক্ষমতার কথা উল্লেখ করেছি তাকেও যোগ করে সে অনুযায়ী সার্বভৌম ক্ষমতার গুণাবলী কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার মধ্যেই পাওয়া যায় এবং আল্লাহ পাককেই সেই সার্বভৌম ক্ষমতার একচ্ছত্র চূড়ান্ত অধিকারী বলে ঘোষণা করা যায়। ইহাই ইসলামের তাওহীদ বা একত্ববাদের মূল ও মর্মকথা।'

সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা

এতক্ষণ আমরা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে হলে কি কি গুণও বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে হবে সে আলোচনা করলাম। ঐ সকল গুনাবলী কোনো মানুষের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। কেননা কোনো মানুষ চিরস্থায়ী ক্ষমতার অধিকারী নয়। কোনো মানুষ নিরঙ্কুশ ক্ষমতার মালিক নয়। কোনো মানুষ অবিভাজ্য ক্ষমতার মালিক নয়। কোনো মানুষ হস্তান্তরযোগ্যহীন ক্ষমতার অধিকারী নয়। কোনো মানুষ জবাবদিহীতার ঊর্দ্ধে নয়। কোনো মানুষ সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ নয়। কোনো মানুষ সম্পূর্ণরূপে অমুখাপেক্ষী নয়। তাই মানুষের পক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার অধীকারী হওয়া সম্ভব নয়। কোনো মানুষ একই সাথে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের জ্ঞানের অধিকারী নয়। বরং এই গুণগুলি পাওয়া যায় কেবল মাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এর মধ্যে। অতএব, তিনিই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক এবং তিনিই আইন-বিধান দেওয়ার অধিকারী।

ইসলাম আল্লাহ পাকের যে সব গুণ বৈশিষ্ট্যের কথা ঘোষণা করে তা নিম্নরূপ :

১. তিনি অনাদি-অনন্ত, তিনি প্রকাশ্য, তিনিই গোপন, (অর্থাৎ তাঁর উপস্থিতির নিদর্শন, প্রমাণ সর্বাধিক এবং সর্বত্র বিরাজিত। অপরদিকে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে তাঁকে এ যাবৎ কেউ কখনও অনুভব করেনি এবং তিনি সর্ব বিষয়ে অভিজ্ঞ। এর প্রমাণ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

'তিনিই প্রথম ও শেষ এবং প্রকাশ্য ও গোপন; আর তিনি সকল বিষয়ে সম্যক অবগত।' (হাদীদ ৫৭:৩)

২. তিনি এক, একক, অদ্বিতীয়, তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি। এবং কাউকে জন্ম দেননি। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন–

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

'বলুন, তিনি আল্লাহ্, এক। আল্লাহ্ অমুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং কেউ তাকে জন্ম দেয়নি এবং তার সমতুল্য কেউ নেই।' (ইখলাস ১১২:১-৪)

৩. তার সমতুল্য কেউ নেই।

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

'কোনো কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি সব শুনেন, সব দেখেন। (শুরা ৪২:১১)

৪. তার কোনো শরীক নেই। তার ক্ষমতা অবিভাজ্য।

لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ

'তার কোনো অংশীদার নেই।' (ফোরকান ২৫:২)

৫. তিনি সকল প্রকার দোষ ত্রুটি মুক্ত।

فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ

'তারা যা বলে তা থেকে আল্লাহ্ পবিত্র।' (আম্বিয়া, ২১:২২; মুমিনুন ২৩:৯১; সাফফাত ৩৭:১৫৯)

আয়াতুল কুরসীতে সার্বভৌমত্বের পরিচয় :

সার্বভৌম ক্ষমতার জন্য যে সকল গুণের আবশ্যক তার গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলি আয়াতুল কুরসীতে উল্লেখ করা হয়েছে–

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর জন্যই আসমানসমূহে যা

রয়েছে তা এবং জমিনে যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও জমিন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু'টোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান।' (বাকারা ২:২৫৫)

এ আয়াতে প্রথমেই বলা হয়েছে اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ 'আল্লাহ তিনি ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই'। এটি সার্বভৌমত্বের দাবি। পরবর্তী অংশগুলোতে সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য সমূহ উল্লেখ করা হয়েছে।

الْحَيُّ الْقَيُّومُ 'তিনি চিরঞ্জীব, চিরস্থায়ী।' অনন্ত-অসীম সত্তা, সৃষ্টির তত্ত্বাবধান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যে সত্তা অনাদি ও অনন্তকালব্যাপী বিরাজমান, আপন সত্তার জন্য যিনি কারও মুখাপেক্ষী নন, অথচ সর্ব সত্তার তিনি ধারক তাকেই কাইয়্যুম বলে।

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে অবশ্যই এ দুটো গুণের অধিকারী হতে হবে। নতুবা প্রথম গুণটির অবর্তমানে তাকে মৃত্যুর কাছে হার মানতে হবে। আর দ্বিতীয় গুণটির অবর্তমানে তাকে ক্ষমতা হারাতে হবে এবং অন্যের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে যা সার্বভৌমত্বের পরিপন্থী।

لا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ 'তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করেনা।'

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে অবশ্যই তন্দ্রা ও নিদ্রা মুক্ত হতে হবে কেননা এগুলো দুর্বলতার পরিচয়। শারীরিক মানসিক দুর্বলতা দূর করার জন্যই ঘুমের প্রয়োজন হয়। সার্বভৌম ক্ষমতার অধিপতিকে যদি তন্দ্রা অথবা নিদ্রা স্পর্শ করে তবে তার এই দুর্বল মুহূর্তে তাঁর আইন পালিত বা রক্ষিত হচ্ছে কিনা অথবা কোথাও কোনো ত্রুটি হচ্ছে কিনা সে সম্পর্কে সার্বভৌম ক্ষমতা গাফেল হতে বাধ্য হবে। এমন দোষ-ত্রুটি বা এরূপ অসংখ্য অগণিত দোষ-ত্রুটি যা সমগ্র মানুষ কল্পনা করতে পারে তার থেকে তিনি মহান আল্লাহ একেবারেই মুক্ত।)

لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ 'আসমান সমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে সমস্তই তাঁর।'

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে অবশ্যই নিরঙ্কুশ মালিকানার অধিকারী হতে হবে। সে কারণেই বলা হয়েছে 'যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীতে আমাদের দৃষ্টিগোচর হয় কিংবা আমাদের অনুভূতির জগতে বিদ্যমান সে সবের একচ্ছত্র মালিক অধিপতি এই আল্লাহ। এমনকি যা আমাদের ধারণা কল্পনা অনুভূতির অগম্য তারও মালিক তিনি।' এরূপ নিরঙ্কুশ মালিকানার অধিকারী না হলে যে অংশটি অন্য মালিকের মালিকানায় অথবা স্বাধীন সে অংশটি অবশ্যই তার ক্ষমতার বাইরে থেকে যাবে। আর সে ক্ষেত্রে তার সার্বভৌমত্ব থাকবে না।

مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْـدَهُ إِلا بِإِذْنِـهِ 'কে সে, যে তার অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করবে?'

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে এত প্রভাবশালী হতে হবে যে, তার কাছে সুপারিশ করতে হলেও পূর্ব অনুমতির প্রয়োজন হবে। তিনি এমন চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী যে, তাঁর নিকট সুপারিশ করতে হলেও সুপারিশকারীকে কার ব্যাপারে কি সুপারিশ, কতখানি সুপারিশ করা হবে তার যেমন অনুমোদন নিতে হবে তেমনি সুপারিশকারীর নিজের সুপারিশ করার যোগ্যতা সম্পর্কেও পূর্ব অনুমোদন আবশ্যক। আর এই বৈশিষ্ট্য কেবল মাত্র মহান আল্লাহর ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়।

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

'তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত।'

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে অবশ্যই অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সব কিছুর সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে। তাকে এমন সর্বজ্ঞাত, অবহিত হতে হবে যে, শুধু ঘটনা নয়, ঘটনার আগ-পিছসহ পরিপূর্ণ পরম্পরা তাঁর নখদর্পণে থাকতে হবে। সত্যিই এমন ক্ষমতার অনুপস্থিতিতে সার্বভৌম হওয়া অসম্ভব। আর এই বৈশিষ্ট্য আল্লাহ ছাড়া কারো মধ্যে নেই। মানুষ অতীতকে ভুলে যায়, বর্তমানকে বুঝে না, ভবিষ্যৎকে জানে না। এরকম অজ্ঞ লোক সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। ইরশাদ হচ্ছে–

وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ

'তিনি (মহান আল্লাহ) যা ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে অক্ষম।'

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন রাখা ও সংরক্ষণ করার ক্ষমতা থাকতে হবে। নতুবা লোকেরা তার সকল গোপন তথ্য ফাঁস করে দিবে। আর এই গুণ কেবল মাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মধ্যেই বিদ্যমান। কেউ তার ইলম ও জ্ঞান থেকে কোনো কিছু চুরি করার বা ফাঁস করার ক্ষমতা রাখে না। বরং তিনি যাকে যতটুকু তথ্য সরবরাহ করেন সে ততটুকু তথ্য জানতে পারে।

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

'তাঁর আরশ (আসন, অবস্থান) আকাশ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত।'

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। সবকিছু তার নখদর্পে থাকতে হবে। যাতে কেউ বিদ্রোহ করতে না পারে অথবা গোপনে কোনো চক্রান্ত বা ষড়যন্ত্র করতে না পারে। আর এই গুণ কেবল মাত্র মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার মধ্যেই বিদ্যমান। আসমান ও জমিনে কোথাও কোনো বিন্দুমাত্র স্থান নেই এবং কালের স্রোতে এমন কোনো কাল নেই যেখানে যে সময়ে তাঁর মহামহিম উপস্থিতির অভাব অনুভূত হয়েছে কিংবা হবে। বস্তুত এমন সর্ব ব্যাপক সার্বভৌম সত্তার বর্ণনাই আল্লাহ পাক কোরআনে আমাদের জানাচ্ছেন। ইরশাদ হচ্ছে–

وَلا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا

'এতদুভয় (আসমান ও জমিনের সকলের) রক্ষণাবেক্ষণে তিনি শ্রান্ত-ক্লান্ত হন না।'

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে শ্রান্তি-ক্লান্তি-অবসাদ-জড়তা ইত্যাকার দোষ-ত্রুটির ঊর্ধ্বে হতে হবে। নতুবা সার্বভৌম সত্তার এসব দোষ-ত্রুটি থাকলে তাঁর এই দুর্বল মুহূর্তে সৃষ্টির রক্ষণাবেক্ষণ, প্রতিপালন, বিকাশ সব কিছুই বিপর্যস্ত হতে বাধ্য। আর এ বিশেষ গুণটিও কেবল মাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-র মধ্যেই বিদ্যমান। মানুষ একটু বেশি পরিশ্রম করলেই ক্লান্ত-শ্রান্ত ও ঘর্মাক্ত হয়ে যায়। আবার কারো হার্ট এট্যাক করে।

وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ 'তিনিই মহান, তিনিই শ্রেষ্ঠ।'

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে অবশ্যই সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোচ্চ হতে হবে। আর এই গুণ দু'টিও মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এর মধ্যেই পাওয়া যায়। অন্য কারো মধ্যে নয়।

এখানে على এবং عظيم শব্দের পূর্বে ال ব্যবহার করার কারণে এর পরিপূর্ণ ভাবার্থ হলো একমাত্র তিনিই সর্বোচ্চ এবং একমাত্র তিনিই শ্রেষ্ঠ এবং এ ব্যাপারেও তাঁর কোনো তুলনীয় বা অংশীদার নেই। এ পর্যন্ত আয়াতুল কুরসীর মাধ্যমে সার্বভৌমত্বের অধিকারী হওয়ার জন্য আবশ্যক গুণাবলী উল্লেখ করা হলো। সর্বশেষ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ 'আর তিনিই তাঁর বান্দাদের ওপর ক্ষমতাবান; আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত।' (আনআম, ৬:১৮)

অর্থাৎ তাঁর ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে এমন কেউ কোথাও কখনও নেই, ছিল না এবং হবেও না। এ আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ 'তিনি প্রজ্ঞাময় এবং সর্বজ্ঞাত।'

এখানেও خَبِيْرٌ ও حَكِيْمٌ শব্দ اَلْ যোগে আসায় তার অর্থ হচ্ছে একমাত্র তিনিই প্রজ্ঞাময় এবং একমাত্র তিনিই সর্বজ্ঞাতা। এ ব্যাপারেও কারও কোনো অংশ নেই। তিনি সকলের জওয়াবদিহীতা করতে পারেন, অথচ তাঁকে জিজ্ঞাসা করার কেউ নেই, তিনি সকলকে পাকড়াও করতে পারেন, শাস্তি দিতে পারেন, পুরস্কৃত করতে পারেন। অর্থাৎ সর্ববিষয়েই তিনি পূর্ণ ক্ষমতাবান। আর এই ক্ষমতার ব্যবহার তিনি পূর্ণ বিচক্ষণতা সহকারে ন্যায়ানুগভাবে করেন।

আইন অমান্যকারীদের পাকড়াও করা, যথাযথ শাস্তি দেয়ার পূর্ণাঙ্গ ক্ষমতা এ গুণটিও কেবল মাত্র আল্লাহর মধ্যেই পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'বলুন ইয়া আল্লাহ! তুমিই সার্বভৌম শক্তির অধিকারী। তুমি যাকে ইচ্ছা ক্ষমতা দান করো এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা ক্ষমতা ছিনিয়ে নাও এবং যাকে ইচ্ছা সম্মান দান করো আর যাকে ইচ্ছা অপমানে পতিত করো। তোমারই হাতে রয়েছে যাবতীয় কল্যাণ। নিশ্চয়ই তুমি সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাশীল।' (আলে ইমরান- ৩ : ২৬)

অন্য আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'পূণ্যময় তিনি, যাঁর হাতে ক্ষমতা। তিনি সবকিছুর ওপর সর্বশক্তিমান।' (মুলক ৬৭ : ১)

এ আয়াত দুটো থেকে জানা গেলো যে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সকল কিছুর নিয়ন্ত্রক। তাঁর হাত থেকে কেউ রক্ষা পাবে না। কেউ অন্যায় করলে তাকে পাকড়াও করতে সক্ষম। তার দৃষ্টি থেকে পালানো বা আত্মগোপন করা সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

'আর তিনিই রাতে তোমাদের মৃত্যু দেন এবং দিনে তোমরা যা কামাই করো তিনি তা জানেন। তারপর তিনি তোমাদের দিনে পুনরায় জাগিয়ে তুলেন, যাতে নির্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ করা হয়। তারপর তাঁর দিকেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তারপর তোমরা যা করতে তিনি তোমাদের সে বিষয়ে অবহিত করবেন।' (আনআম, ৬:৬০)

তিনি আরো ইরশাদ করেছেন–

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لا يُفَرِّطُونَ

'আর তিনিই নিজ বান্দাদের ওপর ক্ষমতাবান এবং তোমাদের ওপর প্রেরণ করেন হিফাযতকারীদের। অবশেষে যখন তোমাদের কারো কাছে মৃত্যু আসে, আমার প্রেরিত দূতগণ তার মৃত্যু ঘটায়। আর তারা কোনো ত্রুটি করে না।' (আনআম, ৬:৬১)

পরবর্তী আয়াতে তিনি আরো বলেন–

ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلاهُمُ الْحَقِّ أَلا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ

'তারপর তাদের প্রত্যাবর্তিত করা হয় তাদের সত্য মাওলা আল্লাহর কাছে। সাবধান! হুকুম প্রাদানের ক্ষমতা তাঁরই। আর তিনি হচ্ছেন খুব দ্রুত হিসাবকারী।' (আনআম, ৬:৬২)

সুরা হাশরের শেষের তিন আয়াতে সার্বভৌমত্বের পরিচয় :

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীকে যেসকল বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীর অধিকারী হতে হবে তার কিছু আলোচনা আয়াতুল কুরসী ও অন্যান্য আয়াতের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। এখন আমরা সুরা হাশরের শেষের তিন আয়াতের দিকে মনোনীবেশ করবো। সেখানেও সার্বভৌম সত্তার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ – هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ – هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই; দৃশ্য-অদৃশ্যের জ্ঞাতা; তিনিই পরম করুণাময়, দয়ালু। তিনিই আল্লাহ; যিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই, তিনিই বাদশাহ, মহাপবিত্র, ক্রুটিমুক্ত, নিরাপত্তাদানকারী, রক্ষক, মহাপরাক্রমশালী, মহাপ্রতাপশালী, অতীব মহিমান্বিত, তারা যা শরীক করে তা হতে পবিত্র মহান। তিনিই আল্লাহ, স্রষ্টা, উদ্ভাবনকর্তা, আকৃতিদানকারী; তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ; আসমান ও জমিনে যা আছে সবই তার মহিমা ঘোষণা করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (হাশর, ৫৯:২২-২৪)

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ

'তিনিই আল্লাহ্ তিনি ব্যতিত কোনো ইলাহ (উপাস্য, আরাধ্য, স্তুতি পাওয়ার যোগ্য, আইনদাতা, শাসনদাতা) নেই।'

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ

তিনিই অধিপতি, তিনি পবিত্র, তিনিই শান্তি।

الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ

'তিনিই নিরাপত্তা বিধায়ক, তিনিই রক্ষক। তিনিই একমাত্র পরাক্রমশালী, তিনিই একমাত্র প্রবল, তিনিই একাই অতীব মহিমান্বিত।'

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

'তারা (ভ্রমবশত) তাঁর সাথে যে বা যাদের অংশীদার সাব্যস্ত করে মহান মহিমান্বিত আল্লাহ তার বা তাদের থেকে অতীব পবিত্র।'

هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ

'তিনিই আল্লাহ সৃজনকর্তা (অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়নকারী সত্তা), উদ্ভাবনকর্তা ও (পরিপূর্ণ) রূপদাতা।'

অর্থাৎ যে সবের কোনো প্রকার অস্তিত্বই ছিলনা তা সবের পরিকল্পনাকারী, রূপদাতা, অস্তিত্বে আনয়নকারী মহান নিপুণ ক্রুটিহীন সত্তা তিনিই আল্লাহ।

لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى

'সকল উত্তম নাম তাঁরই'

অর্থাৎ তাঁর নামগুলো, তাঁর গুণাবলী যথাযথ, পরিপূর্ণ সর্বাধিক সৌন্দর্যমণ্ডিত।

يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

'আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছুই আছে, সমস্তই তাঁর পবিত্রতা তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে।'

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

'এবং তিনিই পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।'

তিনি আরও বলেন –

وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا

'সকল কিছু তিনি সৃষ্টি করেছেন অতঃপর সকল কিছুর যথাযথ পরিমাণ এবং নিয়ম-বিধান তিনি নির্ধারণ করে দিয়েছেন।' (তাঁর নির্ধারিত পরিমাণ ও পরিমাপের বাইরে যাওয়ার সাধ্য কারও নেই।) (ফোরকান, ২৫: ২)

هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

'আল্লাহ ছাড়া এমন স্রষ্টা কি আছেন, যিনি আসমান ও জমিন থেকে তোমাদের রিজিক (তথা যাবতীয় প্রয়োজন পূরণ) এর ব্যবস্থা করেন।' (ফাতির ৩৫:৩) এতদসত্বেও তিনি বলেন–

إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ ــ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ــ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ

'তিনিই অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরাবর্তন ঘটান। তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়; আরশের অধিকারী ও সম্মানিত। তিনি যা ইচ্ছা তাই করেন। (অর্থাৎ তাঁর ইচ্ছার বাধা হওয়ার সাধ্য কারও কষ্মিনকালেও নেই বা থাকতে পারে না।)

সুরা ফাতিহাতে সার্বভৌমত্বের পরিচয় :

رَبُّ الْعَالَمِينَ 'তিনি জগতসমূহের প্রতিপালক'

الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ 'অতীব দয়ালু ও করুণাময় এবং'

مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ 'শেষ বিচার দিনের অধিপতি ।'

বস্তুত সার্বভৌম ক্ষমতা সম্পর্কে পৃথিবীর সকল জ্ঞানীরা যতগুলো গুণ বৈশিষ্ট্য কল্পনা করতে পেরেছেন তার চাইতে অনেক বেশি বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলীতে আল্লাহর স্বীয় সত্তা মহিমান্বিত । তাঁর গুণাবলী যে বর্ণনা করে শেষ করা যায় না তার বর্ণনাও তিনি আমাদের জানাচ্ছেন পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে–

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

'বলো, 'আমার রবের কথা লেখার জন্য সমুদ্র যদি কালি হয়ে যায় তবে সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আমার রবের কথা শেষ হওয়ার আগেই । যদিও এর সাহায্যার্থে অনুরূপ আরো সমুদ্র নিয়ে আসি ।' (কাহাফ, ১৮:১০৯)

আরেকটি আয়াতে অনুরূপ ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'আর জমিনে যত গাছ আছে তা যদি কলম হয়, আর সমুদ্র (হয় কালি), তার সাথে কালিতে পরিণত হয় আরো সাত সমুদ্র, তবুও আল্লাহর বাণীসমূহ শেষ হবে না । নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।' (লোকমান ৩১:২৭)

আমরা পবিত্র কালামে পাক থেকে অল্প কয়টা মাত্র উদ্ধৃতির মাধ্যমে সার্বভৌমত্বের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করলাম, পবিত্র কোরআনে এরূপ আরও শত শত বর্ণনা রয়েছে ।

উপরোক্ত গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের অধিকারীই সার্বভৌমত্ব ও সকল ক্ষমতার একমাত্র মালিক আল্লাহ এবং তিনিই একমাত্র আইন-বিধানদাতা রব ।

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

'বিধান একমাত্র আল্লাহরই । তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, 'তাঁকে ছাড়া আর করো ইবাদাত করো না' । এটিই সঠিক দ্বীন, কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না' । (ইউসুফ ১২:৪০)

ذَلِكُمْ بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ

'এটা তো এজন্য যে, যখন আল্লাহকে এককভাবে ডাকা হত তখন তোমরা তাঁকে অস্বীকার করতে আর যখন তাঁর সাথে শরীক করা হত তখন তোমরা বিশ্বাস করতে । সুতরাং যাবতীয় কর্তৃত্ব সমুচ্চ, মহান আল্লাহর ।' (গাফির ৪০:১২)

وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ

আর যে কোনো বিষয়েই তোমরা মতবিরোধ করো, তার ফয়সালা আল্লাহর কাছে; তিনিই আল্লাহ, আমার রব; তাঁরই ওপর আমি তাওয়াক্কুল করেছি এবং আমি তাঁরই অভিমুখী হই । (শুরা ৪২:১০)

مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

তিনি ছাড়া তাদের কোনো অভিভাবক নেই । তাঁর আইন-বিধানে তিনি কাউকে শরীক করেন না । (কাহফ ১৮:২৬)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত । আর নিশ্চয়ই জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব । (শুরা ৪২:২১)

তাগূতী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান: সংবিধান

তগূতী রাষ্ট্রের দ্বিতীয় মৌলিক উপাদান হলো– সংবিধান । এ সংবিধান তাদের কাছে আল্লাহর কালামের চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ । কোনো বিষয় যদি আল্লাহর কালামের সাথে সংবিধানের সংঘর্ষ হয় সে ক্ষেত্রে সংবিধান

বহাল থাকবে। আল্লাহর কালামকে হয়তো অপব্যখ্যা করবে নয়তো প্রয়োজনে বাতিল করবে। কোনো বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে তারা সংবিধানের কাছে রুজু করে এবং সংবিধান থেকে প্রমাণ করতে পারলে সকলেই তা মেনে নেয়। সংবিধানের বিরুদ্ধে কথা বললে রাষ্ট্রদ্রোহীতার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হয়। জেল-জুলুম, নির্যাতন-নিপীড়নসহ নানা রকম ঝামেলার সম্মুখীন হতে হবে। এমনকি ফাঁসিও হতে পারে। এ প্রসঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৭ এর ২এ বলা হয়েছে : 'জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সহিত অসামঞ্জস্য হয়, তা হলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হবে।'

বাংলাদেশের সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী (২০১১) এর ৭ এর ক' তে বলা হয়েছে– 'সংবিধান বাতিল, স্থগিতকরণ, ইত্যাদি অপরাধ। কোনো ব্যক্তি শক্তি প্রদর্শন বা শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে বা অন্য কোনো অসাংবিধানিক পন্থায়–

(ক) এই সংবিধান বা ইহার কোনো অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করলে কিংবা তা করবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করলে; কিংবা

(খ) এই সংবিধান বা এর কোনো বিধানের প্রতি নাগরিকের আস্থা, বিশ্বাস বা প্রত্যয় পরাহত করলে কিংবা তা করবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করলে-

তার এই কার্য রাষ্ট্রদ্রোহীতা হবে এবং ঐ ব্যক্তি রাষ্ট্রদ্রোহীতার অপরাধে দোষী হবে।'

একটু পরে ৭ এর খ' তে বলা হয়েছে– 'সংবিধানের মৌলিক বিধানাবলী সংশোধন অযোগ্য। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যা কিছুই থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, দ্বিতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম-ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী সাপেক্ষে তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামোসংক্রান্ত অনুচ্ছেদসমূহের বিধানাবলী

সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোনো পন্থায় সংশোধন অযোগ্য হবে।'

পর্যালোচনা : উপরোক্ত ধারাগুলো ইসলামের আকিদা বিশ্বাসের সাথে সম্পূর্ণভাবে অসামঞ্জস্যশীল ও সাংঘর্ষিক। ৭এর ২এর ভাষ্য অনুযায়ী এ সংবিধানকে দেশের সর্বোচ্চ আইন বলা হয়েছে। অথচ কোনো মুসলিম দেশের সর্বোচ্চ আইন হলো আল কুরআন। তারপরে বলা হয়েছে– 'অন্য কোনো আইন যদি এই সংবিধানের সঙ্গে অসামঞ্জস্য হয়, তা হলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হবে।' এ কারণেই তারা পবিত্র কুরআনের অসংখ্য আইন সংবিধানের সাথে অসামঞ্জস্যশীল হওয়ায় বাতিল করেছে। যেমন : চোরের হাত কাটার বিধান। সম্পত্তি বন্টনের বিধান। পর্দার বিধানসহ আরো অসংখ্য বিধান।

৭ এর ক' তে বলা হয়েছে– 'সংবিধানের কোনো অনুচ্ছেদ রদ, রহিত বা বাতিল বা স্থগিত করলে কিংবা তা করবার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ বা ষড়যন্ত্র করলে তা রাষ্ট্রদ্রেহীতার শামিল হবে।' অথচ এ সকল কথাবার্তা কেবল মাত্র আল্লাহর কালামের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মানব রচিত যে কোনো আইন-বিধান পরিবর্তন হতে পারে। আল্লাহর আইনের কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই মুমিনদের আকিদাহ-বিশ্বাস ও ঈমান। তাছাড়া এই সংবিধানের বিরুদ্ধে কথা বললে যদি রাষ্ট্রদ্রোহীতার শামিল হয় তাহলে আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে যে বিধান রচনা করা হয়েছে সেটি কি আল্লাহদ্রোহী বিধান বলে বিবেচিত হবে না? এবং যারা এটা রচনা করেছেন তারা কি আল্লাহদ্রোহী বলে গণ্য হবেন না?

একজন মুসলিমকে বিশ্বাস করতে হবে কুরআন ও সুন্নাহ হলো আইনের উৎস। অন্য কোনো আইন যদি এর সাথে অসামঞ্জজস্যশীল হয় তাহলে তা বাতিল বলে গণ্য হবে। সকল বিতর্কের সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহর কাছে রুজু করতে বলা হয়েছে। আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেন–

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো তাহলে তা আল্লাহ ও রাসুলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।' (নিসা, ৪:৫৯)
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন আমি তোমদের মাঝে এমন দুটো জিনিস রেখে যাচ্ছি যেদুটো জিনিসকে তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তভাবে ধারণ করে রাখবে ততক্ষণ পর্যন্ত গোমরাহ হবে না। সেদুটো জিনিস হচ্ছে 'আল্লাহর কিতাব (কুরআন) ও রাসুলের সুন্নাহ (সহীহ হাদীস)। (মুআত্তায়ে মালেক ২৬৪০; মুসতাদরাকে হাকেম ৩১৯)
কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর বিধানকে কেউ পরিবর্তন করতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِه

'আর আল্লাহই হুকুম করেন এবং তাঁর হুকুম প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই।' (রাদ ১৩:৪১)
যেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ন্যায় বিচারক সেহেতু আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে অন্য কোনো বিধানে কল্যাণ তালাশ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَفَغَيْرَ اللَّه أَبْتَغِي حَكَمًا وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ مُنَزَّلٌ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِه وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে বিচারক হিসেবে তালাশ করব? অথচ তিনিই তোমাদের নিকট বিস্তারিত কিতাব নাযিল করেছেন। আর যাদের আমি কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানত যে, তা তোমার রবের পক্ষ থেকে যথাযথভাবে নাযিলকৃত। সুতরাং তুমি কখনো সন্দেহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' (আনআম ৬:১১৪-১১৬)
আল্লাহর বিধানের কাছে আত্মসমর্পণ করার নামই ইসলাম। কোনো ব্যক্তি যদি আল্লাহর বিধানের কাছে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ না করে তাহলে সে মুমিন বা মুসলিম হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।' (নিসা ৪:৬৫)
এ আয়াতে বুঝা গেলো কোনো ব্যক্তি আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানের ব্যাপারে কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব রাখে এবং সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর বিধানের সামনে নিজেকে সপে না দেয় তাহলে সে মুসলিম হবে না। শুধু তাই নয় আল্লাহর বিধান নাযিল হয়ে যাওয়ার পরে সেটাকে গ্রহণ করা বা না করার ব্যাপারে কাউকে স্বাধীনতা দেওয়া হয়নি। বরং সকলকে এক বাক্যে মেনে নিতে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।' (আহযাব, ৩৩:৩৬)
এ সকল আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হলো আল্লাহর সংবিধানের বিরুদ্ধে কোনো সংবিধান রচনা করা আবার সে সংবিধান মানতে বাধ্য করা আল্লাহর সাথে চরম ধৃষ্টতা ও বিদ্রোহ করার শামিল। একজন মুমিনের পক্ষে দেশের কুরআন-সুন্নাহবিরোধী সংবিধানকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রদ্রোহী হওয়া সম্ভব। কিন্তু আল্লাহর সংবিধানকে অস্বীকার করে আল্লাহদ্রোহী হওয়া সম্ভব নয়।

কোনো মানুষের আইন বিধান তৈরি করার অধিকার আছে কি?

পূর্বের আলোচনায় পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে যে, সার্বভৌমত্বের আদেশ বা কমান্ড-ই হচ্ছে আইন। সুতরাং যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক তিনিই আইন-বিধান দেওয়ার মালিক। অন্য কেউ নয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে; 'أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ' 'জেনে রাখ, সৃষ্টি ও নির্দেশ তাঁরই।' (আরাফ ৭:৫৪)

অর্থাৎ সৃষ্টি যার আইন বিধান দেওয়ার অধিকারও তার। অন্য কারো নয়। তাছাড়া আইন বিধান তৈরি করার জন্য যেসকল গুণাবলীর প্রয়োজন সেসকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্য কোনো মানুষের ভেতর পাওয়া সম্ভব নয়। যা ইতিপূর্বে সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করার জন্য বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে।

আইন প্রণয়নের জন্য যে সকল গুণাবলী ও বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন

আইন প্রণয়নের জন্য যেই গুণাবলী দরকার তা হচ্ছে –

১। اَلْحِكْمَةُ الْكَامِلَةُ মহা কৌশলী ও পূর্ণ প্রজ্ঞাময় হওয়া।

আইন প্রণয়নকারীকে পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাময় এবং কৌশলী হতে হবে। তা না হলে কোনোটি মানুষের জন্য কল্যাণকর আর কোনোটি অকল্যাণকর তা জানতে ব্যর্থ হবে। আর এই গুণটি কেবল আল্লাহর মধ্যেই রয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে– إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ 'নিশ্চয়ই তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।' (যারিয়াত ৫১:৩০)

২। اَلرَّحْمَةُ الْكَامِلَةُ মায়া-মমতা ও পূর্ণ দয়ার অধিকারী হওয়া।

দ্বিতীয় গুণ হলো, আইন প্রণয়নকারীকে সকলের প্রতি নিঃস্বার্থ দয়া ও ব্যাপক মায়া-মমতার অধিকারী হতে হবে। পূর্ণ সদয় ও করুনাময় হতে হবে। তা না হলে সে আইন প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার জন্য হবে এবং তার অপব্যবহার হবে। আর এ রকম পূর্ণ মায়া-মমতা ও দয়ার অধিকারী শুধুমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। অন্য কোনো মাখলুক এরূপ নিঃস্বার্থ দয়ার অধিকারী হতে পারে না। কেননা মানুষ যত দয়া-মায়া উপকার-অনুগ্রহ, দান-খয়রাত করুক না কেনো। সবই কোনো না কোনো স্বার্থের জন্য করে। হয়তো পার্থিব জীবনে সুনাম ও প্রশংসা অর্জনের জন্য নয়তো পরকালের সাওয়াব অর্জন করার জন্য অথবা মানবতার জন্য। কোনো স্বার্থ ছাড়া যিনি দয়া করেন এবং অনুদান দেন তাকেই আরবিতে বলা হয় রাহমান। যেহেতু এই বিশেষ গুণটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ব্যতীত অন্য কারো মধ্যে পাওয়া যায় না সেহেতু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-কে আর রাহ্মান বলা হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ 'তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (ইউসুফ ১২:৬৪)

অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে– وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ 'আর আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (মুমিনুন ২৩:১০৯)

৩। اَلْمُحْسِنُ الْعَادِلُ সৎ ও ন্যায় বিচারক হওয়া।

আইন-বিধান প্রণয়নকারীকে অবশ্যই সৎ, যোগ্য ও ন্যায় বিচারক হতে হবে। সার্থবাদী ও পক্ষপাতদুষ্ট হতে পারবে না। অসৎ ও অন্যায়কারী হলে নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্য অন্যের প্রতি জুলুম ও অত্যাচার করবে এবং সেই অন্যায় অবিচার ও যুলুম-অত্যাচারকে আইনের মাধ্যমে বৈধতা দিবে। যা সাধারণ অন্যায়ের চেয়ে খুবই জঘন্য ও ভয়াবহ। সাধারণ অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে আইনের আশ্রয় নেওয়া যায়। কিন্তু যারা আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে অন্যায় করে তাদের থেকে বাঁচার উপায় কি? এ কারণেই আইন প্রণেতাকে ন্যায় বিচারক হওয়া আবশ্যক। আর এইগুণটিও আল্লাহর মধ্যেই পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ

'আল্লাহ কি বিচারকদের শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?' (ত্বীন ৯৫:৮)

অপর আয়াতে বলা হয়েছে– وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ 'আর আপনি সর্বোত্তম ফায়সালাকারী। (হুদ ১১:৪৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজে যেমন ন্যায় বিচারক, তেমনিভাবে অন্যদেরও ন্যায় বিচারের নির্দেশ দান করেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফ, সদাচার ও নিকট আত্মীয়দের দান করার আদেশ দেন এবং তিনি আশ্লীলতা, মন্দ কাজ ও সীমালঙ্ঘন থেকে নিষেধ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো।' (নাহ্‌ল ১৬:৯০)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

إِنِ الْحُكْمُ إِلا لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

আল্লাহ্ ছাড়া কারো নির্দেশ চলে না। তিনি সত্য বর্ণনা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠতম মীমাংসাকারী। (আনআম ৬:৫৭)

৪। اَلْعِلْمُ الْمُحِيْطُ সর্বময় জ্ঞানের অধিকারী হওয়া।

আইন প্রণেতাকে অবশ্যই অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সব কিছুর জ্ঞান থাকতে হবে। নতুবা ভবিষ্যতে এ আইন দ্বারা কি সমস্যা হবে তা জানতে ব্যর্থ হবে এবং পরে আবার আইন সংশোধন করতে হবে, যেমন আমাদের দেশে বার বার সংবিধান পরিবর্তন করতে হচ্ছে। এক সরকার যেটাকে জনগণের কল্যাণ মনে করে অপর সরকার সেটাকে অকল্যাণ ও যন্ত্রণা মনে করে। এক সরকার এদেশে জনস্বার্থে সব থানাগুলোকে উপজেলা ঘোষণা করলো। পরবর্তী সরকার ওটাকে 'উপ-জ্বালা' মনে করে তা বাতিল করলো। এভাবে বার বার সংশোধন করতে হচ্ছে। এই মূহুর্তে আমাদের সামনে বাংলাদেশের যে সংবিধানটি রয়েছে সেটি হলো পঞ্চদশ সংশোধনী ২০১১। আরো কতবার সংশোধন হবে তা আল্লাহ-ই ভালো জানেন। সুতরাং আইন প্রণেতাকে অবশ্যই সর্বকালের সবকিছুর জ্ঞান থাকতে হবে। আর এ গুণটিও কেবল আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এর মধ্যেই পাওয়া যায়। কারণ আল্লাহর কাছে কোনো অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নেই। তার কাছে সবই বর্তমান। এমনকি তিনি অন্তরের খবরও জানেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

'নিশ্চয়ই তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে, তা আল্লাহ জানেন।' (বাকারা ২:৭৭)

এ প্রসঙ্গে আরেকটি আয়াতে বর্ণিত হয়েছে– وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।' (বাকারা ২:২১৬)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন– وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ 'আর আল্লাহ জানেন কে ফাসাদকারী আর কে সংশোধনকারী।' (বাক্বারা ২:২২০)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেন– وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।' (বাক্বারা ২:২৩২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

'আর জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের অন্তরে যা রয়েছে তা জানেন। সুতরাং তোমরা তাকে ভয় করো এবং জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, সহনশীল।' (বাক্বারা ২:২৩৫)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন– يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ 'তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে।' (বাক্বারা ২:২৫৫)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন– وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ 'আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।' (ইমরান ৩:৬৬)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন– أُولَئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ 'ওরা হল সেসব লোক, যাদের অন্তরে কি আছে আল্লাহ তা জানেন।' (নিসা ৪:৬৩)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন–

أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

'আল্লাহ আসমানসমূহে যা আছে এবং জমিনে যা আছে তা জানেন। আর আল্লাহ সব কিছু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত।' (মায়িদা ৫:৯৭)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন– وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ 'আর তোমরা যা প্রকাশ করো এবং যা গোপন করো আল্লাহ তা জানেন।' (মায়িদা ৫:৯৯)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন–

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

'আর আসমানসমূহ ও জমিনে তিনিই আল্লাহ, তিনি জানেন তোমাদের গোপন ও প্রকাশ্য এবং জানেন যা তোমরা অর্জন করো।' (আন'আম ৬:৩)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন– وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ 'আর আল্লাহ জানেন, নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।' (তাওবা ৯:৪২)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন–

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

'তারা কি জানে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের গোপনীয় বিষয় ও গোপন পরামর্শ জানেন? আর নিশ্চয়ই আল্লাহ গায়েবসমূহের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞাত।' (তাওবা ৯:৭৮)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন–

يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

'তিনি জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা তারা প্রকাশ করে। নিশ্চয়ই তিনি অন্তর্যামী।' (হুদ ১১:৫)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الْأَرْحَامُ

'আল্লাহ জানেন যা প্রতিটি নারী গর্ভে ধারণ করে এবং গর্ভাশয়ে যা কমে ও বাড়ে।' (রা'দ ১৩: ৮)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন– اَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ 'তারা যা গোপন করে এবং যা প্রকাশ্যে ঘোষণা করে, নিশ্চয়ই তা আল্লাহ জানেন।' (নাহাল ১৬:২৩)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে আরো বলেন–

وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

'তিনি অন্তরের বিষয়াদি সম্পর্কেও সম্যক জ্ঞাত।' (হাদীদ ৫৭:৬)

তিনি আরও ইরশাদ করেন–

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلا خَمْسَةٍ إِلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

'তুমি কি লক্ষ্য করনি যে, আসমানসমূহ ও জমিনে যা কিছু আছে নিশ্চয়ই আল্লাহ তা জানেন? তিনজনের কোনো গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসেবে আল্লাহ থাকেন না, আর পাঁচ জনেরও হয় না, যাতে ষষ্ঠজন হিসেবে তিনি থাকেন না। এর চেয়ে কম হোক কিংবা বেশি হোক,

তিনি তো তাদের সঙ্গেই আছেন, তারা যেখানেই থাকুক না কেন। তারপর কিয়ামতের দিনের তিনি তাদের তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক অবগত।' (মুজদালাহ ৫৮:৭)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন– أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ 'যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি করে জানবেন না? তিনি সূক্ষ্ম জ্ঞানী, সম্যক জ্ঞাত।' (মূলক- ৬৭ : ১৪)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন–

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

'আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি এবং তার মন নিভৃতে যে কুচিন্তা করে, সে সম্বন্ধেও আমি অবগত আছি। আমি তার গ্রিবাস্থিত ধমনী থেকেও অধিক নিকটবর্তী।' (ক্বাফ- ৫০:১৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلا بِمَا شَاءَ

'দৃষ্টির সামনে কিংবা পেছনে যা কিছু রয়েছে সে সবই তিনি জানেন। তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে তারা কোনো কিছুকেই পরিবেষ্টিত করতে পারে না, কিন্তু যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন। তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। (বাক্বারা- ২:২৫৫)

৫। اَلْقُدْرَةُ الْكَامِلَةُ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া।

আইন প্রণেতাকে অবশ্যই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হতে হবে। যাতে আইন মান্যকারী ও অমান্যকারী সকলেই তার ক্ষমতার অধীনে থাকে। যারা আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং আইনের যথাযথ বাস্তবায়ন করে তাদের পুরস্কৃত করতে পারেন। আর যারা আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে আইনকে অবজ্ঞা করে, অমান্য করে, উপহাস করে, মজা করে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে তাদের পাকড়াও করে উচিত শিক্ষা দিতে পারেন। নতুবা আইন প্রণয়ন করা হলো কিন্তু বাস্তবায়ন হলো না এতে কোনো উপকার হবে না। আর এই বিশেষ গুণটি কোনো মানুষের মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। যার বিস্তারিত আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। এই গুণটি যার মধ্যে পাওয়া যায় তিনিই হচ্ছেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। তিনি বিচার

দিবসের মালিক। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ বিচার দিবসের মালিক। (ফাতিহা, ১:০৩)

তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে কেউ নয়। তিনি সকলকে পাকড়াও করতে সক্ষম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

'আর তিনিই তাঁর বান্দাদের ওপর ক্ষমতাবান; আর তিনি প্রজ্ঞাময়, সম্যক অবহিত।' (আন'আম, ৬:১৮)

মানব রচিত সংবিধানের স্বরূপ

পূর্বের আলোচনায় পরিষ্কার হয়েছে যে, মানব জাতির জন্য আইন বিধান তৈরি করা ও সংবিধান প্রণয়ন করার অধিকার একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আছে। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো এই ক্ষমতা ও অধিকার নেই। সুতরাং কেউ যদি মানুষের জন্য আইন-বিধান তৈরি করে এবং নিজেকে আইন প্রণেতা বা সংবিধান রচয়িতা দাবি করে সে যেনো নিজেকে স্বয়ং আল্লাহ অথবা আল্লাহর অংশীদার বলে দাবি করলো। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এর এমন কোনো শরীক বা অংশীদার নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ প্রসঙ্গে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে ইরশাদ করেছেন–

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত। আর নিশ্চয়ই জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব।' (শুরা, ৪২:২১)

এই আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু তায়ালা কুফ্ফারদের তৈরি করা বিধান কে 'শারীআহ্' বলে আখ্যায়িত করেছেন। কেননা শারীআহ অর্থ হচ্ছে– اَلطَّرِيْقَةُ الْمُتَّبَعَةُ حَقًّا كَانَتْ اَوْ بَاطِلًا 'অনুসৃত পথ' চাই তা সত্য হোক বা মিথ্যা।'

এতে বুঝা যায় যে, কুফ্ফারদের তৈরি করা বিধান স্বতন্ত্র একটি শারী'আহ্ এবং স্বতন্ত্র একটি ধর্ম। যার সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই। সে কারণেই উপরোক্ত আয়াতে مِنَ الدِّينِ (দ্বীনের বিধান) বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে বিষয়টিকে আরো সুন্দরভাবে স্পষ্ট করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে– لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ 'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন।' (কাফিরূন ১০৯:৬)

এই আয়াতে দেখা গেলো যে, ইসলাম যেরকম একটি স্বতন্ত্র দ্বীন এরকমভাবে কাফেরদের মতবাদকেও দ্বীন বলা হয়েছে। বুঝা গেলো, দ্বীন ইসলামের সাথে দ্বীনে কুফর এর কোনো সম্পর্ক নেই। জীবনের সকল ক্ষেত্রে হয়তো দ্বীন ইসলাম থাকবে, নয়তো দ্বীনে কুফর থাকবে। কিছু ইসলামের আর কিছু দ্বীনে কুফর-এর মান্য করা যাবে না। একথা যেরকম কুরআনে স্পষ্ট করা হয়েছে সেরকভাবে ফিরআউন ও তার জাতীর সামনে স্পষ্ট করেছিলো। মূলত যুগে যুগে ফিরআউনেরা ইসলামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে তাদের দ্বীনে বাতিলকে টিকিয়ে রাখার জন্য। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

'আর ফিরআউন বললো, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি মূসাকে হত্যা করি এবং সে তার রবকে ডাকুক; নিশ্চয়ই আমি আশঙ্কা করি, সে তোমাদের দ্বীন পাল্টে দেবে অথবা সে জমিনে বিপর্যয় ছড়িয়ে দেবে।' (মুমিন ৪০:২৬)

এই আয়াতে দেখা গেলে যে, ফিরআউন তার দ্বীন রক্ষার জন্য উত্তেজিত হয়ে মূসা (আ.) কে হত্যা করার জন্য উদ্ধত হলো। যাতে মূসা (আ.) তার দ্বীনকে পাল্টে দিতে না পারে। এমনিভাবে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বুশ যখন ইরাকে হামলা করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন সে তার তথাকথিত জঙ্গিবাদ তথা ইসলাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন দেশের সমর্থন চায়। বহুদেশ তাকে নিঃশর্ত সমর্থন দেয়। কিছু দেশ তার বিপক্ষে অবস্থান নেয়। আর কিছু মুনাফিক মুসলিম দেশ এতে বিব্রত বোধ করে। মানসিকভাবে যদিও তারা বুশ তথা আমেরিকার সমর্থক ছিলো কিন্তু তাদের দেশের মুসলিম জনগণের ধর্মীয় অনুভূতির দিকে লক্ষ্য করে ভোট হারানোর ভয়ে কোনো

পক্ষ অবলম্বন না করে মাঝামাঝি অবস্থান করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু বুশ তখন তার ভাষণে স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিলো– 'মাঝামাঝি বলতে কিছু নেই। হয়তো আমাদের সঙ্গে, নয়তো সন্ত্রাসীদের সঙ্গে।' আর তার ভাষায় সন্ত্রাসী বলতে বিভিন্ন দেশের মুসলিম মুজাহিদদের বুঝানো হয়েছে। যারা মুসলিমদের ভূমি ও দ্বীন রক্ষার জন্য কাফির-মুশরিক, ইয়াহুদী-খৃষ্টান, নাস্তিক-মুরতাদ ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জীবনবাজি রেখে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। সে যাই হোক বুশের কথায় ও পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, মাঝামাঝি বলতে কিছু নেই। এজন্য আমরাও বলি আপনি হয়তো দ্বীনে হক্ব তথা ইসলামের পক্ষে, নয়তো দ্বীনে বাতিল তথা কাফিরদের পক্ষে। আপনি হয়তো আল্লাহর নাযিলকৃত সংবিধানের পক্ষে, নয়তো মানবরচিত তাগূতী সংবিধানের পক্ষে। এর বাইরে মধ্যমপন্থী মুসলিম, নরমপন্থী মুসলিম, গণতন্ত্রপন্থী মুসলিম, আধুনিক মুসলিম বলতে কিছু নেই। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

'আর যে ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দ্বীন চায় তবে তার কাছ থেকে তা কখনো গ্রহণ করা হবে না এবং সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (ইমরান ৩:৮৫)

উপরোক্ত আয়াত সমূহে মানব রচিত সংবিধান ও আইন-কানুনকেও 'দ্বীন' 'শরী'আহ' ইত্যাদি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং বুঝা গেল দ্বীন ও শারী'আহ্ দুই প্রকার : ক. আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ও শারী'আহ্। খ. মানব রচিত বাতিল দ্বীন ও শারী'আহ। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রদত্ত দ্বীন ও শারীআহ্ মঙ্গলময় ও কল্যাণকর। আর মানব রচিত দ্বীন ও শারী'আহ্ ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর। আল্লাহ প্রদত্ত দ্বীন ও শরী'আতের উৎস স্বংয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যা ওহীর মাধ্যমে নবী-রাসুলদের প্রতি নাযিল করা হয়। পক্ষান্তরে মানব রচিত দ্বীন ও শরী'আতের উৎস মানুষের চিন্তা-ভাবনা ও কল্পনা যা বিতাড়িত শয়তান কর্তৃক তার বন্ধুদের মাথায় প্রবেশ করানো হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ

'এবং শয়তানরা তাদের বন্ধুদের প্ররোচনা দেয়, যাতে তারা তোমাদের সাথে বিবাদ করে। আর যদি তোমরা তাদের আনুগত্য কর, তবে নিশ্চয়ই তোমরা মুশরিক।' (আনআম, ৬:১২১)

সুতরাং মানব রচিত সংবিধান শয়তান কর্তৃক ওহীকৃত অলস মস্তিষ্কের কল্পনা প্রসূত সংবিধান। তাই আমরা কুরআন-সুন্নাহএর দৃষ্টিতে মানব রচিত সংবিধান ও মানব রচিত শরী'আহ-এর বাস্তব চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করবো, ইনশাআল্লাহ।

১. اَنَّهَا شَرِيْعَةُ الْكُفْرِ মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে কুফরি সংবিধান।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

'আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।' (মায়িদা ৫:৪৪)

এ আয়াত অনুযায়ী যারা আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বিচার-ফায়সালা করে না এবং আল্লাহর নাযিলকৃত বিধানকে আধুনিক যুগে অচল মনে করে অথবা অচল মনে না করলেও তার পরিবর্তে মানব রচিত বিধানকে বেশি কল্যাণকর মনে করে তারা অবশ্যই কাফির।

২. وَهِيَ شَرِيْعَةُ الطَّاغُوْتِ মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে তাগূতী সংবিধান।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا

'তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায় অথচ তাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাকে অস্বীকার করতে। আর শয়তান চায় তাদের ঘোর বিভ্রান্তিতে বিভ্রান্ত করতে। (আর আল্লাহর পরিবর্তে যার আনুগত্য করা হয় সেই তাগূত।)' (নিসা ৪:৬০)

এ আয়াতে তাগূত বলতে মানব রচিত আইন-বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালাকারী বিচারকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অনেকে তাগূত এর তরজমা শয়তান দ্বারা করে থাকে। এটি ভুল। শয়তান প্রধান প্রধান তাগূতদের একটি। তবে একমাত্র তাগূত নয়। এ আয়াতে বলা হয়েছে 'তারা তাগূতের কাছে বিচার নিয়ে যেতে চায়।' তাহলে শয়তানের কি

কোনো এজলাস আছে, যেখানে মানুষ দলে দলে তার কাছে বিচার ফায়সালা নিয়ে যায়। না, তাহলে এখানে তাগূত বলতে মানব তাগূতকে বোঝানো হয়েছে। যাদের এজলাস আছে এবং তাদের কাছে মানুষেরা বিচার-ফায়সালা নিয়ে যায়।

৩. وَهِيَ شَرِيْعَةُ الشَّيْطَانِ মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে শয়তানের সংবিধান।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

'আর যে পরম করুণাময়ের জিকির থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে সে হয়ে যায় তার সঙ্গী।' (যুখরুফ ৪৩:৩৬)

সুতরাং যে ব্যক্তি রাহমানের বিধান মানে না সে অবশ্যই শয়তানের বিধান মানে। শয়তান তাদের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করে।

৪. وَهِيَ شَرِيْعَةُ الْجَاهِلِيَّةِ মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে মুর্খতার সংবিধান।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

'তারা কি তবে জাহিলিয়্যাতের বিধান চায়? আর নিশ্চিত বিশ্বাসী কওমের জন্য বিধান প্রদানে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক উত্তম?' (মায়িদা ৫:৫০)

সুতরাং যে সকল বিধান আল্লাহর বিধানের পরিপন্থী সেগুলো মূর্খতা ও জাহিলিয়্যাতের বিধান।

৫. وَهِيَ شَرِيْعَةُ الظُّلُمَاتِ মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে অন্ধকারের সংবিধান।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

'যারা ঈমান এনেছে আল্লাহ তাদের বন্ধু, তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে আনেন। আর যারা কুফরি করে, তাদের অভিভাবক হলো তাগূত। তারা তাদের আলো থেকে বের করে অন্ধকারে

নিয়ে যায়। তারা আগুনের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। (বাকারা ২:২৫৭)

৬. وَهِيَ شَرِيْعَةُ الضَّلَالِ মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে গোমরাহির সংবিধান।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ

'অতএব, তিনিই আল্লাহ, তোমাদের প্রকৃত রব। অতঃপর সত্যের পর ভ্রষ্টতা ছাড়া কী থাকে? অতএব কোথায় তোমাদের ঘুরানো হচ্ছে?' (ইউনুস ১০:৩২)

এই আয়াতে পরিস্কার হলো যে, বিধান দুই প্রকার। হয়তো হক্ব নইলে বাতিল। এ দুয়ের মাঝামাঝি তৃতীয় কোনো বিধান নেই। আল্লাহর বিধান হক্ব ও সত্য বিধান। মানব রচিত বিধান মিথ্যা ও বাতিল বিধান। সুতরাং আল্লাহর বিধান বলবৎ না থাকলে সেখানে মিথ্যা ও গোমরাহির বিধান বলবৎ থাকবে। কাফির-মুশরিকরা সারাক্ষণই মানুষের সাথে প্রতারণা ও ধোঁকাবাজি করার জন্য আল্লাহর বিধানকে বাতিল করে নিজেদের মনগড়া বিধান কায়েম করতে চায়। কিন্তু তাদের সকল চেষ্টা ও ষড়যন্ত্র ব্যর্থতা ও বিভ্রান্তি ছাড়া আর কিছুই নয়। সে কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের প্রসঙ্গে বলেছেন– وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ 'আর কাফিরদের ষড়যন্ত্র কেবল ব্যর্থই হবে।' (মুমিন ৪০:২৫)

৭. وَهِيَ شَرِيْعَةُ الْعَمَيْ মানব রচিত সংবিধান হচ্ছে অন্ধত্বের সংবিধান।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

'যে ব্যক্তি জানে তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা সত্য, সে কি তার মতো, যে অন্ধ? বুদ্ধিমানরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে।' (রা'দ ১৩:১৯)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ

'দল দু'টির উপমা হচ্ছে অন্ধ ও বধির এবং চক্ষুষ্মান ও শ্রবণশক্তিসম্পন্নের মতো, তুলনায় উভয় দল কি সমান? এরপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?' (হুদ ১১:২৪)

صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ

'তারা বধির, বোবা, অন্ধ। তাই তারা বুঝে না।' (বাক্বারা ২:১৭১)

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ওহীর বিধান অমান্যকারী লোকদের অন্ধ, বধির ও বোবা বলে আখ্যায়িত করেছেন। অন্ধ এ জন্য বলেছেন যে, তারা সত্যকে দেখেও দেখেনা। বধির এজন্য বলেছেন যে, তারা সত্যকে শুনেও শুনে না। আর বোবা এজন্য বলেছেন যে, তারা সত্যকে প্রকাশ করে না। সুতরাং এ জাতীয় মানুষ কর্তৃক রচিত আইন-বিধান অন্ধ ও বোবা বধিরদের সংবিধান ছাড়া কিছুই নয়।

৮. وَهِيَ شَرِيْعَةُ الْأَهْوَاءِ মানব রচিত সংবিধান প্রবৃত্তির সংবিধান ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজাতির জন্য ওহীর বিধান নাযিল করেছেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী-রাসুলগণ সে বিধান প্রতিষ্ঠা করার জন্য সংগ্রাম করেছেন। তারা নিজেদের পক্ষ থেকে কোনো কথা তৈরি করে বলেননি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন−

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى− إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

'আর সে মনগড়া কথা বলে না। তাতো কেবল ওহী, যা তার প্রতি ওহীরূপে প্রেরণ করা হয়।' (নাজম ৫৩:৩-৪)

মানুষের উচিৎ ছিলো নবী-রাসুলদের কথায় সাড়া দিয়ে ওহীর বিধানকে মেনে নেওয়া এবং তা সর্বক্ষেত্রে বাস্তবায়ন করা। কিন্তু মানুষেরা সেটা না করে তারা নিজদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। আল্লাহর বিধানকে পশ্চাতে ফেলে দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন−

فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

'অতঃপর তারা যদি তোমার আহ্বানে সাড়া না দেয়, তাহলে জেনে রাখ, তারা তো নিজদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে। আর আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে তার চেয়ে

অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম কওমকে হিদায়াত করেন না।' (কাসাস ২৮:৫০)

এ আয়াতে জীবনবিধান কে দুটি ভাগে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। হয়তো ওহী বা শারিআহ্ এর অনুসরণ নতুবা হাওয়া বা প্রবৃত্তির অনুসরণ। এর বাহিরে তৃতীয় কোনো মাঝামাঝি পদ্ধতি নেই। তাই মুমিনদের ওহীর বিধান অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। হাওয়া ও প্রবৃত্তির বিধানকে বর্জন করতে বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'তারপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ করো এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল−খুশির অনুসরণ করো না।' (জাছিয়া ৪৫:১৮)

সুতরাং সত্যবাদী মুমিন মুসলিমগণ কখনোই মানুষের কল্পনা প্রসূত কোনো বিধানকে কখনোই মেনে নিতে পারে না। আর যখন এই পরিস্থিতি শুরু হবে যে সত্যবাদী মুমিন মুসলিমগণও মিথ্যাবদী কাফির মুশরিক অনুসরণ করতে শুরু করেছে তখন পৃথিবীতে অশান্তি, বিশৃঙ্খলা ও ধবংস নেমে আসবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

'আর যদি সত্য তাদের কামনা-বাসনার অনুগামী হত, তবে আসমানসমূহ, জমিন ও এতদোভয়ের মধ্যস্থিত সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে যেত; বরং আমি তাদের দিয়েছি তাদের উপদেশবাণী (কুরআন)। অথচ তারা তাদের উপদেশ হতে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।' (মু'মিনুন ২৩:৭১)

৯. وَهِيَ شَرِيْعَةُ الظُّلْمِ মানব রচিত সংবিধান স্বৈরাচারী সংবিধান ।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন−

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই জালিম।' (মায়িদা ৫:৪৫)

এ আয়াতে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে যারা নিজেরা বিধান তৈরি করে তারা জালিম ও স্বৈরাচার। আর জুলুম ও স্বৈরাচারী বিধান

যেখানে বলবৎ থাকে সেখানে আল্লাহর রহমত বরকত থাকে না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا

'সুতরাং ইয়াহূদিদের জুলুমের কারণে আমি তাদের ওপর উত্তম খাবারগুলো হারাম করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে অনেককে তাদের বাধা প্রদানের কারণে।' (নিসা ৪:১৬০)

পক্ষান্তরে আল্লাহর বিধান কায়েম করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে নুসরত ও বারাকাত নাযিল করা হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

'আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও জমিন থেকে বরকতসমূহ তাদের ওপর খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তার কারণে আমি তাদের পাকড়াও করলাম।' (আরাফ, ৭:৯৬)

১০. وَهِيَ شَرِيْعَةُ الْخرَابِ মানব রচিত সংবিধান বিরান করার সংবিধান।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

'সুতরাং ঐগুলো তাদের বাড়িঘর, যা তাদের জুলমের কারণে বিরান হয়ে আছে। নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে সে কওমের জন্য যারা জ্ঞান রাখে।' (নামল ২৭:৫২)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজাতিকে পরীক্ষা করার জন্য মাঝে মধ্যে সুযোগ দিয়ে থাকেন। কিন্তু মানুষ যখন সীমালঙ্ঘন করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তখন তাদের ওপর বিভিন্ন প্রকারের গযব নাযিল করে তাদের সম্পূর্ণ রূপে ধবংস করে দেন এবং তাদের জনপদগুলো বিরান ভূমিতে পরিণত হয়। বিভিন্ন জাতির ইতিহাস তার জ্বলন্ত সাক্ষী বা প্রমাণ।

১১. وَهِيَ شَرِيْعَةُ الْمَعِيْشَةِ الضَّنْك মানব রচিত সংবিধান সংকুচিত জীবিকার সংবিধান।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى

'আর যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জন্য হবে নিশ্চয়ই এক সংকুচিত জীবন এবং আমি তাকে কিয়ামত দিবসে উঠাবো অন্ধ অবস্থায়।' (তা'হা ২০:১২৪)

এ আয়াত থেকে বুঝা গেলো যে, যারা আল্লাহর বিধান সম্পর্কে অজ্ঞ আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য সংকীর্ণ ও কষ্টময় জীবনদান করবেন। যদিও বাহ্যিকভাবে তাদের আনন্দিত মনে হবে তথাপিও তারা নানান সমস্যায় জর্জরিত হওয়ার কারণে অশান্তি ও সংকীর্ণময় জীবনযাপন করবে। আর আখিরাতে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।

১২. وَهِيَ شَرِيْعَةُ الْمَصَائِبِ মানব রচিত সংবিধান বিপদ-আপদের সংবিধান।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا - فَكَيْفَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ ثُمَّ جَاءُوكَ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَتَوْفِيقًا

'আর যখন তাদের বলা হয়, 'তোমরা এসো যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসুলের দিকে', তখন মুনাফিকদের দেখবে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে। সুতরাং তখন কেমন হবে, যখন তাদের ওপর কোনো মুসীবত আসবে, সেই কারণে যা তাদের হাত পূর্বেই প্রেরণ করেছে? তারপর তারা আল্লাহর নামে শপথ করা অবস্থায় তোমার কাছে আসবে যে, আমরা কল্যাণ ও সম্প্রীতি ভিন্ন অন্য কিছু চাইনি।' (নিসা ৪:৬১-৬২)

১৩. وَهِيَ شَرِيْعَةُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ মানব রচিত সংবিধান ঘৃণা ও শত্রুতার সংবিধান।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ

'আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নাফরমানী করে এবং তাঁর সীমারেখা লঙ্ঘন করে আল্লাহ তাকে আগুনে প্রবেশ করাবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর তার জন্যই রয়েছে অপমানজনক আজাব।' (মায়িদা ৫:১৪)

১৪. وَهِيَ شَرِيْعَةُ الـدَّمَارِ وَالْهَلَاكِ মানব রচিত সংবিধান ধ্বংস ও বিধ্বস্ত করার সংবিধান।

আল্লাহর বিধান বাতিল করে মানব রচিত বিধান কায়েম করলে আল্লাহর পক্ষ থেকে ধ্বংস ও গজব অবতীর্ণ করা হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا

'আর যখন আমি কোনো জনপদ ধ্বংস করার ইচ্ছা করি, তখন তার সম্পদশালীদের (সৎকাজের) আদেশ করি। অতঃপর তারা তাতে সীমালঙ্ঘন করে। তখন তাদের ওপর নির্দেশটি সাব্যস্ত হয়ে যায় এবং আমি তা সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করি।' (বণী ইসরাঈল ১৭:১৬)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ

'এটা তার রবের নির্দেশে সব কিছু ধ্বংস করে দেবে'। ফলে তারা এমন (ধ্বংস) হয়ে গেল যে, তাদের আবাসস্থল ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। এভাবেই আমি অপরাধী কওমকে প্রতিফল দিয়ে থাকি।' (আহকাফ ৪৬:২৫)

সুতরাং যারা আল্লাহ প্রদত্ত চোরের হাত কাটার বিধান, সম্পত্তি বণ্টনের বিধান, যিনা ব্যভিচারের বিধান, মদ হারাম হওয়ার বিধান, মহিলাদের পর্দার বিধান, সুদ হারাম হওয়ার বিধান বাতিল করে বিকল্প আইন তৈরি করে এবং সে আইন মানতে জনগণকে বাধ্য করে তাদের ব্যাপারে শরী'আতের ফায়সালা কি হবে? তাছাড়া যারা ভাস্কর্যের নামে অথবা

স্মৃতিসৌধের নামে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটির সামনে মূর্তি তৈরি করে এবং তাদের সামনে দাঁড়িয়ে নিরবতা পালন করে, তাদের সম্মানার্থে নগ্ন পায়ে হাঁটে এবং পুষ্পস্তবক অর্পন করে তাদেরকে আপনি কি বলবেন?

এ ছাড়া শিখা চিরন্তন/শিখা অনির্বাণের নামে অগ্নি পূজা করে এবং অন্যকে ঐ কাজে বাধ্য করে আবার যারা মসজিদে গিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আদর্শ, মন্দিরে গিয়ে রামের আদর্শ, গির্জায় গিয়ে যিশু খ্রিস্টের আদর্শ আর প্যাগোডায় গিয়ে বুদ্ধদেবের আদর্শ বাস্তাবয়নের কথা বলে তাদের ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত কি?

তাগূতী রাষ্ট্রের তৃতীয় মৌলিক উপাদান : ভৌগলিক সীমারেখা

তাগূতী রাষ্ট্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ মৌলিক উপাদান হলো ভৌগলিক সীমারেখা, যাকে সংক্ষেপে দেশ বলা হয়। এই দেশ রক্ষা করা তাদের নিকট দ্বীন ও ঈমান রক্ষা করার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। আর এজন্য এটাকে ধর্মীয়ভাবে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য একটি জাল হাদীস তৈরি করা হয়েছে। যা এ অঞ্চলের মানুষের সকলেরই মুখস্ত রয়েছে। যদিও সহীহ হাদীস সম্পর্কে তাদের কোনো ধারণা নেই। আর সেই জাল হাদীসটি হলো– حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ 'স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ।'

ইমাম নাসির উদ্দীন আলবানী বলেন,

مَوْضُوْعٌ وَمَعْنَاهُ غَيْرُ مُسْتَقِيْمٍ إِذْ إِنَّ حُبَّ الْوَطَنِ كَحُبِّ النَّفْسِ وَالْمَالِ وَنَحْوِهِ ، كُلُّ ذَلِكَ غَرِيْزِيٌّ فِي الْإِنْسَانِ لَا يُمْدَحُ بِحُبِّهِ وَلَا هُوَ مِنْ لَوَازِمِ الْإِيْمَانِ ، أَلَـا تَـرَىْ أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ مُشْتَرِكُوْنَ فِيْ هَذَا الْحُبِّ لَا فَرْقَ فِيْ ذَلِكَ بَيْنَ مُؤْمِنِهِمْ وَكَافِرِهِمْ

'স্বদেশপ্রেম ঈমানের অঙ্গ' এই হাদীসটি জাল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নামে চালানো হয়েছে। মূলত আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথা বলেননি। তাছাড়া, এই জাল হাদীসটির অর্থও সঠিক নয়। কেননা মানুষের বাড়িঘর, দেশ-এলাকা এগুলোর ভালোবাসা স্বভাবগত বা জন্মগত, যেভাবে নিজের জান ও মালের ভালোবাসা স্বভাব ও জন্মগত। এতে প্রশংসারও কিছু নেই, ঈমানের জন্য বাধ্যবাধকতারও কিছু নেই। তুমি কি দেখ না যে, দেশপ্রেমের ক্ষেত্রে

সকলেই সমান। কাফির-মুশরিক আর মুমিনের মধ্যে এ ব্যাপারে কোনো ভেদাভেদ নেই। তাহলে এটা ঈমানের অঙ্গ হয় কি করে। (সিল সিলাতুল আহাদীস আদ দা'য়িফা ওয়াল মাওদু'আহ: প্রথম খণ্ড-১১১ পৃ: ৩৬)

বরং মুসলিমদের বলা হয়েছে–

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ তাদের এ মর্মে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি নিশ্চিতভাবে তাদের জমিনের প্রতিনিধিত্ব প্রদান করবেন, যেমন তিনি প্রতিনিধিত্ব প্রদান করেছিলেন তাদের পূর্ববর্তীদের এবং তিনি অবশ্যই তাদের জন্য শক্তিশালী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তিনি তাদের ভয়-ভীতি শান্তি-নিরাপত্তায় পরিবর্তিত করে দেবেন। তারা আমারই ইবাদাত করবে, আমার সাথে কোনো কিছুকে শরীক করবে না। আর এরপর যারা কুফরি করবে তারাই ফাসিক।' (নূর, ২৪:৫৫)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিনদের গোটা জমিনের খিলাফত দেওয়ার ওয়াদা করেছেন। এখানে কোনো আলাদা আলাদা ভূখণ্ডের কথা বলা হয় নাই। তাছাড়া, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও খুলাফায়ে রাশেদার যুগে যে পর্যন্ত ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো সে পর্যন্ত একই ইমারাহ-এর অধীনে ছিলো। তাই স্ব-দেশ প্রেম স্বভাগতভাবে প্রতিটি মানুষের অন্তরে থাকলেও শরয়ীভাবে এর কোনো গুরুত্ব নেই। বরং শরী'আতের নির্দেশ হলো যদি কোনো ভূ-খণ্ডে দ্বীন ও ঈমান ঠিক রাখা সম্ভব না হয় তখন স্বদেশ প্রেম ত্যাগ করে হিজরত করে আল্লাহর প্রতি ভালোবাসার প্রমাণ দিতে হবে। সেক্ষেত্রে স্বদেশ প্রেমের দোহাই দিয়ে হিজরত না করে বসে থাকলে জাহান্নামে যেতে হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي

الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

'নিশ্চয়ই যারা নিজেদের প্রতি জুলুমকারী, ফেরেশতারা তাদের জান কবজ করার সময় বলে, 'তোমরা কী অবস্থায় ছিলে'? তারা বলে, 'আমরা জমিনে দুর্বল ছিলাম'। ফেরেশতারা বলে, 'আল্লাহর জমিন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা তাতে হিজরত করতে'? সুতরাং ওরাই তারা যাদের আশ্রয়স্থল জাহান্নাম। আর তা মন্দ প্রত্যাবর্তনস্থল।' (নিসা, ৪:৯৭)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম (রা.) মক্কাকে ভালোবাসতেন। সেই ভালোবাসার কারণ শুধু পার্থিব-ই ছিলো না। বরং খানায়ে কাবার মতো পবিত্র ঘর ও মসজিদুল হারামের মতো পবিত্র মসজিদ থাকার কারণে তা সত্ত্বেও দ্বীন ও ঈমানের কারণে সবকিছু ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করে গেলেন। হিজরতের সময় মক্কার দিকে তাকিয়ে আক্ষেপও করেছেন। কিন্তু 'হুব্বুল ওয়াতানের' দোহাই দিয়ে অথবা এক রাকাতে লক্ষ রাকাতের সওয়াবের দোহাই দিয়ে মক্কায় বসে থাকেন নাই। এভাবেই কিয়ামত পর্যন্ত দ্বীন ও ঈমান রক্ষার তাগিদে হিজরত অব্যাহত থাকবে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

لاتنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولاتنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها

'হিজরত বন্ধ হবে না যতক্ষণে তওবার সুযোগ বন্ধ না হবে। আর তাওবাহর সুযোগ বন্ধ হবে না যতক্ষণে পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হবে।' (আবু দাউদ ২৪৭৯)

বুঝা গেলো স্বদেশ প্রেমের দোহাই দিয়ে হিজরতের বিষয়টিকে কৌশলে এড়িয়ে যাওয়ার চক্রান্ত করা যাবে না। হাদীসে আরো বলা হয়েছে–

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الرَّجُلِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ وَمَوَاقِعَ الْقَطْرِ يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنْ الْفِتَنِ

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন– অচিরেই এমন একটি সময় আসবে যখন মানুষের সর্বোত্তম সম্পদ হবে ছাগপাল যা নিয়ে সে পাহাড়ের

চূড়া এবং বৃষ্টি বর্ষণের স্থান (জঙ্গল) তালাশ করবে। ফিতনাহ থেকে বাঁচার জন্য দ্বীন নিয়ে সে সেদিকে পালাবে।' (বুখারী, ৩৩০০, ৩৬০০, ৩৪৯০, ৭০৮৮; আবু দাউদ, ৪২৬৯; নাসায়ী, ৫০৫১; মুসনাদে আহমাদ, ১১০৩২)

এই হাদীস থেকে বুঝা গেলো কোনো স্বদেশপ্রেম নয়, বরং ঈমান এবং দ্বীন হেফাজত করা ঈমানের অঙ্গ। তাই তাগূতী রাষ্ট্রের মৌলিক উপাদানের তৃতীয় উপাদানটিও কুরআন সুন্নাহ পরিপন্থী।

তাগূতী রাষ্ট্রের চতুর্থ মৌলিক উপাদান : জনসংখ্যা

তাগূতী রাষ্ট্রের আরেকটি মৌলিক উপাদান হলো জনগণ। তাগূতী রাষ্ট্রের সংবিধান অনুযায়ী এই জনগণই সমস্ত ক্ষমতার মালিক। তারা ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে নেতা নির্বাচন করে। পরবর্তীতে নেতারা জনগণ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এমপি-মন্ত্রী হয়ে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হয়। অতঃপর তারা আইন প্রণয়ন করে। প্রয়োজনে আল্লাহর আইনকে বাতিল করে। এজন্য জনগণের সংখ্যা নির্ণয় করা হয়। সেজন্য মাঝে মধ্যে আদমশুমারী করা হয়। কোনো দেশে যদি জনসংখ্যা ব্যাপক হারে বৃদ্ধি পাওয়া শুরু করে তখন তা রোধ করার জন্য বিভিন্ন রকম কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি ও সরকারি অফিসগুলো থেকে নানান প্রকার স্লোগান প্রচার করা হয়। আমাদের এ দেশের বিলবোর্ডগুলোতে প্রায়ই শোভা পায় 'ছেলে হোক মেয়ে হোক, দুটি সন্তানই যথেষ্ট।' আবার নতুন স্লোগান যোগ করা হয়েছে, 'দুটির চেয়ে বেশি নয় একটি হলে ভালো হয়।' আরও কত কী? আর এই সন্তান যাতে বেশি না আসতে পারে সে জন্য জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু করা হয়। কেননা তাদের ভাষায় জনসংখ্যার ব্যাপক বিস্ফোরণ হলে খাদ্যে ঘাটতি দেখা দিবে। শিক্ষা চিকিৎসার ব্যবস্থা করা যাবে না ইত্যাদি। এ বিষয়টিও কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলামী শরী'আহ-এর সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা ইসলামের দৃষ্টিতে সকল সৃষ্টির রিয্ক ও খাদ্যের দায়-দায়িত্ব আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজে গ্রহণ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

'আর জমিনে বিচরণকারী প্রতিটি প্রাণীর রিয্কের দায়িত্ব আল্লাহরই এবং তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল ও সমাধিস্থল । সব কিছু আছে স্পষ্ট কিতাবে।' (হুদ, ১১:৬)

জাহিলি যুগের লোকেরা একই উদ্দেশ্যে সন্তানদের হত্যা করতো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তা কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

'অভাব-অনটনের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তাদের রিয্ক দেই এবং তোমাদেরও। নিশ্চয়ই তাদের হত্যা করা মহাপাপ।' (বণী ইসরাইল, ১৭:৩১)

এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত রয়েছে। আর তা হলো, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা 'আমি-ই তাদের রিয্ক দেই' কথাটি 'তোমাদেরও রিয্ক দেই' এর আগে উল্লেখ করা হয়েছে। এর দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, তোমাদের সন্তান তোমাদের জন্য কোনো বোঝা তো নয়ই বরং তাদের কারণে আমি তোমাদের রিয্কও বহাল রাখি। পবিত্র কুরআনে এ জাতীয় আরেকটি আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

'আর দারিদ্র্যের কারণে তোমাদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমিই তোমাদের রিয্ক দেই এবং তাদেরও।' (আনআম, ৬:১৫১)

এ আয়াতে 'তোমাদের' আগে 'তাদের' পরে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, প্রত্যেকের রিয্কের ব্যবস্থা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা করেন। যার যার রিয্ক সে সঙ্গে করে নিয়ে আসে। প্রত্যেকেই যার যার রিয্ক খায় একজন অপরজনের রিয্ক খায় না। সুতরাং খাদ্যের অভাবের কারণে পরিবার পরিকল্পনার নামে সন্তান বন্ধ করার যত প্রক্রিয়া রয়েছে সবগুলোই হারাম। স্থায়ী হোক আর অস্থায়ী হোক। অবশ্য মা অথবা সন্তান অথবা উভয়ের জন্য যদি শারীরিক ভাবে মারাত্মক ধরনের বিপদের আশঙ্কা থাকে এবং কোনো মুমিন মুসলিম ডাক্তার সন্তান বন্ধ করার পরামর্শ দেন তা হলেই কেবল মাত্র অস্থায়ীভাবে বন্ধ করার জন্য কোনো ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। স্থায়ীভাবে সন্তান বন্ধ করার ব্যবস্থা করা সম্পূর্ণ ভাবে হারাম।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে যখন সাহাবায়ে কেরামদের মধ্য থেকে কেউ খাসী হওয়ার জন্য অনুমতি চাইলেন, তখন তিনি অনুমতি দেননি। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِى وَقَّاصٍ قَالَ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَلَى عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ التَّبَتُّلَ وَلَوْ أَذِنَ لَهُ لاَخْتَصَيْنَا

'সাদ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উসমান ইবনে মাজ'উন (রা.) এর নারীদের থেকে আলাদা থাকার (বিবাহ না করার) প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন। যদি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে অনুমতি দিতেন তাহলে আমরা খাসী হয়ে যেতাম।' (মুসলিম, ৩৪৭০; বুখারী, ৫০৭৩; তিরমিযী, ১০৮৩; নাসায়ী, ৩২১২; ইবনে মাজাহ, ১৮৪৮; মুসনাদে আহমাদ, ১৫১৪, ১৫২৫, ১৫৮৮)

ইসলাম সন্তান বন্ধ করতে বলে না। বরং বেশি সন্তান জন্ম দিতে উৎসাহিত করে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ إِنِّى أَصَبْتُ امْرَأَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَجَمَالٍ وَإِنَّهَا لاَ تَلِدُ أَفَأَتَزَوَّجُهَا قَالَ لاَ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَنَهَاهُ ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةَ فَقَالَ تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ الأُمَمَ

'মা'কিল ইবনে ইয়াসার (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যে, এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এসে বললো, 'আমি এমন একজন নারী পেয়েছি যে উচ্চবংশ ও অধিক সৌন্দর্যের অধিকারী। কিন্তু তার সন্তান হয় না। আমি কি তাকে বিয়ে করতে পারি?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'না। বরং তোমরা এমন নারীদের বিয়ে করো যারা স্বামী ভক্ত এবং অধিক সন্তান দেয়। কেননা আমি (কিয়ামত দিবসে) তোমাদের সংখ্যাধিক্যের মাধ্যমে অন্যান্য জাতির ওপর গর্ব করবো।' (আবু দাউদ ২০৫২; নাসায়ী ৩২২৭, ইবনে মাজাহ ১৮৬৩, মুসনাদে আহমাদ ১২৬১৩, বায়হাকী ১৩৫৮৭; হাদীসটি সহীহ)

তৃতীয় প্রধান তাগূত اَلْحَاكِمُ 'বিচারক'

আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করা হয় এবং ইসলামের পরিভাষায় যাদের তাগূত বলা হয় তাদের একটি মারাত্মক তাগূত হলো আল্লাহর

নাযিলকৃত ওহীর বিধানের পরিবর্তে মানবরচিত আইন-বিধান দিয়ে বিচার ফায়সালাকারী বিচারক। আল্লাহর আইনের পরিবর্তে মানব রচিত আইনে বিচার ফায়সালা করার কয়েকটি কারণ হতে পারে।

ক. আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর বিধান কখনোই মানুষের জন্য যথেষ্ট ছিলো না। এবং তা মানুষের জন্য কল্যাণকরও নয়।

খ. আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর বিধান এক সময়ে যথেষ্ট ও কল্যাণকর ছিলো। তবে বর্তমান আধুনিক যুগের উপযোগী নয়। তাই মানবরচিত আইনে বিচার ফায়সালা করে।

গ. আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর বিধান বর্তমানেও চলে তবে মানুষের জন্য তা যতটুকু কল্যাণকর তার চেয়ে মানবরচিত আইন-বিধান বেশি কল্যাণকর।

ঘ. আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর বিধান ও মানবরচিত আইন-বিধান দুটোই সমানভাবে মানুষের জন্য কল্যাণকর ও দুটোই সমানভাবে উপযোগী। এই চার প্রকার আকিদা-বিশ্বাস রেখে যারা মানবরচিত আইন-বিধানে বিচার ফায়সালা করে তারা সর্ব সম্মতিক্রমে কাফের। আরেক প্রকার বিচারক রয়েছে যারা বিশ্বাস করে আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর বিধান-ই হলো একমাত্র সঠিক ও কল্যাণকর বিধান এবং বর্তমান যুগেও এটি সবচেয়ে বেশি উপযোগী। আল্লাহর আইন-বিধানের পরিবর্তে মানব রচিত আইন-বিধান চালু করার কোনো অধিকার নেই। তবে চাকরি ঠিক রাখার জন্য বাধ্য হয়ে মানব রচিত আইন-বিধানে বিচার ফায়সালা করে এরা সালাত, সিয়াম, হজ, জাকাতসহ অন্যান্য ইবাদত সমূহ আদায় করে। এ জাতীয় বিচারদের ব্যাপারে ওলাামা একরামদের দুটি মতামত রয়েছে। একটি হলো উপরোক্ত চার প্রকারের সঙ্গে এই পঞ্চম প্রকারের বিচারকরাও কাফের। কেননা তাদের এই মানব রচিত আইনে বিচার-ফাযসালা করতে কেউ বাধ্য করেনি। তারা যদি সত্যিকারেই আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের প্রতি পূর্ণ ঈমান রাখতো তাহলে তারা কোনো অবস্থাতেই মানবরচিত আইন-বিধানে বিচার-ফায়সালা করতো না। কেননা কোনো মুমিন নারী-পুরুষ আল্লাহর বিচার-ফায়সালা বা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কোনো প্রকার নিজস্ব মতামত বা বিবেচনা করার অধিকার রাখে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ

أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

'আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।' (আহযাব, ৩৩:৩৬)

এ আয়াতে স্পষ্ট বলা হয়েছে আল্লাহ ও তার রাসুলের নির্দেশের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না। অন্য আয়াতে আরো স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, অন্য কিছু এখতিয়ার করা তো দূরের কথা আল্লাহর নাযিলকৃত ওহীর বিধান মেনে নেওয়া সত্ত্বেও যদি তার মনের মধ্যে কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব থাকলেও সে মুমিন হতে পারবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

'অতএব তোমার রবের কসম, তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।' (নিসা, ৪:৬৫)

তাই যারা মানব রচিত আইন-বিধানে বিচার-ফায়সালা করে তারা যতই দ্বীনদার, মুত্তাকী, পরহেযগার, হাজি, গাজি, মুসল্লি যাই হোক না কেনো এবং যেকোনো আকিদাহ-বিশ্বাস পোষণ করুক না কেনো তারা সু-স্পষ্ট কাফের। কেননা পবিত্র কুরআনে কোনো প্রকার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করা ছাড়াই আম ভাবে তাদের কাফের বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে– وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ 'যারা আল্লাহর নাযিলকৃত বিধান মোতাবেক বিচার-ফয়সালা করে না তারাই কাফের।' (মায়েদাহ ৫:৪৪)

পক্ষান্তরে ওলামায়েকেরামদের আরেকটি দল মনে করেন যে, প্রথম চার প্রকার বিচারকদের জন্য এই আয়াতটি প্রযোজ্য অর্থাৎ তারা কাফের। কিন্তু পঞ্চম প্রকারের বিচারকদের জন্য ঐ আয়াতটি প্রযোজ্য নয়। বরং তাদের

জন্য প্রযোজ্য পবিত্র কুরআনের নিম্নের দুটি আয়াতের কোনো একটি। অর্থাৎ তারা জালিম অথবা ফাসিক। কাফের নয়।

প্রথম আয়াত :

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই জালিম।' (মায়েদা, ৫:৪৫)

দ্বিতীয় আয়াত :

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করে না, তারাই ফাসিক।' (মায়েদা, ৫:৪৭)

এখানে মোট তিনটি আয়াত নাযিল করা হয়েছে। প্রথম আয়াতে (সুরা মায়েদার, ৪৪ নং আয়াতে) বলা হয়েছে 'যারা আল্লাহর নাযিলকৃত আইনে বিচার-ফায়সালা করে না তারাই কাফের' দ্বিতীয় (সুরা মায়েদার, ৪৫ নং আয়াতে) আয়াতে বলা হয়েছে 'তারাই জালিম' তৃতীয় (সুরা মায়েদার, ৪৭ নং) আয়াতে বলা হয়েছে 'তারাই ফাসেক'। যদি সর্বাবস্থায় কাফের হতো তাহলে তিনটি আয়াত নাযিল করার অর্থ কি? নিশ্চয়ই এর ভিতরে কোনো অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য রয়েছে। আর তা হলো মানবরচিত আইনে বিচার-ফায়সালাকারী বিচারকদের ভিন্ন ভিন্ন আকিদাহ বিশ্বাস ও উদ্দেশ্য। তাই উপরে বর্ণিত পাঁচ প্রকার বিচারকদের মধ্যে প্রথম চার প্রকারের জন্য সুরা মায়েদার ৪৪ নং আয়াত প্রযোজ্য। অর্থাৎ তারা কাফের। আর পঞ্চম প্রকার বিচারকদের জন্য ৪৫ ও ৪৭ নং আয়াত প্রযোজ্য। অর্থাৎ তারা জালিম ও ফাসেক। কাফের নয়।

ওলামায়েকেরামদের এই দ্বিতীয় মতটি বাহ্যিকভাবে খুবই সুন্দর মনে হলেও প্রকৃত পক্ষে এর কোনো বাস্তবতা নেই। কেননা পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে জালিমদের কাফের বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'আর কাফিররাই জালিম।' (বাক্বারা, ২:২০৪)

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, 'আল্লাহর কিতাব ছাড়া যার কাছে বিচারফায়সালা চাওয়া হয়, তাকেই তাগূত নামে আখ্যায়িত করা হয়।'

অর্থাৎ আল্লাহর কিতাব ছাড়া বিচার ফায়সালাকারীই তাগূত (মাজমু উল ফতোয়া ৭০১/ ৭৮পৃ:)

ইমাম ইবনুল কাইয়্যিম (রহ.) বলেন, 'প্রত্যেক কওমের ঐ ব্যক্তিই হচ্ছে তাগূত, কওমের লোকেরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে (সা.) বাদ দিয়ে যার কাছে বিচার-ফয়সালা চায় ।' (এ'লামলু মুয়াক্কি'ঈন ৪০/১পৃ:)

আল্লামা আবদুল্লাহ বিন আবদুর রহমান আবা-বাতীন (রহ.) বলেন, 'আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের পরিপন্থী সব জাহেলী আইনের মাধ্যমে যারা মানুষের মধ্যে বিচার-ফয়সালা করে তারাও তাগূতের মধ্যে শামিল ।' (মাজমুআতুত্ তাওহীদ ১৭৩/১পৃ:)

পূর্ববর্তী শ্রেণীর তাগূতের বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে আমরা স্পষ্টভাবে দেখেছি যে আইন-বিধান দান হচ্ছে রব হিসেবে আল্লাহর একক অধিকার, এ ক্ষেত্রে কেউই তাঁর শরীক নেই, হতে পারে না। কারণ তিনিই একমাত্র সার্বভৌমত্বের অধিকারী । তিনি মানব জাতির কল্যানার্থে বিভিন্ন অপরাধের জন্য বিভিন্ন শাস্তির বিধান দিয়েছেন। অথচ বর্তমানে এমন অনেক বিচারক আছে যারা আল্লাহর এসব বিধান বাদ দিয়ে নিজেরা বিধান দিচ্ছে, এ কারণে তারা তাগূতে পরিণত হয়েছে। বর্তমানে যারা এ শ্রেণীর তাগূত-

সমাজের মধ্যে এরূপ কিছু নেতা শ্রেণীর লোক আছে যারা মনগড়া বিধানে বিচার-ফায়সালা করে। সমাজে যখন কোনো অপরাধ সংঘটিত হয় তখন মানুষ এদের জড়ো করে এদের কাছে ফায়সালা চায়, তখন এরা নিজেদের মনমত বিধান দিয়ে অপরাধের বিচার করে। যেমন চুরির অপরাধের ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধান হচ্ছে হাত কাটা। কিন্তু এদের কাছে যখন মানুষ যায়, তখন এরা চুরির অপরাধের জন্য বিধান দেয়– চোরকে এতটা জুতার বাড়ি, এত টাকা জরিমানা কিংবা জুতার মালা গলায় দিয়ে হাঁটানো, পায়ে আঁক দেয়া, নাকে খত দেয়া ইত্যাদি।

আবার যিনা-ব্যভিচারের ক্ষেত্রে আল্লাহর ফায়সালা হচ্ছে– যিনাকার অবিবাহিত হলে একশ দোররা মারা আর যদি বিবাহিত হয় তবে বুক পর্যন্ত মাটিতে পুঁতে পাথর নিক্ষেপ করে হত্যা করা (রজম করা) এবং একদল মু'মিন সেটা প্রত্যক্ষ করা। অথচ এদের কাছে যখন উক্ত অপরাধের বিচার চায় তখন এরা বিধান দেয়– যিনাকারের এত হাজার টাকা জরিমানা, সমাজ বহির্ভূত করা অথবা ছেলেমেয়ের বিয়ে পড়িয়ে দেয়া ইত্যাদি। এরূপভাবে আল্লাহর বিধান বাদ দিয়ে নিজেরা বিধান দিয়ে এরা তাগূতে পরিণত হয়েছে

আর মানুষ তাদের সেই বিধানকে গ্রহন করে আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের রব রূপে গ্রহন করছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'তাদের কি এমন শরীক দেবতা আছে, যারা তাদের জন্য সে দ্বীন সিদ্ধ করেছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না থাকত, তবে তাদের ব্যাপারে ফয়সালা হয়ে যেত। নিশ্চয়ই জালেমদের জন্যে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ।' (শুরা ৪২:২১)

চতুর্থ প্রধান তাগূত : পীর-ফকির আহবার-রুহবান

আল্লাহর পরিবর্তে যাদের ইবাদত ও আনুগত্য করা হয় যাদের ইসলামের পরিভাষায় তাগূত বলে আখ্যায়িত করা হয় তাদের আরেকটি প্রকার মারাত্মক তাগূত হলো পীর-ফকির ও দরগাহ-মাজার। এটি অন্যান্য তাগূতের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর ও মারাত্মক ক্ষতিকর। কেননা অন্যান্য তাগূতগুলো আল্লাহর ইবাদতের পরিবর্তে নিজেদের ইবাদতের দিকে মানুষদের আহ্বান করলেও তা ধর্মের নামে করে না। কিন্তু এই প্রকারের তাগূত মানুষদের নিজেদের ইবাদত ও আনুগত্যের দিকে আহ্বান করে ধর্মীয় ইবাদতের আদলে। সে কারণে সাধারণ মানুষ আল্লাহর ইবাদত মনে করেই তাদের ইবাদত করে থাকে। এরা সাধারণত মানুষের থেকে দুই ভাবে ইবাদত নেয়। আকিদাহ ও বিশ্বাসগতভাবে এবং আমলগতভাবে। আকিদাহগত বিষয় : যেমন চরমোনাই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা পীর সৈয়দ মোহাম্মদ এছহাক সাহেব বলেন, **ক)** 'পীরের কাছে মুরীদ হওয়া ফরজ' (মাওয়াজে এছহাকিয়া ৫৫ পৃ:), **খ)** 'যদি তোমার দুইজন পীর হয় আর যদি আল্লাহ উভয় পীরকে মাফ করেন কেয়ামতের দিন নাজাত দেন, তবে- 'দুই পীর তোমার দুই ডানা ধরে বেহেশতে নিয় যাবেন। কোনোই ক্ষতি নাই।' (মাওয়াজে এছহাকিয়া ৫৫-৫৬ পৃ:)

অথচ ফরজ বিধান দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। কুরআন ও সহীহ হাদীসের সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ ব্যতীত কোনো ইবাদতকে ফরজ বলা যায় না। তারপর দুই পীর দুই ডানা ধরে বেহেশতে নিয়ে যাওয়া এটারও কোনো দলিল-প্রমাণ নেই। চাই সে যতো বড় পীর

আর যত বড় কামেল ওলী আল্লাহ হোক না কেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও নিজের কন্যা ফাতেমা (রা.) কে ডেকে বলেছেন। হে ফাতেমা! তুমি নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাও। আমি তোমার কোনো উপকার করতে পারবো না। বিস্তারিত হাদীসটি নিম্নে পেশ করা হলো–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا أُنْزِلَتْ هَذِهِ الآيَةُ (وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ) دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوا فَعَمَّ وَخَصَّ فَقَالَ يَا بَنِى كَعْبِ بْنِ لُؤَىٍّ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى عَبْدِ شَمْسٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى عَبْدِ مَنَاف أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى هَاشِمٍ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ أَنْقِذِى نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّى لاَ أَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا غَيْرَ أَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَأَبُلُّهَا بِبَلاَلِهَا

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, যখন এই আয়াত নাযিল হলো 'হে নবী! আপনি আপনার নিকটত্মীয়কে আখিরাতের ব্যাপারে সতর্ক করুন' তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের সাধারণ এবং বিশেষ ব্যক্তিদের আহবান করলেন এবং বললেন, হে কাব ইবনে লুআই এর বংশধরেরা! তোমরা নিজেদের আগুন থেকে বাঁচাও। হে মুররা ইবনে কাবের বংশধরেরা! তোমরা নিজেদের আগুন থেকে বাঁচাও। হে আবদে শামসের বংশধরেরা! তোমরা নিজেদের আগুন থেকে বাঁচাও। হে আবদে মানাফের বংশধরেরা! তোমরা নিজেদের আগুন থেকে বাঁচাও। হে বণী হাশেম! তোমরা নিজেদের আগুন থেকে বঁচাও। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধরেরা তোমরা নিজেদের আগুন থেকে বাঁচাও। হে ফাতেমা! তুমি নিজেকে আগুন থেকে বাঁচাও। মনে রেখ! (ইমান ব্যতিরেকে) আমি তোমাদের কোনো কাজে আসব না। তবে হ্যাঁ! তোমাদের সাথে আমার যেই আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে তা আমি অবশ্যই অটুট রাখবো।' (মুসলিম ৫২২, নাসায়ী ৩৬৪৬, মুসনাদে আহমাদ ২৪০২, ৮৭২৬, ১০৭২৫, মেশকাত ৫৩৭৩)

গ) পীর-সুফিগণ মাঝে মধ্যে আল্লাহর বিরুদ্ধেও জঘন্য মন্তব্য করতে দ্বিধাবোধ করে না। যেমন চরমোনাইয়ের প্রতিষ্ঠাতা পীর সৈয়দ মোহাম্মদ

এছহাক সাহেব বলেন, ... 'কুতুব সাহেব উত্তর করিলেন, মা'বুদের কাছে আবার কি জিজ্ঞাসা করিব– তাঁহার আন্দাজ নাই? এই বৃদ্ধার একটি মাত্র পুত্র ছিল তাহাও নিয়াছে। বাকি ছিল এই নাতিটি, যে গাভী পালন করিয়া কোনোরূপ জিন্দেগী গুজরান করিত, এখন এটিও নিয়া গেল। তাই আমি আল্লাহ্ পাকের দরবার থেকে জোরপূর্বক রূহ্ নিয়া আসিয়াছি। ভেদে মারেফাত বা ইয়াদে খোদা নামক বইয়ের ১৫ নং পৃ: শামছুত তাব্‌রিজী (র)-এর নকল শিরোনামে, প্রকাশক : আল-এছহাক পাবলিকেশন্স, ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০০, সংশোধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ : নভেম্বর, ২০০৬ ইং)

অথচ জীবন-মৃত্যু দেওয়ার একমাত্র মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা। তিনি সবকিছুই আন্দাজ তথা পরিমিতভাবে করেন। কিন্তু এখানে পীর সাহেব আল্লাহর বিরুদ্ধে 'আন্দাজ নাই' বলে এক জঘন্য মন্তব্য ছুড়ে দিলেন যা আল্লাহর সঙ্গে চরম বেয়াদবী ছাড়া আর কিছুই না। বর্তমানে তারা নতুন সংস্করণে এটাকে বৈধ করার জন্য টিকা সংযোজন করেছে। 'এ ধরনের কথা বলা– আমাদের মতো সাধারণ লোকদের জন্য পরিষ্কার কুফুরী গণ্য হইবে। কিন্তু আল্লাহ্ পাকের দেওয়ানা বান্দারা এশকের চরম হালতে অন্তরের ভারসাম্য হারাইয়া এক প্রকার বেহুঁশ অবস্থায় কদাচিৎ এরূপ বলিয়া ফেলেন।

মাওলানা রূমী (র.) বলিয়াছেন- আল্লাহ্ পাকের আশেকদের এ ধরনের উক্তি এশ্‌কের জোশ বশত ঘটিয়া যায়, তাই আল্লাহ্ পাকের নিকট তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হয় না। যেরূপ শিশু যদি পিতার মুখে থাপ্পড় মারে কিংবা দাড়ি ছিড়িয়া ফেলে, পিতার নিকট তা পীড়াদায়ক হয় না বরং তাতে আরও মহব্বতের জোয়ার উঠে।'

এখানে প্রথমে স্বীকার করা হয়েছে যে, এ ধরনেরকথা-বার্তা পরিষ্কার কুফুরী। পরে বলা হয়েছে, এশকের চরম হালতে অন্তরের ভারসাম্য হারাইয়া এক প্রকার বেহুঁশ অবস্থায় কদাচিৎ এরূপ বলিয়া ফেলেন। তাহলে বেহুঁশ বা পাগল-ছাগলের কথা বর্ণনা করার কী প্রয়োজন? কারণ বেহুঁশ ও পাগলের ওপর ইসলামী শরী'আতের কোনো বিধান প্রযোজ্য নয়। শরী'আতের বিধান প্রযোজ্য হওয়ার জন্য আক্বল বালেগ, প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া জরুরি। তারপর বলা হয়েছে, ' শিশু যদি পিতার মুখে থাপ্পড় মারে কিংবা দাড়ি ছিড়িয়া ফেলে, পিতার নিকট তা পীড়াদায়ক হয় না। বরং তাতে আরও মহব্বতের জোয়ার উঠে।' তাহলে কি পীর সাহেবরা

এবং তার মুরীদরা সকলেই ইয়াহুদি-খ্রিস্টানদের মতো নিজেদের আল্লাহর সন্তান ও নাতি-পুতি বলে দাবি করছে? আমাদের জানামতে ইয়াহুদি-খ্রিস্টানরা নিজেদের আল্লাহর সন্তান ও নাতি-পুতি বলে দাবি করেছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ

'ইয়াহুদি ও নাসারারা বলে, আমরা আল্লাহর পুত্র ও তার প্রিয়জন।' (মায়েদা ৫:১৮)

তাছাড়া শিশুরা অবুঝ। অবুঝ বলেই শরী'আতের বিধি-বিধান তাদের জন্য প্রযোজ্য নয়। তাহলে উনাদের পীর-মুরীদ এবং তাদের শামসুত তাবরীজিসহ সকলেই কি অবুঝ শিশু? শিশুরা তো বাবার কোলে পেশাব-পায়খানাও করে দেয়। তাহলে উনারা আবার এমনকিছু করছেন না তো? মূলত তাদের এ সকল কথাবার্তা কুরআন হাদীসের দলিল-প্রমাণ ছাড়া পাগলের প্রলাপ ছাড়া কিছুই নয়। এগুলো থেকে মুসলিম জাতিকে সাবধান থাকা উচিত।

ঘ. ইসলামের আকিদাহ হলো কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসুল প্রদর্শিত শরী'আহ কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে। কোনো অবস্থাতেই কারো ওপর থেকে শরীআহ রহিত হয়ে যায় না। কিন্তু পীর-সুফিদের মতে কামেল পীরের নির্দেশ হলে শরী'আতের প্রকাশ্য বিধানকেও অমান্য করতে হবে। যেমন : সুফিদের ইমাম হাফেজ রুমীর প্রসিদ্ধ কিতাব 'মাসনবী' এর বরাত দিয়ে চরমোনাইয়ের প্রতিষ্ঠাতা পীর সৈয়দ মো. এছহাক সাহেব বলেন–

بمی سجادہ رنگین کن گرت پیر مغاں گوید # کہ سالک بے خبر نہ بود زراہ ورسم منزل

'কামেল পীরের আদেশ পাইলে নাপাক শারাব (মদ) দ্বারাও জায়নামাজ রঙিন করিয়া তাতে নামাজ পড়। অর্থাৎ শরী'আতের কামেল পীর সাহেব যদি এমন কোনো হুকুম দেন, যা প্রকাশ্যে শরী'আতের খেলাফ হয়, তবুও তুমি তা নিরাপত্তিতে আদায় করবে। কেননা, তিনি রাস্তা সব তৈরি করেছেন। তিনি তার উঁচু-নিচু অর্থাৎ ভালোমন্দ সব চিনেন, কম বুঝের দরুন জাহেরিভাবে যদিও তুমি তা শরীয়তের খেলাফ দেখ কিন্তু মূলে

খেলাফ নয়।' ('আশেক মাশুক বা এস্কে এলাহী' ৩৫ পৃষ্ঠা, আল-এছহাক প্রকাশনী, ইসলামী টাওয়ার, ১১/১- বাংলাবাজার, ঢাকা, সংশোধীত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ- নভেম্বর ২০০৬)

ঙ. পীর-সুফিগণ অনেক সময় অকপটে স্বীকার করেন যে, তাদের ধর্ম ও মাযহাব ভিন্ন। অর্থাৎ কুরআন সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত যে ধর্ম ও মাযহাব অর্থাৎ ইসলাম পীর সাহেবদের মাযহাব ও ধর্ম সে ইসলাম নয়। বরং তাদের ধর্ম ও মাযহাব শুধু খোদা কেন্দ্রিক। অর্থাৎ খোদা থেকে তারা সরাসরি নির্দেশ পেয়ে থাকে। এজন্য তাদের শরী'আতের হুকুম মানার প্রয়োজন হয় না। এ প্রসঙ্গে চরমোনাইয়ের পীর বলেন,

عاشقاں راملت ومذہب جداست # عاشقاں راملت ومذہب خداست

'মাওলানা রুমি ফরমাইয়াছেন– প্রেমিক লোকদের জন্য মিল্লাত ও মাজহাব ভিন্ন। তাহাদের মিল্লাত ও মাজহাব শুধু মা'বুদ কেন্দ্রিক।' (ভেদে মারেফাত বা ইয়াদে খোদা, পৃ: ৭২)

এমনকি আধ্যাত্মিকতার শীর্ষ মাকামে গেলে কোনো ইবাদত করার প্রয়োজন নেই তো বটেই বরং ইবাদত করার ইচ্ছে করলেও সে কাফের হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে চন্দ্রপাড়ার পীর বলেন, 'হাক্কুল ইয়াকীন বা চূড়ান্ত প্রত্যয়ের মাধ্যমে একক সত্তায় উপনীত হওয়ার পর ঈমানের মাত্রাও শেষ হয়ে যায়। কেবল ইয়াকীন অবশিষ্ট থেকে যায়। এখানে এসেই হাক্কানী বা প্রকৃত বান্দাগণের ইবাদতের ধারার পরিসমাপ্তি ঘটে। মহান আল্লাহর বক্তব্যই তা সমর্থন করে। যেমন আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ

'ওয়া'বুদ রাব্বাকা হাত্তা ইয়া'তিইয়াকাল ইয়াকীন' (হিজ্‌র ১৫:৯৯)

'এবং আল্লাহর বন্দেগী করো, যতক্ষণ না তোমার ইয়াকীন পূর্ণতা পায়।' এ পর্যায়ে উপনীত হওয়ার মাধ্যম হলো এরফান বা আধ্যাত্মিকতা। অর্থাৎ আরেফদের জন্য এরফান ছাড়া অন্য কোনো ইবাদত নেই। যদিও ইবাদতের রূপে অনেক কিছুই করা হয়, তবু এর তাৎপর্য হচ্ছে তাওহীদ। মাকামে তাওহীদ অর্জন করার পর বন্দেগী করা কুফরি। নাউযুবিল্লাহ মিনহা (এ থেকে আল্লাহ্‌র কাছে আমরা পানাহ্ চাই)। এ প্রসঙ্গে গাউসুল আযম বড়পীর রাহমাতুল্লাহে আলাইহি বলেছেন–

مَنْ اَرَادَ الْعِبَادَةَ بَعْدَ اتِّصَالِ فَهُوَ كَافِرٌ

'মান আরাদাল ইবাদাতা বা'দাত্ তিসালী ফাহুয়া কাফির ।'
'যে ব্যক্তি মাকামে তাওহীদ বা আল্লাহর সান্নিধ্যে উপনীত হয়ে ইবাদতের ইচ্ছা করেছে, সেই কাফির ।' (সিররে হক্ক জামে নূর, সুফি সৈয়্যেদ আহ্মদ আলী সুরেশ্বরী, প্রকাশকাল: ৩রা ফেব্রুয়ারী ২০০৪ খৃ:)
এ হলো পীরের বক্তব্য অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত জামাতে সালাত আদায় করে গেছেন । সাহাবায়ে কিরামগণও করেছেন । এমনকি পূর্বের নবী-রাসুলরাও এমনটি করেছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

'আমি যেখানেই থাকি, তিনি আমাকে বরকতময় করেছেন । তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, যতদিন জীবিত থাকি, ততদিন সালাত ও জাকাত আদায় করতে ।' (মারইয়াম ১৯:৩১)

চ. পীর-সুফিগণ অনেকসময় কুরআন-সুন্নাহ বহির্ভূত মনগড়া ইবাদত তৈরি করে । যেমন পীর-সুফিদের প্রসিদ্ধ ৬ লতিফার যিকির সম্পর্কে চরমোনাই দরবারের প্রতিষ্ঠাতা পীর সৈয়দ মো. এছহাক সাহেব বলেন, '৬ লতিফার কথা কোরআনে পাক ও হাদীস শরীফে নাই, তবে আল্লাহ পাকের ওলীগণ আল্লাহ পাককে পাইবার জন্য একটা রাস্তা হিসেবে ইহা বাহির করিয়াছেন ।' (ভেদে মারেফাত ৩৪ পৃ: , আল-এছহাক পাবলিকেশন্স, ইসলামী টাওয়ার, ১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, সংশোধিত ও পরিমার্জিত নতুন সংস্করণ: নভেম্বর, ২০০৬)
এ হলো পীর-সুফিদের নতুন ইসলামের সামান্য চিত্র । এছাড়া বহু তরীকা আবিষ্কার, কেউ ১২৬ তরীকা (যেমন চরমমোনাই পীরের প্রায় সব কিতাবেই বলা হয়েছে), আবার কেউ ৩৫০ তরীকা (সুফি-দর্শন) আবিষ্কার করেছেন । আবার এগুলোর জন্য একএক তরীকার একএক জিকির । আবার সেই জিকিরের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি ও অঙ্গভঙ্গি, ইত্যাদী আবিষ্কার করা । এসবকিছুই কুরআন সুন্নাহ বাদ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে । যা আল্লাহর শরী'আত থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও স্বতন্ত্র এক শরী'আহ । যা পীর-সুফিগন নিজেরা তৈরি করেছেন । অথচ এ জাতীয় শরী'আহ তৈরি করার অধিকার আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কাউকে দেননি । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'তাদের জন্য কি এমন কিছু শরীক আছে, যারা তাদের জন্য দ্বীনের বিধান দিয়েছে, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? আর ফয়সালার ঘোষণা না থাকলে তাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয়েই যেত । আর নিশ্চয়ই জালিমদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব ।' (শুরা ৪২:২১)
এ আয়াতে আল্লাহ (সুব:) কঠোরভাবে নতুন কোনো শরী'আহ তথা ইবাদতের পদ্ধতি তৈরি করতে নিষেধ করেছেন । আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আহর ভেতরে বহু তরীকার কোনো স্থান নেই । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ

'তিনি তোমাদের জন্য দ্বীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন; যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইব্রাহিম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তা হলো, তোমরা দ্বীন কায়েম করবে এবং এতে বিচ্ছিন্ন হবে না । তুমি মুশরিকদের যেদিকে আহ্বান করছ তা তাদের কাছে কঠিন মনে হয়; আল্লাহ যাকে চান তার দিকে নিয়ে আসেন । আর যে তাঁর অভিমুখী হয় তাকে তিনি হিদায়াত দান করেন ।' (শুরা ৪২:১৩ ।)
এমনিভাবে আল্লাহ প্রদত্ত শরী'আহ বা কুরআন-সুন্নাহ ও আল্লাহর শরী'আতের বিপরীতে কেউ কোনো হুকুম দিলে তা মান্য করা যাবে না । এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে−

عَنْ أُمِّ حُصَيْنٍ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وسَلَّم لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الخَالِقِ

'উম্মে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন− স্রষ্টাকে অমান্য করে সৃষ্টিজগতের কারো আনুগত্য চলবে না' । (জামেউল আহাদীস: হা: ১৩৪০৫, মুয়াত্তা: হা: ১০, মু'জামূল

কাবীর: হা: ৩৮১, মুসনাদে শিহাব: হা: ৮৭৩ আবি শাইবা: হা: ৩৩৭১৭, কানযুল উম্মাল: হা: ১৪৮৭৫ ।)

এই হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আল্লাহর শরী'আহ্ এর বিপরীতে কারো আনুগত্য করা যাবে না। হোক সে মা-বাপ, বড় ভাই, ময়-মুরুব্বী, পীর-মুর্শিদ, আমির-উমারা, কারো আনুগত্য করা যাবে না যদি তারা আল্লাহর শরী'আতের বিপরীতে কোনো হুকুম করে। এর একটি উজ্জ্বল উদাহরণ পাওয়া যায় নিম্নের হাদীসটিতে–

عَنْ عَلِىٍّ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلاً مِنَ الأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَأَغْضَبُوهُ فِى شَىْءٍ فَقَالَ اجْمَعُوا لِى حَطَبًا فَجَمَعُوا لَهُ ثُمَّ قَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقَدُوا ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنْ تَسْمَعُوا لِى وَتُطِيعُوا قَالُوا بَلَى قَالَ فَادْخُلُوهَا قَالَ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مِنَ النَّارِ فَكَانُوا كَذَلِكَ وَسَكَنَ غَضَبُهُ وَطُفِئَتِ النَّارُ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا خَرَجُوا مِنْهَا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِى الْمَعْرُوف

'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সেনাদল যুদ্ধাভিযানে প্রেরণ করলেন। এক আনসারী ব্যক্তিকে তাদের সেনাপতি নিযুক্ত করলেন এবং সাহাবীদের তার কথা শুনা ও মানার জন্য নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তাদের কোনো আচরণে সেনাপতি রাগ করলেন। তিনি সকলকে লাকড়ি জমা করতে বললেন। সকলে লাকড়ি জমা করলো এরপর আগুন জ্বালাতে বললেন। সকলে আগুন জ্বালালো। তারপর সেনাপতি বললো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তোমাদের আমার আনুগত্য করার এবং আমার কথা শুনা ও মানার নির্দেশ দেন নাই? সকলেই বললো, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাহলে তোমাদের প্রতি আমার নির্দেশ তোমরা সকলেই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়। সাহাবীরা একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন এবং বললেন, আমরাতো আগুন থেকে বাঁচার জন্যই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসেছি। তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা না করা পর্যন্ত আমরা আগুনে ঝাঁপ দিবো না। এ অবস্থায় কিছুক্ষন পর তার রাগ ঠাণ্ডা হলো এবং

আগুনও নিভে গেল। যখন সাহাবারা মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন তখন বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে উপস্থাপন করা হলো। উত্তরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন 'তারা যদি আমিরের কথা মতো আগুনে ঝাঁপ দিতো তাহলে তারা আর কখনোই তা থেকে বের হতে পারতো না। প্রকৃতপক্ষে আনুগত্য কেবল ন্যায় এবং সৎ কাজেই।' (মুসলিম ৪৮৭২; বুখারী ৪৩৪০; মুসলিম ৪৬১৫)

এ হাদীস থেকে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, শরিয়তের বিরূদ্ধে কারো হুকুমের আনুগত্য করা যাবে না। না কোনো ওলী-বুযুর্গের, আর না কোনো পীরে মুগাঁর।

ছ. পীর-সুফিদের আক্বীদাহ্ বিশ্বাস হলো আল্লাহর কাছে কোনো কিছু চাইতে হলে পীর-ওলী বুযুর্গদের ভায়া মাধ্যম ছাড়া সম্ভব নয়। কোনো ব্যক্তি যদি অন্যায় করে আল্লাহর কাছে সরাসরি ক্ষমা চায়, সেক্ষেত্রে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে সরাসরি ক্ষমা করেন না। এ প্রসঙ্গে চরমোনাইয়ের পীর সাহেব বলেন, 'বান্দা অসংখ্য গুনাহ করার ফলে আল্লাহ পাক তাকে কবুল করতে চান না। পীর সাহেব আল্লাহ পাকের দরবারে অনুনয়-বিনয় করিয়া ঐ বান্দার জন্য দোয়া করবেন যাতে তিনি কবুল করে নেন। ঐ দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক তাহাকে কবুল করে নেন।' (ভেদে মারেফাত বা ইয়াদে খোদা বইয়ের ৩৪ পৃ:)

অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন–

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمً

'আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি জুলুম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (নিসা ৪:১১০)

পবিত্র কুরআনের এই আয়াত বলছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সরাসরি গুনাহগারদের ক্ষমা করে দেন। কোনো ভায়া-মাধ্যমের শর্তারোপ করেন নাই। আর চরমোনাইয়ের পীর সাহেব বললেন, 'আল্লাহ সরাসরি মাফ করেন না'। আমরা কার কথা বিশ্বাস করবো? চরমোনাই পীর সাহেবের কথা না আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এর নিজের কথা। অবশ্যই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এর কথা বিশ্বাস করতে হবে।

তার উপরে ঈমান রাখতে হবে। মনগড়া কারো কোনো কথা বিশ্বাস করা যাবে না। মূলত এই পীর সাহেবরা আল্লাহ এবং বান্দার মাঝখানে নিজেদের ভায়া-মাধ্যম বানিয়ে আল্লাহর ইবাদতগুলোর মধ্যে নিজেদের অংশীদার বানায়। আর এভাবে যারা আল্লাহর ইবাদতকে নিজেরা গ্রহণ করে অথবা আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে নিজেদের শরীক বানায় তারাই তাগূত। এরা আল্লাহর পরিবর্তে নিজেদের রবের আসনে বসিয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ

'তারা আল্লাহকে ছেড়ে তাদের পণ্ডিত ও সংসার-বৈরাগীদের রব হিসেবে গ্রহণ করেছে।' (তাওবাহ ৯:৩১)

আর এর মাধ্যমে মূল উদ্দেশ্য পর্থিব জীবনের অর্থ সম্পদ উপার্জন করা। এ কারণে তারা মুরিদের আদব বর্ণনা করতে গিয়ে বলে থাকেন পীরের সাথে খালি হাতে দেখা করা ঠিক নয়। বরং কিছু হাদিয়া-তোহফা নিয়ে আসতে হয়। এভাবে তারা সাধারণ মানুষকে ধর্মীয় দুর্বলতার সুযোগে বোকা বানিয়ে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তি গড়ে তোলে। এরা মুরীদদের দুনিয়ার ধন-সম্পদের মায়া ত্যাগ করে ফকির-দরবেশ ও জঙ্গলের প্রবাসী হওয়ার উপদেশ দিলেও নিজেরা দামি গাড়ি, আলীশান বাড়ি, একাধিক সুন্দরী নারীসহ বিলাসবহুল জীবনযাপন করেন। তাদের মৃত্যুর পরে তাদের রেখে যাওয়া সম্পদের পাহাড় ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে ওয়ারিশদের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ হতে দেখা যায়। এমনকি মামলা মোকদ্দমা হয়ে তা সর্বোচ্চ আদালত পর্যন্ত গড়ায়। যা এদেশের কিছু বড় বড় পীরদের ব্যাপারে খোঁজ নিলেই জানা যাবে। এজন্যই কোনো কবি বলেছেন–

'ইয়েহ্ হাল তেরা জাল হ্যাঁয়,
মকসুদ তেরা মাল হ্যাঁয়
কিয়া আজব তেরা চাল হ্যাঁয়।'

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে এ জাতীয় তাগূতদের মুখোশ উন্মোচন করে ইরশাদ করেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয়ই পণ্ডিত ও সংসার বৈরাগীদের অনেকেই মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে।' (তাওবাহ ৯:৩৪)

পীর-মুরিদির যে সিলসিলা বর্তমানকালে দেখা যাচ্ছে, এ জিনিস সম্পূর্ণ নতুন ও মনগড়াভাবে উদ্ভাবিত। এ জিনিস রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে ছিল না, তিনি কখনো পীর-মুরিদি করেন নি। তিনি নিজে বর্তমান অর্থে না ছিলেন পীর আর না ছিলেন সাহাবায়ে কিরাম তাঁর মুরিদ। সাহাবায়ে কিরামও কখনো এই পীর-মুরীদী করেন নি। তাঁদের কেউ কারো 'পীর' ছিলনা এবং কেউ ছিলো না তাদের মুরিদ। তাবেঈন ও তাবে-তাবেঈনের যুগেও এ পীর-মুরিদির নাম চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না।

শুধু তাই নয়। কুরআন হাদীস তন্ন তন্ন করে খুঁজেও এ পীর-মুরিদির কোনো দলিলের সন্ধান পাওয়া যাবে না। অথচ বর্তমানকালের এক শ্রেণীর পীর নামে কথিত জাহিল লোক ও তাদের ততোধিক জাহিল মুরিদ এ পীর-মুরিদিকে ইসলামের অন্যতম ভিত্তিগত জিনিস বলে প্রচারণা চালাচ্ছে। আর এর মাধ্যমে অজ্ঞ মুর্খ লোকদের মুরিদ বানিয়ে এক একটি বড় আকারের বিনা পুঁজির ব্যবসা সাজিয়ে বসেছে।

শরীয়াত মারিফাত : পীর-সুফিগণ ইসলামের সবচেয়ে বেশি যে সর্বনাশটি করেছে তা হলো শরী'আত ও তরীকতকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন এবং দুই স্বতন্ত্র জিনিস মনে করা। এতদূর পতন ঘটেছে যে, শরীয়াতকে 'ইলমে জাহের' এবং 'তরিকত বা মারিফাতকে ইলমে বাতেন বলে অভিহিত করে দ্বীন ইসলামকেই দ্বিধাবিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। এক শ্রেণীর জাহিল তরীকতপন্থী বলতে শুরু করেছে যে, ইসলামের আসলই তরীকত মারিফাত, আর এই হাকীকত। এ হাকীকত কেউ যদি লাভ করতে পারল, তাহলে তাকে শরী'আত পালন করতে হয় না, সেতো আল্লাহকে পেয়েই গেছে। তাদের মতে শরী'আতের আলিম এক, আর মারিফাত বা তরীকতের আলিম অন্য। এ তরীকতের আলিমরাই উপমহাদেশে পীর নামে অভিহিত হয়ে থাকেন।

কিন্তু তাসাউফবাদীরা এ মারিফাতকে কেন্দ্র করে গোলক ধাঁধার এক প্রাসাদ রচনা করেছে। তাদের মতে মারিফাত বা ইলমে বাতেন ইসলামী শরী'আত

থেকে তা সম্পূর্ণ ভিন্ন এক জিনিস। তাদের মতে রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম না কি এ মারিফাত তাঁর কোনো কোনো সাহাবীকে শিক্ষা দিয়েছিলেন, আর অনেককে দেননি। তাঁরা আরো মনে করেন, ইলমে বাতেন আলী (রা.) থেকে হাসান বসরী পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর তাঁরই থেকে সীনায়-সীনায় এ জিনিস চলে এসেছে এ কালের পীরদের পর্যন্ত।

এই সমস্ত কথাই সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কেননা রাসুলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকেই এ জিনিস শিখিয়ে জান নি, যা এখনকার পীর তার মুরিদকে শিখিয়ে থাকে। তিনি এরূপ করতে কাউকে বলেও যান নি। কোনো দরকারী ইলম তিনি কোনো কোনো সাহাবীকে শিখিয়ে দেবেন, আর অনেক সাহাবীকেই তা থেকে বঞ্চিত রাখবেন এরূপ করা নবী করীমের নীতি ও আদর্শের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। তা ছাড়া হাসান বসরি (র.) বড় হওয়ার পর আলী (রা.) এর সাক্ষাৎ পাননি, তাঁর নিকট থেকে মারিফাত শিক্ষা করা ও খিলাফতের 'খিরকা' লাভ করা তো দূরের কথা। আসলে এ কথাটাই বাতিল। শেষের জামানার লোকেরা এটাকে রচনা করেছে ও কবুল করেছে। আর এ ধরনের কথা আদৌ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী আল্লামা ইবনে হাযার আসকালানীর (৭৭৩হি.-৮৫২ হি. যিনি বুখারী শরীফের শরাহ বা ভাষ্য গ্রন্থ 'ফতহুল বারী' লিখেছেন) উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন সুফি ও মারিফাতপন্থীরা যে সব তরীকা ও নিয়ম-নীতি প্রমাণ করতে চায়, তা প্রমাণ হওয়ার মতো কোনো জিনিসই নয়। সহীহ, হাসান বা যয়ীফ কোনো প্রকার হাদীসেই একথা বলা হয়নি যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোনো সাহাবীকে তাসাউফপন্থীদের প্রচলিত ধরনের খিলাফতের 'খিরকা' (বিশেষ ধরনের জামা বা পোশাক) পরিয়ে দিয়েছেন। সেরূপ করতে তিনি কাউকে হুকুমও করেননি। এ পর্যায়ে যা কিছু বর্ণনা করা হয়, তা সবই সুস্পষ্টরূপে বাতিল। তা ছাড়া আলী (রা.) হাসান বসরিকে 'খিরকা পরিয়েছেন (মারিফাতের খিলাফাত দিয়েছেন) বলে যে দাবি করা হয়, তা সম্পূর্ণরূপে মনগড়া মিথ্যা কথা।

শাহ ওয়ালী উল্লাহ দেহলভী এ সম্পর্কে লিখেছেন মারিফাতের যেসব তরীকা, মুরাকাবা-মুশাহাদা ও যিকির এখনকার পীরেরা তাদের মুরীদদের শিখিয়ে থাকে, তা রাসুল করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা

সাহাবায়ে কিরামের জামানায় ছিল না। উপায়-উপার্জন ত্যাগ করা, তালিযুক্ত পোশাক পরা ও বিয়ে-ঘর সংসার না করা ও খানকার মধ্যে বসে থাকা সেকালে প্রচলিত ছিল না।

ওয়াহ্দাতুল ওযুদ :

পীর-সুফিদের মতে বান্দা আল্লাহর ইবাদত করতে করতে এমন এক পর্যায়ে পৌছে যায় যখন বান্দার মধ্যে আর আল্লাহর মধ্যে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। চিনি যেরকম পানির সাথে মিশে যায় আল্লাহর ওলীরাও তেমনিভাবে আল্লাহর সাথে মিশে যায়। সুফিদের পরিভাষায় এটাকে 'হুলুল' বলা হয়। এই আক্বীদাহ্র রূপকার হিসেবে মানসুর হাল্লাজকে মনে করা হয়। পীর-সুফিদের অপর অংশের মতো হলো বান্দা ও আল্লাহ্ কখনোই ভিন্ন ছিলো না। বরং সবকিছুই আল্লাহর প্রতিচ্ছবি। আল্লাহর ভিন্ন কোনো অস্তিত্ব নেই। তিনি সব কিছুর মধ্যে মিশে আছেন। আর এ কারণেই তারা বিশ্বাস করে 'মুমিন বান্দার কলব হলো আল্লাহর আরশ।' এই আক্বীদাহ্ ওয়াহদাতুল ওযুদ নামে প্রসিদ্ধ। এই মতবাদের প্রথম রূপকার হিসেবে সুফিদের শায়খে আকবার মহিউদ্দীন ইবনে আরাবী-কে মনে করা হয়। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে এ দর্শনের সঠিক পরিচয় হল অদ্বৈত্যবাদ (হিন্দুদের আকীদার ভিত্তি)। মানে আল্লাহ ও জগত কিংবা স্রষ্টা এবং যিনি স্রষ্টা অভিন্ন বিশ্বাস করা যা একটি স্পষ্ট ভ্রান্ত আক্বিদা। যা সৃষ্টি তাই স্রষ্টা এবং যিনি স্রষ্টা তিনিই সৃষ্টি- অদ্বৈত্যবাদী মতাদর্শের এই গোড়ার কথা। আর তা-ই হচ্ছে হিন্দু ধর্মের তত্ত্ব, যা বর্তমানে পীর-মুরিদি ধারায় ইসলামের মারিফাত নাম ধারণ করে মুসলিম সমাজে প্রচলিত হয়েছে এবং এ যে স্পষ্ট শিরক তাতে এক বিন্দু সন্দেহের অবকাশ নেই। বস্তুত ইসলাম এক সর্বাত্মক দ্বীন, মানুষ যখন শরী'আত মুতাবিক আমল করে, তখন হয় শরী'আতের আমল। পীর-মুরিদি সম্পর্কে মুজাদ্দিদে আলফেসানী শরী'আত ও মারিফাত পর্যায়ে তিনি তাঁর মাকতুবাতে লিখেছেন, কাল কিয়ামতের দিন শরী'আত সম্পর্কেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, তাসাউফ সম্পর্কে কিছুই জিজ্ঞাসা করা হবে না। জান্নাতে যাওয়া ও জাহান্নাম থেকে রক্ষা পাওয়া শরী'আতের বিধান পালনের ওপর নির্ভরশীল। এ জাতীয় আরো বহু ভ্রান্ত আক্বীদাহ্ বিশ্বাস ও

বিদ'আতের সমন্বয়ে ইসলামের নামে যে নতুন ধর্মটি চালু হয়েছে তার নাম সুফিইজম আর এই সুফিইজম-কে কেন্দ্র করে বহু ইলাহ ও বহু রবের ইবাদত ইসলামে প্রবেশ করেছে। মাজার পূজা, কবর পূঁজা, গাছ পূজা, মাছ পূজা, কচ্ছপ পূজা, কুমীর পূজা, গজাঁর মাছ পূজা। খাঁজা বাবা, গাঁজা বাবা, লেংটা বাবা, বান্দা নেওয়াজ, গরীব নেওয়াজ, জুলফেদরাজ, গেছোঁদরাজ, মুশকিলকুশাঁ, হাজতরাওয়াঁ, গাউস-কুতুব, আকতাব-আবদাল, গাউসুল আযম ইত্যাদি নাম দিয়ে বিভিন্নভাবে এদের ইবাদত করা হয়। যাদের নামে এগুলো করা হচ্ছে তারা যদি তাদের জীবদ্দশায় এগুলো করার জন্য আদেশ করে গিয়ে থাকেন। অথবা তাদের কেন্দ্র করে এ ধরনের শির্ক-বিদ'আত করা হতে পারে একথা জানা সত্ত্বেও যদি নিষেধ না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই তারা তাগূত বলে বিবেচিত হবে। আর যদি তারা এগুলো নিষেধ করে গিয়ে থাকেন অথবা তাদের অজান্তেই এসব করা হয় তাহলে তারা তাগূত বলে গণ্য হবেন না। এক্ষেত্রে যারা এগুলো করেছে শুধু মাত্র তারাই গুনাহগার হবে। এ প্রসঙ্গে ঈসা (আ.) এর বিষয়টি দলিল হিসেবে পেশ করা যেতে পারে। ঈসা (আ.)-কেও খৃস্টানরা আল্লাহর পুত্র দাবি করে তার ইবাদত করেছে। কিন্তু এজন্য ঈসা (আ.)-কে তাগূত বলা যাবে না। কেননা তিনি এগুলো করতে বলেননি এবং তাঁর এগুলো জানাও ছিলো না। পবিত্র কুরআনে বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّه قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

আর আল্লাহ যখন বলবেন, 'হে মারইয়ামের পুত্র ঈসা, তুমি কি মানুষদের বলেছিলে যে, 'তোমরা আল্লাহ ছাড়া আমাকে ও আমার মাতাকে ইলাহরূপে গ্রহণ কর?' সে বলবে, 'আপনি পবিত্র মহান, যার অধিকার আমার নেই তা বলা আমার জন্য সম্ভব নয়। যদি আমি তা বলতাম তাহলে অবশ্যই আপনি তা জানতেন। আমার অন্তরে যা আছে তা আপনি জানেন, আর আপনার অন্তরে যা আছে তা আমি জানি না; নিশ্চয়ই আপনি গায়েবি বিষয়সমূহে সর্বজ্ঞাত'। (মায়েদা, ৫:১১৬)

পঞ্চম প্রধান তাগূত : اَلسَّاحِرُ 'জাদুকর'

আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করা হয় অথবা আল্লাহর কোনো বিশেষ ক্ষমতা কেউ নিজের জন্য দাবি করে সেই তাগূত। এদের মধ্যে প্রধান প্রধান কিছু তাগূত রয়েছে যাদের মধ্যে অন্যতম হল জাদুকর, গণক-জ্যোতিষী ইত্যাদি। যারা নিজেদের অদৃশ্যের জ্ঞানের দাবিদার তথা আলিমুল গায়িব হিসেবে দাবি করে। বর্তমান যুগে আমাদের সমাজে এদের উৎপাত জাহেলী যুগকেও ছাড়িয়ে গেছে। কেউ পাগড়ি পড়ে বিজ্ঞাপন দেয়, অমুক দরবারের এত বছরের খাদেম যিনি আপনাকে দেখামাত্র অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবকিছু বলে দিবেন। আবার কেউ সুন্দর চেহারা, মুখে দাড়ি, মাথায় পাগড়ি, গায়ে আলখেল্লা জড়িয়ে নিজেকে গদ্দিনাশীন পীর সাহেব, শাহ সাহেব অথবা পীরজাদা দাবি করে অথবা জ্বীন হুজুর দাবি করে সর্বরোগের মহাচিকিৎসক হিসেবে চ্যালেঞ্জ দিয়ে থাকেন। এ কারণে এই প্রকার তাগূত অন্যান্য তাগূতের চেয়ে বেশি ক্ষতিকর। এমনকি শয়তানের চেয়েও। তাই এ অধ্যায়ে আমরা জাদুকর, গণক ও জ্যোতিষী নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবো। সাথে সাথে এসব থেকে বাঁচার উপায় কি তাও আলোচনা করার চেষ্টা করবো, ইনশা-আল্লাহ।

اَلسَّاحِرُ শব্দের আভিধানিক অর্থ

اَلسَّاحِرُ শব্দটি اَلسِّحْرُ থেকে নির্গত। اَلسِّحْرُ অর্থ হচ্ছে اَلشَّيْءُ الْخَفِيُّ গোপন, সুক্ষ্ম বস্তু, ধোঁকা, ভেল্কি বাজি, কৌশল।

وَقِيْلَ اَلسِّحْرُ مَا خَفِيَ وَلَطُفَ سَبَبُهُ، জাদু এমন একটি বস্তু যার কারণ সুক্ষ্ম, অদৃশ্য। (ফাতহুল মাজীদ ৩৯৫ নং পৃষ্ঠা) السَّحَر রাতের শেষ অংশ। কেননা রাতের শেষ অংশের অন্ধকার ভেদ করে আস্তে আস্তে গোপন এবং সূক্ষ্মভাবে দিন বের হয়ে আসে।

اَلسِّحْرُ اِصْطِلَاحاً পরিভাষায় সিহর- জাদু

قَالَ أَبُوْ مُحَمَّد الْمَقْدسِيْ فِى الْكَافِىْ : اَلسِّحْرُ : عَزَائِمُ وَرُقَى تُؤَثِّرُ فِى الْقُلُوْبِ وَالْأَبْدَانِ فَيُمَرِّضُ وَيَقْتُلُ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَيَأْخُذُ اَحَدَ الزَّوْجَيْنِ عَنْ صَاحِبِهِ،

'আবু মুহাম্মাদ আল মাক্বদিছী বলেন, 'জাদু হচ্ছে এমন কিছু মন্ত্র এবং ঝাড়-ফুঁক যা দেহ বা মনে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে মানুষ অসুস্থ হয়, মারা যায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল সৃষ্টি করে।' পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ

'অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে।' (বাক্বারা, ২: ১০২)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ،

'গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দিয়ে জাদুকারিনীদের অনিষ্ট থেকে।' (ফালাক্ব, ১১৩: ৪)

وَنَقَلَ ابْنُ حَجْرٍ فِى الْفَتْحِ عَنِ الْقُرْطُبِيْ قَوْلُهُ اَنَّ السِّحْرَ حِيَلٌ صَنَاعِيَّةٌ يَتَوَصَّلُ اِلَيْهَا بِالْاِكْتِسَابِ غَيْرَ اَنَّهَا لِدِقَّتِهَا لَايَتَوَصَّلُ اِلَيْهَا اِلَّا آحَادُ النَّاسِ وَمَادَّتُهُ اَلْوُقُوْفُ عَلَىْ خَوَاصِّ الْاَشْيَاءِ وَالْعِلْمُ بِوُجُوْهِ تَرْكِيْبِهَا وَاَوْقَاتِهِ

ইমাম ইবনে হাজর আসক্বালানী তাফসিরে কুরতুবী হতে বর্ণনা করেন যে, জাদু হচ্ছে কিছু কারিগরি কৌশল যা শিখতে হয়। তবে এগুলো অতিসূক্ষ্ম হওয়ার কারণে খুব কম লোকই এটাকে অর্জন করতে পারে। আর মৌলিক উপাদান হলো 'বিভিন্ন জিনিসের ক্রিয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া, এর গঠন প্রণালী এবং সময় জানা। (ফাতহুল বারী ১৩/২২৩)

اَلسِّحْرُ জাদুর কোনো ভিত্তি আছে কিনা তা নিয়ে আলেমদের মতভেদ রয়েছে, কেউ কেউ বলেছেন এর কোনো ভিত্তিই নেই। আবার কেউ বলেছেন হাঁ, এর ভিত্তি আছে। কথার মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে জাদুকরা যায়, কষ্ট পায়, অসুস্থ হয়, মরে যায়, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন করে দেয়, মূলত: এই মতবিরোধের কারণ হচ্ছে জাদুর বিভিন্ন প্রকার থাকা।

জাদু দুই প্রকার : হাক্বিক্বী এবং তাখঈলী

প্রথম প্রকার : হাক্বিকী জাদু

فَالْحَقِيْقِيُّ مِنْهُ : عِبَارَةٌ عَنْ عَمَلٍ يُؤَثِّرُ فِى الْأَبْدَانِ أَوْ فِى الْقُلُوْبِ، يُؤَثِّرُ فِى الْأَبْدَانِ بِالْمَرْضِ أَوْ بِالْمَوْتِ، أَوْ يُؤَثِّرُ فِى الْكُفْرِ بِأَنْ يُخَيِّلُ أَلَىْ إِنْسَانٍ أَنَّهُ فَعَلَ شَيْأً وَهُوَ لَمْ يَفْعَلْهُ

হাক্বিকী সিহর (জাদু) এমন কিছু আমল যা মানুষের দেহ অথবা মনের ভিতরে প্রতিক্রিয়া করে যাতে মানুষ অসুস্থ হয়, মরে যায়, অথবা মানসিক রোগে আক্রান্ত হয় ফলে কোনো কাজ করে সে ভুলে যায়।

أَوْ يُؤَثِّرُ فِى الْقَلْبِ فَيُوْرِثُ بِهِ كَرَاهَةً، أَوْ مَحَبَّةً اَوْ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ أَوْ يُحَبِّبُ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ، وَيُسَمَّى بِالتَّوْلَةِ

অথবা অন্তরের ভিতরে অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া করে ফলে কাউকে সে অপছন্দ করে, কারো প্রতি আসক্ত হয়, কাউকে ঘৃণা করে, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল সৃষ্টি করে, আবার কারো প্রতি আসক্ত করে। এইগুলোকে তولة বলা হয়।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এ প্রকারের সিহর (জাদু) করা হয়েছিল, । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى كَانَ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا يَفْعَلُهُ حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ دَعَا وَدَعَا ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ أَنَّ اللَّهَ أَفْتَانِي فِيمَا فِيهِ شِفَائِي أَتَانِي رَجُلَانِ فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْسِي وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِلْآخَرِ مَا وَجَعُ الرَّجُلِ قَالَ مَطْبُوبٌ قَالَ وَمَنْ طَبَّهُ قَالَ لَبِيدُ بْنُ الْأَعْصَمِ قَالَ فِيمَا ذَا قَالَ فِي مُشُطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفِّ طَلْعَةٍ ذَكَرٍ قَالَ فَأَيْنَ هُوَ قَالَ فِي بِئْرِ ذَرْوَانَ فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ حِينَ رَجَعَ نَخْلُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ فَقُلْتُ اسْتَخْرَجْتَهُ فَقَالَ لَا أَمَّا أَنَا فَقَدْ شَفَانِي اللَّهُ وَخَشِيتُ أَنْ يُثِيرَ ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا ثُمَّ دُفِنَتْ الْبِئْرُ

'আয়েশা (রা.) বলেন, নবী (সা.) কে জাদু করা হয়। এমনকি জাদুর প্রভাবে তাঁর খেয়াল হতো যে, তিনি স্ত্রীগণের বিষয়ে কোনো কাজ করে ফেলেছেন অথচ তিনি তা করেননি। শেষ পর্যন্ত একদিন তিনি রোগ আরোগ্যের জন্য বারবার দুআ করলেন, এরপর তিনি আমাকে বললেন,

তুমি কি জান? আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন, যাতে আমার রোগের আরোগ্য নিহিত আছে? আমার নিকট দুজন লোক আসল। তাদের একজন আমার মাথার কাছে বসলো অপরজন আমার পায়ের কাছে বসলো। এরপর একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসা করলো, এ ব্যক্তির রোগটি কি? জিজ্ঞাসিত লোকটি জবাব দিল, তাকে জাদু করা হয়েছে। প্রথম লোকটি বললো, তাকে জাদু কে করলো? সে বললো, লবীদ ইবনে আসাম। প্রথম ব্যক্তি বললো, কিসের দ্বারা জাদু করল? দ্বিতীয় ব্যক্তি বললো, তাকে জাদু করা হয়েছে, চিরুনি, সুতার তাগা এবং খেজুরের খোসায়। প্রথম ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করলো, এগুলো কোথায় আছে? দ্বিতীয় ব্যক্তি জবাব দিল, যারওয়ান কূপে? তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেখানে গেলেন এবং ফিরে আসলেন, এরপর আয়েশা (রা.) কে বললেন, কূপের কাছের খেজুর গাছগুলো যেন এক একটি শয়তানের মুণ্ড। তখন আমি (আয়েশা রা.) জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি কি সেই জাদু কার জিনিসগুলো বের করতে পেরেছেন? তিনি বললেন, না। তবে আল্লাহ আমাকে আরোগ্য দিয়েছেন। আমার আশঙ্কা হয়েছিল এসব জিনিস বের করলে মানুষের মধ্যে ফাসাদ সৃষ্টি হতে পারে। এরপর সেই কূপটি বন্ধ করে দেয়া হলো। (বুখারী ৫৭৬৫, মুসলিম ২১৮৯)

দ্বিতীয় প্রকার : তাখ্ঈলী জাদু

اَلتَّخْيِيْلِيُّ : مَا يُؤَثِّرُ فِى الْأَبْصَارِ وَالْأَنْظَارِ فَتَرَىْ الشَّيْءَ عَلَىْ خِلَافِ مَا هُوَ عَلَيْهِ

অর্থাৎ যে জাদু চোখ এবং দৃষ্টিশক্তির ওপর প্রভাব ফেলে। যার কারণে কোনো বস্তুকে বাস্তবতার বিপরীত দেখে। ফেরাউনের জাদুকররা মুসা (আ.)-এর সাথে এই প্রকারের জাদুই করেছিল। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে–

فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى

' অতঃপর তাদের জাদুর প্রভাবে মূসার কাছে মনে হলো যেন তাদের রশি ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে। (ত্বহা, ২০:৬৬)

এমনিভাবে সুরা আ'রাফে বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِيمٍ

'যখন তারা নিজেদের জাদু ছাড়লো, তখন তা দ্বারা লোকদের দৃষ্টিকে জাদু করলো এবং তাদের আতঙ্কিত করে তুললো।' (আরাফ : ১১৬) এখানে আল্লাহ

তা'আলা **سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ** (মানুষকে জাদু করলো) না বলে **سَحَرُوا النَّاسَ** (মানুষের চোখে জাদু করেছে) বলেছেন।

এখানে একথা বলা হচ্ছে যে, এ প্রভাব সাধারণ লোকদের ওপর পড়েনি, মূসা (আ.)-ও জাদু দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তার চোখই কেবল এটা অনুভব করেনি বরং তাঁর মস্তিষ্কও অনুভব করছিল যে, লাঠি ও রশিগুলো সাপ হয়ে দৌড়াচ্ছে। এবং হাঠাৎই তার চোখ ভেসে উঠেছে যেন শত শত সাপ কিল বিল করতে করতে তার দিকে দৌড়ে চলে আসছে। এ দৃশ্য দেখে মূসা (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে নিজের মধ্যে যদি একটি আশঙ্কার ভাব অনুভব করে থাকেন তাহলে এটা কোনো অবাক হবার কথা নয়। মানুষ তো সর্বাবস্থায় একজন মানুষই। একজন নবী নবী হলেও মানবিক আবেগ-অনুভূতি এবং অন্যান্য মানবিক চাহিদা থেকে তিনি কখনোই মুক্ত নন। তাছাড়া এ সময় মুসা (আ.) স্বাভাবিকভাবে এ আশঙ্কাও করে থাকতে পারেন যে, মু'জিযার সাথে এতটা সাদৃশ্যপূর্ণ দৃশ্য দেখে জনসাধারণ নিশ্চয়ই বিভ্রাটে পড়ে যাবে এবং তাদের পক্ষে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কঠিন হয়ে পড়বে।

একটি কথা উল্লেখ্য, কুরআন এখানে এ কথার সত্যতা প্রমাণ করছে যে, নবীও জাদু দ্বারা প্রভাবিত হতে পারেন। যদিও জাদুকর তার নবুওয়াত কেড়ে নেবার অথবা তাঁর প্রতি নাযিলকৃত অহীর মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করার কিংবা জাদুর প্রভাবে তাঁকে পথভ্রষ্ট করার ক্ষমতা রাখে না, তবুও মোটামুটিভাবে কিছুক্ষণের জন্য তার স্নায়ুর ওপর এক ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে পারে। এ থেকে হাদীসগ্রন্থগুলোতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর জাদু করার ঘটনাটি পাঠ করে শুধুমাত্র এ রেওয়ায়াতগুলোকে মিথ্যা বলেই ক্ষান্ত হন না বরং আরো সামনে অগ্রসর হয়ে সমগ্র হাদীস শাস্ত্রকেই অনির্ভরযোগ্য গণ্য করে, তাদের চিন্তাধারার গলদও সামনে এসে যাবে।

জাদু টোনা, জ্বিনের আসর বদনযর ও শয়তানের অনিষ্ট থেকে বাঁচার উপায়

পৃথিবীতে আল্লাহর প্রচলিত নিয়ম-নীতির প্রতি কেউ গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, বিপদ-মুসীবত আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত একটি অবধারিত নীতি। আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেন–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ

'আমি তোমাদের পরীক্ষা করব কিছু ভয়-ভীতি ও ক্ষুধা-অভাব দিয়ে। আরো পরীক্ষা করব সম্পদ, জান ও ফসলের ঘাটতি করে। এসকল ক্ষেত্রে যারা ধৈর্য ধারণ করে আপনি তাদের সুসংবাদ প্রদান করুন।' (বাক্বারা ২:১৫৫)

যারা মনে করে যে নেক লোকদের কোনো বিপদ নেই, তাদের ধারণা ভুল; বরং বিপদ-মুসীবতই হচ্ছে ঈমানের পরিচয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলো কোনো মানুষ সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত হয়? তিনি বললেন–

عَنْ سَعْدٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ النَّاسِ أَشَدُّ بَلَاءً فَقَالَ الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ فَيُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلَى حَسَبِ دِينِهِ فَإِنْ كَانَ رَقِيقَ الدِّينِ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ ذَاكَ وَإِنْ كَانَ صُلْبَ الدِّينِ ابْتُلِيَ عَلَى حَسَبِ ذَاكَ قَالَ فَمَا تَزَالُ الْبَلَايَا بِالرَّجُلِ حَتَّى يَمْشِيَ فِي الْأَرْضِ وَمَا عَلَيْهِ خَطِيئَةٌ

সা'আদ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে জিজ্ঞাসা করলাম মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত কে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'নবীগণ, তারপর তাদের নিকটবর্তী। ধর্মের দৃঢ়তা অনুযায়ী মানুষকে বিপদ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়। ধর্মীয় দিক থেকে যদি দুর্বল হয় তাহলে তাকে সে অনুযায়ী পরীক্ষা করা হয়। আর যদি ধর্মীয় দিক থেকে শক্ত থাকে তাহলে তাকে সে অনুযায়ী কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন করা হয়। এভাবে বিপদ-আপদ, বালা-মুসিবত তার সঙ্গে লেগেই থাকে। একপর্যায়ে সে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ অবস্থায় জমীনে চলাচল করে।' (তিরমিযী ২৩৯৮, মুসনাদে আহমাদ ১৪৮১, ১৪৯৪, ১৫৫৫, ১৬০৭, বায়হাকী ৬৭৭২)

বিপদাপদ হচ্ছে বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার একটি অন্যতম আলামত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ، أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ أَعْظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلاءِ ، وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلاهُمْ ، فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا ، وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السَّخَطُ

আনাস বিন মালিক (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'নিশ্চয়ই বড় পুরস্কার বড় বিপদের সাথে সম্পৃক্ত। আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন কোনো জাতীকে ভালোবাসেন তখন তাদের বিপদে আক্রান্ত করেন। তখন যারা সন্তুষ্ট থাকে তাদের প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি আর যারা অসন্তুষ্ট হয় তাদের প্রতি আল্লাহর অসন্তুষ্টি অবধারিত হয়। (তিরমিযী ২৩৯৬, বায়হাকী ৭২১, ইবনে মাজাহ ১৩৩৮)

এ ছাড়া বিপদাপদ হলো বান্দার প্রতি আল্লাহর কল্যাণের একটি অন্যতম পরিচয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

إذا أَرَادَ الله بِعَبْدِه الخَيْرَ عَجَّلَ لهُ العُقُوبَةَ في الدُّنْيا وَإذا أَرادَ بِعَبْدِه الشَّرَّ أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِه حَتَّى يُوافِيَ بِه يَوْمَ القِيامَةِ

'আল্লাহ যখন তাঁর বান্দার কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়াতে ত্বরিত তার শাস্তির ব্যবস্থা করেন। আর আল্লাহ যখন বান্দার অকল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন গুনাহ করার পরও তাকে শাস্তি প্রদান থেকে বিরত থাকেন। অতঃপর সেই শাস্তি ক্বিয়ামত দিবসে পূর্ণরূপে দান করবেন।' (তিরমিযী ২৩৯৬, মেশকাত ১৫৬৫)

বিপদ-মুসীবত সামান্য হলেও তা গুনাহ মাফ হওয়ার অন্যতম মাধ্যম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ لَتُوعَكُ وَعْكًا شَدِيدًا قَالَ أَجَلْ إِنِّي أُوعَكُ كَمَا يُوعَكُ رَجُلَانِ مِنْكُمْ قُلْتُ ذَلِكَ أَنَّ لَكَ أَجْرَيْنِ قَالَ أَجَلْ ذَلِكَ كَذَلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا

'আব্দুল্লাহ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে প্রবেশ করলাম। তখন তিনি প্রচন্ড জ্বরে আক্রান্ত ছিলেন। আমি বললাম হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি তো প্রচণ্ডভাবে জ্বরে আক্রান্ত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, তোমাদের মধ্যে দুজন ব্যক্তি যে পরিমাণ জ্বরে আক্রান্ত হয় আমি একা সে পরিমাণ জ্বরে আক্রান্ত হই। আমি বললাম এটা এজন্য যে, আপনার জন্য দ্বিগুণ সওয়াব। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হ্যাঁ, বিষয়টি এরকমই। যেকোনো মুসলিম কোনো কষ্টে আক্রান্ত হয়, এমনকি একটি কাঁটা বা তার চেয়েও ছোট কোনো আঘাত প্রাপ্ত হয় তবে তার দ্বারা তার গুনাহ্ সমূহ ঝড়ে যায়, যেভাবে গাছের পাতা ঝড়ে যায়।' (বুখারী ৫৬৪৮, ৫৬৬০ ৫৬৬৭ মুসলিম ৬৭২৪ মুসনাদে আহমাদ ৪৩৪৬)

বিপদগ্রস্ত মুসলিম ব্যক্তি যদি নেককার হয়, তবে তার বিপদ পূর্বকৃত পাপের কাফ্ফারা স্বরূপ হয়ে যায়। অথবা তা দ্বারা তার মর্যাদা উন্নীত হয়। কিন্তু সে যদি গুনাহগার হয় তবে বিপদাপদ তার পাপের কাফ্ফারা স্বরূপ হয় এবং পাপের ভয়াবহতার কথা তাকে স্মরণ করানোর জন্য হয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

'জলে-স্থলে যে সকল বিপদ-বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে তা মানুষের কৃতকর্মের জন্যই। যাতে করে তার মাধ্যমে তাদের কর্মের কিছুটা শাস্তি প্রদান করা হয়। যাতে করে তারা সৎ পথে ফিরে আসে।' (রূম, ৩০:৪১)

ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহ.) বলেন, বান্দার যখন সকাল ও সন্ধ্যা হয় এমতাবস্থায় যে, এক আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোনো লক্ষ্য থাকে না, তখন আল্লাহ তার সকল প্রয়োজন মিটানোর দায়িত্ব বহন করেন। তাঁর সকল বিষণ্নতা দূর করে দেন। আর আল্লাহর ভালোবাসার জন্য তার অন্তরকে, তাঁর যিকিরের জন্য জিহ্বাকে ও তাঁর অনুসরণের জন্য তার অঙ্গ-প্রতঙ্গকে মুক্ত করে দেন।

আর যখন বান্দার সকাল ও সন্ধ্যা হয় এমতাবস্থায় যে, দুনিয়াই তার লক্ষ্য, তখন আল্লাহ তার ওপর দুনিয়ার সকল চিন্তা ভাবনা ব্যস্ততা চাপিয়ে দেন। আর তাকে তার নিজের ওপর নির্ভরশীল করেন। অতঃপর তার অন্তরকে আল্লাহর ভালোবাসার পরিবর্তে সৃষ্টির ভালোবাসা দ্বারা, তার জিহ্বাকে আল্লাহর যিকিরের পরিবর্তে তাদের স্মরণ দ্বারা ও তার সকল অঙ্গকে আল্লাহর অনুসরণ করার পরিবর্তে তাদের সেবা ও কাজ দ্বারা ব্যস্ত করে

দেন। অতঃপর সে বন্য পশুর মতো অন্যের সেবায় পরিশ্রম করে। কামারের হাপরের মতো যা ভিতরে বাতাস ভরে এবং তা অন্যের উপকারের জন্য চিপিয়ে বের করে। (তাতে নিজের কোনো উপকার হয় না)

অতএব যেসব লোক আল্লাহর ইবাদত, তাঁর অনুসরণ ও তাঁর ভালোবাসা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তাকে সৃষ্টির ইবাদত (দাসত্ব) ও তাদের ভালোবাসা দ্বারা পরীক্ষায় লিপ্ত করা হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন–

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

'আর যে পরম করুণাময়ের যিকির থেকে বিমুখ থাকে আমি তার জন্য এক শয়তানকে নিয়োজিত করি, ফলে সে হয়ে যায় তার সঙ্গী।' (যুখরূফ ৪৩:৩৬)

বিপদ-মুসীবতের প্রকারভেদ :

বিপদ-আপদ দুপ্রকার। কল্যাণের বিপদ। যেমন ধন-সম্পদের প্রবৃদ্ধি। অকল্যাণের বিপদ। যেমন, ভয়-ভীতি, ক্ষুধা-দারিদ্রতা, জান-মালের ক্ষতি ইত্যাদি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেন, **وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً** আমি তাদের কল্যাণ ও অকল্যাণের ফিতনায় ফেলে পরীক্ষা করে থাকি। (আম্বিয়া ২১:৩৫)

যে সব পথে শয়তান মানুষকে আক্রমণ করে

অজ্ঞতা, ক্রোধ, দুনিয়ার ভালোবাসা, দীর্ঘ আশা, লোভ, কৃপণতা, অহঙ্কার, প্রশংসা পাওয়ার বাসনা, লোক দেখানো কাজ, আত্মম্ভরিতা, হা-হুতাশ, নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ, কুধারণা হওয়া, মুসলমানকে অবজ্ঞা করা, গুনাহসমূহকে তুচ্ছ মনে করা, আল্লাহর পাকড়াও এর ব্যাপারে নির্লিপ্ততা ও আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হওয়া।

বাড়ি-ঘরকে শয়তান থেকে রক্ষা করা :

১. বাড়িতে প্রবেশ, পানাহার ও ঘুমানোর সময় আল্লাহকে স্মরণ করা। ও হাদীসে বর্ণিত মাসনুন দোয়া সমূহ নিয়মিত পাঠ করা। এ সম্পর্কীয় যাবতীয় দোয়া আমাদের 'কিতাবুদ দু'আ' নামক কিতাবে পাবেন।

২. বাড়িতে বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করা, বিশেষ করে সুরা বাক্বারাহ পাঠ করা।

৩. ছবি, ক্রুশ ও মূর্তি হতে বাড়ি-ঘর পবিত্র রাখা।

৪. কুকুর থেকে বাড়ি-ঘর পবিত্র রাখা।

৫. গান-বাজনা, বাদ্যযন্ত্র ও ডিশ থেকে বাড়ি-ঘর মুক্ত রাখা।
৬. শঙ্খ বাজানো ও ইবলিসের বাঁশি থেকে বাড়ি-ঘর পবিত্র রাখা।

জাদুটোনা, বদনযর ও জিনের আসর থেকে বাঁচার উপায় :
সতর্কতা চিকিৎসার চাইতে উত্তম। অতএব সতর্কতার প্রতি সচেতন থাকা জরুরি। যে সমস্ত বিষয় আমাদের জাদু ও বদ নযর থেকে বাঁচাতে পারে তন্মধ্যে অন্যতম হচ্ছে–

● ঈমান ও তাওহীদ দ্বারা নিজেকে শক্তিশালী করা। সুদৃঢ়ভাবে এই বিশ্বাস রাখা যে, পৃথিবীর যাবতীয় কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহর হাতে। সেই সাথে বেশি বেশি সৎ কাজে লিপ্ত থাকা।

● আল্লাহর প্রতি সুধারণা পোষণ করা ও তার ওপর ভরসা করা। কোনো সমস্যা দেখা দিলেই যেন তা অসুখ বা বদনযর ধারণা না করে। কেননা ধারণা ও খেয়ালই একটি অসুস্থতা।

● কোনো লোক যদি সমাজে পরিচিত হয় যে, তার বদনযর আছে বা সে জাদুকর তবে তার থেকে দূরে থাকা উচিত। তাদের ভয়ে নয়; বরং উপায়-উপকরণ অবলম্বন করার কারণে তাদের থেকে দূরে থাকবে।

● সর্বদা আল্লাহর যিকির করা এবং আশ্চর্য ও আনন্দময় কিছু দেখলে তার বরকতের জন্য দু'আ করা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

إِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مِنْ أَخِيهِ أَوْ مِنْ نَفْسِهِ أَوْ مِنْ مَالِهِ مَا يُعْجِبُهُ فَلْيُبَرِّكْهُ فَإِنَّ الْعَيْنَ حَقٌّ

'কোনো মানুষ যদি নিজের মধ্যে বা নিজ সম্পদের মধ্যে বা কোনো মুসলিম ভাইয়ের মধ্যে আনন্দময় কিছু দেখে তবে তার জন্য যেন বরকতের দুআ করে। কেননা বদনযর সত্য।' (ইবনে মাজাহ ৩৫০৮, মুসনাদে আহমাদ ১৫৭০০)
বরকতের দু'আ করার জন্য বলবে, بَارَكَ اللَّهُ لَكَ 'বারাকাল্লাহু লাকা'।

● জাদু ইত্যাদি থেকে বাঁচার শক্তিশালী একটি মাধ্যম হচ্ছে, প্রতিদিন সকালে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মদীনার (আজওয়া) নামক সাতটি খেজুর খাওয়া। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ

يَضُرَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি প্রতিদিন সকালে সাতটি আজওয়া (মদীনার বিশেষ এক প্রকারের খেজুর) খাবে সে ব্যক্তিকে ঐ দিন কোনো বিষ অথবা জাদু ক্ষতি করতে পারবে না। (বুখারী ৫৪৪৫, ২০৬৬)

● আল্লাহ তা'আলার স্মরণাপন্ন হওয়া, তার ওপর ভরসা করা, তার প্রতি সুধারণা পোষণ করা এবং জাদু ও বদনযর থেকে তার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা। প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যার যিকির সমূহ যথারীতি পাঠ করা। আল্লাহর হুকুমে এই যিকিরগুলোর বিশেষ প্রভাব আছে। আর তার কারণ দু'টি: ১. এগুলোর মধ্যে যা বলা হয়েছে তা সত্য ও সঠিক একথার প্রতি ঈমান এবং আল্লাহর হুকুমে এগুলো উপকারী। ২. উহা নিজের মুখে উচ্চারণ করে নিজের কানে শোনা এবং অন্তর উপস্থিত রেখে পাঠ করা। কেননা উহা দুআ। আর উদাস অন্তরের দুআ কবুল করা হয় না। যেমনটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

● শিরক মিশ্রিত আক্বীদা (বিশ্বাস) থেকে মুক্ত থাকা।

● শুধুমাত্র আল্লাহকেই ভয় করা, অন্য কাউকে ভয় না করা।

● ধারণা ও অনুমানভিত্তিক কথা-বার্তা থেকে বিরত থাকা।

● বেশি বেশি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করা।

● অন্তর পরিষ্কার রাখা, নিয়ত সঠিক করা ও মুসলিম ভাই-বোনদের প্রতি হিংসা করা থেকে বিরত থাকা।

● সকল সালাত যথাসময়ে জামাতের সাথে যথাপোযুক্তভাবে আদায় করার প্রতি যত্নবান হওয়া। সালাত বর্জন ও সালাতের ব্যাপারে অবহেলা করা শয়তানের প্রভাব-প্রতিপত্তির কারণ।

● রাতের বেলায় সালাত মানে তাহাজ্জুদের সালাত বাড়িতে পড়া।

● অধিক পরিমাণে আল্লাহর যিকির করা ও সকাল সন্ধ্যার পঠনীয় দু'আগুলো পাঠ করা। (এ সম্পর্কে আমাদের কিতাবুদ দু'আ দেখতে পারেন)

● সন্তানের জন্য আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা।

● তাওবাহ করা ও বান্দা যে সকল বিপদ-আপদে পতিত হয় সেসব বিষয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করা। আর তা (বিপদ) তার গুনাহের কারণেই ঘটে থাকে। অতঃপর সে যখন তাওবাহ করে তখন তা (বিপদ) তার নিকট হতে দূর করা হয়।

● পবিত্রতা অর্জন করা, নিশ্চয়ই শয়তান পবিত্রতা ও পবিত্রতা অর্জনকারী থেকে ভয়ে দূরে চলে যায়।

● বাড়ি ঘরকে ছবি, মূর্তি, কুকুর, বাদ্যযন্ত্র ও বিপর্যয়ের সরঞ্জামাদি যেমন ডিশ ইত্যাদি থেকে পবিত্র রাখা।

● দুআ করা ও আল্লাহর নিকট অনুনয় বিনয় করা।

● বাড়ি ও অন্যান্য স্থানে অধিক পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করা, বিশেষ করে সুরা বাক্বারা।

● আল্লাহর বিষয়ে তুমি যত্নবান হও আল্লাহ তোমার যত্ন নিবেন।

বদনযর বা জাদুটোনা থেকে বাঁচার জন্য ঝাড়-ফুঁক করার দোয়া

জিবরাঈল (আ.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিচের দোয়াটি পড়ে ফুঁ দিয়েছিলেন–

بِسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ وَاللَّهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ يُؤْذِيكَ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

প্রতিটি কষ্টদায়ক রোগ হতে, প্রতিটি প্রাণের অথবা হিংসুটে চোখের অনিষ্ট হতে আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ফুঁ দিচ্ছি। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। আমি আল্লাহর নামে আপনাকে ঝাড়ছি। আল্লাহ আপনাকে আরোগ্য দান করুন। (মুসনাদে আহমাদ ৯৭৫৭, ১১৮১০, ইবনে মাজাহ ৩৫২৭)

ঝাড়-ফুঁকের আরেকটি দু'আ–

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাসান ও হুসাইন (রা.)-কে এই দু'আ পড়ে ঝাড়-ফুঁক করতেন–

أُعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

'আমি তোমাদের দু'জনকে আল্লাহর পরিপূর্ণ কালামের মাধ্যমে সকল শয়তান, বিষধর জন্তু ও ক্ষতিকর চক্ষু থেকে আল্লাহর আশ্রয়ে দিলাম।' (তিরমিযী ২০৬০, আউ দাউদ ৪৭৩৯, মুসনাদে আহমাদ ২১১২, মেশকাত ১৫৩৫)

ঝাড়–ফুঁকের আরো একটি দু'আ

اللَّهُمَّ رَبَّ النَّاسِ مُذْهِبَ الْبَاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

'হে আল্লাহ মানুষের প্রভু, রোগ ব্যাধি দূর করে দিন। আরোগ্য দান করুন। আপনিই আরোগ্য দানকারী। আপনার আরোগ্য ছাড়া আর কোনো আরোগ্য নেই। এমন আরোগ্য করুন যাতে কোনো রোগ না থাকে।' (বুখারী ৫৭৪২, আবু দাউদ ৩৮৯২, মুসনাদে আহমাদ ১২৫৩২)

যিকির-আযকার করার সময় : সকালের যিকির সমূহ ফজরের নামাযের পর পাঠ করবে। কিন্তু সন্ধ্যার যিকির সমূহ আছরের পর পাঠ করতে হবে। কেউ যদি উক্ত যিকির সমূহ যথাসময়ে পাঠ করতে ভুলে যায় বা অলসতা করে, তবে যখনই স্মরণ হবে পাঠ করে নিবে।

সকাল সন্ধ্যার আমলসহ যাবতীয় দু'আ ও ঝাড়-ফুঁকের জন্য আমাদের 'কিতাবুদ দু'আ' অবশ্যই সংগ্রহে রাখবেন। এই কিতাবে সকল প্রকার দু'আ, যিকির-আযকার, তাসবীহ্-তাহলীল দলিল প্রমাণ সহ লেখা হয়েছে।

বদনযর প্রভৃতিতে আক্রান্ত হওয়ার আলামত : শরী'আত সম্মত ঝাড়-ফুঁক ও আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে কোনো দ্বন্দ্ব নেই। শারীরিক ও মানসিক সবধরনের রোগের চিকিৎসা রয়েছে পবিত্র কুরআনে। বদনযরে আক্রান্ত হওয়ার পর মানুষ হয়তো বাহ্যিকভাবে শারীরিক রোগ থেকে মুক্ত থাকবে, কিন্তু তারপরও সাধারণত: বিভিন্ন ধরনের উপসর্গ দেখা যেতে পারে। যেমন বিভিন্ন সময় মাথা ব্যথা অনুভব করবে। মুখমণ্ডলের রং পরিবর্তন হয়ে হলুদ হয়ে যাবে। বেশি বেশি ঘাম নির্গত হবে। বেশি বেশি পেশাব করবে। খানা-পিনার আগ্রহ কমে যাবে। শরীরের বিভিন্ন পার্শ্বে ঠাণ্ডা বা গরম বা কখনো গরম কখনো ঠাণ্ডা অনুভব করবে। হার্টের উঠা-নামা বা বুক ধরফড় করবে। পিঠের নিম্নাংশে বা দু'স্কন্ধে বিভিন্ন সময় ব্যথা অনুভব করবে। অন্তরে দু:শ্চিন্তা ও সংকীর্ণতা অনুভব হবে। রাতে অনিদ্রা হবে। অস্বাভাবিক ক্রোধ বা ভয়ের কঠিন প্রতিক্রিয়া দেখা যাবে। বেশি বেশি ঢেকুর বা উদগিরণ হবে। দীর্ঘ নি:শ্বাস ফেলবে। একাকীত্বকে পছন্দ

করবে। অলস ও শ্রমবিমুখ হবে। নিদ্রার প্রতি আগ্রহী হবে। স্বাস্থ্যগত অন্যান্য সমস্যা দেখা দিবে যার ডাক্তারি কোনো কারণ নেই। রোগের দুর্বলতা ও কাঠিন্যতা অনুযায়ী এই আলামতের কিছুটা দেখা যেতে পারে।
আবশ্যক হচ্ছে মুসলিম ব্যক্তি শক্তিশালী ঈমান ও সুদৃঢ় হৃদয়ের অধিকারী হবে। কোনো ওয়াসওয়াসা যেন তার মধ্যে অনুপ্রবেশ করার সুযোগ না পায়। কোনো উপসর্গ অনুভব করলেই আমি রোগে আক্রান্ত এরূপ ধারণা যেন মনের মধ্যে স্থান না পায়। কেননা 'ধারণা' রোগের চিকিৎসা করা খুবই কঠিন। অবশ্য কারো কারো মধ্যে উক্ত উপসর্গগুলো থেকে কিছু কিছু দেখা যেতে পারে অথচ তারা সুস্থ। আবার কখনো কিছু উপসর্গ দেখা যায় শারীরিক অসুস্থতার কারণে, কখনো ঈমানের দুর্বলতার কারণে। যেমন অন্তরে সংকীর্ণতা অনুভব, দুশ্চিন্তা, অলসতা ইত্যাদি। তখন আল্লাহর সাথে সম্পর্কের বিষয়কে উন্নত করার চেষ্টা করা উচিত।
রোগ যদি বদনযরের কারণে হয়, তবে আল্লাহর হুকুমে নিম্ন লিখিত যে কোনো একটি মাধ্যমে চিকিৎসা নেয়া যেতে পারে।
শরী'আত সম্মত ঝাড়-ফুঁক, দু'আ ও শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে আরোগ্য লাভের চেষ্টা করতে হবে।

জাদুর চিকিৎসা

আল্লাহর পক্ষ থেকে জাদুর চিকিৎসা দুভাগে বিভক্ত।
প্রথম ভাগ : জাদুতে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই উহা থেকে বাঁচার উপায়।
আর সেগুলো হলো–

১। সকল ওয়াজিব পালন করা, হারামসমূহকে বর্জন করা ও সকল গুনাহ থেকে তাওবাহ করা।

২। প্রচুর পরিমাণে কুরআন মাজিদ প্রতি দিন নিয়মিত অজিফা হিসেবে পাঠ করা।

৩। বিভিন্ন প্রকার তাআওউয (মানে যে সব দো'আর মাধ্যমে আল্লাহর আশ্রয় চাওয়া হয়) ও যিকিরসমূহ দ্বারা রক্ষা পাওয়া, আর সেগুলো নিম্নরূপ:

بِسْمِ اللَّهِ الَّذِى لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَىْءٌ فِى الأَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'শুরু করছি সেই আল্লাহর নামে, যার নামের সাথে আসমান ও জমিনের কোনো বস্তুই কোনো ক্ষতি করতে পারবে না, তিনি মহাশ্রোতা মহাজ্ঞানী।' (সকাল বিকাল তিনবার করে পাঠ করবেন) (তিরমিযী ৩৩৮৮, আবু দাউদ ৫০৯০, ইবনে মাজাহ ৩৮৬৯, মুসনাদে আহমাদ ৪৭৪)
সকল সালাতের পর, নিদ্রার পূর্বে ও সকাল সন্ধ্যা একবার আয়াতুল কুরসী পড়া এবং সুরা ফালাক্ব, সুরা নাস ও সুরা ইখলাস সকল সালাতের পরে একবার করে এবং মাগরিব ও ফজরের পর তিনবার করে পড়া।
আরেকটি দু'আ : (সকাল সন্ধ্যায় একশত বার করে পড়তে হবে।)

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই তিনি এক তার কোনো শরীক নেই, তারই জন্য রাজত্ব আর তিনি সর্বশক্তিমান।' (বুখারী ৩২৯৩, ৬৪০৩, মুসলিম ৭০১৮)
সকাল ও সন্ধ্যার পাঠনীয় দুআ পড়া, সালাত শেষের দুআগুলো, নিদ্রার পূর্বের ও পরের দু'আ, বাড়িতে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ, যান বাহনের দু'আসমূহ, মসজিদে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ, টয়লেটে প্রবেশ ও বের হওয়ার দু'আ ও বিপদাপদে পঠনীয় দু'আগুলো নিয়মিত পাঠ করা।
দ্বিতীয় ভাগ : জাদুতে আক্রান্ত হওয়ার পর আল্লাহর হুকুমে নিম্ন লিখিত যে কোনো একটির মাধ্যমে চিকিৎসা হতে পারে :

১. কোথায় জাদু করা হয়েছে তা জানা গেলে : সেই জাদুকৃত বস্তু বের করে নিয়ে আসতে হবে। অতঃপর সেখানে গিরা ইত্যাদি থাকলে মুআবেযাতাইন (সুরা নাস ও ফালাক) পড়ে তা খুলতে হবে। তারপর ঐ বস্তুকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে।

২. শরীয়ত সম্মত ঝাড়-ফুঁক : কুরআনের আয়াত বিশেষ করে মুআবেযাতাইন (সুরা নাস ও ফালাক), সুরা বাক্বারা, দুআ ইত্যাদি দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করবে। (সামনে ঝাড়-ফুঁকের কিছু দু'আ উল্লেখ করা হবে বাকি দু'আ সমূহ আমাদের কিতাবুদ দু'আ-তে পাওয়া যাবে, ইনশাআল্লাহ)

৩. জাদু বের করা : যদি পেটের মধ্যে জাদুর ক্রিয়া অনুভব হয় তবে ঔষধ ইত্যাদি দিয়ে তা পায়খানার মাধ্যমে বের করে দেয়ার চেষ্টা করবে। যদি অন্য কোনো স্থানে থাকে তবে শিঙ্গা লাগানোর মাধ্যমে তা বের করার চেষ্টা করবে।

৪. প্রাকৃতিক ঔষধসমূহ : অনেক প্রাকৃতিক উপকারী ঔষধ আছে। যেগুলো কুরআন মাজীদ ও পবিত্র সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত। মানুষ যদি আস্থা ও সততার সাথে সেগুলো ব্যবহার করে এ বিশ্বাস রেখে যে, আরোগ্য একমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে। তবে ইনশাআল্লাহ উহা দ্বারা আল্লাহ উপকার করবেন। এমনি আর কিছু ঔষধ আছে ঘাস ও অন্যান্য তরুলতা থেকে, সেগুলো পরীক্ষা করে বানানো হয়েছে। অতএব সেগুলো দ্বারা উপকৃত হওয়া নিষেধ নয়। আল্লাহর অনুমতিক্রমে উপকারী প্রাকৃতিক চিকিৎসার মধ্য থেকে একটি হলো মধু।

মধু দ্বারা চিকিৎসা :

মধু সম্পর্কে কুরআনে বলা হয়েছে :

يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ

'তার পেট থেকে এমন পানীয় বের হয়, যার রং ভিন্ন ভিন্ন, যাতে রয়েছে মানুষের জন্য রোগ নিরাময়।' (নাহল ১৬:৬৯)

কালো জিরা দ্বারা চিকিৎসা :

কালো জিরা সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে–

إِنَّ هَذِهِ الْحَبَّةَ السَّوْدَاءَ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا مِنْ السَّامِ

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই কালো জিরা মৃত্যু ব্যতিত সকল রোগের চিকিৎসা।' (বুখারী ৫৬৮৭, ৫৬৮৮, মুসলিম ৫৮৯৬, ৫৮৯৯)

জমজমের পানি দ্বারা চিকিৎসা :

ইহা সকল পানির প্রধান, সর্বোৎকৃষ্ট সবচেয়ে মূল্যবান ও আত্মার নিকট সবচেয়ে প্রিয় পানি। সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ

'জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, জমজমের পানি যে রোগের জন্য পান করা হয় তার জন্য চিকিৎসা।' (ইবনে মাজাহ ৩০৬২, মুসনাদে আহমাদ ১৪৮৪৯)

বৃষ্টির পানি দ্বারা চিকিৎসা :

বৃষ্টির পানি আল্লাহর রহমতের পানি। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا

'আর আমি আসমান থেকে বরকতময় পানি নাযিল করেছি।' (ক্বাফ ৫০:৯)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বৃষ্টির পানিকে একটি অনুগ্রহ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। আর নিশ্চয়ই অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয় কোনো মূল্যবান জিনিস দ্বারা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বৃষ্টির পানি শরীরে মাখাতেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ أَنَسٌ أَصَابَنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَطَرٌ قَالَ فَحَسَرَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– ثَوْبَهُ حَتَّى أَصَابَهُ مِنَ الْمَطَرِ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ صَنَعْتَ هَذَا قَالَ لأَنَّهُ حَدِيثُ عَهْدٍ بِرَبِّهِ تَعَالَى

'আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম। আমাদের গায়ে বৃষ্টির পানি পড়তে লাগলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাতের থেকে কাপড় গুটিয়ে ফেললেন, যাতে বৃষ্টির পানি গায়ে লাগে। আমরা বললাম, 'ইয়া রাসুলুল্লাহ, আপনি এই কাজটি কেনো করলেন?' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'যেহেতু এটি তার রবের কাছ থেকে সদ্য আগমণ করেছে।' ' (মুসলিম ২১২০)

যাইতুনের তেলের দ্বারা চিকিৎসা :

যাইতুনের তেলও উপকারী। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي أَسِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُوا الزَّيْتَ وَادَّهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ

'আবু আসিদ (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: 'তোমরা যাইতুনের তেল খাও ও উহা দ্বারা (শরীরে) তেল মর্দন কর, নিশ্চয়ই ইহা বরকতময় বৃক্ষ হতে।' (মুসনাদে আহমাদ ১৬০৫৫, ১৬০৫৪, ইবনে মাজাহ ৩৩১৯, তিরমিযী ১৮৫২)

বাস্তব পরীক্ষা, ব্যবহার ও গবেষণা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, উহা সর্বোৎকৃষ্ট তেল। এগুলো কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত চিকিৎসা। এ ছাড়াও নিয়মিত গোসল করা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হওয়া ও সুগন্ধি ব্যবহার করা।

ঝাড়-ফুঁক এর জন্য শর্তাবলী :

১. ঝাড়-ফুঁক হতে হবে কুরআনের আয়াত ও রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত দুআর মাধ্যমে। **২.** উহা আরবী ভাষায় হতে হবে। তবে দুআ আরবী ছাড়া অন্য ভাষাতেও হতে পারে। **৩.** এই বিশ্বাস রাখবে যে, ঝাড়-ফুঁকের মধ্যে কোনো প্রভাব নেই। আরোগ্য শুধুমাত্র আল্লাহই দিতে পারেন। **৪.** হারাম কোনো বক্তব্যের সাথে সম্পর্কিত যাতে না হয়। যেমন : গালিগালাজ করা অথবা গাইরুল্লাহকে (আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে) ডাকা। **৫.** এর উপরেই যেন নির্ভরশীল না হয়। অতঃপর ইহা শুধু একটি মাধ্যম মাত্র, ইহা দ্বারা কখনো ভালো হতেও পারে অথবা ভালো নাও হতে পারে।

ঝাড়-ফুঁকের প্রভাব বেশি পেতে চাইলে কুরআন পাঠ করবে আরোগ্যের নিয়তে ও জিন-ইনসানের হেদায়েতের নিয়তে। কেননা কুরআন হেদায়াতের জন্য এবং আরোগ্যের জন্য নাযিল হয়েছে। তবে জিনকে হত্যা করার নিয়তে কুরআন পড়বে না।

যিনি ঝাড়-ফুঁক করবেন তার জন্য কতিপয় শর্ত :

১. তিনি মুসলমান হবেন। নেককার ও পরহেজগার হবে। যত বেশি আল্লাহভীরু হবেন ততই তার ঝাড়-ফুঁকে কাজ বেশি হবে।

২. ঝাড়-ফুঁকের সময় একনিষ্ঠ হৃদয় নিয়ে আল্লাহর দিকে নিজেকে ধাবিত করবেন। যাতে করে মুখ যা বলবে অন্তর যেন তা অনুধাবন করে। উত্তম হচ্ছে মানুষ নিজে নিজেকে ঝাড়-ফুঁক করবে। কেননা সাধারনত অন্যের অন্তর ব্যস্ত থাকে। তাছাড়া নিজের বিপদ ও প্রয়োজন সে নিজে যেমন অনুভব করে অন্যে তা অনুভব করতে পারবে না। বিপদগ্রস্তরা আল্লাহর দ্বারস্থ হলে তাদের ডাকে সাড়া দেয়ার অঙ্গীকার তিনি তাদের দিয়েছেন।

যাকে ঝাড়-ফুঁক করা হবে তার জন্য কতিপয় শর্ত :

১. সে মুমিন ও নেককার হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঈমান অনুযায়ী প্রভাব হবে। কেননা কুরআন মুমিনদের জন্য রোগের শেফা এবং আল্লাহর রহমত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا

'আমি কুরআনে যা নাযিল করেছি তাতে মুমিনদের জন্য রয়েছে আরোগ্য ও রহমত। আর জালেমদের ক্ষতি ছাড়া অন্য কিছু বৃদ্ধি করবে না। (বণী ইসরাঈল ১৭:৮২)

২. সত্যিকারভাবে আল্লাহর স্মরণাপন্ন হবে যে, তিনি তাকে আরোগ্য দান করবেন।

৩. আরোগ্য পেতে দেরি হচ্ছে কেন এরূপ অভিযোগ করবে না। কেননা ঝাড়-ফুঁক এক ধরনের দুআ। দুআ কবুল হওয়ার ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলে হয়তো তা কবুলই হবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ يَعْجَلْ يَقُولُ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي

'আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের প্রত্যেকের দু'আ কবুল করা হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সে তাড়াহুড়া না করে আর একথা না বলে যে, এত দুআ করলাম কিন্তু কবুল হল না। (বুখারী ৬৩৪০. মুসলিম ৭১১০, ৭১১১, তিরমিযী ৩৩৮৭, আবু দাউদ ১৪৮৬)

ঝাড়-ফুঁকের জন্য আয়াত ও হাদীছ :

সুরা ফাতিহা :

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ – الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ – مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ – إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ – اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ – صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ

'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি সৃষ্টিকুলের রব। দয়াময়, পরম দয়ালু, বিচার দিবসের মালিক। আপনারই আমরা ইবাদাত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য চাই। আমাদের সরল পথ দেখান। তাদের পথ, যাদের ওপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। যাদের ওপর (আপনার) ক্রোধ আপতিত হয়নি এবং যারা পথভ্রষ্টও নয়।'

আয়াতুল কুরসী :

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا

يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

'আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না। তাঁর জন্যই আসমানসমূহে যা রয়েছে তা এবং জমিনে যা আছে তা। কে সে, যে তাঁর নিকট সুপারিশ করবে তাঁর অনুমতি ছাড়া? তিনি জানেন যা আছে তাদের সামনে এবং যা আছে তাদের পেছনে। আর তারা তাঁর জ্ঞানের সামান্য পরিমাণও আয়ত্ব করতে পারে না, তবে তিনি যা চান তা ছাড়া। তাঁর কুরসী আসমানসমূহ ও জমিন পরিব্যাপ্ত করে আছে এবং এ দু'টোর সংরক্ষণ তাঁর জন্য বোঝা হয় না। আর তিনি সুউচ্চ, মহান।' (বাক্বারা ২:২৫৫)

সুরা বাকারার শেষের দুই আয়াত,

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ – لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

রাসুলুল্লাহ তার নিকট তার রবের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত বিষয়ের প্রতি ঈমান এনেছে, আর মুমিনগণও। প্রত্যেকে ঈমান এনেছে আল্লাহর ওপর, তাঁর ফেরেশতাকুল, কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসুলগণের ওপর, আমরা তাঁর রাসুলগণের কারও মধ্যে তারতম্য করি না। আর তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মানলাম। হে আমাদের রব! আমরা আপনারই ক্ষমা প্রার্থনা করি, আর আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তনস্থল। আল্লাহ কোনো ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার জন্যই এবং সে যা কামাই করে তা তার ওপরই বর্তাবে। হে আমাদের রব! আমরা যদি ভুলে যাই, অথবা ভুল করি তাহলে আপনি আমাদের পাকড়াও করবেন না। হে আমাদের রব, আমাদের ওপর বোঝা চাপিয়ে দেবেন না, যেমন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছেন। হে আমাদের রব, আপনি

আমাদের এমন কিছু বহন করাবেন না, যার সামর্থ্য আমাদের নেই। আর আপনি আমাদের মার্জনা করুন এবং আমাদের ক্ষমা করুন, আর আমাদের ওপর দয়া করুন। আপনি আমাদের অভিভাবক। অতএব আপনি কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য করুন। (বাক্বারা ২:২৮৫-২৮৬)

সুরা কাফিরূন :

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ – لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ – وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ – وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ – وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ – لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

বলো, 'হে কাফিররা, তোমরা যার 'ইবাদাত করো আমি তার 'ইবাদাত করি না'। এবং আমি যার 'ইবাদাত করি তোমরা তার 'ইবাদাতকারী নও'। 'আর তোমরা যার 'ইবাদত করছ আমি তার 'ইবাদাতকারী হব না'। 'আর আমি যার 'ইবাদাত করি তোমরা তার 'ইবাদাতকারী হবে না'।'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন আর আমার জন্য আমার দ্বীন।' (কাফিরূন ১০৯:১-৬)

সুরা ইখলাস :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ – اللَّهُ الصَّمَدُ – لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ – وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

বলো, তিনিই আল্লাহ, এক-অদ্বিতীয়। আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন, সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। আর তাঁর কোনো সমকক্ষও নেই। (ইখলাস ১১২:১-৪)

সূলা ফালাক :

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ – مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ – وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ – وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ – وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

'বলো, 'আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি ঊষার রবের কাছে, তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, আর রাতের অন্ধকারের অনিষ্ট থেকে যখন তা গভীর হয়, আর গিরায় ফুঁ-দানকারী নারীদের অনিষ্ট থেকে, আর হিংসুকের অনিষ্ট থেকে যখন সে হিংসা করে'।

সুরা নাস :

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ – مَلِكِ النَّاسِ – إِلَهِ النَّاسِ – مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ – الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ (٥) مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

'বলো, 'আমি আশ্রয় চাই মানুষের রব, মানুষের অধিপতি, মানুষের ইলাহ-এর কাছে, কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে দ্রুত আত্ম গোপন করে। যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয় জিন ও মানুষ থেকে।'

উপরোক্ত সুরাগুলো প্রতি ফরজ সালাতের পরে একবার করে তবে ফজর ও মাগরিবের পরে সুরা নাস, সুরা ফালাক্ব, সুরা ইখলাস, তিনবার করে পড়তে হবে। অতঃপর নিম্নের আয়াত গুলো একবার করে পাঠ করতে হবে।

فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

'তাই তাদের বিপক্ষে তোমার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (বাকারা ২:১৩৭)

يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

'হে আমাদের কওম, আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর প্রতি সাড়া দাও এবং তার প্রতি ঈমান আন, আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর তোমাদের যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে রক্ষা করবেন'।' (আহকাফ ৪৬:৩১)

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلا خَسَارًا

'আর আমি কুরআন নাযিল করি যা মুমিনদের জন্য শিফা ও রহমত, কিন্তু তা জালিমদের ক্ষতিই বাড়িয়ে দেয়।' (বনী ইসরাঈল ১৭:৮২)

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

'বরং তারা কি লোকদের হিংসা করে, আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে তাদের যা দিয়েছেন তার কারণে?' (নিসা ৪:৫৪)

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

''আর যখন আমি অসুস্থ হই, তখন যিনি আমাকে আরোগ্য করেন'।' (শু'আরা ২৬:৮০)

وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ

'এবং মুমিন কওমের অন্তরসমূহকে চিন্তামুক্ত করবেন।' (তাওবা ৯:১৪)

قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ

'বলো, এটি মুমিনদের জন্য হিদায়াত ও প্রতিষেধক।' (ফুসসিলাত ৪১:৪৪)

﴿ لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ﴾

'এ কুরআনকে যদি আমি পাহাড়ের ওপর নাযিল করতাম তবে তুমি অবশ্যই তাকে দেখতে, আল্লাহর ভয়ে বিনীত ও বিদীর্ণ।' (হাশর ৫৯:২১)

فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ

'তুমি আবার দৃষ্টি ফিরাও, কোনো ত্রুটি দেখতে পাও কি?' (মূলক ৬৭:৩)

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ

'আর কাফিররা যখন উপদেশবাণী শুনে তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে আছড়ে ফেলবে, আর তারা বলে, 'এ তো এক পাগল'।' (কলম ৬৮:৫১)

وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ — فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ — فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ

'আর আমি মূসার প্রতি ওহী পাঠালাম যে, 'তুমি তোমার লাঠি ছেড়ে দাও' তৎক্ষণাৎ সে গিলতে লাগল সেগুলোকে যে অলীক বস্তু তারা বানিয়েছিল। ফলে সত্য প্রকাশ হয়ে গেল এবং তারা যা কিছু করছিল তা বাতিল হয়ে গেল। তাই সেখানে তারা পরাজিত হল এবং লাঞ্ছিত হয়ে গেল।' (আরাফ ৭:১১৭-১১৯)

قَالُوا يَا مُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقِيَ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَى — قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى — فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى — قُلْنَا لا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى — وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى

'তারা বললো, হে মূসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরাই প্রথমে নিক্ষেপ করি। মূসা বললো, 'বরং তোমরাই নিক্ষেপ করো। অতঃপর তাদের জাদুর প্রভাবে মূসার কাছে মনে হলো যেন তাদের রশি ও লাঠিগুলো ছুটোছুটি করছে। তখন মূসা তার অন্তরে কিছুটা ভীতি অনুভব করল। আমি বললাম, 'তুমি ভয় পেয়ো না, নিশ্চয়ই তুমিই বিজয়ী হবে'। 'আর তোমার ডান হাতে যা আছে, তা ফেলে দাও। তারা যা করেছে, এটা সেগুলো গ্রাস করে ফেলবে। তারা যা করেছে, তাতো কেবল জাদুকরের কৌশল। আর জাদুকর যেখানেই আসুক না কেন, সে সফল হবে না।' (ত্বহা ২০:৬৫-৬৯)

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ

'তারপর আল্লাহ তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন তাঁর রাসুলের ওপর ও মুমিনদের ওপর।' (তাওবা ৯:২৬)

فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا

'অতঃপর আল্লাহ তার ওপর তাঁর পক্ষ থেকে প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাকে এমন এক সৈন্য বাহিনী দ্বারা সাহায্য করলেন যাদের তোমরা দেখনি।' (তাওবা ৯:৪০)

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا

'অবশ্যই আল্লাহ মুমিনদের ওপর সন্তুষ্ট হয়েছেন, যখন তারা গাছের নিচে আপনার হাতে বাই'আত গ্রহণ করেছিল; অতঃপর তিনি তাদের অন্তরে কি ছিল তা জেনে নিয়েছেন, ফলে তাদের ওপর প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের পুরস্কৃত করলেন নিকটবর্তী বিজয় দিয়ে।' (ফাতাহ্ ৪৮:১৮)

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ

'তিনিই মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেছিলেন যেন তাদের ঈমানের সাথে ঈমান বৃদ্ধি পায়।' (ফাতাহ ৪৮:৪)

ঝাড়-ফুক সংক্রান্ত কিছু দুআ

أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظِيمَ رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ أَنْ يَشْفِيَكَ

'সুবিশাল আরশের প্রভু সুমহান আল্লাহর কাছে আমি প্রার্থনা করছি, তিনি আপনাকে আরোগ্য দান করুন।' (তিরমিযী ২০৮৩, আবু দাউদ, ৩১০৮, মুসনাদে আহমাদ ২১৩৭, মেশকাত ১৫৫২) (৭ বার পড়তে হবে)

أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ

'আল্লাহর পরিপূর্ণ বাণী সমূহের মাধ্যমে আমি তোমাদের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করছি সকল প্রকার শয়তান থেকে, বিষধর প্রাণীর অনিষ্ট থেকে এবং সকল প্রকার বদ নযর থেকে।' (বুখারী ৩৩৭১, আবু দাউদ ৩৭৩৯, ইবনে মাজাহ, ৩৫২৫, মুসনাদে আহমাদ ২১১২, মেশকাত ১৫৩৫) (৩ বার পড়তে হবে)

أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ وَأَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

'হে মানুষের রব, বিপদ দূরীভূত করে দাও, আরোগ্য দান কর- এমন আরোগ্য যার পর আর কোনো রোগ অবশিষ্ট না থাকে, কেননা তুমিই একমাত্র আরোগ্য দানকারী, তোমার আরোগ্য ছাড়া আর কারো আরোগ্য নেই।' (বুখারী, ৫৬৭৫, ৫৭৪২, ৫৭৪৩, ৫৭৫০, মুসলিম ৫৮৩৬, ৫৮৩৭, তিরমিযী ৯৭৩, ৩৫৬৫) (৩ বার পড়তে হবে)

اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنْهُ حَرَّهَا وَبَرْدَهَا وَوَصَبَهَا

'হে আল্লাহ তার থেকে গরম, ঠাণ্ডা ও ক্লান্তি দূর করে দাও।' (মুসনাদে আহমাদ ১৫৭০০) (১ বার পড়তে হবে)

بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ اللَّهُ يَشْفِيكَ بِاسْمِ اللَّهِ أَرْقِيكَ

'আমি আল্লাহর নাম নিয়ে তোমার ঝাড়-ফুঁক করছি- তোমাকে কষ্টদানকারী সকল বস্তু হতে এবং প্রত্যেক ব্যক্তির অথবা হিংসুক ব্যক্তির নযরের অনিষ্ট থেকে। আল্লাহ তোমাকে আরোগ্য দান করুন। আল্লাহর নাম নিয়ে তোমাকে ঝাড়-ফুঁক করছি।' (মুসলিম ৫৮২৯, মেশকাত ১৫৩৪) (৩ বার পড়তে হবে)

শরীরের যে স্থানে ব্যথা অনুভূত হয় সেখানে হাত রেখে 'বিসমিল্লাহ' বলবেন ৩ বার। তারপর এই দুআ পড়বেন– أَعُوذُ بِاللَّهِ وَقُدْرَتِهِ مِنْ شَرِّ مَا أَجِدُ وَأُحَاذِرُ 'আল্লাহর ইজ্জত ও ক্ষমতার উসিলায় যে অনিষ্ট আমি অনুভব করছি এবং যার ভয় করছি তা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।' (মুসলিম ৫৮৬৭, ইবনে মাজাহ ৩৫২২, মেশকাত ১৫৩৩) (৭ বার পড়তে হবে)

বদনযর লাগা ব্যক্তির জন্য উপদেশাবলী :

- শুধুমাত্র এক আল্লাহর তাওহীদে (একত্ববাদ) বিশ্বাসী হওয়া।
- আল্লাহকে ভয় করা ও তাঁর সীমা রক্ষা করা।
- শয়তান থেকে আল্লাহর নিকট সঠিকভাবে আশ্রয় চাওয়া।

- বেশি করে কুরআন পড়া।
- বেশি করে আল্লাহর যিকির করা ও উহা দ্বারা রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করা।
- হিংসুকের হিংসায় ধৈর্য ধরা।
- আল্লাহর ওপর দৃঢ়ভাবে নির্ভরশীল হওয়া।
- দৃঢ় ভালোবাসার মাধ্যমে আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করা।
- বেশি বেশি গুনাহ থেকে ক্ষমা চাওয়া।
- ছদকাহ করা ও হিংসুকের প্রতি দয়া করা।

কয়েকটি সতর্কতা :

১. বদনযরকারীর সাথে সংশ্লিষ্ট কুসংস্কারকে বিশ্বাস করা জায়েয নয়। যেমন তার প্রস্রাব পান করা, তার স্পর্শকৃত বস্তু পাওয়া গেলে তা দ্বারা কোনো উপকার পাওয়া যাবে এমন বিশ্বাস করাও যাবে না।

২. বদনযর লাগবে এই আশঙ্কায় তাবীজ লটকানো বা চামড়া বা রিং বা তাবীজের মালা পরিধান করা জায়েয নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ

'যে ব্যক্তি কোনো কিছু লটকাবে, তাকে সেই বস্তুর প্রতি সোপর্দ করা হবে।' (তিরমিযী ২০৭২, মুনাদে আহমাদ ১৮৭৮১)

৩. গাড়ীর মধ্যে 'মাশাআল্লাহ তাবারাকাল্লাহ' লিখে, তলোয়ার, চাকু, চোখ আঁকিয়ে লটকিয়ে দেয়া, কুরআন রাখা, অথবা বাড়িতে কুরআনের বিভিন্ন আয়াত লিখে লটকিয়ে রাখা জায়েয নয়। কেননা এগুলো দ্বারা বদনযর থেকে বাঁচা যাবে না। বরং এগুলো নিষিদ্ধ তাবীজের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেতে পারে।

৪. রোগী দৃঢ় বিশ্বাস রাখবে যে তার দু'আ কবুল হবে। আরোগ্য হতে দেরি হচ্ছে কেন এ কথা বলবে না। যদি বলা হয় যে আরোগ্যের জন্য সারা জীবন ঔষধ খেতে হবে তবে ভীত হয় না। কিন্তু যদি দীর্ঘ সময় ঝাড়-ফুঁক করা হয় তবে অস্থির হয়ে যায়। অথচ ঝাড়-ফুঁকের জন্য যে আয়াত পাঠ করা হয় তার প্রত্যেকটা অক্ষরে নেকি পাওয়া যাবে। আর একটি নেকিকে দশগুণ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। রোগীর ওপর আবশ্যক হচ্ছে বেশি বেশি

দুআ, ইস্তেগফার করা এবং বেশি বেশি দান-সাদকা করা। কেননা এগুলোর মাধ্যমে আরোগ্য আশা করা যায়।

৫. দলবদ্ধ হয়ে ঝাড়-ফুঁকের দু'আ পাঠ করা সুন্নাতের খেলাফ। এর প্রভাবও দুর্বল। অনুরূপভাবে শুধুমাত্র টেপরেকর্ডারের মাধ্যমে শোনাও ঠিক না। কেননা এতে নিয়ত উপস্থিত থাকে না। অথচ ঝাড়-ফুঁককারীর নিয়ত থাকা অন্যতম শর্ত। যদিও টেপরেকর্ডারের কেরাত শোনাতে কল্যাণ আছে। আরোগ্য লাভ করা পর্যন্ত ঝাড়-ফুঁকের দু'আ বারবার পাঠ করা সুন্নাত। কিন্তু ক্লান্ত হয়ে গেলে ঝাড়-ফুঁক কমিয়ে দিবে যাতে করে বিতৃষ্ণাভাব সৃষ্টি না হয়। বিনা দলীলে আয়াত ও দু'আ পাঠ করার ক্ষেত্রে সংখ্যা নির্দিষ্ট করা ঠিক নয়।

৬. কিছু কিছু আলামত আছে যা দ্বারা প্রমাণ পাওয়া যাবে যে, ঝাড়-ফুঁককারী জাদু বা শিরকী কিছু ব্যবহার করছে; কুরআন দ্বারা ঝাড়-ফুঁক করছে না। উপরে ধর্মীয় কিছু পরিচয় থাকলেও ধোঁকায় পড়া যাবে না। শুরুতে কুরআন থেকে হয়তো কিছু পাঠ করবে, অল্পক্ষণ পরেই অন্যকিছু পড়া শুরু করবে। আবার অনেকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ঘনঘন মসজিদে যাবে। আপনার সামনে ঠোঁট নাড়িয়ে যিকির পাঠ করবে। সাবধান! এদের আক্বীদা ও মূল পরিচয় না জেনে যেন ধোকায় না পড়েন।

জাদুকর ও ভেল্কীবাজদের চেনার উপায়

সে রোগী এবং তার বাবা-মার নাম জিজ্ঞেস করবে। অথচ নাম জানা না জানার সাথে চিকিৎসার কোনো সম্পর্ক নেই। রোগীর ব্যবহৃত কোনো বস্তু যেমন টুপি বা কাপড় বা চুল ইত্যাদি তলব করবে। জিনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট বৈশিষ্টের কোনো প্রাণী জবেহ করার কথা বলবে। কখনো জবেহকৃত প্রাণীর রক্ত নিয়ে রোগীর গায়ে মাখবে। ঝাড়-ফুঁক করার সময় দুর্বোধ্য শব্দে গুনগুন করে মন্ত্র পাঠ করবে বা লিখে দিবে। তাবিজ-কবচ যেমন : নম্বরের মাধ্যমে বা বিচ্ছন্ন অক্ষরের মাধ্যমে ছক আঁকিয়ে রোগীকে প্রদান করবে। রোগীকে নির্দিষ্ট কিছু দিন অন্ধকার ঘরের মধ্যে নির্জনে একাকী থাকার জন্য নির্দেশ দিবে। নির্দিষ্ট দিনের জন্য রোগীকে পানি স্পর্শ করতে নিষেধ করবে। রোগীকে এমন কিছু প্রদান করবে যা মাটিতে বা কবরস্থানে বা নিজ গৃহে পুঁতে রাখতে বলবে বা কাগজে কিছু লিখে দিবে যা পুড়িয়ে ধোঁয়া

নেয়ার জন্য বলবে। রোগীকে তার ব্যক্তিগত ব্যাপারে (অতীত, ভবিষ্যৎ) সম্পর্কে কিছু খবর প্রদান করবে যা একমাত্র সে ছাড়া অন্য কেউ জানে না। অথবা রোগীর কথা বলার পূর্বেই তার নাম, ঠিকানা ও কি অসুখ হয়েছে ইত্যাদি বলে দিবে। রোগী তার কাছে যাওয়া মাত্র ব্যবস্থাপত্র দিয়ে দিবে বা টেলিফোন বা ডাকের মাধ্যমে ব্যবস্থাপত্র লিখে দিবে।

জাদু ও মু'জেযার পার্থক্য

পয়গম্বরদের মু'জেযা ও ওলীদের কারামাত দ্বারা যেমন অস্বাভাবিক ও অলৌকিক ঘটনাবলী প্রকাশ পায়, জাদুর মাধ্যমেও তেমনি প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। ফলে মূর্খ লোকেরা বিভ্রান্তিতে পতিত হয়ে জাদুকরদেরও সম্মানিত ও মাননীয় মনে করতে থাকে। এ কারণে এতদুভয়ের পার্থক্য বর্ণনা করা দরকার।

বলাবাহুল্য, প্রকৃত সত্তার দিক দিয়ে এবং বাহ্যিক প্রতিক্রিয়ার দিক দিয়ে এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। সত্তাগত পার্থক্য এই যে, জাদুর প্রভাবে সৃষ্ট ঘটনাবলীও ব্যাখ্যাতীত কোনো কার্যকারণের আওতাবহির্ভূত নয়। পার্থক্য শুধু কারণটি দৃশ্য কিংবা অদৃশ্য হওয়ার মধ্যে। যেখানে কারণ দৃশ্যমান, সেখানে ঘটনাকে কারণের সাথে সম্পৃক্ত করে দেয়া হয় এবং ঘটনাকে মোটেই বিস্ময়কর মনে করা হয় না। কিন্তু যেখানে কারণ অদৃশ্য, সেখানেই ঘটনাকে অদ্ভূত ও আশ্চর্যজনক মনে করা হয়। সাধারণ লোক 'কারণ' না জানার দরুন এ ধরনের ঘটনাকে অলৌকিক মনে করতে থাকে। অথচ বাস্তবে তা অন্যান্য সাধারণ ঘটনার মতোই। কোনো দূরপ্রাচ্য থেকে আজকের লেখা পত্র হঠাৎ সামনে পড়লে দর্শকমাত্রই সেটাকে অলৌকিক বলে আখ্যায়িত করবে। অথচ জ্বিন ও শয়তানরা এ জাতীয় কাজের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে। মোটকথা এই যে, জাদুর প্রভাবে দৃষ্ট ঘটনাবলীও বিশেষ কারণের অধীন। তবে কারণ অদৃশ্য হওয়ার দরুন মানুষ অলৌকিকতার বিভ্রান্তিতে পতিত হয়।

মু'জেযার অবস্থা এর বিপরীত। মু'জেযা প্রত্যক্ষভাবে আল্লাহ তাআলার কাজ। এতে প্রাকৃতিক কারণের কোনো হাত নেই। ইব্রাহিম (আ.)-এর জন্যে নমরূদের জ্বালানো আগুনকে আল্লাহ তা'আলাই আদেশ করেছিলেন–

قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

'আমি বললাম, 'হে আগুন, তুমি শীতল ও নিরাপদ হয়ে যাও ইবরাহীমের জন্য।' (আম্বিয়া ২১:৬৯)

আল্লাহর এই আদেশের ফলে আগুন শীতল হয়ে যায়।

ইদানিং কোনো কোনো লোক শরীরে ভেষজ প্রয়োগ করে আগুনের ভেতরে চলে যায়। এটা মু'জেযা নয়; বরং ভেষজের প্রতিক্রিয়া। তবে ভেষজটি অদৃশ্য, তাই মানুষ একে অলৌকিক বলে ধোঁকা খায়।

স্বয়ং কুরআনের বর্ণনা দ্বারা বুঝা যায় যে, মু'জেযা সরাসরি আল্লাহর কাজ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে– فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى 'তোমরা তাদের হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদের হত্যা করেছেন। আর তুমি নিক্ষেপ করনি যখন তুমি নিক্ষেপ করেছিলে; বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন।' (আনফাল ৮:৩৬)

অর্থাৎ এক মুষ্টি কঙ্কর সমবেত সবার চোখে পৌঁছে গেল, এতে আপনার কোনো হাত ছিল না। এটা ছিল একান্তভাবেই আল্লাহর কাজ। এই মু'জেযাটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত হয়েছিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একমুষ্টি কঙ্কর কাফের বাহিনীর প্রতি নিক্ষেপ করেছিলেন যা সবার চোখেই পড়েছিল।

মু'জেযা প্রাকৃতিক কারণ ছাড়াই সরাসরি আল্লাহর কাজ আর জাদু অদৃশ্য স্বাভাবিক কারণের প্রভাব। এ পার্থক্যটিই মু'জেযা ও জাদুর স্বরূপ বোঝার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখানে একটি প্রশ্ন থেকে যায় যে, সাধারণ লোক এই পার্থক্যটি কিভাবে বুঝবে? কারণ, উভয়টিরই বাহ্যিক রূপ এক। এ প্রশ্নের উত্তর এই যে, সাধারণ লোকদের বুঝার জন্য আল্লাহ তা'আলা কয়েকটি পার্থক্য প্রকাশ করেছেন।

প্রথমত : মু'জেযা ও কারামত এমন ব্যক্তিবর্গের দ্বারা প্রকাশ পায়, যাদের আল্লাহভীতি, পবিত্রতা, চরিত্র ও কাজকর্ম সবার দৃষ্টির সামনে থাকে। পক্ষান্তরে জাদু তারাই প্রদর্শন করে, যারা নোংরা, অপবিত্র এবং আল্লাহর যিকির থেকে দূরে থাকে। এসব বিষয় চোখে দেখে প্রত্যেকেই মু'জেযা ও জাদুর পার্থক্য বুঝতে পারে।

দ্বিতীয়ত : আল্লাহর চিরাচরিত রীতি এই যে, যে ব্যক্তি মু'জেযা ও নবুওয়্যাত দাবি করে জাদু করতে চায়, তার জাদু প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। অবশ্য নবুওয়্যাতের দাবি ছাড়া জাদু করলে, তা প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

নবী-রাসুলদের ওপর জাদু ক্রিয়া করে কি না? এ প্রশ্নের উত্তর হবে ইতিবাচক। কারণ, পূর্বেই বর্ণিত হয়েছে যে, জাদু প্রকৃতপক্ষে প্রাকৃতিক কারণের প্রভাব। নবী-রাসুলগণ প্রাকৃতিক কারণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হন। এটা নবুওয়্যাতের মর্যাদার পরিপন্থী নয়। সবাই জানেন, বাহ্যিক কারণ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে নবী-রাসুলগণ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হন, রোগাক্রান্ত হন এবং আরোগ্য লাভ করেন। তেমনিভাবে জাদুর অদৃশ্য কারণ দ্বারাও তারা প্রভাবান্বিত হতে পারেন। সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, ইহুদিরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর জাদু করেছিল এবং সে জাদুর কিছু প্রতিক্রিয়াও প্রকাশ পেয়েছিল। ওহীর মাধ্যমে তা জানা সম্ভব হয়েছিল এবং জাদুর প্রভাব দূরও করা হয়েছিল।

جادুর শরয়ী বিধান حُكْمُ السِّحْرِ فِى الشَّرْعِ

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় জাদু এমন অদ্ভুত কর্মকাণ্ড যাতে কুফর, শির্ক এবং পাপাচার অবলম্বন করে জ্বীন ও শয়তানদের সন্তুষ্ট করে তাদের সাহায্য নেয়া হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

'তারা ঐ শাস্ত্রের অনুসরণ করল, যা সোলায়মানের রাজত্ব কালে শয়তানরা আবৃত্তি করত। সোলায়মান কুফ্‌রি করেনি; শয়তানরাই কুফ্‌রি করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা এবং বাবেল শহরে হারূত ও মারূত দুই ফেরেশতার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছিল, তা শিক্ষা দিত। তারা উভয়ই

একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না। অতঃপর তারা তাদের কাছ থেকে এমন জাদু শিখত, যদ্দ্বারা স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটে। তারা আল্লাহ্‌র আদেশ ছাড়া তদ্দ্বারা কারও অনিষ্ট করতে পারত না। যা তাদের ক্ষতি করে এবং উপকার না করে, তারা তাই শিখে। তারা ভালোরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোনো অংশ নেই। যার বিনিময়ে তারা আখিরাত বিক্রয় করেছে, তা খুবই মর্মান্তুদ যদি তারা জানত।' (বাক্বারা ২:১০২-১০৩)

অর্থাৎ বণী ইসরাঈলদের মধ্যে যখন নৈতিক ও বস্তুগত পতন সূচিত হলো, গোলামি, মূর্খতা, অজ্ঞতা, দারিদ্র্য, লাঞ্ছনা ও হীনতা যখন তাদের সমস্ত জাতিগত উচ্চ মনোবল ও উচ্চাকাঙ্খার বিলোপ সাধন করলো তখন জাদুটোনা, তাবিজ-তুমার, টোটকা ইত্যাদির প্রতি তারা আকৃষ্ট হতে থাকলো বেশি করে। তারা এমন সব পন্থার অনুসন্ধান করতে লাগলো যাতে কোনো প্রকার পরিশ্রম ও সংগ্রাম-সাধন ছাড়াই নিছক ঝাড়-ফুঁক তন্ত্র-মন্ত্রের জোরে বাজিমাত করা যায়। তখন শয়তানরা তাদের প্ররোচনা দিতে লাগলো। তাদের বুঝাতে থাকলো যে, সোলাইমান (আ.) এর বিশাল রাজত্ব এবং তাঁর বিস্ময়কর ক্ষমতা তো আসলে কিছু মন্ত্র-তন্ত্র ও কয়েকটা আঁচড়, নকশা তথা তাবিজের ফল। শয়তানরা তাদের সেগুলো শিখিয়ে দেয়ার দায়িত্ব নিল। বণী ইসরাঈলরা অপ্রত্যাশিত মহামূল্যবান সম্পদ মনে করে এর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফলে আল্লাহর কিতাবের প্রতি তাদের কোনো আগ্রহ ও আকর্ষণ থাকলো না এবং কোনো সত্যের আহ্বায়কের আওয়াজ তাদের হৃদয়তন্ত্রীতে কোনো প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলো না।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বিভিন্ন বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। কিন্তু এখানে আমি যা কিছু বুঝেছি তা হচ্ছে এই যে, সমগ্র বণী ইসরাঈল জাতি যে সময় ব্যাবিলনে বন্দি ও গোলামির জীবনযাপন করছিল, আল্লাহ তখন তাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে দু'জন ফেরেশতাকে মানুষের বেশে তাদের কাছে হয়তো পাঠিয়ে থাকবেন। লূত জাতির কাছে যেমন ফেরেশতারা গিয়েছিলেন সুদর্শন বালকের বেশ ধারণ করে তেমনি বণী ইসরাঈলদের কাছে তারা হয়তো পীর ও ফকীরের ছদ্মবেশে হাজির হয়ে থাকবে। সেখানে একদিকে তারা নিজেদের জাদুর দোকান সাজিয়ে বসে থাকতেন আর অন্যদিকে

লোকদের এই মর্মে সতর্ক করে দিতেন : দেখো, আমরা তোমাদের জন্য পরীক্ষাস্বরূপ। কাজেই নিজেদের পরকাল নষ্ট করো না। কিন্তু তাদের এই সতর্কবাণী ও সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্ত্বেও লোকেরা তাদের দেয়া ঝাড়-ফুঁক ও তাবীজ-তুমারের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ফেরেশতাদের মানুষের আকার ধারণ করে মানুষের মধ্যে কাজ করার ব্যাপারটায় অবাক হবার কিছুই নেই। তারা আল্লাহর সাম্রাজ্যের কর্মচারী। নিজেদের দায়িত্ব পালনের জন্য যে সময় যে আকৃতি ধারণ করার প্রয়োজন হয় তারা তাই করেন। এখনই এ মুহূর্তে আমাদের চারদিকে কতজন ফেরেশতা মানুষের আকার ধরে এসে কাজ করে যাচ্ছেন তার কতটুকু খবরই বা আমরা রাখি। তবে ফেরেশতাদের এমন একটা কাজ শেখাবার দায়িত্ব নেয়া, যা মূলত খারাপ, এর অর্থ কি? এটা বুঝার জন্য এ ক্ষেত্রে এমন একটি পুলিশের দৃষ্টান্ত পেশ করা যেতে পারে যে পুলিশের পোশাক ছেড়ে সাধারণ নাগরিকের পোশাক পরে কোনো ঘুষখোর প্রশাসকের কাছে হাজির হয় তার ঘুষখোরীর প্রমাণ সংগ্রহের জন্য। একটি নোটের গায়ে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে সে ঘুষ হিসেবে প্রশাসককে দেয়, যাতে ঘুষ নেয়ার সময় হাতেনাতে তাকে ধরতে পারে এবং তার পক্ষে নিজের নির্দোষিতা প্রমাণ করার কোনো অবকাশই না থাকে।

এ আয়াতগুলো থেকে প্রমাণিত হলো :

১. সেহর (জাদু) শয়তানের কাজ।

২. সেহর (জাদু) কুফরি কাজ। যা একজন নবীর জন্য অসম্ভব।

৩. 'শয়তানরাই কুফর করেছিল। তারা মানুষকে জাদুবিদ্যা শিক্ষা দিতো।' এ থেকে বুঝা যায়, জাদু শিক্ষা দেয়া একটি কুফরি কাজ এবং তা শয়তানের তালিম। কোনো নবী-রাসুল, ওলী-আওলিয়া ও ভালো মানুষের কাজ নয়। এগুলো শয়তানের কাজ। সুতরাং যেসকল পীর-বুযুর্গ, ওলী-আওলিয়া নামধারী লোকেরা বর্তমানেও এ সকল কাজ করে তারা শয়তান হতে পারে, ইবলিস হতে পারে, ধোঁকাবাজ ও প্রতারক হতে পারে কিন্তু আল্লাহর ওলী হতে পারে না।

৪. 'তারা উভয়ই একথা না বলে কাউকে শিক্ষা দিত না যে, আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না।'

আয়াতের এ অংশ দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যায় যে, জাদু শিক্ষা করা একটি কুফরি কাজ। আর যারা শিখে তারা কাফের হয়ে যায়।

৫. 'তারা ভালোরূপে জানে যে, যে কেউ জাদু অবলম্বন করে, তার জন্য পরকালে কোনো 'অংশ নেই'।' বুঝা গেলো জাদু শিক্ষা করা এটা কাফেরদের কাজ আর কাফেরদের জন্য পরকালে কোনো হিস্যা (জান্নাত) নেই। সুতরাং জাদু এমন একটা কুফরি কাজ যার দ্বারা জান্নাত চিরস্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

৬. 'যদি তারা ঈমান আনত এবং আল্লাহ ভীরু হত।' আয়াতের এ অংশ থেকে আরো পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, 'সেহর' (জাদু) ঈমান ও তাকওয়ার পরিপন্থী কাজ। জাদু শিক্ষা করলে ঈমান ও তাকওয়া থাকে না।

এই সব আয়াতগুলো থেকে স্পষ্ট হলো যে, জাদু শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষা করা কুফরি কাজ বটে। যে ব্যক্তি ঈমানের পরিবর্তে কুফরকে গ্রহণ করে সে ব্যক্তি কাফির হয়ে যায়। জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যায়। আরো প্রমাণিত হলো যে, 'সেহর' ঈমানের পরিপন্থী কাজ এবং তা ঈমান বিনষ্টকারী বিষয়সমূহের একটি। এইজন্য ফেরেশতারা জাদু শিক্ষা দেওয়ার আগে বলতেন, **إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ** ' আমরা পরীক্ষার জন্য; কাজেই তুমি কাফির হয়ো না'।

এই আয়াতের তাফসির করতে গিয়ে বিভিন্ন তাফসিরকারকদের মতামত পেশ করা হলো।

ইবনে আব্বাস বলেন :

وَذَلِكَ أَنَّهُمَا عَلَّمَا الْخَيْرَ وَالشَّرَّ وَالْكُفْرَ وَالْإِيْمَانَ فَعَرَّفَا أَنَّ السِّحْرَ مِنَ الْكُفْرِ

'হারুত-মারুত উভয় ফেরেশতা ভালো-মন্দ, কুফর-ঈমান উভয় প্রকারই শিখাতো এবং সিহর (জাদু) একটি কুফরি কাজ তাও সুস্পষ্ট করে দিতো।' (তাফসীর ইবনে কাসীর সুরা বাক্বারা, ২:১০২-১০৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

হাসান এবং কাতাদাহ বলেন :

أَنَّ اللهَ قَدْ أَخَذَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ أَنْ لَا يُعَلِّمَا أَحَدًا حَتَّى يَقُوْلَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ

'আল্লাহ তা'আলা উভয় ফেরেশতা থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা কাউকে কিছু শিখাবে না যতক্ষণ না তারা বলবে আমরা ফেতনাহ' (পরীক্ষার বস্তু), সুতরাং তোমরা কুফরি করো না।' (তাফসীরে তাবারী সুরা বাক্বারা, ২:১০২-১০৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

ইবনে জারীর তাবারী বলেন :

وَمَا يُعَلِّمُ الْمَلَكَان أحدًا منَ النَّاس الَّذىْ أَنْزَلَ عَلَيْهِمَا منَ التَّفْرِيْق بَيْنَ الْمَرْء وَزَوْجه حَتَّى يَقُوْلَا إِنَّمَا نَحْنُ بَلَاءٌ وَفتْنَةٌ لبَنىْ آدَمَ فَلَا تَكْفُرْ برَبِّكَ

'উভয় ফেরেশতা কোনো মানুষকে তাদের প্রতি নাযিলকৃত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারী জাদু শিখাতেন না যতক্ষণ না তারা সুস্পষ্টভাবে বলতেন, 'আমরা পরীক্ষার বস্তু' কাজেই তোমরা তোমাদের রবের সাথে কুফরি করো না।' (তাফসীরে তাবারী সুরা বাক্বারা, ২:১০২-১০৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

ইবনে কাসীর বলেন :

وَقَدْ اسْتَدَلَّ بقَوْله (وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوْا وَاتَّقَوْا...) مَنْ ذَهَبَ إِلَىْ تَكْفيْر السَّاحر كَمَا هُوَ روَايَةٌ عَن الْإِمَام أَحْمَدَ بْن حَنْبَلٍ وَطَائفَة منَ السَّلَف

'وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوْا وَاتَّقَوْا... দ্বারা প্রমাণ করেন। জাদুকর কাফির, ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল ও একদল সালাফ আস সালেহীন থেকে এভাবেই বর্ণিত হয়েছে।' (তাফসীরে ইবনে কাসীর সুরা বাক্বারা, ২:১০২-১০৩ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)

ইমাম নববী বলেন :

عَمَلُ السِّحْرِ حَرَامٌ وَهُوَ منَ الْكَبَائر بالْإِجْمَاع...وَقَدْ يَكُوْنُ كُفْرًا وَقَدْ لَا يَكُوْنُ كُفْرًا بَلْ مَعْصيَتُهُ كَبيْرَةٌ، فَإِنْ كَانَ فيْه قَوْلٌ أَوْ فعْلٌ يَقْتَضىْ الْكُفْر كُفِّرَ وَإِلَّا فَلَا

'জাদুর কাজ হারাম এবং তা সর্বসম্মতিক্রমে কাবীরা গুনাহের অন্তর্ভুক্ত। তবে কখনও কুফর হয় কখনও হয় না। বরং গুনাহে কাবীরা হয়। যদি জাদুর মধ্যে কোনো কুফরি কথা বা কাজ পাওয়া যায় তাহলে কাফের হবে নতুবা নয়।' (নাইলুল আওতার খণ্ড ৭, পৃ: ২০০ দ্রষ্টব্য)

জাদুকর কাফের কি না?

আস-সিহরুল-হাক্বিকী কুফরি কাজ। আর যে ব্যক্তি এটা করে সে কাফের। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন উলামাদের অভিমত–

ইমাম শাফেয়ী (রহ.) বলেন :

إِذَا تَعَلَّمَ السِّحْرَ قُلْنَا لَهُ صفْ لَنَا سحْرَكَ فَإِنْ وَصَفَ مَا يُوْجبُ الْكُفْرَ مثْلُ مَا اعْتَقَدَ أَهْلُ بَابلَ منَ التَّقَرُّب إِلَى الْكَوَاكب السَّبْعَة، وَأَنَّهَا تَفْعَلُ مَا يَلْتَمسُ منْهَا فَهُوَ كَافرٌ

'যদি কেউ জাদু শিখে। আমরা তাকে বলবো, তোমার জাদুর বর্ণনা দাও, যদি সে এমন কিছু বর্ণনা করে যা কুফরি কাজ, তাহলে সে কাফের।' (আল মুগনী, খণ্ড ৮, পৃ: ১৫২)

ইমাম সাবুনী বলেন :

وَمَنْ سَحَرَ منْهُمْ وَاسْتَعْمَلَ السِّحْرَ وَاعْتَقَدَ أَنَّهُ يَضُرُّ أَوْ يَنْفَعُ بغَيْر إِذْن الله تَعَالَىْ فَقَدْ كَفَرَ

'যে ব্যক্তি জাদু শিখলো এবং তা কাজে লাগালো এবং এ আক্বিদাহ পোষণ করে যে, উহা স্বয়ংক্রিয়ভাবে আল্লাহর অনুমতি ব্যতিরেকে মানুষের লাভ-ক্ষতি করতে পারে সে ব্যক্তি কুফরি করলো।' (মাজমুআতুর রাসায়েল আল মুনিরীয়্যাহ, খণ্ড ১, পৃ: ১৩০)

মোটকথা জাদু শিক্ষা দেওয়া, শিক্ষা করা, জাদু দিয়ে কাজ করা, এর প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এসবই কুফরি কাজ।

হাদীস শরীফে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– : حَدُّ السَّاحرِ ضَرْبُهُ بالسَّيْف

'জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'জাদুকরের শাস্তি হলো তরবারির এক আঘাত। অর্থাৎ এক আঘাতে গর্দান উড়িয়ে দেওয়াই হলো জাদুকরের প্রাপ্য শাস্তি'।' (তিরমিযী ১৪৬০, বায়হাকী ১৬৯৪২, মেশকাত ৩৫৫১; হাদীসটি দুর্বল সনদে বর্ণিত)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, জাদুকরকে হত্যা করতে হবে। অর্থাৎ যদি তার জাদুর ভেতরে কুফরি কাজ পাওয়া যায় তাহলে তাকে হত্যা করতে হবে। আর যদি কুফুরী কোনো কাজ না পাওয়া যায় তাহলে হত্যা করা যাবে না।

উমর (রা.)-এর ফরমান–

كَتَبَ عُمَرُ رَضىَ اللَّهُ عَنْهُ أَن اقْتُلُوا كُلَّ سَاحرٍ وَسَاحرَةٍ

'উমর (রা.) তার শাসনামলে সরকারি কর্মকর্তাদের প্রতি আদেশ জারি করলেন যে, 'সকল জাদুকর পুরুষ-নারীকে হত্যা কর'।' (বায়হাকী ১৬৯৪০, আবু দাউদ ৩০৪৫, মুসনাদে আহমাদ ১৬৫৭)

হাদীসের বর্ণনাকারী বাজালাহ বলেন আমরা এই নির্দেশ পেয়ে তিন জন জাদুকরকে হত্যা করেছি।

ইবনে কুদামা বলেন :

تَعَلُّمُ السِّحْرِ وَتَعْلِيْمُهُ حَرَامٌ لَا نَعْلَمُ فِيْهِ خِلَافًا بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ

জাদু শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেওয়া উভয়টাই হারাম। এ ব্যাপারে কোনো আলেমের দ্বিমত আছে বলে আমার জানা নেই। (আল মুগনী, খণ্ড ৭, পৃ: ১৫১)

فَالْأئِمَّةُ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ عَلَىٰ أَنَّهُ يُكَفِّرُ مَنْ تَعَلَّمَ السِّحْرَ وَاسْتَعْمَلَهُ

'ইমাম আবু হানীফা, মালেক, আহমাদ সকলেই একমত যে ব্যক্তি জাদু শিখে এবং জাদুর কাজ করে সে কাফের।' (আল ফিক্বহু আলাল মাজাহিব আল আরবা'আ, খণ্ড ৫, পৃ: ৪৬২)

জাদুকর তাগূত কেন?

আমাদের মূল আলোচনা চলছিলো তাগূত প্রসঙ্গ নিয়ে। প্রধান প্রধান তাগূতদের মধ্যে এক প্রকার ছিলো জাদুকর। আর সে কারণেই আমরা জাদুর প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখন প্রশ্ন হলো জাদুকর তাগূত কেন? এই প্রশ্নের উত্তর হলো যেহেতু সে বিভিন্ন জিনিসের ওপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতার অধিকারী বলে দাবি করে এবং মানুষের লাভ-ক্ষতির অধিকারী মনে করে, সে ইচ্ছে করলেই কারো ওপর বিপদ-আপদ নাযিল করতে পারে আবার ইচ্ছে করলে কারো থেকে বিপদ-আপদ দূর করে দিতে পারে। অথচ এ কাজগুলো একান্তই আল্লাহর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয়। যেহেতু জাদুকররা আল্লাহর এই সকল বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী বলে নিজেদের দাবি করে এবং মানুষ তাদের এই সব কথা বিশ্বাস করে তাদের আনুগত্য করে। আর আল্লাহর পরিবর্তে যাদের আনুগত্য করা হয় তারাই তাগূত।

اَلْكَاهِنُ 'গণক-জ্যোতিষী'

كاهن ঐ সকল গণক, জ্যোতিষী যারা হস্তরেখা দেখে অথবা বিভিন্ন গ্রহ-উপগ্রহ এবং তারকার উদয়-অস্তাচলের ভিত্তিতে অথবা অন্য কোনো লক্ষ্মণ দেখে বা তিথী গণনা করে অথবা اِسْتِرَاقُ السَّمْعِ অর্থাৎ শয়তানদের মাধ্যমে

ফেরেশতাদের পরামর্শ চুরি করে ভবিষ্যৎ বাণী করে এবং ইলমে গায়েবের দাবি করে।

অবশ্য শেষোক্ত বিষয়টি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়ত প্রাপ্তির আগে বেশি ছিল। নবুওয়ত প্রাপ্তির পরে কমে গেছে। কেননা আল্লাহ তাআলা আকাশকে প্রজ্বলিত অগ্নিখণ্ড দিয়ে হেফাজত করেছেন। এই উম্মতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জ্বীন এবং শয়তানরা তাদের মানব বন্ধুদের কাছে বিভিন্ন গায়েব সম্পর্কীয় খবর পৌঁছায়, সে অনুযায়ী ঐ শয়তান-এর বন্ধু পীর-সাহেব, গণক, জ্যোতিষী ভবিষ্যৎ বাণী করে ও আগাম খবর দেয়। কিন্তু মূর্খ মুরীদ এবং অনুসারীরা ইহাকে কাশফ্ এবং কারামত মনে করে। আর এভাবেই ধোঁকা খেয়ে অনেক মানুষ এই আওলিয়া-উশ-শয়তানদের আল্লাহর অলী মনে করে ধোঁকা খায়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ

'যেদিন আল্লাহ্ সবাইকে একত্রিত করবেন, হে জ্বীন সম্প্রদায়, তোমরা মানুষদের মধ্যে অনেককে অনুগামী করে নিয়েছ। তাদের মানব বন্ধুরা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা, আমরা পরস্পরে পরস্পরের মাধ্যমে ফল (সুযোগ-সুবিধ) লাভ করেছি। আপনি আমাদের জন্য যে সময় নির্ধারণ করেছিলেন, আমরা তাতে উপনীত হয়েছি। আল্লাহ্ বলবেন, আগুন হল তোমাদের বাসস্থান। তথায় তোমরা চিরকাল অবস্থান করবে; কিন্তু যখন চাইবেন আল্লাহ্। নিশ্চয়ই আপনার পালনকর্তা প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।" (আনআম ৬:১২৮)

এ আয়াতে দেখা গেলো যেসকল পীর-বুযুর্গ আর জ্বীন হুজুরেরা জ্বীনদের মাধ্যমে বিভিন্ন খবরা-খবর সংগ্রহ করে মানুষের সামনে নিজেদের কারামত জাহির করে। তারা কিয়ামত দিবসে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করবে। এবং আল্লাহ তাদের চিরস্থায়ী জাহান্নামে শাস্তি দিবেন।

গণক-জ্যোতিষীর কাছে গমণকারী ব্যক্তিদের ইবাদত কবুল হয় না।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে−

عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি কোনো গণকের কাছে আসলো এবং কোনো কিছু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো (অতঃপর সে যা বললো তা বিশ্বাস করলো।) সে ব্যক্তির চল্লিশ দিনের সালাত কবুল হবে না। (মুসলিম ৫৯৫৭, মুসনাদে আহমাদ ১৬৬৩৮, ২৩২২২, বায়হাকী ১৬৯৩৮, ১৬৯৫২, মেশকাত ৪৫৯৫)

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো গণক অথবা জ্যোতিষীর কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করলো, সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি যা নাযিল হয়েছে তা অস্বীকার করলো। (মুসনাদে আহমাদ ৯৫৩৬, বায়হাকী ১৬৯৩৮)

অপর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ ، أَوْ تُطَيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ ، أَوْ تُكِهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ ، أَوْ سُحِرَ لَهُ وَمَنْ عَقَدَ عُقْدَةً أَوْ قَالَ : مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ – صلى الله عليه وسلم

'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, 'যে ব্যক্তি পাখী উড়িয়ে মঙ্গল-অমঙ্গল, শুভ-অশুভ নির্ণয় করে অথবা যার উদ্দেশ্যে এইগুলো করা হয়, এমনিভাবে যে ব্যক্তি গণনা করে ভবিষ্যৎ বাণী করে অথবা যার জন্য করা হয়, অথবা যে জাদু করলো অথবা যার জন্য করা হলো সে ব্যক্তি আমাদের (মুসলিম) অন্তর্ভুক্ত নয়। যে ব্যক্তি জ্যোতিষী বা গণকের কাছে গেল এবং সে যা বললো তা বিশ্বাস করলো। সে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে অস্বীকার করলো'।'

كَاهِنٌ (গণক) কেন তাগূত?

যেহেতু সে (গণক) নিজেকে **عالم الغيب** (অদৃশ্যের জ্ঞান) রাখে বলে দাবি করে এবং গায়েবের ব্যাপারে খবর দেয়। যা একান্তই আল্লাহর কাজ। সে কারণে সে বাতিল ইলাহ এবং বাতিল রব হিসেবে গণ্য হয়। আর যেহেতু সে এর মাধ্যমে লোকদের নিজের ইবাদতের দিকে আহ্বান করে এ কারণে তাগূত। অথচ গায়েবের খবর একমাত্র আল্লাহ তা'আলা-ই রাখেন। এটি আল্লাহর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ 'আলিমুল গায়িব' বা অদৃশ্যের জ্ঞান রাখে না। নবী-রাসুল, ওলী-আওলিয়া, জ্বীন-ইনসান কেহই আলিমুল গায়িব নন। আল্লাহ যাকে যতটুকু জানান, সে কেবলমাত্র ততটুকুই জানতে পারে।

আল্লাহ ছাড়া কেউ গায়েব জানে না

আল্লাহ তায়ালার যে অর্থে **عَالِمُ الْغَيْبِ** (আলিমুল গায়িব) নিজের থেকে নিজে সব কিছু জানেন, কোনো ভায়া মাধ্যমের প্রয়োজন হয় না। সে অর্থে কোনো নবী, রাসুল, ওলী, বুযুর্গ **عَالِمُ الْغَيْبِ** (আলিমুল গায়িব) নন। তবে আল্লাহ তা'আলা যাকে যতটুকু জানান, তিনি ততটুকুই জানেন। আর এভাবে যিনি জানেন তাকে পরিভাষায় **عَالِمُ الْغَيْبِ** (আলিমুল গায়িব) বলা হয় না। যখন নবী-রাসুলগণই **عَالِمُ الْغَيْبِ** (আলিমুল গায়িব) নন, তখন গণক, জ্যোতিষী, টিয়া পাখী ওয়ালা, জ্বীন-শয়তান বা কোনো ওলী-বুযুর্গ, খাজা বাবা, গাঁজা বাবা, ল্যাংটা বাবা, পীর বাবা, জ্বীন হুজুর **عَالِمُ الْغَيْبِ** (আলিমুল গায়িব) হওয়ার বা গায়েব জানার প্রশ্নই আসে না।

জাহিলী যুগে যেভাবে গণক, জ্যোতিষী এবং এক শ্রেণীর পীর-বুযুর্গ গায়েব জানার দাবি করতো বর্তমানেও এক শ্রেণীর জ্যোতিষী, গণক, টিয়া পাখিওয়ালা এবং এক শ্রেণীর ভণ্ড পীর-ফকির তথাকথিত সুফি সাধক যারা পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যৎ সবকিছু জানে বলে দাবি করে, তারা মূলতঃ কুরআন এবং সহীহ হাদীস থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে গেছে। কেননা **عَالِمُ الْغَيْبِ** (অদৃশ্যের জ্ঞান) একমাত্র আল্লাহ তা'আলা জানেন। এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। নিম্নে কিছু আয়াত ও হাদীস পেশ করা হলো–

প্রথম আয়াত :

قُلْ لا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَّبِعُ إِلا مَا يُوحَى إِلَيَّ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ أَفَلا تَتَفَكَّرُونَ

'আপনি বলুন, আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার রয়েছে। তাছাড়া আমি অদৃশ্য বিষয় অবগতও নই। আমি এমন বলি না যে, আমি ফেরেশতা। আমি তো শুধু ঐ ওহীর অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আসে। আপনি বলে দিন, অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা করো না ? (আনআম, ৬: ৫০)

দ্বিতীয় আয়াত :

وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لا يَعْلَمُهَا إِلا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلا يَعْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلا رَطْبٍ وَلا يَابِسٍ إِلا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ

'তাঁর কাছেই অদৃশ্য জগতের চাবি রয়েছে। এগুলো তিনি ব্যতীত কেউ জানে না। স্থলে ও জলে যা আছে, তিনিই জানেন। কোনো পাতা ঝরে না; কিন্তু তিনি তা জানেন। কোনো শস্য কণা মৃত্তিকার অন্ধকার অংশে পতিত হয় না এবং কোনো আর্দ্র ও শুষ্ক দ্রব্য পতিত হয় না; কিন্তু তা সব প্রকাশ্য গ্রন্থে রয়েছে। (আনআম, ৬: ৫৯)

তৃতীয় আয়াত :

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ

'তিনিই সঠিকভাবে নভোমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। যেদিন তিনি বলবেন, হয়ে যা, অতঃপর হয়ে যাবে। তাঁর কথা সত্য। যেদিন শিঙ্গায় ফুৎকার করা হবে, সেদিন তাঁরই আধিপত্য হবে। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত। তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। (আনআম, ৬: ৭৩)

চতুর্থ আয়াত :

قُلْ لا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلا ضَرًّا إِلا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إِلا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

'আপনি বলে দিন, আমি আমার নিজের কল্যাণ সাধনের এবং অকল্যাণ সাধনের মালিক নই, কিন্তু যা আল্লাহ্‌ চান। আর আমি যদি গায়বের কথা

জেনে নিতে পারতাম, তাহলে বহু মঙ্গল অর্জন করে নিতে পারতাম, ফলে আমার কোনো অমঙ্গল কখনও হতে পারত না। আমি তো শুধুমাত্র একজন ভীতি প্রদর্শক ও সুসংবাদদাতা ঈমানদারদের জন্য। (আরাফ, ৭: ১৮৮)

পঞ্চম আয়াত :

ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

'তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত সত্তার নিকট। তিনিই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে। (তাওবা, ৯: ৯৪)

ষষ্ঠ আয়াতর :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

'আর তুমি বলে দাও, তোমরা আমল করে যাও, তার পরবর্তীতে আল্লাহ্‌ দেখবেন তোমাদের কাজ এবং দেখবেন রাসূল ও মুসলমানরা। তাছাড়া তোমরা শিগগির প্রত্যাবর্তিত হবে তাঁর সান্নিধ্যে যিনি গোপন ও প্রকাশ্য বিষয়ে অবগত। তারপর তিনি জানিয়ে দেবেন তোমাদের যা করতে। (তাওবা, ৯: ১০৫)

সপ্তম আয়াত :

وَيَقُولُونَ لَوْلا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ

'তারা বলে, তাঁর কাছে তাঁর পরওয়ারদেগারের পক্ষ থেকে কোনো নির্দেশ এলো না কেন? বলে দাও গায়েবের কথা আল্লাহই জানেন। আমিও তোমাদের সাথে অপেক্ষায় রইলাম।' (ইউনুছ, ১০: ২০)

অষ্টম আয়াত :

وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

'আর আমি তোমাদের বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহ্‌র ভাণ্ডার রয়েছে এবং একথাও বলি না যে, আমি গায়বি খবরও জানি; একথাও বলি না যে,

আমি একজন ফেরেশতা, আর তোমাদের দৃষ্টিতে যারা লাঞ্ছিত আল্লাহ্ তাদের কোনো কল্যাণ দান করবেন না। তাদের মনের কথা আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। সুতরাং এমন কথা বললে আমি অন্যায়কারী হব।' (হুদ, ১১: ৩১)

নবম আয়াত :

تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلا قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

'এটি গায়বের খবর, আমি আপনার প্রতি ওহী প্রেরন করছি। ইতিপূর্বে এটা আপনার এবং আপনার জাতির জানা ছিল না। আপনি ধৈর্যধারণ করুন। যারা ভয় করে চলে, তাদের পরিণাম ভালো।' (হুদ, ১১: ৪৯)

দশম আয়াত :

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

'আর আল্লাহ্র কাছেই আছে আসমান ও জমিনের গোপন তথ্য; আর সকল কাজের প্রত্যাবর্তন তাঁরই দিকে; অতএব, তাঁরই বন্দেগী করো এবং তাঁর ওপর ভরসা রাখ, আর তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তোমার পালনকর্তা কিন্তু বে-খবর নন।' (হুদ, ১১: ৪৯)

একাদশ আয়াত :

قُلْ لا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ الْغَيْبَ إِلاّ اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ

'বলুন, আল্লাহ্ ব্যতীত নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে কেউ গায়বের খবর জানে না এবং তারা জানে না যে, তারা কখন পুনরুজ্জীবিত হবে।' (নামল, ২৭: ৬৫)

দ্বাদশ আয়াত :

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ

'এগুলো অদৃশ্যের খবর, আমি আপনার কাছে প্রেরণ করি। আপনি তাদের কাছে ছিলেন না, যখন তারা স্বীয় কাজ সাব্যস্ত করছিল এবং চক্রান্ত করছিল।' (ইউছুফ, ১২: ১০২)

ত্রয়োদশ আয়াত :

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ

'তিনি সকল গোপন ও প্রকাশ্য বিষয় অবগত, মহোত্তম, সর্বোচ্চ মর্যাদাবান।' (রা'দ, ১৩: ৯)

চতুর্দশ আয়াত :

وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে। কিয়ামতের ব্যাপারটি তো এমন, যেমন চোখের পলক অথবা তার চাইতেও নিকটবর্তী। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছুর ওপর শক্তিমান।' (নাহল ১৬: ৭৭)

পঞ্চদশ আয়াত :

عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

'তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী। তারা শরীক করে, তিনি তা থেকে ঊর্ধ্বে।' (মুমিনুন, ২৩: ৯২)

ষষ্ঠদশ আয়াত :

فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ

'যখন আমি সোলায়মানের মৃত্যু ঘটালাম, তখন ঘুণ পোকাই জিনদের তাঁর মৃত্যু সম্পর্কে অবহিত করল। সোলায়মানের লাঠি খেয়ে যাচ্ছিল। যখন তিনি মাটিতে পড়ে গেলেন, তখন জিনেরা বুঝতে পারল যে, অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান থাকলে তারা এই লাঞ্ছনাপূর্ণ শাস্তিতে আবদ্ধ থাকতো না। (সাবা, ৩৪: ১৪)

সপ্তদশ আয়াত :

إِنَّ اللَّهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ

'আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত। তিনি অন্তরের বিষয় সম্পর্কেও সবিশেষ অবহিত। (ফাতির, ৩৫: ৩৮)

অষ্টদশ আয়াত :

قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

'বলুন, হে আল্লাহ্ আসমান ও জমিনের স্রষ্টা, দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, আপনিই আপনার বান্দাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন, যে বিষয়ে তারা মত বিরোধ করত।' (যুমার, ৩৯: ৪৬)

উনিশতম আয়াত :

إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

'আল্লাহ্ নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের অদৃশ্য বিষয় জানেন, তোমরা যা করো আল্লাহ্ তা দেখেন। (হুজরাত, ৪৯: ১৮)

বিশতম আয়াত :

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

'না তাদের কাছে অদৃশ্য বিষয়ের জ্ঞান আছে যে, তারাই তা লিপিবদ্ধ করে?' (তুর, ৫২: ৪১)

একুশতম আয়াত :

أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى

'তার কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে দেখে?' (নাজম : ৩৫)

বাইশতম আয়াত :

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لا إِلَهَ إِلا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

'তিনিই আল্লাহ্ তা'আলা, তিনি ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যকে জানেন তিনি পরম দয়ালু, অসীম দাতা। (হাশর, ৫৯: ২২)

তেইশতম আয়াত :

أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ

'না তাদের কাছে গায়েবের খবর আছে? অতঃপর তারা তা লিপিবদ্ধ করে।' (কলম, ৬৮: ৪৭)

চব্বিশতম আয়াত :

عَالِمُ الْغَيْبِ فَلا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا

'তিনি অদৃশ্যের জ্ঞানী। পরন্ত তিনি অদৃশ্য বিষয় কারও কাছে প্রকাশ করেন না।' (জ্বিন, ৭২: ২৬)

পঁচিশতম আয়াত :

يَوْمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لا عِلْمَ لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ

'যেদিন আল্লাহ্ সব পয়গম্বরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর বলবেন তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তাঁরা বলবেন, আমরা অবগত নই, আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে মহাজ্ঞানী।' (মায়েদা, ৫: ১০৯)

ছাব্বিশতম আয়াত :

تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ

'যখন আল্লাহ্ বললেন, হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদের বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোনো অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথাও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয়ই আপনি অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত।' (মায়েদা, ৫: ১১৬)

সাতাশতম আয়াত :

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ

'সোলায়মান পক্ষীদের খোঁজখবর নিলেন, অতঃপর বললেন, কি হল, হুদহুদকে দেখছি না কেন? নাকি সে অনুপস্থিত?' (নামল, ২৭: ২০)

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও গায়েব জানতেন না।

হাদীস সমূহ হতে কয়েকটি হাদীস :

প্রথম হাদীস : (তারা কি আমাকে বের করে দিবে?)

فَقَالَتْ لَهُ خَدِيجَةُ يَا ابْنَ عَمِّ اسْمَعْ مِنْ ابْنِ أَخِيكَ فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ يَا ابْنَ أَخِي مَاذَا تَرَى فَأَخْبَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرَ مَا رَأَى فَقَالَ لَهُ وَرَقَةُ هَذَا النَّامُوسُ الَّذِي نَزَّلَ اللَّهُ عَلَى مُوسَى يَا لَيْتَنِي فِيهَا جَذَعًا لَيْتَنِي أَكُونُ حَيًّا إِذْ يُخْرِجُكَ قَوْمُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوَمُخْرِجِيَّ هُمْ قَالَ نَعَمْ لَمْ يَأْتِ رَجُلٌ قَطُّ بِمِثْلِ مَا جِئْتَ بِهِ إِلَّا عُودِيَ وَإِنْ يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا مُؤَزَّرًا ثُمَّ لَمْ يَنْشَبْ وَرَقَةُ أَنْ تُوُفِّيَ وَفَتَرَ الْوَحْيُ

(আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত দীর্ঘ হাদীসের একটি অংশ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নবুওয়ত প্রাপ্ত হলেন। তখন খাদিজা

(রা.) তাঁকে অরাক্বাহ ইবনে নাওফাল এর কাছে নিয়ে যান। তখন অরাক্বাহ ইবনে নাওফাল বলেন, ...হায় আফসোস! যদি আমি তখন জীবিত থাকতাম যখন আপনার কওম আপনাকে (নিজ দেশ থেকে) বের করে দিবে। তখন আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছিলেন, 'তারা কি আমাকে (নিজ দেশ থেকে) বের করে দিবে? তিনি (অরাক্বাহ) বললেন, হাঁ,...। (বুখারী হাঃ নঃ ৩, মুসলিম ৪২২, মুসনাদে আহমাদ ২৫৮৬৫, বায়হাকী ১৩৭১৬)

এই হাদীসে দেখা গেলো যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানতেন না। কারণ যদি তিনি গায়েব জানতেন তাহলে অরাক্বাহ-এর কথার উত্তরে তিনি (তারা কি আমাকে নিজ দেশ থেকে বের দিবে?) এ কথা বলতেন না।

দ্বিতীয় হাদীস : (আয়েশা রা. এর ওপর অপবাদের ঘটনা)

قَالَ يَا عَائِشَةُ فَإِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْك كَذَا وَكَذَا فَإِنْ كُنْت بَرِيئَةً فَسَيُبَرِّئُك اللَّهُ وَإِنْ كُنْت أَلْمَمْت بِذَنْب فَاسْتَغْفِرِي اللَّهَ وَتُوبِي إِلَيْه فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِه ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْه فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِي حَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً وَقُلْتُ لِأَبِي أَجِبْ عَنِّي رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ

(এটিও ইফ্‌কের ঘটনা সম্বলিত একটি দীর্ঘ হাদীসের অংশ যা আয়েশা (রা.)-এর থেকে বর্ণিত) '..আয়েশা (রা.) বলেন, 'সেই অবস্থায় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগমন করলেন। তিনি বসে শাহাদাহ পাঠ করে বললেন, হে আয়েশা, তোমার সম্পর্কে আমার কানে এ ধরনের কথা এসেছে। যদি তুমি এসব থেকে মুক্ত থাকো তবে শিগগির আল্লাহ তায়ালা তোমার পবিত্রতা ঘোষণা করবেন। আর যদি আল্লাহ না করুন, তুমি কোনো পাপ করে থাকো, তবে তুমি আল্লাহর কাছে মাগফিরাত চাও, তাওবা করো। বান্দা যখন নিজের পাপের কথা স্বীকার করে এবং আল্লাহর কাছে তাওবা করে, তখন আল্লাহ তায়ালা সেই তাওবা কবুল করেন....শেষ পর্যন্ত'।' (বুখারী ২৬৬১, ৪১৪১, মুসলিম ৭১৯৬, মুসনাদে আহমাদ ২৫৬২৩)

এই হাদীসটি হচ্ছে 'ইফকের হাদীসের অংশবিশেষ'। এখানে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আয়েশা (রা.) কে বললেন, (তুমি যদি

কোনো পাপ করে থাকো....)। বুঝা গেল রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানেন না কারণ যদি জানতেন তাহলে তিনি বলে দিতেন যে, আয়েশা (রা.) কোনো পাপ কাজ করেননি।

তৃতীয় হাদীস : (রাসুলুল্লাহ সা. এর ওপর জাদু করার ঘটনা)

আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাদু করা হয়েছিল এবং যে জাদু করেছিল তার নাম ছিল 'লাবিদ ইবনুল আ'সাম'। এ জাদুর কারণে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, শেষে দুই ফেরেশতার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, তাকে জাদু করা হয়েছে। বুঝা গেল আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি গায়েব জানতেন তাহলে ফেরেশতাদের মাধ্যমে জানার প্রয়োজন হতো না। হাদীসটি এই–

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُحِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَتَّى إِنَّهُ لَيُخَيَّلُ إِلَيْه أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا فَعَلَهُ حَتَّى إِذَا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ وَهُوَ عِنْدِي دَعَا اللَّهَ وَدَعَاهُ ثُمَّ قَالَ أَشَعَرْتِ يَا عَائِشَةُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيمَا اسْتَفْتَيْتُهُ فِيه ...

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জাদু করা হয়েছিলো। ফলে তার অবস্থা এমন হয়েছিলো যে, কোনো কাজ তিনি করেন নাই অথচ মনে করতেন তিনি করেছেন। এ অবস্থায় তিনি আমার কাছে থাকাকালীন আল্লাহর কাছে খুব বেশি করে দো'আ করলেন। অতঃপর তিনি বললেন, হে আয়েশা! তুমি জান কি যে বিষয়টি সম্পর্কে আমি আল্লাহর কাছে জানতে চেয়েছিলাম সে বিষয়টি আল্লাহ আমাকে জানিয়ে দিয়েছেন..........। (বুখারী ৫৭৬৬, ৬৩৯১, মুসলিম ৫৮৩২, বায়হাকী ১৬৯৩৬, মেশকাত ৫৮৯৩)

চতুর্থ হাদীস : (রাসুলুল্লাহ সা. কে বিষ প্রয়োগের ঘটনা)

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي مَرَضِه الَّذِي مَاتَ فِيه يَا عَائِشَةُ مَا أَزَالُ أَجِدُ أَلَمَ الطَّعَامِ الَّذِي أَكَلْتُ بِخَيْبَرَ فَهَذَا أَوَانُ وَجَدْتُ انْقِطَاعَ أَبْهَرِي مِنْ ذَلِكَ السُّمِّ

'আয়েশা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত্যু রোগে আক্রান্ত অবস্থায় বলতেন, 'হে আয়েশা! আমি সব

সময় ঐ খাদ্যের কষ্টে ভুগছি যা খয়বরে খেয়েছিলাম। আর এখন আমার মনে হচ্ছে যেনো ঐ বিষের কারণে আমার পেটের নাড়ী-ভূড়ি কেটে যাচ্ছে'।' (বুখারীঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অসুস্থ্যতা ও ওফাত অধ্যায় শিরোনাম দ্রষ্টব্য)

বিস্তারিত ঘটনা বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। খায়বার যুদ্ধের পরে সালাম ইবনে মুশকিম এর স্ত্রী যয়নব বিনতে হারেছ আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বকরির ভুনা গোশত বিষ মিশিয়ে উপঢৌকন হিসেবে পাঠায়। সেই মহিলা আগেই খবর নিয়েছিলো যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বকরির কোনো অংশ বেশি পছন্দ করেন। শোনার পর পছন্দনীয় অংশে বেশি করে বিষ মেশায়। অন্যান্য অংশেও বিষ মেশায়। এরপর আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে এনে সেই বিষ মিশ্রিত গোশত রেখে দেয়। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পছন্দনীয় অংশের এক টুকরো মুখে দেন। কিন্তু চিবিয়েই তিনি ফেলে দেন। এরপর তিনি বললেন, এই হাড় আমাকে বলছে যে, আমার মধ্যে বিষ মেশানো রয়েছে। যয়নবকে ডেকে এনে জিজ্ঞাসা করা হলো, সে স্বীকার করলো। তিনি বললেন, তুমি কেন এ কাজ করেছ? মহিলা বললো, আমি ভেবেছিলাম যদি এই ব্যক্তি বাদশাহ হন, তবে আমরা তার শাসন থেকে মুক্তি পাবো, আর যদি এই ব্যক্তি নবী হন, তবে আমার বিষ মেশানোর খবর তাকে জানিয়ে দেয়া হবে। এ নির্জলা স্বীকারোক্তি শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মহিলাকে ক্ষমা করে দিলেন।

এ ঘটনার সময় আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাথে বাশার ইবনে বারা ইবনে মারুরও ছিলেন। তিনি এক লোকমা খেয়েছিলেন। এতে তিনি বিষক্রিয়ায় শাহাদাৎ বরণ করেন।

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই মহিলাকে ক্ষমা করেছিলেন না হত্যা করেছিলেন, এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। একাধিক বর্ণনার সমন্বয় এভাবে করা হয়েছে যে, প্রথমে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ক্ষমা করলেও, সাহাবী বাশার-এর মৃত্যুর কারণে কেসাসস্বরূপ তাকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। (ফতহুল বারী, সপ্তম খণ্ড, পৃ.৪৯৭, ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ৩৩৭)

এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানতেন না। কারণ যদি গায়েব জানতেন তাহলে তিনি বিষ মেশানো গোশাত খেতেন না এবং এর কারণে একজন সাহাবী মৃত্যুবরণ করতো না।

এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যখন হুদায়বিয়ায় আটকে দেওয়া হলো। তখন উসমান (রা.) আসতে দেরি হওয়ায় গুজব ছড়িয়ে পড়লো যে, উসমান (রা.) কে হত্যা করা হয়েছে। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সকল সাহাবীদের কাছ থেকে বায়আত নিলেন এই মর্মে যে, 'যতক্ষণ পর্যন্ত উসমান হত্যার প্রতিশোধ গ্রহণ না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ যুদ্ধের ময়দান ছেড়ে পলায়ন করবো না।' এভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সবার থেকে অঙ্গীকার নিলেন। অথচ উসমান হত্যার খবরটি একটি মিথ্যা অপপ্রচার ছিলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি সত্যিই গায়েব জানতেন তাহলে উসমান হত্যার মিথ্যা খবরকে কেন্দ্র করে এত কিছু করতেন না। এ ছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজন মানুষ ছিলেন। মানুষ যে রকম বিভিন্ন জিনিস ভুলে যায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও ভুলে যেতেন। যদি সত্যি 'আলিমুল গায়েব' হতেন তাহলে তো কোনো কিছু ভুলে যাওয়ার কথা নয়। যেমন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কখনো কোনো কিছু ভুল করেন না এবং কোনো কিছু ভুলে যান না। অথচ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাঝে মধ্যে সালাতের রাকা'আতে ভুল করতেন। কিরাতে ভুল করতেন। আর এ জন্য সাহাবায়ে কেরামদের স্মরণ করিয়ে দিতে বলতেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ أَنْسَى كَمَا تَنْسَوْنَ فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِي

'নিশ্চয়ই আমি তোমাদের মধ্যে থেকে একজন মানুষ। আমিও ভুল করি। যেভাবে তোমরা ভুল করো। সুতরাং যদি আমি ভুলে যাই তোমরা আমাকে স্মরণ করিয়ে দিবে।' (বুখারী ৪০১, মুসলিম ১৩০২, ১৩১৩, আবু দাউদ ১০২২)

পঞ্চম হাদীস : (বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর বানী)

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِه مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا بِقَوْلِه فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنْ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا

'উম্মে সালামা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই তোমরা আমার কাছে বিচার-ফায়সালা নিয়ে আস। হতে পারে তোমাদের মধ্যে কেহ কারো থেকে বাকপটু, যে তার প্রতিপক্ষের তুলনায় সুন্দরভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে দলিল-প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে। সুতরাং আমি যদি কারো কথার ভিত্তিতে তার অপর ভাইয়ের কোনো হক্ব (অধিকার) তাকে দিয়ে দেই, তাহলে সেটা তার জন্য আমি একটি আগুনের টুকরা কেটে দিলাম। অত:এব সে যেনো তা গ্রহণ না করে'।' (বুখারী ২৬৮০, ৬৯৬৭, ৭১৬৯, মুসলিম ৩৫৬০, তিরমিযী ১৩৩৯, আবু দাউদ ৩৫৮৫, নাসায়ী ৫৪১৬)

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গায়েব জানতেন না। গায়েব জানলে একজনের হক্ব আরেকজনকে দিয়ে দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। আর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন গায়েব জানতেন না, তাহলে আর এমন কোনো ব্যক্তি আছে যে নিজেকে 'আলিমুল গায়িব' (দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছুর জ্ঞান রাখে) বলে দাবি করতে পারে? আল্লাহ ছাড়া কেহই 'আলিমুল গায়িব' নয়। আল্লাহ ব্যতিত যে কেহ নিজেকে 'আলিমুল গায়িব' দাবি করলো সেই তাগূত। চাই সে জ্যোতিষী হোক কিংবা গণক হোক কিংবা পীর-সুফি, দরবেশ, গাউছ-কুতুব, ওলী-আবদাল, খাঁজা বাবা, গাঁজা বাবা, ল্যাংটা বাবা, মাজার ওয়ালা, খানক্বাহ্ ওয়ালা, দরগা ওয়ালা যেই হোক না কেনো। বরং এরা আরো বড় তাগূত। যার বিস্তারিত আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে।

ষষ্ঠ প্রধান তাগূত **: اَلْهَوَىْ 'হাওয়া' বা প্রবৃত্তির অনুসরণ**

আল্লাহর পরিবর্তে যার আনুগত্য করা হয় তাকেই তাগূত বলা হয়। এই তাগূতের সংখ্যা অনেক। তবে প্রধান প্রধান তাগূত কয়েকটি। এরমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি তাগূত হলো الهوى 'হাওয়া' বা প্রবৃত্তির অনুসরণ। আল্লাহর বিধান পালনের ক্ষেত্রে এই 'হাওয়া' নামক তাগূত অন্তরায় হয়ে দাড়ায়।

মানুষকে যখন তার 'হাওয়া'র বিপরীতে কোনো হুকুম করা হয় তখন আল্লাহর হুকুম পালন না করে নিজ 'হাওয়া'-এর হুকুম পালন করে। এভাবেই আল্লাহর পরিবর্তে 'হাওয়া'-এর ইবাদত করা হয়। আর একথা পূর্বে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত করা হয় সেই তাগূত। অতএব 'হাওয়া' একটি তাগূত। সুতরাং 'হাওয়া' সম্পর্কে জানা এবং তার আনুগত্য থেকে বাঁচা ঈমানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যা না জানলে কোনো ক্রমেই একজন মানুষ নিজেকে মুসলিম বলে দাবি করতে পারে না। তাই এ অধ্যায়ে আমরা কুরআন-সুন্নাহের আলোকে 'হাওয়া' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করবো, ইনশা-আল্লাহ।

اَلْهَوَىْ শব্দের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ :

اَلْمَيْلُ وَالْحُبُّ وَالْعِشْقُ، وَيَكُوْنُ فِىْ مَدَاخِلِ الْخَيْرِ وَالشَّرِّ

الهوى শব্দের আভিধানিক অর্থ হল আকৃষ্ট হওয়া, ভালোবাসা, আসক্ত হওয়া। আর এটা ভালো-মন্দ উভয় ক্ষেত্রেই হতে পারে। তবে সাধারণত: মন্দ কাজের ইচ্ছা করার ক্ষেত্রেই বেশি ব্যবহার করা হয়। পরিভাষায় হাওয়া বলা হয়– মনে মনে কোনো কিছুকে ভালোবেসে তাকে পাওয়া, অর্জন করা বা আনুগত্য করা। **هَوَى النَّفْسِ** মানে হচ্ছে 'মনের ইচ্ছা'। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে –

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى – فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

'আর যে স্বীয় রবের সামনে দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং কুপ্রবৃত্তি থেকে নিজকে বিরত রাখে, নিশ্চয়ই জান্নাত হবে তার আবাসস্থল। (নাযি'আত ৭৯:৪০-৪১)

اِتِّبَاعُ الْهَوَيْ 'প্রবৃত্তির অনুসরণ' দুই প্রকার :

(ক) اَلْهَوَىْ بِمَعْنَى الْكُفْرِ الْاَكبَرِ الْمُخْرِجِ عَنِ الْمِلَّةِ 'বড় কুফর; যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।'

(খ) اَلْهَوَىْ بِمَعْنَى الْفُسُوْقِ اَوِ الْمَعْصِيَةِ الَّتِىْ هِىَ دُوْنَ الْكُفْرِ الْاَكْبَرِ 'সাধারণ পাপ এবং নাফরমানী; যা কুফরে আকবারের চেয়ে ছোট। যা পাপ বটে তবে মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে না।'

প্রথম প্রকার : **اَلْهَوَىْ بِمَعْنَى الْكُفْرِ الْاَكبَرِ الْمُخْرِجِ عَنِ الْمِلَّةِ** 'বড় কুফর; যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়।' এই প্রকার হাওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ

'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় উপাস্য স্থির করেছে? আল্লাহ্ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন। (জাসিয়া ৪৫:২৩)
অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

'আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তারা প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? (ফুরকান ২৫: ৪৩)
অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হাওযার অনুসরণ করাকে সবচেয়ে বেশি পথভ্রষ্টতা বলে আখ্যায়িত করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنَ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ

'আর আল্লাহর দিকনির্দেশনা ছাড়া যে নিজের খেয়াল খুশির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ জালিম কওমকে হিদায়াত করেন না।' (কাসাস ২৮: ৫০)
অর্থাৎ মানুষকে গোমরাহ করার মতো যত জিনিস আছে, তার মধ্যে মানুষের هَوَىْ বা নফস্-ই হচ্ছে সর্বপ্রধান পথভ্রষ্টকারী শক্তি। কারণ শয়তানকেও শয়তান বানিয়ে ছিল এই 'নফস্'। কেননা শয়তানকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য অন্য কোনো শয়তান ছিল না। বরং তার 'নফস্'ই তাকে أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ('আমি তার চেয়ে উত্তম। আপনি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছেন, আর তাকে সৃষ্টি করেছেন কাদামাটি থেকে') বলতে শিখিয়েছিল। সুতরাং যে ব্যক্তি নিজের هوى বা প্রবৃত্তির দাসত্ব করবে, তার পক্ষে আল্লাহর বান্দা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। কারণ যে কাজে টাকা পাওয়া যাবে, যে কাজ করলে সুনাম ও সম্মান পাওয়া যাবে, যে জিনিসে অধিক স্বাদ ও আনন্দ লাভ করা যাবে, কেবল সে কাজই করতে সে প্রাণ-পণ চেষ্টা করবে। সেসব কাজ করতে যদি আল্লাহ নিষেধও করে

থাকেন, তবুও সে সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করবে না। আর এসব জিনিস যেসব কাজে পাওয়া যাবে না সেসব কাজ করতে সে কখনও প্রস্তুত হবে না। আল্লাহ তাআলা যদি সেই কাজের নির্দেশ দিয়ে থাকেন তবুও সে তার কিছুমাত্র পরোয়া করবে না। এমতাবস্থায় একথা পরিষ্কার করে বলা যেতে পারে যে, সে আল্লাহ তা'আলাকে তার একমাত্র ইলাহ রূপে স্বীকার করেনি বরং তার নফসকেই সে তার একমাত্র ইলাহের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। কাজেই এমন ব্যক্তি কোনো প্রকারে আল্লাহর হেদায়াত লাভ করতে পারে না। কুরআন শরীফে একথা অন্যত্র এভাবে বলা হয়েছে–

أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ـــ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

'আপনি কি তাকে দেখেন না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি আপনি তার যিম্মাদার হবেন? আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে অথবা বোঝে? তারা তো চতুস্পদ জন্তুর মতো; বরং আরও পথভ্রষ্ট।' (ফুরকান ২৫:৪৩-৪৪)
যে ব্যক্তি নফসের দাস, সে যে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট তাতে কোনো প্রকার সন্দেহ থাকতে পারে না। কোনো পশুকে আপনারা নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করতে দেখবেন না। প্রত্যেক পশু সেই জিনিসই আহার করে এবং ঠিক সেই পরিমাণ খাদ্য খায় যে পরিমাণ আল্লাহ তাআলা তার জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। কিন্তু এই মানুষ এমনই এক শ্রেণীর পশু যে, সে যখন নফসের দাস হয়ে যায়, তখন সে এমন সব কাজ করে যা দেখে শয়তানও ভয় পেয়ে যায়। মানুষের পথভ্রষ্ট হওয়ার এটাই প্রথম কারণ। এই জাতীয় মানুষের অনুসরণ করতে আল্লাহ তা'আলা স্বীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا

'যার মনকে আমার স্মরণ থেকে গাফেল করে দিয়েছি, যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে এবং যার কার্য কলাপ হচ্ছে সীমা অতিক্রম করা, আপনি তার অনুগত্য করবেন না।' (কাহাফ ১৮:২৮)

উপরোক্ত আয়াতে যারা নিজের হাওয়া বা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাদের আনুগত্য করতে নিষেধ করা হয়েছে। অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

'সুতরাং ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বলো কিংবা এড়িয়ে যাও তবে আল্লাহ তোমরা যা করো সে বিষয়ে সম্যক অবগত।' (নিসা ৪:১৩৫)

এই আয়াতে ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কোনোভাবে প্রবৃত্তির অনুসরণ না করতে বলা হয়েছে। অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلا تَتَّبِعِ الْهَوَى

'তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়সঙ্গতভাবে রাজত্ব করো এবং খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না। (ছোয়াদ ৩৮:২৬)

এ আয়াতে শাসনকার্য ও বিচার-ফায়সালার ক্ষেত্রে প্রবৃত্তির অনুসরণ না করার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে। অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ

'আপনি তাদের পারস্পরিক ব্যাপারাদিতে আল্লাহ্ যা নাযিল করেছেন তদানুযায়ী ফয়সালা করুন; তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। (মায়েদা ৫:৪৯)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

فَلا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى

'অতএব যে ব্যক্তি তার প্রতি ঈমান রাখে না এবং স্বীয় প্রবৃত্তির অনুসরণ করে সে যেন কিছুতেই তাতে ঈমান আনয়নে তোমাকে বাধা দিতে না পারে; অন্যথায় তুমি ধ্বংস হয়ে যাবে।' (ত্বাহা ২০:১৬)

এ আয়াতে বুঝা গেলো প্রবৃত্তি পূজারিরা ধীরে ধীরে নাস্তিক হয়ে যায় এবং পরকালে ও কিয়ামতে অবিশ্বাসী হয়। এরা সবসময় অন্যকেও নাস্তিক বানানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করে। এ আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিনদের তাদের আনুগত্য করা থেকে সাবধানে থাকতে

বলেছেন। এই একই বিষয়টি আরো স্পষ্টভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ

'তোমরা এমন কওমের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা নিজেরা পূর্বেই পথভ্রষ্ট হয়েছে, আর অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে এবং সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।' (মায়েদা ৫:৭৭)

এ আয়াতে দেখা গেলো প্রবৃত্তি পূজারিরা নিজেরা শুধু গোমরাহ থাকে তা নয় বরং অন্যকেও পথভ্রষ্ট করে এবং আল্লাহর সোজা রাস্তা বাদ দিয়ে শয়তানের আবিষ্কার করা বক্র পথের অনুসরণ করে। এরা আল্লাহর আয়াত ও নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা মনে করে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا

'এবং তাদের কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না, যারা আমার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে।' (আনআম ৬:১৫০)

এ পর্যন্ত যতগুলো আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে তাতে বলা হয়েছে, 'তোমরা নিজেরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাদের আনুগত্য করো না। যারা আল্লাহর আয়াতকে অস্বীকার করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করা যাবে না। প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে ন্যায় প্রতিষ্ঠা ও ন্যায় বিচার থেকে বিচ্যুত হওয়া যাবে না।' এখন আমরা এমন কিছু আয়াত পেশ করবো যেগুলোতে হক্বের জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও যদি প্রবৃত্তির অনুসরণ করা হয় তাহলে পরিণতি কি হবে, তার বর্ণনা উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম আয়াত :

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ

'যদি আপনি তাদের আকাঙ্খাসমূহের অনুসরণ করেন, ঐ জ্ঞান লাভের পর, যা আপনার কাছে পৌঁছেছে, তবে কেউ আল্লাহ্‌র কবল থেকে আপনার উদ্ধারকারী ও সাহায্যকারী নেই। (বাক্বারা ২:১২০)

এ আয়াতে দেখা গেলো যে, সঠিক ইল্‌ম থাকা সত্ত্বেও যারা প্রবৃত্তির অনুসরণ করবে তাদের জন্য কোনো অভিভাবক ও সাহায্যকারী থাকবে না।

এ কারণেই মুসলিম জাতি আজ অভিভাবকবিহীন দিশেহারা হয়ে ইয়াহুদী-খৃষ্টানদের করুণা ভিক্ষা করছে। কিন্তু কোনোক্রমেই নিজেদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারছে না। অথচ এই লোকগুলোই আবার আল্লাহর বিরুদ্ধে অভিযোগ দেয় যে, আল্লাহ কেনো আমাদের সাহায্য করছে না? আমাদের এতো লোক মারা যাচ্ছে কেনো আল্লাহ আমাদের দিকে তাকাচ্ছেন না? ইত্যাদি। এর জবাব পাওয়া যাবে পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতটিতে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ

'সত্য যদি তাদের কামনা-বাসনার অনুসারী হতো, তবে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল এবং এগুলোর মধ্যবর্তী সবকিছুই বিশৃঙ্খল হয়ে পড়তো।' (মুমিনুন ২৩:৭১)

এখানে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হক্ব যদি মানুষের প্রবৃত্তির অনুসরণ করতো অর্থাৎ মানুষ যেভাবে চায়, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সেভাবে পৃথিবীর নেযাম চালাতেন, তাহলে আসমান-জমিন ও এর মধ্যবর্তী যা কিছু আছে সবকিছুই ফাসাদ ও বিশৃঙ্খলায় পতিত হতো। এ কারণে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যেভাবে মানুষের প্রবৃত্তি ও চাহিদার অনুসরণ করেন না। ঠিক সেভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও মানুষের চাহিদা ও প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে নিষেধ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ

'আর যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার নিকট জ্ঞান আসার পর, তবে নিশ্চয়ই আপনি তখন জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।' (বাক্বারা ২:১৪৫)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন–

وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ

'যদি আপনি তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেন আপনার কাছে জ্ঞান পৌঁছার পর, তবে আল্লাহর কবল থেকে আপনার না কোনো সাহায্যকারী আছে এবং না কোনো রক্ষাকারী। (রা'দ ১৩:৩৭)

সুবহানাল্লাহ! এ আয়াত দুটো খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসুলকে পর্যন্ত সাবধান করে দিয়েছেন যে,

মানুষের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলে আপনি কোনো সাহায্যকারী ও রক্ষাকারী পাবেন না। তাহলে আমরা যদি মানুষের প্রবৃত্তির অনুসরণ করি, মানুষ যা চায় তা বলি, কুরআন-হাদীসের যে অংশ মানুষের প্রবৃত্তির পছন্দ মাফিক সে অংশ প্রচার করি, আর যে অংশ অপছন্দনীয় তা এড়িয়ে যাই তাতে হয়তো সর্বজন প্রিয় ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিত্ব বলে একটি খেতাব হয়তো পাওয়া যাবে। কিন্তু আল্লাহর পক্ষ থেকে কোনো প্রকার সাহায্য সহযোগিতার আশা করা যাবে না। উদাহরণ স্বরূপ : ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হলো 'জিহাদ'। কিন্তু এটা অনেকেই পছন্দ করে না। কাফির-মুশরিক, ইয়াহুদি-খৃস্টানরা তো নয়ই। বহু টুপি-দাড়িওয়ালা, মুসল্লি, হাজি, দায়ী, মুবাল্লিগ ও ইসলামী চিন্তাবিদ রয়েছেন যারা মানসিকভাবে জিহাদ পছন্দ করেন না। জিহাদের আয়াত ও হাদীসগুলোকে তারা বিভিন্নভাবে অপব্যাখ্যা করে যথা স্থান থেকে সরিয়ে ফেলে। এটাই বেশিরভাগ মানুষের চরিত্র। পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ

'তোমাদের ওপর ক্বিতাল (যুদ্ধ) ফরজ করা হয়েছে অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়' (বাক্বারা ২:২১৬)

যেহেতু বেশিরভাগ মানুষ জিহাদ পছন্দ করে না, তাই আমরা মানুষকে খুশি করার জন্য জিহাদকে এড়িয়ে গেলাম। আর যেগুলোতে কারো কেনো আপত্তি নেই সেগুলো প্রচার করলাম। যেমন, সিয়াম। এটিও একটি ফরজ ইবাদত। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমাদের ওপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে, যেভাবে ফরয করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর।' (বাক্বারা ০২:১৮৩)

এই সিয়ামের ব্যাপারে কারো কোনো আপত্তি নেই। এমনকি ইয়াহুদী-খৃষ্টান, হিন্দু-বৌদ্ধ, নাস্তিক-মুরতাদ সকলেই সিয়ামকে স্বাগত জানায়। পৃথিবী থেকে জিহাদকে নির্মূল করার জন্য যারা যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, মুসলিম জাতির বীর মুজাহিদদের যারা জঙ্গীবাদী ও সন্ত্রাসী বলে বিতর্কিত করে সাধারণ মুসলিমদের থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন করছে, যারা পৃথিবীর সকল

সন্ত্রাস ও অপকর্মের গডফাদার সেই আমেরিকার 'হোয়াইট হাউসে' মুসলিম জাতির 'সিয়াম'কে স্বাগত জানিয়ে ইফতার মাহফিল দেওয়া হয়। অথচ ক্বিতাল ও সিয়াম দুটোই একই আল্লাহ নাযিল করেছেন। একই রাসুলের ওপর নাযিল করা হয়েছে। একই কুরআনে, একই সুরায়, একই শব্দ দিয়ে নাযিল করেছেন। তা সত্ত্বেও সিয়ামকে পছন্দ করা হয়। আর ক্বিতালকে অস্বীকার করা হয়। এর কারণ কি? এর কারণটিও আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ আয়াতে স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন। আর তা হলো 'মানুষের কাছে অপছন্দনীয় হওয়া'। এখন যারা মানুষকে খুশি করার জন্য তাদের দাওয়াতী ছয় উসূল থেকে জিহাদকে বাদ দিয়েছে, যারা তাদের বিভিন্ন তরীকার যিকির-আজকার, ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদি থেকে জিহাদের কর্মসূচি বাদ দিয়েছে তারা হয়তো এর মাধ্যমে ইয়াহুদী-খৃষ্টান, নাস্তিক-মুরতাদ ও সেকুলার মুসলিমদের খুশি করতে পারবে। কিন্তু আল্লাহকে খুশি করা সম্ভব নয়। এটাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। আর পূর্বোল্লিখিত আয়াত সমূহে اَلْكُفْرُ الْاَكْبَرُ اَلْهَوَىْ শব্দটি (বড় কুফর) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যা মানুষকে ইসলাম থেকে খারিজ করে দেয়। ইমাম ইবনে তাইমিয়্যাহ (রহ.) বলেন–

فَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ مَا يَهْوَاهُ فَقَد اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ

'যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির ইবাদত করে অর্থাৎ মনে যা চায় তাই করে, সে ব্যক্তি মূলত: নিজের মনকেই তার ইলাহ বা মাবুদ বানিয়ে নিয়েছে।' (আল ফাতাওয়া, ৮/৩৫৯)

দ্বিতীয় প্রকার : اَلْهَوَىْ بِمَعْنَى الْفُسُوْقِ اَوِ الْمَعْصِيَةِ الَّتِىْ هِىَ دُوْنَ الْكُفْرِ الْاَكْبَرِ

দ্বিতীয় প্রকার 'হাওয়া' হলো সাধারণ পাপ এবং নাফরমানি; যা কুফরে আকবারের চেয়ে ছোট। যা পাপ বটে তবে ইসলাম থেকে খারিজ করে না। এই জাতীয় 'ইত্তেবাউল হাওয়া' বা প্রবৃত্তির অনুসরণ সম্পর্কে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

'অতএব, তোমরা বিচার করতে গিয়ে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার অনুসরণ করো না। আর যদি তোমরা ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে কথা বল কিংবা পাশ কাটিয়ে

যাও, তবে আল্লাহ্ তোমাদের যাবতীয় কাজ কর্ম সম্পর্কেই অবগত। (নিসা ৪:১৩৫)

এ সম্পর্কীয় আরেকটি আয়াত :

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى — فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى

'পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি তার রবের সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে ভয় করেছে এবং মনের খেয়াল-খুশি থেকে নিজেকে নিবৃত্ত রেখেছে। নিশ্চয়ই জান্নাতই তার ঠিকানা। (নাযিআ'ত ৭৯:৪০)

قَالَ الْبَغْوِىْ فِى التَّفْسِيْرِ، قَالَ مُقَاتِلٌ: هُوَ الرَّجُلُ يَهِمُّ بِالْمَعْصِيَةِ فَيَذْكُرُ مَقَامَهُ لِلْحِسَابِ فَيَتْرُكُهَا

'ইমাম বাগাভী (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর করতে গিয়ে বলেন– বিশিষ্ট তাফসীরকারক মুকাতিল বলেন, 'হাওয়ার অনুসরণ থেকে নিবৃত্ত রাখা বলতে ঐ সকল লোকদের বুঝানো হয়েছে, যারা গুনাহ করার ইচ্ছে করেছিলো। কিন্তু কিয়ামত দিবসে হিসাব নিকাশের কথা স্মরণ করে সুযোগ থাকা সত্ত্বেও উক্ত গুনাহ থেকে বিরত থাকে। তাদের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উপরোক্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছেন। তাই 'হাওয়া' নামক তাগূতকে বর্জন করা প্রতিটি মুমিনের জন্য খুবই জরুরি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের তাওফিক দান করুন। আমীন।

সপ্তম প্রধান তাগূত تَقْلِيْدُ الْاٰبَاءِ 'তাক্বলীদে আবা'

তাওহীদের মূল ভিত্তি দু'টো। একটি 'কুফর বিত তাগূত'। অপরটি 'ঈমান বিল্লাহ'। তাগূত বলা হয় আল্লাহর পরিবর্তে যার ইবাদত ও আনুগত্য করা হয়। এরকম তাগূতের সংখ্যা অনেক। তবে প্রধান প্রধান তাগূতগুলো কয়েক প্রকারে সীমাবদ্ধ। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ তাগূত হলো تَقْلِيْدُ الْاٰبَاءِ 'তাক্বলীদে আবা' অর্থাৎ বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষের অন্ধ অনুসরণ করা। বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষ থেকে চলে আসা যত রসম-রেওয়াজ ও কুসংস্কার রয়েছে সেগুলোকেই শক্তভাবে ধরে রাখা, তা যতই গর্হিত ও কুরআন-সুন্নাহবিরোধী হোক না কেনো। এটা কোনো নতুন রোগ নয়। পূর্বের যুগের উম্মতরাও এই একই রোগে আক্রান্ত ছিলো।

যুগে যুগে নবী-রাসুলগণ যখনই মানুষকে কুরআন-সুন্নাহ তথা হক্বের দিকে আহ্বান করেছেন তখনই তারা পূর্ব পুরুষ ও আকাবিরদের দোহাই দিয়ে বলত, 'এটা পূর্ব পুরুষ হতে চলে এসেছে, অমুক অমুক বড় বড় বুযুর্গ এ কাজ করেছেন, তারা কি কম বুঝেছেন? অথচ পবিত্র কুরআনে এ প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে–

وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ ــ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ

'আর এভাবেই তোমাদের পূর্বে যখনই আমি কোনো জনপদে সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখনই সেখানকার বিলাসপ্রিয়রা বলেছে, 'নিশ্চয়ই আমরা আমাদের পিতৃপুরুষদের এক মতাদর্শের ওপর পেয়েছি এবং নিশ্চয়ই আমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব'। তখন সে (সতর্ককারী) বলেছে, 'তোমরা তোমাদের পিতৃপুরুষদের যে মতাদর্শে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের কাছে তার চেয়ে উৎকৃষ্ট পথে নিয়ে আসি তবুও কি'? (তোমরা তাদের অনুসরণ করবে?) তারা বলেছে, 'নিশ্চয়ই তোমাদের যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তার অস্বীকারকারী'। (যুখরুফ ৪৩:২৩-২৪)

পবিত্র কুরআনে আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

'আর যখন তাদের বলা হয়, 'তোমরা অনুসরণ কর, যা আল্লাহ নাযিল করেছেন', তারা বলে, 'বরং আমরা অনুসরণ করব আমাদের পিতৃ-পুরুষদের যার ওপর পেয়েছি'। যদিও তাদের পিতৃ–পুরুষরা কিছু না বুঝে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত না হয়, তাহলেও কি?' (বাক্বারা ২:১৭০)

এ আয়াতে বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। আর তা হলো কিছু নির্বোধ মূর্খ লোকেরা আসমানি কিতাবের ইল্ম না থাকা সত্ত্বেও নিজেদের বড় বড় পীর-বুযুর্গ হিসেবে মানুষের কাছে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো। তারা তাদের অনুসারীদের খুশি করার জন্য এবং তাদের কর্মব্যস্ত রাখার জন্য বিভিন্ন রকমের তরীকার যিকির-আজকার, অযীফা, মুরাকাবা-মুশাহাদা, মিলাদ

ইত্যাদি তৈরি করে দিয়েছিলো। মানুষ ওগুলোকেই দ্বীনের মৌলিক কাজ হিসেবে পালন করতে থাকে। পরবর্তীতে যখন সহীহ আলেমগণ তাদের আল্লাহর কিতাবের অনুসরণ করতে আহ্বান জানায় তখন তারা এ আলেমদের বিরুদ্ধে নানা রকম কটূক্তি, সমালোচনা, গালি-গালাজ ও অপবাদ দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে জনগণকে ক্ষেপিয়ে তোলে এবং জনগণকে বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষের অনুসরণ করতে আহ্বান জানায়। এ জাতীয় লোকদের মুখোশ উন্মোচন করার উদ্দেশ্যেই পবিত্র কুরআনে এ আয়াতের শেষাংশে বলেছেন 'যদিও তাদের পিতৃ–পুরুষরা কিছু না বুঝে এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত না হয়, তাহলেও কি?'। এ প্রসঙ্গে আমরা এই কিতাবের শুরুতে 'তাওহীদের বিষয়ে ৯ জন নবী-রাসুলগণের ভাষণ' শিরোনামে উল্লেখ করেছি। এখানে শুধু নবী-রাসুলদের তাওহীদের দাওয়াতের প্রতি উত্তরে তাদের সম্প্রদায়ের লোকেরা যা বলেছিলো তা আলোচনা করা হলো।

নূহ (আ.) এর জাতি :

নূহ (আ.) যখন তাদের তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন তার জাতির উচিৎ ছিলো এ দাওয়াতে সাড়া দিয়ে সাদরে গ্রহণ করা। কিন্তু তারা তার পরিবর্তে গোটা জাতিকে নূহ (আ.) এর বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিলো। আর সেজন্য তারা কিছু নেক্কার লোকদের নাম উল্লেখ করলো। যারা ব্যক্তিগতভাবে ভালো ছিলো। কিন্তু লোকেরা তাদের মূর্তি তৈরি করে তাদের ইবাদত করতো। তারা যে ভাষায় জনগণকে ক্ষেপিয়ে ছিলো তার কিছু অংশ পবিত্র কুরআনে নিম্নের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَقَالُوا لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلا سُوَاعًا وَلا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا

'তারা বললো, তোমরা তোমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করো না এবং ত্যাগ করো না ওয়াদ, সূয়া, ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নসরকে।' (নূহ ৭১:২৩)

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় এই যে, নূহ (আ.) তার জাতীকে শুধু তাওহীদের দাওয়াত দিয়েছিলেন, তিনি কারো নাম নেননি, কারো বিরুদ্ধে বক্তব্য দেননি। কিন্তু তার জাতি সাধারণ মানুষদের উত্তেজিত করার জন্য তৎকালীন পাঁচজন বড় বড় আল্লাহ ওয়ালাদের নাম উল্লেখ করলো।

সালেহ (আ.) এর জাতি : সালেহ (আ.) যখন তার কওমকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন তার কওম যে উত্তর দিয়েছিলো, পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে তা উল্লেখ করা হয়েছে–

قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانَا أَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ

'তারা বললো, 'হে সালিহ, তুমি তো ইত:পূর্বে আমাদের মধ্যে ছিলে প্রত্যাশিত। তুমি কি আমাদের নিষেধ করছ তাদের উপাসনা করতে আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের উপাসনা করত? তুমি আমাদের যার দিকে আহ্বান করছ, সে ব্যাপারে নিশ্চয়ই আমরা ঘোর সন্দেহের মধ্যে আছি'।' (হুদ ১১:৬২)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ

'বরং তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি এক পথের পথিক এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করে পথপ্রাপ্ত।' (যুখরুফ ৪৩:২২)

এখানেও সেই পুরাতন রোগ 'বাপ-দাদার' দোহাই দেয়া হয়েছে।

শোআইব (আ.) এর জাতি :

শোআইব (আ.) যখন তার কওমকে তাওহীদের দাওয়াত দিলেন তখন তার কওম উত্তরে বললো–

قَالُوا يَا شُعَيْبُ أَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَنْ نَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا

'তারা বললো, 'হে শু'আইব, তোমার সালাত কি তোমাকে এই নির্দেশ প্রদান করে যে, আমাদের পিতৃপুরুষরা যাদের উপাসনা করত, আমরা তাদের ত্যাগ করি? অথবা আমাদের সম্পদে আমরা ইচ্ছামত যা করি তাও (ত্যাগ করি?) তুমি তো বেশ সহনশীল সুবোধ'!' (হুদ ১১:৮৭)

আকাবিরদের দোহাই :

পূর্বের যুগের গোমরাহ জাতিগুলো শুধু বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষের দোহাই দিতো। কিন্তু বর্তমানে আরো একটি শব্দ যুক্ত হয়েছে আর তা হলো 'আকাবির'। যখন কুরআন-সুন্নাহ-এর সহীহ দলিলের ভিত্তিতে কোনো কথা

বলা হয়, তখন বলা হয় এটা আমাদের আকাবিরদের তরিকার খেলাফ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এ জাতীয় লোকদের মুখোশ উন্মোচন করে দিয়ে ইরশাদ করেছেন–

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

'আর এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে কিছু বড় বড় অপরাধী 'আকাবির' সর্দার নিয়োগ করেছি যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই; কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না। (আনআ'ম ৬:১২৩)

বর্তমানেও বিভিন্ন পীরের মুরীদদের যখন হক্বের দাওয়াত বা কুরআন-হাদীসের কথা বলা হয়, তখন তাদের বলতে শুনা যায়, 'আমরা এই পীর-বুযুর্গদের মাধ্যমেই দ্বীন পেয়েছি, আমরা তাদের ত্বরিকায় আছি, থাকবো (যদিও তা কুরআন-হাদীসে না থাকে)।'

তৃতীয় অধ্যায় : اِمْتِثَالُ الْاَ وَامِرِ 'ইমতেসালুল আওয়ামের'

আল্লাহর ওপর ঈমান আনা বলতে কি বুঝায়। সে প্রসঙ্গে বলা হয়েছিলো, আল্লাহর ওপর ঈমান আনা বলতে মৌলিকভাবে ৪টি জিনিসের উপরে ঈমান আনা বোঝায়।

ক) 'ওযুদে বারী তা'আলা', খ) 'তাওহীদে বারী তা'আলা', গ) 'ইমতেসালুল আওয়ামের', ঘ) 'ইজতিনাবুন নাওয়াহী'

ইতিমধ্যে আমরা 'ওযুদে বারী তা'আলা' ও 'তাওহীদে বারী তা'আলা' সম্পর্কে আলোচনা করেছি। এখন তৃতীয় বিষয় 'ইমতেসালুল আওয়ামের' নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করবো, ইনশা-আল্লাহ। 'ইমতেসালুল আওয়ামের' অর্থ হলো আল্লাহর আদেশ সমূহ পালন করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজাতিকে সৃষ্টি করে তাদের জন্য কিছু বিধি-নিষেধ আরোপ করে দিয়েছেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইচ্ছে করলে মানবজাতিকে তার হুকুম মানতে বাধ্য করতে পারতেন। কেউ তার বিরূদ্ধে যেতে পারতো না। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষ ও জ্বীনদের ক্ষেত্রে তা করেননি। বরং তাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর নির্দেশ দুই প্রকার।

আল্লাহর নির্দেশ দুই প্রকার :

১) تَكْوِيْنِيْ (তাকভীনি), **২) تَشْرِيْعِيْ** (তাশরী'য়ি)

تَكْوِيْنِيْ (তাকভীনি) নির্দেশ বলতে ঐ সকল বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলীকে বুঝানো হয় যা লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। যেমন : সূর্যের প্রতি নির্দেশ পৃথিবীকে আলো প্রদান করা। চাঁদের প্রতি নির্দেশ পৃথিবীকে স্নিগ্ধ আলো প্রদান করা এবং চন্দ্র-সূর্য উভয়ের প্রতি নির্দেশ আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট পথে চলা। চন্দ্র-সূর্যের ক্ষমতা নেই এই নিয়মকে লঙ্ঘন করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ - وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ - لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

'আর সূর্য ভ্রমণ করে তার নির্দিষ্ট পথে, এটা মহাপরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ (আল্লাহ)–র নির্ধারণ। আর চাঁদের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি মানযিলসমূহ, অবশেষে সেটি খেজুরের শুষ্ক পুরাতন শাখার মতো হয়ে যায়। সূর্যের জন্য সম্ভব নয় চাঁদের নাগাল পাওয়া, আর রাতের জন্য সম্ভব নয় দিনকে অতিক্রম করা, আর প্রত্যেকেই কক্ষ পথে ভেসে বেড়ায়।' (ইয়াসীন ৩৬:৩৮-৪০)

এমনিভাবে মানুষ এবং জ্বীনজাতি ছাড়া অন্য সকল মাখলুক আল্লাহর নির্দেশ মানতে বাধ্য। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

'তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে? অথচ আসমানসমূহ ও জমিনে যা আছে তা তাঁরই আনুগত্য করে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায় এবং তাদের তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তন করা হবে।' (আল ইমরান ৩:৮৩)

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের ব্যাপারে বলেছেন, 'তারা কি আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে অন্য কিছু তালাশ করছে?' সত্যিই তো, মানুষেরা আল্লাহর দ্বীন ছেড়ে দিয়ে আবরাহাম লিঙ্কন, লেনিন, মাওসেতুংদের তৈরি করা গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, রাজতন্ত্র ইত্যাদি তালাশ করছে। পক্ষান্তরে কেউ আবার আল্লাহর নাযিলকৃত ইবাদতের পরিবর্তে চিশতি, কাদরী, নকশাবন্দি, মোজাদ্দেদী ইত্যাদির নামে নতুন নতুন ইবাদত তৈরি করে আল্লাহর দ্বীনের পরিবর্তে মনগড়া দ্বীন তৈরি করেছে। অথচ অন্য কোনো প্রাণী বা মাখলুক এ কাজ করে না। বরং তারা সকলেই এ আয়াত অনুযায়ী মুসলিম। সকলেই আল্লাহর হুকুমের আনুগত্যশীল বান্দা। তারা কেউ গণতন্ত্রী, সমাজতন্ত্রী, রাজতন্ত্রী ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী নয়। তারা সকলেই ইসলামপন্থী। আবার ইসলামপন্থী হয়ে চিশতী, কাদেরী, নকশাবন্দি, মোজাদ্দেদী ইত্যাদি নামক কোনো ভেজাল যুক্ত করেনি। বরং তারা মুসলিম। শুধু মুসলিম। আর মুসলিম। এ ছাড়া তাদের অন্য কোনো পরিচয় নেই। অবশ্য তাদের সে সুযোগও নেই। কেননা তাদের প্রতি আল্লাহর যে নির্দেশ সেটা تَكْوِيْنِيْ (তাকভীনি)। সেখানে তাদের নিজস্ব কোনো ইখতিয়ার নেই। এ কারণেই আয়াতে বলা

হয়েছে طَوْعًا وَكَرْهًا (ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়)। মানুষের ক্ষেত্রেও আল্লাহর কিছু কিছু নির্দেশ রয়েছে تَكْــوِيْنِيْ (তাকভীনি) যা কারো পক্ষে লঙ্ঘন করা সম্ভব নয়। যেমন, মানুষের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ হলো– চোখ দিয়ে দেখা, কান দিয়ে শ্রবণ করা, মুখ দিয়ে খাওয়া, পা দিয়ে চলা, হাত দিয়ে ধরা ইত্যাদি। এগুলো মানুষের পক্ষে লঙ্ঘন করার কোনো সুযোগ নেই। মানুষ ইচ্ছে করলেও কান দিয়ে দেখতে পারবে না, চোখ দিয়ে শুনতে পারবে না। এভাবে মানুষকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিছু ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ মানতে বাধ্য করে দেখালেন যে, তিনি ইচ্ছে করলে অন্যান্য নির্দেশ পালনেও এরকম বাধ্য করতে পারতেন। কিন্তু মানুষের সম্মানার্থে সেটা করেননি। বরং তাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ভালো-মন্দ যাচাই করার ক্ষমতা দিয়েছেন।

تَشْرِيْعِيْ (তাশরী'য়ি) নির্দেশ বলতে ঐ সকল বিধি-বিধান ও নির্দেশাবলীকে বুঝানো হয় যা মানুষের ইচ্ছা ও স্বাধীনতায় ছেড়ে দেওয়া হয়। মানুষ ইচ্ছে করলে পালন করবে, আর ইচ্ছে করলে পালন নাও করতে পারে। যেমন, সালাত, সিয়াম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি। এসব বিষয়গুলো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বান্দার প্রতি ফরয করে দিয়েছেন। কিন্তু পালন করা ও না করার ব্যাপারে ইচ্ছাধীন রেখেছেন। পালন করলে সওয়াব পাবে, আর পালন না করলে গুনাহগার হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যদি ইচ্ছে করতেন তাহলে এ ক্ষেত্রেও বাধ্য করতে পারতেন। মনে করুন! যদি কোনো ব্যক্তি ফজরের সালাত আদায় না করে তাহলে সূর্য উদয়ের পর সে আর হাটতে পারবে না। হাত-পা অচল হয়ে যাবে। মেরুদণ্ডের হাড্ডিগুলো তক্তা হয়ে যাবে। আর কোনো রকম ভাঁজ করা যাবে না। এরকম যদি কোনো সিস্টেম করতেন তা হলে এমন কোনো ব্যক্তি খুঁজে পাওয়া যেতো না যে ফজরের আযানের পরে বিছানায় শুয়ে থাকতো। বরং আযান শেষ না হতেই লাফ দিয়ে উঠতো, 'না জানি আমার পিঠটা তক্তা হয়ে যায়।' এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ

'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট পন্থা এবং আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তোমাদের এক উম্মত বানাতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের যা দিয়েছেন, তাতে তোমাদের পরীক্ষা করতে চান।' (মায়েদা, ৫:৪৮)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ ইচ্ছে করলে সমস্ত মানুষকে তার আনুগত্যশীল এক উম্মতে পরিণত করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা তা না করে মানুষের ইচ্ছার উপরে ছেড়ে দিয়েছেন। কেন তা করলেন? সে কারণটিও এ আয়াতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন। আর তা হলো 'তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে চান'। এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ভালো-মন্দ উভয় রাস্তা বাতলে দিয়েছেন। যার মনে চায় ভালো পথে চলবে, যার মনে চায় মন্দ পথে চলবে। ভালো পথে চললে পুরস্কার পাবে জান্নাত, আর মন্দ পথে চললে শাস্তি পাবে জাহান্নাম। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا - إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِــلَ وَأَغْلَالًــا وَسَعِيرًا

'অবশ্যই আমি তাকে পথ প্রদর্শন করেছি, হয় সে শোকরকারী অথবা অকৃতজ্ঞ। আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছি শেকল, বেড়ি ও প্রজ্বলিত অগ্নি।' (ইনসান ৭৬:৩-৪)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসুলকে নির্দেশ করেছেন সঠিক পথ বাতলে দেওয়ার জন্য। তারপর যার মনে চায় মানবে, যার মনে চায় মানবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا

'আর বলো, 'সত্য তোমাদের রবের পক্ষ থেকে। সুতরাং যে ইচ্ছা করে সে যেন ঈমান আনে এবং যে ইচ্ছা করে সে যেন কুফরি করে। নিশ্চয়ই আমি জালিমদের জন্য আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি।' (কাহাফ ১৮:২৯)

মূলত মানুষকে পরীক্ষা করার জন্যই এ স্বাধীনতটুকু দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

'যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন যে, কে তোমাদের মধ্যে আমলের দিক থেকে উত্তম। আর তিনি মহাপরাক্রমশালী, অতিশয় ক্ষমাশীল।' (মূলক ৬৭:২)

শরী'আহ্

উপরোক্ত আলোচনার মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে বোঝা গেলো যে, আল্লাহর নির্দেশ দুই প্রকার। প্রথম প্রকার নির্দেশ যেহেতু মানুষের ইচ্ছা ক্ষমতার বাইরে সেহেতু ওগুলোর সাথে শাস্তি বা পুরস্কারের কোনো সম্পর্ক নেই। দ্বিতীয় প্রকার আদেশের সাথে যেহেতু মানুষের ইচ্ছা ক্ষমতার সম্পর্ক আছে সেহেতু ওগুলোর সাথে শাস্তি বা পুরস্কারেরও সম্পর্ক আছে। আর এই প্রকারের বিধি-বিধানকেই ইসলামের পরিভাষায় বলা হয় শরী'আহ। সৃষ্টির সূচনা থেকে এ পর্যন্ত সবসময়ই আল্লাহর দ্বীন ছিলো একটা। তার নাম ইসলাম। ইব্রাহিম (আ.), ইয়াকুব (আ.) সহ সকল নবীরাই মুসলিম ছিলেন। এবং তাদের সন্তানদেরও মুসলিম হওয়ার জন্য ওসিয়ত করেছেন। তারা কেউ ইয়াহুদি-খৃস্টান ছিলেন না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

'ইব্রাহিম ইয়াহূদীও ছিল না, নাসারাও ছিল না; বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। আর সে মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।' (ইমরান ৩:৬৭)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

'আর এরই উপদেশ দিয়েছে ইব্রাহিম তার সন্তানদের এবং ইয়াকুবও (যে,) 'হে আমার সন্তানেরা, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য এই দ্বীনকে চয়ন করেছেন। সুতরাং তোমরা মুসলিম হওয়া ছাড়া মারা যেয়ো না।' (বাক্বারা ২:১৩২)

কিয়ামত পর্যন্ত এই ইসলামই একমাত্র আল্লাহর মনোনীত দ্বীন হিসেবে টিকে থাকবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের ওপর আমার নিআমত সম্পূর্ণ করলাম এবং তোমাদের জন্য দ্বীন হিসেবে পছন্দ করলাম ইসলামকে।' (মায়েদা ৫:৩)

এ আয়াতগুলো থেকে বুঝা গেলো সর্বযুগের মানুষের জন্য আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন হলো ইসলাম। এবং তাদের সকলের মূল দাওয়াত ছিলো তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত কেন্দ্রিক। সকলেরই মূল কালিমা ছিলো কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। তবে শরী'আহ্ ছিলো ভিন্ন ভিন্ন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا

'তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীআত ও স্পষ্ট পন্থা।' (মায়েদা ৫:৪৮)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিলেন যে, প্রত্যেক জাতির জন্য নির্ধারিত শরী'আহ্ ছিলো। সকলের জন্য একই শরী'আহ্ ছিলো তা নয়। এ কারণেই এ উম্মতের জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা একটি সুনির্দিষ্ট শরী'আহ্ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

'তারপর আমি তোমাকে দ্বীনের এক বিশেষ (শরী'আতের) বিধানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি। সুতরাং তুমি তার অনুসরণ করো এবং যারা জানে না তাদের খেয়াল– খুশির অনুসরণ করো না।' (জাসিয়া ৪৫:১৮)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসুল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এবং তার উম্মতদের যে শরী'আহ্ দান করেছেন সে শরী'আতেরই অনুসরণ করতে বলেছেন। পূর্বেকার কোনো শরী'আহ্, আইন-কানুন, বিধি-বিধান ও বর্তমান যুগের মানবরচিত কোনো বিধি-বিধান বা আইন-কানুন পালন করতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহর আইন-কানুন ও বিধি-বিধান জানার মাধ্যম হলো 'অহী'। অহীর বিধানকেই ইসলামের পরিভাষায় শরী'আহ বলা হয়।

শরী'আতের বিধান জানার মাধ্যম :

মানুষের জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যম সাধারণত দুটো। একটি হলো ইন্দ্রীয়, অপরটি হলো আকল বা বিবেক-বুদ্ধি। ইন্দ্রীয়ের মাধ্যমে মানুষ প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করে। যেমন : চোখ দিয়ে দেখে, কান দিয়ে শুনে, নাক দিয়ে ঘ্রাণ নিয়ে, জিহবা দিয়ে স্বাদ নিয়ে, ত্বকের মাধ্যমে স্পর্শ করে কোনো জিনিস সম্পর্কে জানতে পারে জিনিসটি কি? অতঃপর ইন্দ্রীয়ের কাজ যেখানে শেষ সেখান থেকে আক্বল বা বিবেক-বুদ্ধির কাজ শুরু হয়। বিবেক ওটাকে নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করে বিভিন্ন কাজে লাগায়। সাধারণ মানুষের জন্য জ্ঞান অর্জনের উপকরণ বা মাধ্যম এই দুটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু একজন মুসলিমের জন্য আরেকটি মাধ্যম রয়েছে। সেটি হলো অহী। বিবেকের সীমানা যেখানে শেষ সেখান থেকে অহীর জ্ঞানের সূচনা। মনে করুন! বাবা মেয়েকে বিবাহ করতে পারবে না। ভাই বোনকে বিয়ে করতে পারবে না। দুই বোনকে একত্রে বিয়ে করা যাবে না। কারণ কি? এরকম আরো অনেক বিধান রয়েছে যার কারণ না কোনো ইন্দ্রীয়ের সাহায্যে জানা যাবে। আর না কোনো বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে জানা যাবে। এসব বিধান জানা যাবে শুধুমাত্র একটি মাধ্যমেই, যার নাম অহী। অহীর মাধ্যমে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানবজাতির জন্য যে বিধি-বিধান দিয়েছেন সেটাই হলো শরী'আহ্। এজন্য পবিত্র কুরআনে অহীর বিধানকে মানার জন্য কঠোরভাবে নির্দেশ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ

'আর তোমার নিকট যে অহী পাঠানো হচ্ছে, তুমি তার অনুসরণ করো এবং সবর করো, যতক্ষণ না আল্লাহ ফয়সালা করেন। আর তিনিই উত্তম ফয়সালাকারী।' (ইউনূস ১০:১০৯)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

'আর তোমার রবের কাছ থেকে তোমার প্রতি যা অহী করা হয় তুমি তার অনুসরণ করো। নিশ্চয়ই তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।' (সুরা আহযাব, ৩৩:২)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও অহীর বিধান অনুসরণ করতেন :

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

'আমিতো শুধু আমার প্রতি অবতীর্ণ অহীর অনুসরণ করি। নিশ্চয়ই আমি যদি রবের অবাধ্য হই তবে ভয় করি কঠিন দিনের আজাবের'।' (ইউনুস ১০:১৫)

এ আয়াতে দেখা যায় রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অহীর অনুসরণ করতেন এবং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এটা ঘোষণা করার জন্য হুকুম দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

'বলো, 'আমিতো তারই অনুসরণ করি, যা আমার কাছে আমার রবের পক্ষ থেকে অহীরূপে প্রেরণ করা হয়। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ। আর তা হিদায়াত ও রহমত সে কওমের জন্য যারা ঈমান আনে'।' (আরাফ ৭:২০৩)

পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নিজের ব্যাপারে স্পষ্টভাবে মানুষের সামনে বলার জন্য হুকুম করেছেন। সেখানেও অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে অহীর অনুসরণের বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَى إِلَيَّ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ

'বলো, 'আমি রাসুলদের মধ্যে নতুন নই। আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আর আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র'।' (আহক্বাফ ৪৬:৯)

অহীর বিধান মানা বাধ্যতামূলক :

অহীর বিধান বা আল্লাহর নির্দেশ মানা বাধ্যতামূলক। কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা যখন কোনো বিষয় আল্লাহর নির্দেশ হিসেবে জানা যাবে

সেক্ষেত্রে কোনো প্রকার যুক্তি অথবা দলীলের মাধ্যমে অথবা হঠকারিতার মাধ্যমে তা অমান্য করা যাবে না। এমনকি সে ব্যাপারে কোনো বিবেচনা করার অধিকারও থাকবে না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا

‘আর আল্লাহ ও তাঁর রাসুল কোনো নির্দেশ দিলে কোনো মুমিন পুরুষ ও নারীর জন্য নিজেদের ব্যাপারে অন্য কিছু এখতিয়ার করার অধিকার থাকে না; আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করল সে স্পষ্টই পথভ্রষ্ট হবে।’ (আহযাব ৩৩:৩৬)

এ আয়াতে স্পষ্টভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল কোনো নির্দেশ দিলে সেক্ষেত্রে অন্য কিছু এখতিয়ার করার কোনো অধিকার দেওয়া হয় নাই। শুধু তাই না, বরং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের আদেশের ব্যাপারে যদি কারো অন্তরে কোনো প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ ও সংশয় থাকে তাহলেও সে মুমিন হতে পারে না। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

‘অতএব তোমার রবের কসম! তারা মুমিন হবে না যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক নির্ধারণ করে, তারপর তুমি যে ফয়সালা দেবে সে ব্যাপারে নিজেদের অন্তরে কোনো দ্বিধা অনুভব না করে এবং পূর্ণ সম্মতিতে মেনে নেয়।’ (নিসা ৪:৬৫)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজের কসম করে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের বিচার-ফয়সালার ব্যাপারে যদি কোনো প্রকার সংশয় অনুভব করে এবং সম্পূর্ণরূপে আন্তরিকভাবে মেনে না নেয় তাহলে সে মুমিন নয়। যারা কুরআন ও হাদীসের বিধান জানার পরে মানতে দ্বিধা বোধ করে তাদের মুনাফিক বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ

صُدُودًا

‘আর যখন তাদের বলা হয়, ‘তোমরা আস যা আল্লাহ নাযিল করেছেন তার দিকে এবং রাসুলের দিকে’, তখন মুনাফিকদের দেখবে তোমার কাছ থেকে সম্পূর্ণরূপে ফিরে যাচ্ছে।’ (নিসা ৪:৬১)

অহীর বিধান যারা কিছু মানে ও কিছু মানে না তারা কাফের :

বর্তমানে আমাদের সমাজে অনেক লোক এরকম আছে যারা নিজেদের মুসলিম পরিচয় দেয়। মাঝে মধ্যে অথবা নিয়মিত সালাত, সিয়াম, হজ্ব ইত্যাদি আদায় করে, কিন্তু সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, আন্তর্জাতিক জীবনে, ব্যাংকে, আদালতে, ব্যবসা-বাণিজ্যে আল্লাহর হুকুম মানতে রাজি নয়। অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশ কিছু মানে আর কিছু মানে না। কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী তারাও কাফির। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

‘তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে ঈমান রাখ আর কিছু অংশ অস্বীকার কর? সুতরাং তোমাদের মধ্যে যারা তা করে দুনিয়ার জীবনে লাঞ্ছনা ছাড়া তাদের কী প্রতিদান হতে পারে? আর কিয়ামতের দিনে তাদের কঠিনতম আজাবে নিক্ষেপ করা হবে। আর তোমরা যা করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে গাফিল নন।’ (বাক্বারা ২:৮৫)

এ আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, যারা কিছু মানে আর কিছু মানে না তাদের দুনিয়াতেও লাঞ্ছিত করা হবে আর আখিরাতে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে। তাহলে বর্তমান বিশ্বে মুসলিম জাতি ইয়াহুদি-খৃস্টান, হিন্দু-বৌদ্ধদের হাতে চরমভাবে লাঞ্ছিত হওয়ার কারণ এটাই নয় কী? মূলত এ জাতীয় মুসলিমদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নুসরত তথা সাহায্য-সহযোগীতা করার কোনো অঙ্গীকার করেন নাই। বরং এ জাতীয় লোকেরা আসলে কাফের। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا – أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

'নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলগণের সাথে কুফরি করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় এবং বলে, 'আমরা কতককে বিশ্বাস করি আর কতকের সাথে কুফরি করি' এবং তারা এর মাঝামাঝি একটি পথ গ্রহণ করতে চায়, তারাই প্রকৃত কাফির এবং আমি কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি অপমানকর আজাব।' (নিসা ৪:১৫০-১৫১)

এ জাতীয় লোকেরা অনেক সময় নিজেদের মধ্যমপন্থী বলে দাবি করে। আর যারা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর বিধান মানে এবং তা প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক জিহাদ করে তাদের মৌলবাদী, কট্টরপন্থী, আবার কখনো জঙ্গীবাদী ও সন্ত্রাসী বলে আখ্যায়িত করে। অথচ ইসলামে মধ্যমপন্থী, উদারপন্থী, নরমপন্থী বা ধর্ম নিরপেক্ষতার কোনো সুযোগ নেই। বরং এরা পথভ্রষ্ট। এদের প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا

'তারা এর মধ্যে দোদুল্যমান, না এদের দিকে আর না ওদের দিকে। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তুমি কখনো তার জন্য কোনো পথ পাবে না।' (নিসা ৪:১৪৩)

এরা যখন মুমিনদের কাছে আসে বা জমু'আর দিন মসজিদে যায় তখন নিজেদের একজন পূর্ণাঙ্গ ধার্মিক ও মুমিন বলে পরিচয় দেয়। আবার যখন তাদের দাদা ইয়াহুদী-খৃষ্টান ও হিন্দু লিডারদের কাছে যায় তখন তাদের কাছে গিয়ে নিজেদের সেক্যুলার, ধর্মনিরপেক্ষ ও মডারেট মুসলিম বলে পরিচয় দেয়। আর কুফ্ফারদের সাথে পূর্ণ সহযোগীতার অঙ্গীকার করে। বিশেষকরে জঙ্গীবাদ নির্মূলের নামে ইয়াহুদি-খৃস্টানরা ইসলামের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে সেক্ষেত্রে কাফিরদের পূর্ণ সহযোগিতা করার ঘোষণা দেয়। এদের বাস্তব চরিত্রটি পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতে সুন্দরভাবে তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ – اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ

'আর যখন তারা মুমিনদের সাথে মিলিত হয়, তখন বলে 'আমরা ঈমান এনেছি' এবং যখন গোপনে তাদের শয়তানদের সাথে একান্তে মিলিত হয়,

তখন বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা তোমাদের সাথে আছি। আমরা তো কেবল উপহাসকারী'। আল্লাহ তাদের প্রতি উপহাস করেন এবং তাদের তাদের অবাধ্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে ঘোরার অবকাশ দেন।' (বাক্বারা ২:১৪-১৫)

এ জাতীয় লোকেরা সাধারণত বাকপটু ও চাটুকার হয়। এরা খুব সহজে সকলকে খুশি করে বা ম্যানেজ করে চলতে পারে। পবিত্র কুরআনে তাদের এই চরিত্রটিও তুলে ধরা হয়েছে। ইরশাদ হচ্ছে–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ – وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

'আর মানুষের মধ্যে এমনও আছে, যার কথা দুনিয়ার জীবনে তোমাকে অবাক করে এবং সে তার অন্তরে যা রয়েছে, তার ওপর আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। আর সে কঠিন ঝগড়াকারী। আর যখন সে ফিরে যায়, তখন জমিনে প্রচেষ্টা চালায় তাতে ফাসাদ করতে এবং ধ্বংস করতে শস্য ও প্রাণী। আর আল্লাহ ফাসাদ ভালোবাসেন না।' (বাক্বারা ২:২০৪-২০৫)

এ আয়াতে চমৎকারভাবে মুনাফিক লোকগুলোর চরিত্র তুলে ধরা হয়েছে। এরা মুখে যতই সুন্দর কথা বলুক না কেনো আর মুমিনদের ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিজেদের পাক্কা মুমিন-মুসলিম হিসেবে জাহির করুক না কেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এদের মুসলিম হিসেবে মেনে নেননি। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ

'আর মানুষের মধ্যে কিছু এমন আছে, যারা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি আল্লাহর প্রতি এবং শেষ দিনের প্রতি', অথচ তারা মুমিন নয়।' (বাক্বারা ২:৮)

এই আয়াতে বলা হয়েছে তারা মুমিন নয়। তাহলে তারা কি? তারা মুনাফিক। আর এখান থেকেই মুনাফিকদের আলোচনা শুরু। পবিত্র কুরআনের সুরা বাক্বারার প্রথম পাঁচটি আয়াত মুত্তাকীণদের প্রসঙ্গ নিয়ে। তারপর দুটি আয়াত কাফেরদের প্রসঙ্গে। তারপর ১৩টি আয়াত মুনাফিকদের প্রসঙ্গ নিয়ে নাযিল করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে কাফেরদের চেয়েও মুনাফিকরা বেশি মারাত্মক। পবিত্র কুরআনে কাফেরদের নামে একটা সুরা রয়েছে আর মুনাফিকদের নামেও একটা সুরা

রয়েছে। সুরা 'কাফিরূন' মাত্র দুই লাইনের। আর সুরা 'মুনাফিকূন' দেড় পৃষ্ঠা ব্যাপী। এতে অনুমান করা যায় যে, মুনাফিকরা কত ভয়ঙ্কর। আর এজন্যই কাফেরদের চেয়ে মুনাফিকদের শাস্তিও কঠিন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ نَصِيرًا – إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا

'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা জাহান্নামের সর্বনিম্ন স্তরে থাকবে। আর তুমি কখনও তাদের জন্য কোনো সাহায্যকারী পাবে না। তবে যারা তাওবা করে নিজেদের শুধরে নেয়, আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে এবং আল্লাহর জন্য নিজেদের দ্বীনকে খালেস করে, তারা মুমিনদের সাথে থাকবে। আর অচিরেই আল্লাহ মুমিনদের মহাপুরস্কার দান করবেন।' (নিসা ৪:১৪৫-১৪৬)

অহী দুই প্রকার :

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে, যারা সত্যিকার মুমিন তারা সম্পূর্ণরূপে অহীর বিধান মেনে নিবে। অহীর বিধান বলতে কি বুঝায়? অহী বলতে কি শুধু কুরআন কেই বুঝায়? নাকি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীসও অহীর অন্তর্ভুক্ত? বর্তমানে একদল মানুষ, যারা নিজেদের আহলুল কুরআন বলে দাবি করে তারা হাদীসকে অস্বীকার করে। তারা বলে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে হাদীস সংরক্ষণ করা হয়নি। প্রায় ২৫০ থেকে ৩০০ বৎসর পরে হাদীস লিপিবদ্ধকরণ ও সংরক্ষণের কাজ শুরু হয়। তাই হাদীসের ওপর আস্থা রাখা যায় না। তাছাড়া পবিত্র কুরআনেই সবকিছু বলা আছে। হাদীসের প্রয়োজন কি? এ জন্য তারা কুরআনের কিছু আয়াত প্রমাণ স্বরূপ পেশ করে থাকে। যেমন, কুরআনে বলা হয়েছে–

وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

'আর আমি প্রত্যেক বিষয় বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।' (বণী ইসরাইল ১৭:১২)

তারা বলে, যখন কুরআনে সবকিছু বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে তাহলে হাদীসের কি প্রয়োজন? তাছাড়া আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া

তা'আলা পবিত্র কুরআনের অপর একটি আয়াতে শুধু কুরআনকেই অনুসরণ করতে বলেছেন। ইরশাদ হয়েছে–

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'আর এটি কিতাব– যা আমি নাযিল করেছি– বরকতময়। সুতরাং তোমরা তার অনুসরণ করো এবং তাকওয়া অবলম্বন কর, যাতে তোমরা রহমতপ্রাপ্ত হও।' (আনআম ৬:১৫৫)

এ জাতীয় আরো কিছু আয়াত ও হাদীস দ্বারা তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, হাদীস শরী'আতের কোনো হুজ্জাত নয়। অথচ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে বহু আয়াতে বলেছেন **أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ** 'তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর এবং আনুগত্য করো রাসুলের।' এরকম আয়াতের সংখ্যা অনেক, যাতে শব্দের কিছুটা পরিবর্তন থাকলেও বিষয়বস্তু একই। আর তাহলো 'আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের আনুগত্য করো'। আমরা এখানে সুরা ও আয়াত নম্বরগুলো তুলে দিলাম। যার প্রয়োজন তালাশ করার জন্য অনুরোধ রইলো। আল ইমরান- ৩:৩২,৫০; নিসা- ৪:৫৯; মায়েদা-৫:৯২; আনফাল ৮:১, ২০, ৪৬; নূর-২৪:৫৪, ৫৬; মুহাম্মাদ-৪৭:৩৩; মুজাদালাহ্-৫৮:১৩; তাগাবুন-৬৪:১২, ১৬; শু'আরা- ২৬:১০৮, ১১০, ১২৬, ১৩১, ১৪৪, ১৫০, ১৬৩, ১৭৯; যুখরূফ-৪৩:৬৩; নূহ-৭১:৩।

তাছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র কুরআনের শিক্ষক ছিলেন। তার মূল দায়িত্বের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হলো কুরআন শিক্ষা দেওয়া। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'তিনিই উম্মীদের মাঝে তাদের মধ্য থেকে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের কাছে তেলাওয়াত করেন তাঁর (আল্লাহর) আয়াতসমূহ, তাদের পবিত্র করে এবং তাদের শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমাত। যদিও ইতি:পূর্বে তারা স্পষ্ট গোমরাহীতে ছিল।' (জুমু'আ ৬২:২)

এ প্রসঙ্গে আরো একটি আয়াতে বলা হয়েছে–

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'অবশ্যই আল্লাহ্ মুমিনদের ওপর অনুগ্রহ করেছেন, যখন তিনি তাদের মধ্য থেকে তাদের প্রতি একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যে তাদের কাছে তাঁর আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করে এবং তাদের পরিশুদ্ধ করে আর তাদের কিতাব ও হিকমাত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা ইতিঃপূর্বে স্পষ্ট ভ্রান্তিতে ছিল।' (আল ইমরান ৩:১৬৪)

এ দুই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, তিনি কিতাব ও হিকমতের তালিম দিবেন। আর তিনি যে তালিম দিয়েছেন তাই হলো হাদীস। এছাড়া রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বলেছেন–

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَلَا إِنِّى أُوتِيتُ الْكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ أَلَا يُوشِكُ رَجُلٌ شَبْعَانُ عَلَى أَرِيكَتِهِ يَقُولُ عَلَيْكُمْ بِهَذَا الْقُرْآنِ فَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَلَالٍ فَأَحِلُّوهُ وَمَا وَجَدْتُمْ فِيهِ مِنْ حَرَامٍ فَحَرِّمُوهُ

'নিশ্চয়ই আমাকে কিতাব (কুরআন) দেওয়া হয়েছে এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ আরো (ইলম) দেওয়া হয়েছে। সাবধান! অচিরেই এমন লোক পাওয়া যাবে যে, তারা আরামদায়ক চেয়ারে বসে বা সুসজ্জিত খাটে হেলান দিয়ে বলবে 'তোমরা এই কুরআনকে শক্তভাবে ধর। এই কুরআনে যা হালাল হিসেবে পাবে তা হালাল মনে করবে। আর যা হারাম হিসেবে পাবে তা হারাম মনে করবে'।' (আবু দাউদ ৪৬০৬, মুসনাদে আহমাদ ১৭১৭৪, মেশকাত ১৬৩)

এ হাদীস থেকে একদিকে হাদীস অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে ভবিষ্যৎবানী পাওয়া যায়। অপরদিকে হাদীস অস্বীকারকারীরা বিলাসপ্রিয় হবে তাও বুঝা গেলো। বর্তমানে যারা হাদীস অস্বীকার করে তাদের মধ্যে এই চরিত্রটি খুব ভালো ভাবেই পাওয়া যায়। তারা সালাতের ব্যাপারে বলে কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের উল্লেখ নেই। আবার তারা যত ওয়াক্ত মানে তা আদায়ের পদ্ধতি ভিন্ন। অথচ হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট বলে দিয়েছেন দিবা-রাত্রিতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ এবং তা কিভাবে আদায় করতে হবে তা হাদীসে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ইমামতি করেছেন। তিনি দৈনিক

পাঁচ ওয়াক্ত সালাতই আদায় করেছেন। সাহাবায়ে কেরামগণও তার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করেছেন। তাকবিরে তাহ্‌রিমা দিয়ে শুরু করেছেন। সালাম দিয়ে শেষ করেছেন। কিন্তু আহলে কুরআন নামধারী লোকগুলো হাদীস অস্বীকার করার কারণে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর গোটা শিক্ষাকেই অস্বীকার করে ফেলেছে।

মাপকাঠি দুটো :

পূর্বের আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, অহী দুই প্রকার। প্রথম প্রকার অহী 'কিতাবুল্লাহ' তথা আল্লাহর কুরআন। দ্বিতীয় প্রকার অহী 'অহী গায়রে মাতলু' তথা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর হাদীস। যে কোনো বিষয়ে বিতর্ক দেখা দিলে সেক্ষেত্রে এই দুটো জিনিসের সঙ্গে মিলাতে হবে। কুরআন ও সহীহ হাদীসের সঙ্গে যেটা মিলবে সেটা মেনে নিতে হবে। আর কুরআন ও সহীহ হাদীসের সাথে যেটা মিলবে না সেটা মানা যাবে না। চাই সেটা তথাকথিত যত বড় আলেম, পীর-ওলী, গাউছ-কুতুব যেই বলুক না কেনো। সেক্ষেত্রে একথা বলা যাবে না যে, এত বড় বড় আলেমগণ কি বুঝে নাই? এত লক্ষ লক্ষ মানুষ, তাদের ভক্ত-মুরিদ, যদি তারা সঠিক পথের ওপর প্রতিষ্ঠিত না হতো, তাহলে এতো মানুষ তাদের কাছে কেন আসে? তারা হাজার হাজার মাদ্রাসা পরিচালনা করে। ইত্যাদি আগডুম, বাগডুম প্রশ্ন করা যাবে না বরং কুরআন ও সহীহ হাদীসের দৃষ্টিতে যার বক্তব্যের পক্ষে সহীহ দলিল পাওয়া যাবে তার কথাই মেনে নিতে হবে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

'অতঃপর কোনো বিষয়ে যদি তোমরা মতবিরোধ করো তাহলে তা আল্লাহ ও রাসুলের দিকে প্রত্যার্পণ করাও– যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। এটি উত্তম এবং পরিণামে উৎকৃষ্টতর।' (নিসা ৪:৫৯)

এ আয়াতে 'যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ' কথার মাধ্যমে অত্যন্ত কঠোরভাবে মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ–এর দিকে রুজু করতে বলা হয়েছে।

এমনিভাবে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও কুরআন-সুন্নাহকে শক্তভাবে ধারণ করার জন্য নির্দেশ করেছেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ مَالك اَنَّهُ بَلَغَهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ :تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ

'মালেক (রহ.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমার নিকট রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই সংবাদ পৌঁছেছে যে, তিনি বলেছেন, আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিষ ছেড়ে গিয়েছি, যতক্ষন তোমরা সে দুটি আঁকড়ে ধরবে ততক্ষণ পর্যন্ত পথভ্রষ্ট হবে না। সে দুটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তাঁর নবীর সুন্নাত।' (মুয়াত্তায়ে মালেক ১৫৯৪; মিশকাতুল মাসাবীহ ১৮৬)

ইজমা-ক্বিয়াস :

পূর্বের আলোচনায় পরিষ্কার করা হয়েছে যে, ইসলামে দলিলের মূল ভিত্তি দুটি। কুরআন ও সহীহ হাদীস। যদি কোনো বিষয়ে কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলিল-প্রমাণ পাওয়া যায়, সেক্ষেত্রে কোনো প্রকার ইজমা অথবা ক্বিয়াসের সুযোগ নেই। আর যদি কোনো বিষয়ে সরাসরি কুরআন বা হাদীসে দলিল খুঁজে না পাওয়া যায়, তাহলে সে ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের কোনো নীতিমালার আলোকে সমাধান খুঁজে বের করাকে ক্বিয়াস বলা হয়। এ জন্যই উসুলে ফিক্বহের কিতাবে বলা হয়েছে যে, ক্বিয়াস বলতে কিতাব ও সুন্নাহ থেকে নির্গত ক্বিয়াসকেই বুঝায়। শুধু মানবিক চিন্তা চেতনা থেকে নির্গত ক্বিয়াসকে নয়। কুরআন-সুন্নাহ এর নীতিমালার বাহিরে শুধু যুক্তি নির্ভর ক্বিয়াস শরীআতে গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা এ জাতীয় ক্বিয়াসের প্রথম উদ্ভাবক ইবলিস শয়তান। এমনিভাবে ইজমা বলতে ভিন্ন কোনো দলিলকে বুঝায় না। বরং কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত মাসআলা-মাসায়েল সমূহ দুই প্রকার। কিছু মাসআলা রয়েছে যেগুলোর ওপর মুসলিম জাতির সর্বস্তরের মানুষেরা সর্বসম্মতিক্রমে ঐক্যমত পোষণ করেছে। যেমন, পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ হওয়া। রমাদান মাসে সিয়াম ফরজ হওয়া ইত্যাদি। আবার কিছু মাসআলা-মাসায়েল রয়েছে যেগুলো মতবিরোধপূর্ণ। যেমন : সালাতের ভিতর রফউল ইয়াদাইন করা অর্থাৎ রুকুর আগে ও রুকুর পরে হাত ওঠানো। আমীন জোরে বলা। সালাতরত অবস্থায় বুকে হাত বাঁধা। এ

সকল মাসআলার ক্ষেত্রে সকল আলেম একমত নয়। কেউ বলেছে আমীন জোরে বলা উত্তম। আবার কেউ বলেছে আস্তে বলা উত্তম। কেউ বলেছে সালাতরত অবস্থায় বুকে হাত বাধা উত্তম। আবার কেউ বলেছে নাভীর নিচে হাত বাধা উত্তম ইত্যাদী। এগুলোতে ইজমা হয় নি। সুতরাং ইজমা কোনো সতন্ত্র দলিল নয়। আমাদের প্রিয়নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। এ বিষয়ে কাদিয়ানিরা ছাড়া সমস্ত উম্মাতের ইজমা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, খতমে নবুয়্যাতের বিষয়টি কুরআন ও হাদীসের ব্যতীত ইজমা দ্বারা প্রমাণ করতে হয়েছে। বরং কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য দলিল-প্রমাণ দ্বারা প্রমাণিত যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী। উম্মতের দল-মত নির্বিশেষে সকলেই যেহেতু এ ব্যাপারে একমত, তাই বলা যায় এক্ষেত্রে ইজমা হয়েছে। বর্তমানেও যদি এমন কোনো বিষয় বা সমস্যা উম্মতের সামনে উপস্থিত হয় যার সমাধান কুরআন-হাদীসে খুঁজে পাওয়া যায় না এবং সে ক্ষেত্রে কুরআন ও হাদীসের আলোকে সমকালীন গ্রহণযোগ্য ওলামাগণ ঐক্যমত পোষণ করেন তাহলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে।

সুতরাং ইসলামের মূল দলিল দুটোই। কুরআন ও সুন্নাহ (সহীহ হাদীস)। বাকি ইজমা-ক্বিয়াস যাই বলা হোক না কেন, এ দুটোর বাহিরে নয়।

অহীর বিধানের মৌলিক কিছু বিধান :

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পবিত্র হাদীসের মাধ্যমে যে বিধান মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন তাতে মানব-জীবনের এমন কোনো দিক নেই যে বিষয়ে ইসলামী শরী'আতে বিধি-বিধান দেওয়া হয় নাই। মানবজীবনের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় রয়েছে যার হিফাজত করা (সংরক্ষণ করা) জরুরি। তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি বিষয় হলো এই–

১. দ্বীন হিফাজত (নিরাপত্তা),

২. জীবনের হিফাজত (নিরাপত্তা)

৩. সম্পদের হিফাজত (নিরাপত্তা),

৪. বংশের হিফাজত (নিরাপত্তা),

৫. জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধির হিফাজত (নিরাপত্তা)।

এক : দ্বীন হিফাজত করা (হিফজুত দ্বীন)

দ্বীন হিফাজত করা ইসলামের দৃষ্টিতে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। দ্বীন হিফাজত করতে না পারলে সেই এলাকা থেকে হিজরত করা ফরজ। কেউ ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হলে তাকে হত্যা করার নির্দেশ রয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, ইসলামের দৃষ্টিতে দ্বীন হিফাজতের গুরুত্ব কত বেশি। দ্বীন হিফাজতের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের পক্ষ থেকে যে সকল কর্মসূচী দেওয়া হয়েছে তা সংক্ষিপ্তভাবে নিম্নে তুলে ধরা হলো–

এক : ইলমে দ্বীন অর্জন করা।

দ্বীন অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

'অতঃপর তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক কেন বের হয় না, যাতে তারা দ্বীনের গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারে এবং যখন আপন সম্প্রদায়ের নিকট প্রত্যাবর্তন করবে, তখন তাদের সতর্ক করতে পারে, যাতে তারা (গুনাহ থেকে) বেঁচে থাকে।' (তাওবাহ ৯:১২২)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কিছু লোকদের ইলমে দ্বীন শিক্ষার জন্য বের হতে বলেছেন যাতে তারা ইলমে দ্বীন শিক্ষা শেষে নিজ এলাকার প্রতিটি মানুষকে দ্বীন শিখাতে পারে। বিশেষ করে তাওহীদের ইলম অর্জন করা সকলের জন্যই ফরজ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

'অতএব জেনে রাখ, নি:সন্দেহে আল্লাহ ছাড়া কোনো (সত্য) ইলাহ নেই।' (মুহাম্মদ ৪৭:১৯)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করার নির্দেশ করেছেন। এটি এমন একটি ইল্‌ম যা ব্যতিত কোনো ইবাদত আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয় না। যে কোনো আমল করার পূর্বে তাওহীদের জ্ঞান অর্জন করা আবশ্যক নতুবা ঐ আমল আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। এ কারণেই ইমাম বুখারী (রহ.) তার প্রসিদ্ধ কিতাব সহীহ বুখারীর একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন **بَابُ الْعِلْمِ قَبْلَ الْعَمَلِ** 'আমলের

পূর্বে ইলম অর্জন করা' এবং সেখানে দলিল হিসেবে উপরোল্লিখিত সুরা তাওবার ১২২ নং আয়াতটিই উপস্থাপন করেছেন। ইমাম বুখারী (রহ.) এর একটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে 'তরজুমাতুল আবওয়াব' অর্থাৎ বিভিন্ন অধ্যায়ের যথোপযুক্ত শিরোনাম ধার্য করা। এজন্য মুহাদ্দিসীনদের মাঝে প্রসিদ্ধ আছে যে, 'ফিক্বহুল বুখারী ফি-আবওয়াবিত তারাজীম' অর্থাৎ বুখারীর জ্ঞানের নৈপুন্যতা তাঁর অধ্যায়ের শিরোনামের মধ্যে নিহিত। আর বাস্তবেও তাই। তিনি প্রথমে সহীহ বুখারীকে শুরু করেছেন অহীর অধ্যায় দিয়ে। তারপর ইমানের অধ্যায়। তারপর ইল্‌ম এর অধ্যায়। অতঃপর কিতাবুত তাহারাত থেকে অজু-গোসল, সালাত-সিয়াম, হজ্ব-যাকাতসহ অন্যান্য সকল বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এখানে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় ইমাম বুখারী (রহ.) প্রথমে ওহীর আলোচনার মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন যে, ইসলামে ইলমের উৎস ওহী। অতঃপর ইসলামের মূল বিষয় ঈমান নিয়ে আলোচনা করেছেন। ঈমানের পরে আমলের আলোচনাও হওয়া উচিত ছিলো। কিন্তু তিনি তা করেননি। কেননা ইমানের পরে আমল করা প্রয়োজন হলেও ইলম বিহীন আমল করা সম্ভব নয়। তাই ঈমান ও আমলের মধ্যে সেতু হিসেবে ইলমের আলোচনা করেছেন। কেননা আমল যদি অল্পও হয় কিন্তু সহীহ ও সঠিক হয় তাহলে তা আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য। আর আমল যদি পরিমাণে অনেক বেশিও হয় কিন্তু ইলম বিহীন উল্টা-পাল্টা করা হয় তাহলে তা আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না। যে আমলগুলো ফরজ সেগুলোর জন্য প্রয়োজনীয় ইলম অর্জন করাও ফরজ। আনাস বিন মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

'প্রত্যেক মুসলিম নর-নারীর ওপর ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা ফরজ।' (সহীহ ইবনে মাজাহ, ২২০, ইবনে মাজাহ : ২২২, ২২৪, মেশকাত : ২১৮, মুসনাদে বায্‌যার: ৯৪)

দুই : আলেমদের সাথে সম্পর্ক রাখা।

দ্বীন হিফাজত করার লক্ষ্যে কুরআন-সুন্নাহ-এর সঠিক জ্ঞানের অধিকারী আলেমদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখা ও প্রয়োজনে অজানা বিষয়ে তাদের থেকে জানার জন্য নির্দেশ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'সুতরাং জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা করো, যদি তোমরা না জানো।' (নাহল ১৬:৪৩)

তাছাড়া সাধারণভাবেও সত্যবাদীদের সঙ্গী হওয়ার জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্দেশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।' (তাওবাহ ৯:১১৯)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সত্যবাদীদের সঙ্গে থাকার জন্য বলেছেন। এ আয়াতকে আমাদের দেশের প্রচলিত পীর-মুরীদেরা অপব্যাখ্যা করে 'সাদিকুন' এর তরজমা 'পীর' করে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেয়। তারা মানুষকে বুঝায় পীর ধরার কথা পবিত্র কুরআনেই বলা হয়েছে। অথচ 'সাদিকুন' এর ব্যাখ্যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই পবিত্র কুরআনের অন্য আয়াতে বাতলে দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

'মুমিন কেবল তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান এনেছে, তারপর সন্দেহ পোষণ করেনি। আর নিজেদের সম্পদ ও নিজেদের জীবন দিয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে। এরাই সত্যবাদী।' (হুজরাত ৪৯:১৫)

পবিত্র কুরআনের অপর আয়াতে বলা হয়েছে–

الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

'যাদের নিজেদের ঘরবাড়ি ও ধন-সম্পত্তি থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। অথচ এরা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে সাহায্য করেন। এরাই তো সত্যবাদী।' (হাশর ৫৯:৮)

এ আয়াতদ্বয়ে 'সাদিকুন' বা সত্যবাদী কারা তাদের পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং সত্যবাদীদের সঙ্গী হও এ আয়াতের অপব্যাখ্যা করে পীর ধরা ফরজ প্রমাণ করার ব্যর্থ চেষ্টা করা পবিত্র কুরআনকে বিকৃত করার

শামিল। কেননা ইয়াহুদি-খৃস্টানরা একাজটি করতো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ

'ইয়াহুদিদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা কালামসমূহকে তার স্থান থেকে পরিবর্তন করে ফেলে।' (নিসা ৪:৪৬)

তাই ইয়াহুদিদের মতো নিজেদের স্বার্থে আয়াতের অর্থ যথাস্থান থেকে পরিবর্তন না করে যেটা সঠিক সেটাই মানুষের সামনে তুলে ধরা উচিৎ। 'সাদিকুন' বলতে কাদের বোঝানো হয়েছে তা কুরআন থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। এমনিভাবে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সত্যিকার আল্লাহওয়ালাদের পথ অনুসরণ করতে বলেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

'আর অনুসরণ করো তার পথ, যে আমার অভিমুখী হয়। তারপর আমার কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তোমাদের জানিয়ে দেব, যা তোমরা করতে।' (লুকমান ৩১:১৫)

এ আয়াতেও আল্লাহওয়ালাদের পথ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বর্তমান যুগের প্রচলিত পীর-মুরীদগণ পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটিকেও তারা পীর-মুরীদির দলিল হিসেবে উপস্থাপন করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তারা এ আয়াতে আল্লাহর অভিমুখী বান্দা বলতে পীরসাহেবদের বুঝিয়ে থাকেন। অথচ পবিত্র কুরআনের আয়াতে বর্তমান যুগের প্রচলিত পীর-মুরীদদের বুঝানো হয় নাই। আর এই পীর-মুরিদি কুরআন নাযিলের সময় এর কোনো অস্তিত্বও ছিলো না। বরং এখানে কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক যারা আল্লাহর পথে চলে, আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়েছে তাদের পথ অনুসরণ করতে বলা হয়েছে। তাহলে এই আয়াত দ্বারা পীররা কি করে উদ্দেশ্য হন। কেনোনা তারা তো কুরআন ও সুন্নাহর পথে চলে না। তারা চলে চীশতির পথে (চীশতিয়া তরিকা), কাদেরীর পথে (কাদেরীয়া তরিকা), নকশাবন্দীর পথে (নকশাবন্দিয়া তরিকা), মোজাদ্দেদীর পথে (মোজাদ্দেদীয়া তরিকা), সাবেরীর পথে (সাবেরীয়া তরিকা)। তারা রাসুলের তরিকা বাদ দিয়ে বিভিন্ন মনগড়া

তরিকার জিকির করে। ছয় লতিফার জিকির, বিভিন্ন তরীকার অযিফা, নাক দিয়ে সাঁপের মতো ফোঁস ফোঁস করার অভিনব যিকির. হেলে-দুলে, নেচে-গেয়ে, বাঁদর ঝুলে, দৌড়-ঝাঁপ করে যিকির করে। যার কোনো ভিত্তি ইসলামে নেই। তাই উপরোক্ত আয়াতে এ সকল লোকদের উদ্দেশ্য করা হয়নি। বরং যারা সহীহভাবে কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী চলে এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর তরিকায় ইবাদত করে, জিকির করে, অযিফা করে তাদেরই উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

তিন : আলেমদের মর্যাদার কথা ঘোষণা করা।

দ্বীন হিফাজত করার জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো আলেমদের বিশেষ মর্যাদা প্রদান করা। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে–

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

'বলো, 'যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান?' বিবেকবান লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে।' (জুমার ৩৯:৯)

এ আয়াতে প্রশ্নবোধক বাক্য ব্যবহার করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আলেমদের অসংখ্য মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। পবিত্র কুরআনের অপর আয়াতে সুস্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে–

يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে আল্লাহ তাদের মর্যাদায় সমুন্নত করবেন। আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবহিত।' (মুজাদালাহ ১৮:১১)

এ ছাড়া অসংখ্য হাদীসে আলেমদের মর্যাদা বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ كَثِيرِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِى الدَّرْدَاءِ فِى مَسْجِدِ دِمَشْقَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ إِنِّى جِئْتُكَ مِنْ مَدِينَةِ الرَّسُولِ –صلى الله عليه وسلم– لِحَدِيثٍ بَلَغَنِى أَنَّكَ تُحَدِّثُهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَا جِئْتُ لِحَاجَةٍ قَالَ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلُبُ فِيهِ عِلْمًا سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا مِنْ طُرُقِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِى السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِى الأَرْضِ وَالْحِيتَانُ فِى جَوْفِ

الْمَاءِ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلاَ دِرْهَمًا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ

'কাসীর ইবনু ক্বায়স (রহ.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দামেশকের মসজিদে আবু দারদা (রাযি.) এর সাথে বসা ছিলাম। এ সময় তার নিকট একজন লোক এসে তাকে বললেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর শহর মদিনা থেকে আপনার কাছে এসেছি একটি হাদীস জানার জন্য। আমি জেনেছি আপনি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। এ ছাড়া আর কোনো উদ্দেশ্যে আমি আপনার কাছে আসিনি। তার এ কথা শুনে আবু দারদা (রাযি.) বললেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমি এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনের জন্য কোনো পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাআলা তাকে জান্নাতের পথে চালিয়ে নিয়ে যাবেন। আর মালায়িকাহ 'ইলম অনুসন্ধানকারীর পথে তার আরামের জন্য তাদের পালক বা ডানা বিছিয়ে দেন আর 'আলিমদের জন্য আকাশে ও পৃথিবীর সকলেই আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, এমনকি পানির মাছসমূহও। 'আলিমদের মর্যাদা মূর্খ 'ইবাদতকারীর চেয়ে অনেক বেশি। যেমন পূর্ণিমা চাঁদের মর্যাদা তারকারাজির ওপর। আর 'আলিমগণ হচ্ছে নবীদের ওয়ারিস। নবীগণ কোনো দিনার বা দিরহাম (ধন-সম্পদ) উত্তরাধিকারী হিসেবে রেখে যান না। তাঁরা মীরাস হিসেবে রেখে যান শুধু 'ইলম'। তাই যে ব্যক্তি ইলম হাসিল করেছে সে পূর্ণ অংশ লাভ করেছে।' (আহমাদ ২১৭১৫, মেশকাত ২১২, তিরমিযী ২৬৮২, আবু দাউদ ৩৬৪১, ৩৬৪৩, ইবনু মাজাহ ২২৩)

আর তিরমিযী বর্ণনাকারীর নাম ক্বায়েস ইবনু কাসীর উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কাসীর ইবনু ক্বায়সই সঠিক (যা মিশকাতের সংকলকও নকল করেছেন। মিশকাতুল মাসাবীহ- ২১২ তাহকীক আলবানী : হাসান)

অপর হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

وَعَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ الْبَاهِلِيْ قَالَ ذُكِرَ لِرَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ رَجُلَان أَحَدُهُمَا عَابِدٌ وَالْآخَرُ عَالِمٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَىْ أَدْنَاكُمْ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ وَأَهْلَ

السَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ حَتَّى النَّمْلَةُ فِيْ جُحْرِهَا وَحَتَّى الْحُوْتُ لِيُصَلُّوْنَ عَلَــىْ مُعَلِّــمِ النَّاسِ الْخَيْرَ

'আবু উমামাহ আল-বাহিলী (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সামনে দুই ব্যক্তির উল্লেখ করা হলো। এদের একজন ছিলেন 'আবিদ, আর দ্বিতীয়জন ছিলেন 'আলিম। তিনি বললেন, 'আবিদের ওপর 'আলিমের মর্যাদা হলো যেমন আমার মর্যাদা তোমাদের একজন সাধারণ ব্যক্তির ওপর। এরপর তিনি বললেন, আল্লাহ তা'য়ালা তার মালায়িকাহ এবং আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা, এমনকি পিঁপড়া তার গর্তে ও মাছ পর্যন্ত 'ইলম শিক্ষার্থীদের জন্য দোয়া করে। (তিরমিযী ২৬৮৫, মিশকাতুল মাসাবীহ- ২১৩)। আলবানীর তাহকীক অনুযায়ী হাদীসটি হাসান। তিরমিযী ও দারিমীর এই হাদীস বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে এর কোনো কোনোটি যঈফ আবার কোনো কোনোটি হাসান সহীহ)

وَرَوَاهُ الدَّارِمِيْ عَنْ مَكْحُوْلٍ مُرْسَلًا وَلَمْ يَذْكُرْ : رَجُلَانِ وَقَالَ : فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَــىْ الْعَابِدِ كَفَضْلِيْ عَلَىْ أَدْنَاكُمْ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةُ : (إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ) وَسَرَدَ الْحَدِيْثُ إِلَىْ آخِرِهِ

'দারামী এই বর্ণনাটিকে মাকহূল (রহ.) থেকে মুরসাল হিসেবে নকল করেছেন এবং দুই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করেননি। তিনি বলেছেন, আবিদের তুলনায় আলিমের ফাজিলত (মর্যাদা) এমন যেমন তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের ওপর আমার ফাজিলত। এরপর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথার প্রমাণে কুরআনের এ আয়াত তিলাওয়াত করলেন–

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

'নিশ্চই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলিমরাই তাকে ভয় করে।' (ফাতির ৩৫:৮)।

এ আয়াতে বলা হয়েছে আলেমরাই আল্লাহকে ভয় করে। এর অর্থ এই নয় যে, সাধারণ লোকেরা আল্লাহকে ভয় করে না। বরং বিষয়টি হলো সাধারণ লোকেরা ভয় করে হয়তো বাড়াবাড়ি করে। যেমন : মনে করে আল্লাহকে সরাসরি পাওয়া যাবে না, পাপী-গোনাহগারদের কথা আল্লাহ সরাসরি শুনেন না। এজন্য কেউ ভায়া-মাধ্যম হিসেবে পীরদের শরণাপন্ন হয়, আবার কেউ নিরাশ হয়ে ইবাদত ছেড়ে দিয়ে জঘন্য পাপে লিপ্ত হয়ে যায়। আবার কেউ

যায় ছাড়াছাড়ির দিকে। তারা আজীবন পাপ করতে থাকে। আর মনে করে আল্লাহ মাফ করে দিবে। অথচ ইসলামে বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি কোনোটারই স্থান নেই। ঈমান হলো **بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَــاءِ** ভীতি এবং আশা উভয়ের মাঝামাঝি। একজন আলেম যে সঠিকভাবে কুরআন ও সুন্নাহ-এর জ্ঞান রাখে সে যত বড় পাপ করে ফেলুক না কেন আল্লাহর রহমতের আশা ত্যাগ করবে না। পক্ষান্তরে আল্লাহর অসীম রহমাতের আশা করে একেবারে গুনাহে ডুবেও থাকে না। একজন সাধারণ মানুষ মনে করে ইবাদত বেশি করলেই আল্লহাকে খুশি করা যায়। এজন্য সে বিভিন্ন বিদ'আত ও শিরকে পর্যন্ত লিপ্ত হয়ে যায়। পক্ষান্তরে একজন আলেম, সে জানে যে, ইবাদত বেশি করলেই আল্লাহকে খুশি করা যাবে না। বরং সঠিকভাবে আল্লাহর নির্দেশ মেনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তরিকায় অল্প আমল করলেও নাজাত পাওয়া যায়। এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেছেন : 'নিশ্চয়ই আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আলিমরাই তাকে ভয় করে।' (ফাতির ৩৫:৮)।

যাই হোক, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উপরে হাদীসের প্রমাণ হিসেবে এই আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন। এ ছাড়া দারেমীর হাদীসের বাকি অংশ তিরমিযীর বর্ণনার অনুরূপ। (দারিমী ৮৮/৮৯)

وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيْ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيْ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا أَنَّ التِّرْمِذِيْ وَأَبَا دَوُادَ لَمْ يَذْكُرَا : " ثَلَاثٌ لَا يُغَلُّ عَلَيْهِنَّ " إِلَىْ آخِرِهِ

'এই হাদীসটি যায়েদ ইবনু সাবিত (রাযি.) থেকেও আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী বর্ণনা করেছেন। তবে তিরমিযী ও আবু দাউদ **ثَلَاثٌ لَا يُغَــلُّ** হতে শেষ পর্যন্ত বর্ণনা করেননি। (ইমাম আহমাদ ১২৯৩৭, ২১০৮০, তিরমিযী ২৬৫৮, আবু দাউদ, ইবনু মাজাহ ৩০৫৬, দারিমী ২২৭)। মিশকাতুল মাসাবীহ ২২৯; তাহকীক আলবানী : সহীহ)

وَعَنْهُ مُرْسَلًا قَالَ : سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَا فِيْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَحَدُهُمَا كَانَ عَالِمًا يُصَلِّي الْمَكْتُوْبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ وَالْآخَرُ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَضْلُ

هَذَا الْعَالِمِ الَّذِيْ يُصَلِّيْ الْمَكْتُوبَةَ ثُمَّ يَجْلِسُ فَيُعَلِّمُ النَّاسَ الْخَيْرَ عَلَى الْعَابِدِ الَّذِيْ يَصُوْمُ النَّهَارَ وَيَقُوْمُ اللَّيْلَ كَفَضْلِيْ عَلَىْ أَدْنَاكُمْ

'এই হাদীসটি যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) থেকে হাসান বাসরি (রহ.) বর্ণনা করেছেন মুরসালসূত্রে। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে বাণী ইসরাঈলের দু'জন লোকের মর্যাদা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তাদের একজন ছিলেন 'আলিম' যিনি ওয়াক্তিয়া ফারয সালাত আদায় করার পর বসে মানুষকে তা'লীম দিতেন। আর দ্বিতীয় জন দিনে সিয়াম (রোজা) পালন করতেন, গোটা রাত ইবাদত করতেন। (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল) এ দু'ব্যক্তির মধ্যে মর্যাদার দিক দিয়ে উত্তম কে? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ফরয আদায় করার সাথে সাথেই যে ব্যক্তি তালীম দেয়ার জন্য বসে যায়, সে ব্যক্তি যে দিনে সিয়াম (রোজা) পালন করে ও রাতে ইবাদত করে তার চেয়ে বেশি মর্যাদাবান। যেমন, তোমাদের একজন সাধারণ মানুষের ওপর আমার মর্যাদা।' (দারিমী ৩৪০, মিশকাতুল মাসাবীহ- ২৫০। তাহক্বীক্ব আলবানী : হাসান সহীহ। আলবানী বলেন, এর সানাদ হাসান সহীহ তবে হাদীসটি মুরসাল বটে কিন্তু এর একটি মাওসুল শাহিদ হাদীস একে শক্তিশালী করেছে। যা আবু উমামা আলবাহিলী থেকে বর্ণিত হয়েছে)

চার : ইলম অনুযায়ী আমল করার গুরুত্ব।

দ্বীন হিফাজত করার জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইলম অনুযায়ী আমল করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা। কেননা যখন কোনো বিষয়ের আমল চালু থাকে তখন সেটা সমাজ থেকে বিলুপ্ত হতে পারে না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ زِيَادِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَقَالَ وَذَاكَ عِنْدَ أَوَانِ ذَهَابِ الْعِلْمِ قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ يَذْهَبُ الْعِلْمُ وَنَحْنُ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَنُقْرِئُهُ أَبْنَاءَنَا وَيُقْرِئُهُ أَبْنَاؤُنَا أَبْنَاءَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ قَالَ ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ يَا ابْنَ أُمِّ لَبِيدٍ إِنْ كُنْتُ لَأَرَاكَ مِنْ أَفْقَهِ رَجُلٍ بِالْمَدِينَةِ أَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَءُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَنْتَفِعُونَ مِمَّا فِيهِمَا بِشَيْءٍ

'যিয়াদ ইবনে লাবিদ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বিষয় নিয়ে আলাপ করলেন। তিনি বললেন,

সেটা 'ইলম উঠে যাবার সময় সংঘটিত হবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! কি করে ইলম উঠে যাবে? আমরা তো কুরআন পড়ছি, আমাদের সন্তানদের কুরআন শিক্ষা দিচ্ছি। আমাদের সন্তানেরা তাদের সন্তান-সন্ততিদের কুরআন শিক্ষা দিতে থাকবে! রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যিয়াদ! তোমার মা তোমার জন্য ভারাক্রান্ত হোক। আমি তো তোমাকে মাদিনার একজন বিজ্ঞ ও জ্ঞানী ব্যক্তি মনে করতাম। এসব ইয়াহুদি ও নাসারারা তো তাওরাত ও ইঞ্জিল পড়েছে। অথচ তারা তদনুযায়ী কাজ করছে না।' (আহমদ ১৭০১৯, ইবনে মাজাহ ৪০৪৮) ইমাম তিরমিযী ও অনুরূপ যিয়াদ (রাযি.) হতে বর্ণনা করেছেন। তাহকীক আলবানী : সহীহ)

পাঁচ : ইলম অর্জনের প্রয়োজনীয়তা।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلاَّ مِنْ ثَلاَثَةٍ إِلاَّ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

'আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মানুষ মরে গেলে তার থেকে তার কার্যক্রম বিচ্ছিন্ন (নিঃশেষ) হয়ে যায়। কিন্তু তিনটি আমালের সাওয়াব অব্যাহত থাকে। ১. সাদাক্বায়ে জারিয়াহ্ যা তার মৃত্যুর পরেও অব্যাহত থাকে। ২. এমন জ্ঞান (রেখে যায়) যার থেকে মানুষ উপকৃত হতে থাকে এবং ৩. এমন সন্তান রেখে যায় যে তার জন্য দোয়া করে।' (মুসলিম ৪৩১০, আবু দাউদ ২৮৮২)

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِى الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِى بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

আবু হুরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুসলিম ব্যক্তির পার্থিব

বিপদ সমূহের একটি বিপদ দূর করে দিল, আল্লাহ তার আখিরাতের বিপদ সমূহের একটি বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মূ'মিনের কষ্টসমূহে একটি কষ্ট দূর করে দিবে, আল্লাহ তায়ালা তার ইহকাল ও পরকালের কষ্টসমূহ দূর করে দিবেন এবং যে ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর হালকা করবে (অর্থাৎ তাকে ঋণ পরিশোধ করার সুযোগ দিবে) আল্লাহ তায়ালা দুনিয়া ও পরকালে তার (সময় দাতার) প্রতি হালকা ও সুখ-সাচ্ছন্দ্য প্রদান করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মু'মিনের দোষ ঢেকে রাখবে (প্রকাশ করবে না), আল্লাহ তায়ালা তার দুনিয়া ও পরকালের দোষ ঢেকে রাখবেন। আল্লাহ তায়ালা তার বান্দাদের ততক্ষণ পর্যন্ত সাহায্য করতে থাকেন যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে। যে ব্যক্তি জ্ঞান আহরণের জন্য কোনো পথ বা পন্থায় অনুপ্রবেশ করার সন্ধান করে, আল্লাহর তা'আলা এর বিনিময়ে তার জান্নাতে প্রবেশ করার পথ সহজ করে দেন। যখন কোনো দল আল্লাহর কোনো ঘরে সমবেত হয়ে আল্লাহর কিতাব তিলাওয়াত করে এবং জ্ঞানচর্চা করে, তাদের ওপর আল্লাহর তরফ থেকে প্রশান্তি নাযিল হয়। আল্লাহর রহমত তাদের বেষ্টন করে নেয় এবং মালায়িকাহ তাদের ঘিরে রাখে। তাছাড়াও আল্লাহ নিকটবর্তী মালায়িকাহ্দের সাথে তাদের ব্যাপারে আলোচনা করেন। (মুসলিম ৭০২৮, তিরমিযী ১৪২৫, মুসনাদে আহমাদ ৭৪২৭, মেশকাত ২০৪)

অন্য হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيثًا فَحَفِظَهُ حَتَّى يُبَلِّغَهُ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَحْفَظُ لَهُ مِنْ سَامِعٍ

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, আল্লাহ তায়ালা সেই ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন যে আমার কোনো কথা শুনেছে এবং যেভাবে শুনেছে ঠিক সেভাবেই অন্যের কাছে তা পৌঁছে দিয়েছে। অনেক সময় যাকে পৌঁছানো হয় সে শ্রোতা থেকে অধিক স্মরণকারী হয়। (মুসনাদে আহমাদ ৪১৫৭, তিরমিযী ২৬৫৭, ইবনু মাজাহ ২৩০, ২৩২, মিশকাতুল মাসাবীহ ২৩০, তাহক্বীক্ব আলবানী : সহীহ)

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

وَعَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَىْ إِلَيْ أَنَّهُ مَنْ سَلَكَ مَسْلَكًا فِيْ طَلَبِ الْعِلْمِ سَهَّلْتُ لَهُ طَرِيْقَ الْجَنَّةِ وَمَنْ سَلَبْتُ كَرِيمَتَيْهِ أَثْبَتهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ وَفَضْلٌ فِي عِلْمٍ خَيْرٌ مِنْ فَضْلٍ فِيْ عِبَادَةٍ وَمَلَاكِ الدِّيْنِ الْوَرْعِ

'আয়িশা (রাযি.) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'য়ালা আমার কাছে অহী পাঠিয়েছেন, যে ব্যক্তি ইলম (জ্ঞান) হাসিল করার জন্য কোনো পথ চলবে, আমি তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দিব। আর যে ব্যক্তির দুই চোখ আমি নিয়ে নিয়েছি অর্থাৎ যে অন্ধ হয়ে গেছে তার বিনিময় আমি তাকে জান্নাত দান করিব। আর ইবাদতের পরিমাণ বেশি হওয়ার চেয়ে ইলমের পরিমাণ বেশি হওয়া উত্তম। দ্বীনের মূল হল তাক্বওয়া ও ধার্মিকতা।' (বায়হাকী ৫৭৫১, মিশকাতুল মাসাবীহ ২৫৫, আলবানী তাহকীক অনুযায়ী সহীহ)

ছয় : খলিফা নিযুক্তকরণ।

দ্বীন হিফাজত করার জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো খলিফা নিয়োগ করা বাধ্যতামূলক। আর খলিফাতুল মুসলিমিনের প্রথম কাজ হচ্ছে দ্বীন হিফাজত করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمْ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

'রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, বণী ইসরাইল এর নবীগণ তাদের উম্মতকে শাসন করতেন। যখন কোনো একজন নবী ইন্তেকাল করতেন তখন অন্য একজন নবী তার স্থলাভিষিক্ত হতেন। আর আমার পরে কোনো নবী নেই, তবে অনেক খলিফা হবে। সাহাবারা আরজ করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ আমাদের কি নির্দেশ করছেন? তিনি বললেন, তোমরা একের পর এক তাদের বাইআ'তের হক আদায় করবে। তোমাদের ওপর তাদের যে হক রয়েছে তা আদায় করবে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা তাদের জিজ্ঞাসা করবেন ঐসকল বিষয় সমন্ধে যে সবের

দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পন করা হয়েছিল।' (সহীহ বুখারী-৩৪৫৫, মুসলিম ৪৮৭৯, মুসনাদে আহমাদ ৭৯৬০, বায়হাকী ১৬৯৮৯)

অপর হাদীসে ইমামকে ঢাল বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ بِهِ

'আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, নিশ্চয়ই ইমাম হলো ঢাল স্বরূপ তার পিছনে থেকে মানুষ যুদ্ধ করবে।' (আবু দাউদ: ২৭৫৯)

সাত : ইসলামের দাওয়াহ ফরজ করা হয়েছে।

দ্বীন হিফাজতের জন্য যেসকল পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ন বিষয় হলো ইসলামে দাওয়াহকে ফরজ করা হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছে–

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

'হে রাসুল, তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার নিকট যা নাযিল করা হয়েছে, তা পৌঁছে দাও আর যদি তুমি তা না করো তবে তুমি তাঁর রিসালাত পৌঁছালে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে হিদায়াত করেন না।' (মায়িদা ৫:৬৭) এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাবলিগ (দ্বীন প্রচার) করা ফরজ করে দিয়েছেন। তবে এখানে তাবলিগ বলতে বর্তমান ভারতে জন্ম নেওয়া প্রচলিত তাবলীগ এর কথা বলা হয় নাই। যেখানে বিভিন্ন পীর-বুজুর্গদের কিচ্ছা-কাহিনী দিয়ে সাজানো 'ফাজায়েলে আমাল' নামক একটি কিতাবকে কুরআন তিলাওয়াতের চেয়েও বেশি তিলাওয়াত করা হয়। বরং আল্লাহর পক্ষথেকে নাযিলকৃত অহীর বিধানের তাবলিগ করতে বলা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে বলেছেন–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً وَحَدِّثُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجَ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنْ النَّارِ

'আব্দুল্লাহ বিন আমর থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার পক্ষ থেকে পৌঁছিয়ে দাও যদিও একটি আয়াত হয়। তোমরা বণী ইসরাঈল থেকে বর্ণনা করো কোনো সমস্যা নেই। এবং যে ব্যক্তি এমন কোনো কথা বলে যা আমি বলিনি এবং তা আমার নামে চালিয়ে দেয় সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে করে নেয়।' (সহীহ বুখারী ৩৪৬১, তিরমিযী ২৬৬৯, মুসনাদে আহমাদ ৬৪৮৬, ৬৮৮৮, মেশকাত ১৯৮)

আট : সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান।

দ্বীন হিফাজত করার জন্য যেসকল গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপগুলো নেওয়া হয়েছে তার মধ্যে আরেকটি বিষয় হলো সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদান করাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

'আর যেন তোমাদের মধ্য থেকে এমন একটি দল হয়, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান করবে, ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারাই সফলকাম।' (আল ইমরান ৩:১০৪)

অপর আয়াতে সৎ কাজের আদেশ ও অসৎ কাজে বাধা প্রদানকে এই উম্মাতের শ্রেষ্ঠত্বের বিশেষ কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

'তোমরা হলে সর্বোত্তম উম্মত, যাদের মানুষের জন্য বের করা হয়েছে। তোমরা ভালো কাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে, আর আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে। আর যদি আহলে কিতাব ঈমান আনত, তবে অবশ্যই তা তাদের জন্য কল্যাণকর হত। তাদের কতক ঈমানদার। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।' (আল ইমরান ৩:১১০)

অপর আয়াতে মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করাকে কোনো ব্যক্তির কথা উত্তম হওয়ার সনদ দেওয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ

'আর তার চেয়ে কার কথা উত্তম, যে আল্লাহর দিকে দাওয়াত দেয়, সৎকর্ম করে এবং বলে, অবশ্যই আমি মুসলিমদের মধ্য থেকে একজন' (ফুসসিলাত ৪১:৩৩)

এই দাওয়াতের কাজ বিরতিহীনভাবে করার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উদ্দেশ্য করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا

নিশ্চয়ই তোমার জন্য দিনের বেলায় রয়েছে দীর্ঘ সাতার। (মুজ্জাম্মিল ৭৩:৭)

এখানে সাঁতার বলা হয়েছে এই জন্য যে, সাঁতার কাটতে গেলে একদিকে হাত-পা নাড়তে হয়। অপরদিকে তা বিরতিহীনভাবে করতে হয়। যদি হাত পা নাড়া বন্ধ করা হয় তাহলে ডুবে মারা যাবে। ঠিক তেমনিভাবে ইসলামের দাওয়াতের কাজও সর্বদা বিরতিহীনভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ

'আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের কেউ যখন কোনো অন্যায় কাজ দেখবে তাহলে সে যেন তাকে হাত দ্বারা প্রতিহত করে। আর যদি তা করতে সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন মুখ দ্বারা বাধা প্রদান করে। আর যদি তাও সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন অন্তর দ্বারা তা প্রতিহত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। আর এটা হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর।' (সহীহ মুসলিম ১৮৬, আবু দাউদ ১১৪২, নাসায়ী ৫০২৩, ইবনে মাজাহ ৪০১৩, মুসনাদে আহমাদ ১১১৫০, ১১৪৬০, বায়হাকী ১১৮৪৭, মেশকাত ৫১৩৭)

নয় : জিহাদ ফরজকরণ।

দ্বীন হিফাজতের জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে আরেকটি হলো আল্লাহর পথে যুদ্ধ-জিহাদ করাকে ফরজ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

'তোমাদের ওপর যুদ্ধ করা ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয় এবং হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা অপছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হতে পারে কোনো বিষয় তোমরা পছন্দ করছ অথচ তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।' (বাকারা ২:২১৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে আরো বলেন–

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

'তোমরা যুদ্ধ করো আহলে কিতাবের সে সব লোকের সাথে যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে ঈমান রাখে না এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুল যা হারাম করেছেন তা হারাম মনে করে না, আর সত্য দ্বীন গ্রহণ করে না, যতক্ষণ না তারা স্বহস্তে নত হয়ে জিযয়া দেয়।' (তাওবা ৯:২৯)

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা তোমাদের নিকটবর্তী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো এবং তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকিদের সাথে আছেন।' (তাওবা ৯:১২৩)

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ

'আর তোমরা তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যতক্ষণ না ফিতনার (শিরক) অবসান হয় এবং দ্বীন পূর্ণরূপে আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। (আনফাল ১০:৩৯)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ

'আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো যে পর্যন্ত না ফিতনা (শিরক) খতম হয়ে যায় এবং দ্বীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। (বাকারা ২:১৯৩)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মুমিনদের ক্বিতাল এর জন্য উদ্বুদ্ধ করতে বলেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ

'হে নবী, তুমি মুমিনদের লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করুন।' (আনফাল ৮:৬৫)

দশ : মুরতাদদের হত্যাকরণ।

দ্বীন হিফাজতের জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হেয়েছে তার মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো মুরতাদদের হত্যা করা। যারা ইসলাম গ্রহণ করার পরে কোনো কারণে আবার ইসলাম ত্যাগ করে কাফির ও মুরতাদ হয়ে যায় তাদের হত্যা করতে বলা হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

'ইকরামা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আলী (রা.) এর কাছে কতিপয় জিন্দিককে ধরে নিয়ে আসা হলো, তিনি তাদের আগুনে পুড়ে মেরে ফেললেন। এই খবর ইবনে আব্বাস (রা.) এর কছে পৌঁছার পর তিনি বললেন, যদি আলী (রা.) এর স্থলে আমি হতাম তাহলে তাদের আগুনে পুড়ে হত্যা করতাম না। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, তোমরা মানুষদের আল্লাহর শাস্তি (আগুন) দ্বারা শাস্তি দিও না। অবশ্য আমি তাদের হত্যা করতাম। কেননা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে তার দ্বীন (ইসলাম) কে পরিবর্ত করে তাকে তোমরা হত্যা করো'।' (সহীহ বুখারী ৬৯২২, তিরমিযী ১৪৫৮, আবু দাউদ ৪৩৫৩)

মুরতাদরা সাধারণ কাফিরদের চেয়েও মারাত্মক। কারণ তারা ইসলাম গ্রহণ করার পরে তা ত্যাগ করার কারণে ইসলামকে অপমান করছে। এ কারণেই তাদের হত্যার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরা পরকালেও চিরস্থায়ী জাহান্নামী হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

'আর যে তোমাদের মধ্য থেকে তাঁর দ্বীন থেকে ফিরে যাবে, অতঃপর কাফির অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, বস্তুত এদের আমলসমূহ দুনিয়া ও আখিরাতে বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং তারাই আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।' (বাকারা ২:২১৭)

এগার : দ্বীন হিফাজতের জন্য প্রয়োজনে অন্য জাতি সৃষ্টি করা।

দ্বীন হিফাজত করার জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো দ্বীন হিফাজতের জন্য নতুন প্রজন্ম সৃষ্টি করা। কেহ যদি ইসলাম ত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যায় তাতে আল্লাহর কিছু আসে যায় না। এমনকি পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি আল্লাহর দ্বীন থেকে মুরতাদ হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাদের ধ্বংস করে দিয়ে অন্য জাতি সৃষ্টি করবেন। যারা আল্লাহর দ্বীন হিফাজত এর জন্য কাজ করবে এবং নিম্নের আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

'হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার দ্বীন থেকে ফিরে যাবে তাহলে অচিরেই আল্লাহ এমন কওমকে আনবেন, যাদের তিনি ভালোবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালোবাসবে। তারা মুমিনদের ওপর বিনম্র এবং কাফিরদের ওপর কঠোর হবে। আল্লাহর রাস্তায় তারা জিহাদ করবে এবং কোনো কটাক্ষকারীর কটাক্ষকে ভয় করবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তিনি তাকে তা দান করেন। আর আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।' (মায়িদা ৫:৫৪)

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে–

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আজাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। (তাওবা ৯:৩৯)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্পষ্ট বলে দিলেন যে, তোমরা যদি দ্বীন হিফাজতের জন্য যুদ্ধ করতে বের না হয় তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের ধ্বংস করে এমন জাতি সৃষ্টি করবেন যারা আল্লাহর দ্বীনের জন্য জান-মাল উৎসর্গ করবে। পবিত্র কুরআনে আরেকটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرَضِيتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ – إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কী হলো, যখন তোমাদের বলা হয়, আল্লাহর রাস্তায় (যুদ্ধে) বের হও, তখন তোমরা জমিনের প্রতি প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়? তবে কি তোমরা আখিরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে সন্তুষ্ট হলে? অথচ দুনিয়ার জীবনের ভোগ-সামগ্রী আখিরাতের তুলনায় একেবারেই নগণ্য। যদি তোমরা (যুদ্ধে) বের না হও, তিনি তোমাদের বেদনাদায়ক আজাব দেবেন এবং তোমাদের পরিবর্তে অন্য এক কওমকে আনয়ন করবেন, আর তোমরা তাঁর কিছুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।' (তাওবা ৯:৩৮-৩৯)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ

'যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে তিনি তোমাদের ছাড়া অন্য কোনো কওমকে স্থলাভিষিক্ত করবেন। তারপর তারা তোমাদের অনুরূপ হবে না।' (মুহাম্মাদ ৪৭:৩৮)

বার : আল্লাহর দুশমনদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার নির্দেশ প্রদান।

দ্বীন হিফাজতের জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো 'আল ওয়ালা ওয়াল বরাআহ' এর

নির্দেশ প্রদান। অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাদের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করা এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুলের দুশমনদের থেকে বারা'আহ বা সম্পর্কচ্ছেদ করা। যাতে কাফের-মুশরিক, মুনাফিক, বেদ'আতীরা মুমিনদের সাথে মিশে গিয়ে দ্বীনকে ধংস করার ষড়যন্ত্র করতে না পারে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

'হে মুমিণগণ! তোমরা ইহুদি ও খ্রিস্টানদের বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে যে তাদের সাথে বন্ধুত্ব করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্ জালেমদের পথ প্রদর্শন করেন না। (মায়েদা ৫:৫১)

এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা কিতাবুল আক্বাঈদে 'আল ওয়ালা ওয়াল বারাআহ' অধ্যায় থেকে দলিল প্রমাণগুলো দেখে নেয়া যেতে পারে।

তের : তাওবাহ এর সুযোগ প্রদান।

দ্বীন হিফাজতের জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হলো পাপীদের জন্য তাওবাহ-এর দরজা খোলা রাখা। মানুষ যত বড় অন্যায় করুক যদি খালিস দিলে আল্লাহর নিকট তাওবাহ করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তাকে ক্ষমা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এমনকি সারা জীবন অন্যায় করে যদি মৃত্যুর আগেও তাওবাহ করে তবুও তাকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ক্ষমা করে দিবেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا

'আর যে ব্যক্তি মন্দ কাজ করবে কিংবা নিজের প্রতি জুলুম করবে তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইবে, সে আল্লাহকে পাবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (নিসা ৪:১১০)

কোনো নিরাশ হওয়া যাবে না। চাই সে যত বড় অন্যায় করুক না কেনো। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'বলো, 'হে আমার বান্দাগণ! যারা নিজেদের ওপর বাড়াবাড়ি করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। অবশ্যই আল্লাহ সকল পাপ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'।' (যুমার ৩৯:৫৩)

অনেকে হয়তো পাপ করে ভয় করতে থাকে যে, আমি এত বড় পাপী আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করবেন কিনা? সেজন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পাপীদের অভয় দিয়ে ইরশাদ করেছেন−

نَبِّئْ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

'আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, আমি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (হিজর ১৫:৪৯)

এ প্রসঙ্গে আরো একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে−

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ

'আর তোমাদের রব বলেছেন, 'তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের জন্য সাড়া দেব। নিশ্চয়ই যারা অহঙ্কার বশত আমার ইবাদত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (মুমিন ৪০:৬০)

অনেকে মনে করতে পারে হয়তো আল্লাহ তা'আলা আমাদের ডাক শুনেন না। তাদের এ সংশয় নিরসনকল্পে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন−

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

'আর আমি তার গলার ধমনী হতেও অধিক কাছে।' (ক্বাফ ৫০:১৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেন−

فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

সুতরাং তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও, সে দিকেই আল্লাহর চেহারা। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (বাকারা ২:১১৫)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে−

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ

'ইবনে উমর থেকে বর্নিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা বান্দার তওবাকে গ্রহণ করেন যতক্ষণ পর্যন্ত মুমূর্ষ অবস্থায় না পৌছে।' (মুসনাদে আহমাদ ১৫৫৩৮, ৬১৬০, ৬৪০৮, মেশকাত ২৩৪৩, তিরমিযী ২০৮, ৩৫৩৮)

দুই : জানের হিফাজত (হিফজুন নাফ্‌স)

মানব জীবনের যেসকল মৌলিক বিষয়ের হিফাজত করার জন্য ইসলাম গুরুত্বারোপ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো 'হিফজুন নাফ্‌স' বা জীবনের নিরাপত্তা। এটা সকলের কাছেই গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এজন্য অনেকেই স্লোগান দেয় স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চাই। অথচ তাদের কাছে এজন্য সুনির্দিষ্ট কোনো পদক্ষেপ নাই। ইসলাম ধর্ম-ই হলো একমাত্র দ্বীন, যেখানে গুরুত্ব সহকারে জীবনের নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। আর এজন্য রয়েছে ইসলামে অনেকগুলো বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ। নিম্নে সেগুলো ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা হলো।

এক : কিসাস।

জীবনের নিরাপত্তার জন্য ইসলাম যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে অন্যতম হলো 'কিসাস'। কেউ যদি কাউকে সেচ্ছায়, স্বজ্ঞানে হত্যা করে তাহলে তাকেও তার বিনিময়ে হত্যা করার বিধান দেয়া হয়েছে। পবিত্র কুরআনের ভাষায় এটাকেই কিসাস বলা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

'হে মুমিনগণ! নিহতদের ব্যাপারে তোমাদের ওপর 'কিসাস' ফরয করা হয়েছে। স্বাধীনের বদলে স্বাধীন, দাসের বদলে দাস, নারীর বদলে নারী। তবে যাকে কিছুটা ক্ষমা করা হবে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে, তাহলে সততার অনুসরণ করবে এবং সুন্দরভাবে তাকে আদায় করে দেবে। এটি তোমাদের রবের পক্ষ থেকে হালকাকরণ ও রহমত। সুতরাং এরপর যে

সীমালঙ্ঘন করবে, তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আজাব। আর হে বিবেকসম্পন্নগণ, কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন, আশা করা যায় তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করবে।' (বাক্বারা ২:১৭৮)

এ আয়াতে কিসাসের বিধান বর্ণনা করা হয়েছে। সাথে সাথে বলা হয়েছে, 'কিসাসে রয়েছে তোমাদের জন্য জীবন'। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ বাক্য। কেননা এর মাধ্যমে কিসাসের উপকারিতা তুলে ধরা হয়েছে। কিসাসের বিধান প্রতিষ্ঠীত হলে মানুষ মানুষকে হত্যা করা থেকে বিরত হবে। হত্যাকারী যখন নিশ্চিতভাবে জানবে যে, কাউকে হত্যা করলে তাকেও হত্যা করা হবে এবং নিহত ব্যক্তির ওয়ারিশরা ব্যতীত কেউ তা ক্ষমা করতে পারবে না, এমনকি দেশের প্রেসিডেন্টও নয়, তখন সে তার কাঙিক্ষত ব্যক্তিকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। এভাবেই দুটি জীবন রক্ষা পাবে। মানবরচিত আইনে যদিও হত্যার বিনিময়ে হত্যার বিধান রয়েছে, কিন্তু, সেখানে আল্লাহর বিধানের পরিবর্তে দেশের প্রেসিডেন্টকে ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে। যেমন বাংলাদেশে সংবিধানের প্রেসিডেন্টের ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার অধ্যায়ে একথা উল্লেখ রয়েছে– 'কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত যে কোনো দণ্ডের মার্জনা, বিলম্বনা ও বিরাম মঞ্জুর করবার এবং যে কোনো দণ্ড মওকুফ, স্থগিত বা হ্রাস করবার ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির থাকবে'। আর এ কারণেই আমাদের সমাজে খুন, গুম, হত্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

অঙ্গের বিনিময়ে অঙ্গ :

শুধু হত্যা নয়, কেহ যদি কারও অঙ্গ কর্তন করে তাহলে তারও সে অঙ্গ কর্তন করতে হবে। এটা হলো অঙ্গহানীর বিনিময়ে অঙ্গহানী করার কিসাস। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'আর আমি এতে তাদের ওপর অবধারিত করেছি যে, প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ, চোখের বিনিময়ে চোখ, নাকের বিনিময়ে নাক, কানের বিনিময়ে কান ও দাঁতের বিনিময়ে দাঁত এবং জখমের বিনিময়ে সমপরিমাণ জখম।

অতঃপর যে তা ক্ষমা করে দেবে, তার জন্য তা কাফ্ফারা হবে। আর আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে যারা ফয়সালা করবে না, তারাই জালিম।' (মায়িদা ৫:৪৫)

দুই : চিরস্থায়ী জাহান্নাম।

হত্যার বিনিময়ে উপরোল্লিখিত কিসাসের সাথে সাথে পরকালীন শাস্তির বিধানও রাখা হয়েছে। কেউ যদি কোনো মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তার জন্য চিরস্থায়ী জাহান্নামের শাস্তি ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا

'আর যে ইচ্ছাকৃত কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তার প্রতিদান হচ্ছে জাহান্নাম, সেখানে সে স্থায়ী হবে। আর আল্লাহ তার ওপর ক্রুদ্ধ হবেন, তাকে লা'নত করবেন এবং তার জন্য বিশাল আজাব প্রস্তুত করে রাখবেন।' (নিসা ৪:৯৩)

এ আয়াতে খুবই ভয়াবহ সতর্কবাণী রয়েছে। কেননা একদিকে চিরস্থায়ী জাহান্নাম অপরদিকে আল্লাহর গজব, লা'নত ও কঠিন শাস্তির হুমকি প্রদান করা হয়েছে।

মানব হত্যার ব্যাপারে আল কুরআনের স্বকীয়তা :

মানব হত্যার ব্যাপারে কম বেশি সকল ধর্মগ্রন্থেই সাবধান করা হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কুরআনে যেভাবে সাবধান করা হয়েছে সেভাবে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা কোনো লিখিত গ্রন্থে করা হয় নাই। এমনকি কোনো ধর্মীয় গ্রন্থেও নয়। এটা পবিত্র কুরআনেরই স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। কেননা পবিত্র কুরআনে কোনো মানুষকে হত্যা করলে গোটা মানবজাতিকে হত্যার সমান অপরাধ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পক্ষান্তরে কোনো মানুষকে হত্যার হাত থেকে বাঁচানোকে গোটা মানবজাতিকে বাঁচানোর সমান বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا المائدة/৩২

‘যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করা কিংবা জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করা ছাড়া যে কাউকে হত্যা করল, সে যেন সব মানুষকে হত্যা করল। আর যে তাকে বাঁচাল, সে যেন সব মানুষকে বাঁচাল।’ (মায়িদা ৫:৩২)

তিন : দিয়াত।

ইচ্ছাকৃত হত্যা করলে তার শাস্তি যেমন পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনিভাবে অনিচ্ছাকৃতভাবে বা ভুলক্রমে কাউকে হত্যা করে ফেলে তাহলে তার জন্য ‘দিয়াত’ এর বিধান রাখা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

‘আর কোনো মুমিনের কাজ নয় অন্য মুমিনকে হত্যা করা, তবে ভুলবশত (হলে ভিন্ন কথা)। যে ব্যক্তি ভুলক্রমে কোনো মুমিনকে হত্যা করবে, তাহলে একজন মুমিন দাসকে মুক্ত করতে হবে এবং দিয়াত (রক্ত পণ দিতে হবে) যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিজনদের কাছে। তবে তারা যদি সদাকা (ক্ষমা) করে দেয় (তাহলে দিতে হবে না)। আর সে যদি তোমাদের শত্রু কাওমের হয় এবং সে মুমিন, তাহলে একজন মুমিন দাস মুক্ত করবে। আর যদি এমন কাওমের হয় যাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সন্ধিচুক্তি রয়েছে তাহলে দিয়াত দিতে হবে, যা হস্তান্তর করা হবে তার পরিবারের কাছে এবং একজন মুমিন দাস মুক্ত করতে হবে। তবে যদি না পায় তাহলে একাধারে দু’মাস সিয়াম পালন করবে। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে ক্ষমাস্বরূপ। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।’ (নিসা ৪:৯২)

চার : আক্রমনের মোকাবেলা করা।

জীবনের নিরাপত্তার জন্য আরেকটি পদক্ষেপ হলো শত্রুপক্ষের হামলার মোকাবিলা করা। কেউ যদি কারো ওপর আক্রমণ করে তা প্রতিহত করার জন্য বিধান রাখ হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُتِلَ دُونَ أَهْلِهِ أَوْ دُونَ دَمِهِ أَوْ دُونَ دِينِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

‘সাইদ ইবন যায়েদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় তবে সে শহীদ। যদি কেউ তার পরিবার রক্ষার্থে নিহত হয় তবে সে শহীদ। যদি কেউ নিজের জীবন রক্ষার্থে নিহত হয় তবে সে শহীদ। যদি কেউ তার দ্বীন রক্ষার্থে নিহত হয় তবে সে শহীদ।’ (তিরমিযী ১৪২১, আবু দাউদ ৪৭৭৪, নাসায়ী ৪১০৬, মুসনাদে আহমাদ ১৬৩৯, মেশকাত ৩৫২৯)

এমনিভাবে যখন মুমিনদের দুটি দল মারামারি ও যুদ্ধ-বিগ্রহ করার জন্য মুখোমুখি হয়, তখন তা মীমাংসা করে দেওয়ার জন্য নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

‘আর যদি মুমিনদের দু’দল যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তাহলে তোমরা তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। অতঃপর যদি তাদের একদল অপর দলের ওপর বাড়াবাড়ি করে, তাহলে যে দলটি বাড়াবাড়ি করবে, তার বিরুদ্ধে তোমরা যুদ্ধ করো, যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। তারপর যদি দলটি ফিরে আসে তাহলে তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে মীমাংসা করো এবং ন্যায়বিচার করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়বিচারকারীদের ভালোবাসেন।’ (হুজরাত ৪৯:৯)

পাঁচ : আত্মহত্যা হারাম।

জীবনের নিরাপত্তার জন্য ইসলামে আত্মহত্যা করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

‘আর তোমরা নিজেরা নিজদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু। (নিসা ৪:২৯)

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

'এবং নিজ হাতে নিজদের ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না। আর সুকর্ম করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুকর্মশীলদের ভালোবাসেন।' (বাক্বারা ২:১৯৫)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ يَتَرَدَّى فِيهِ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَحَسَّى سُمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَسُمُّهُ فِي يَدِهِ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِي يَدِهِ يَجَأُ بِهَا فِي بَطْنِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন– যে ব্যক্তি নিজেকে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে আত্মহত্যা করল সে ব্যক্তি জাহান্নামে চিরস্থায়ীভাবে পাহাড় থেকে নিজেকে ফেলে দিতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি বিষপানে আত্মহত্যা করলো সে ব্যক্তি জাহান্নামে চিরকাল বিষপান করতে থাকবে। আর যে ব্যক্তি ধারালো অস্ত্র দিয়ে আত্মহত্যা করলো তার ধারালো অস্ত্রটি তার হাতে থাকবে। যার দ্বারা সে জাহান্নামে চিরকাল নিজ পেটে আঘাত করতে থাকবে।' (বুখারী ৫৭৭৮, মুসলিম ৩১৩, তিরমিযী ২০৪৪, আবু দাউদ ৩৮৭৪, নাসায়ী ১৯৬৪, ইবনে মাজাহ ৩৪৬০, মুসনাদে আহমাদ ৭৪৪৮)

ছয় : চিকিৎসা গ্রহণ।

জীবনের নিরাপত্তার জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে আরেকটি হলো রোগ হলে চিকিৎসা গ্রহণ করা বৈধকরণ। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهُ قَالَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءُ الدَّاءِ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

'জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রত্যেক রোগের-ই ওষুধ রয়েছে যখন কোনো রোগের ওষুধ যথাযথ রোগের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় তখন আল্লাহর ইচ্ছায়

সে সুস্থ হয়ে যায়।' (সহীহ মুসলিম-৫৮৭১, মুসনাদে আহমাদ ১৪৫৯৭, বায়হাকী ২০০৪২, মেশকাত ৩৫১৫)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। তৎকালীন সময়ের প্রসিদ্ধ চিকিৎসা হাজামত (শিঙ্গা লাগানো) এর মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ وَلَوْ عَلِمَ كَرَاهِيَةً لَمْ يُعْطِهِ

'আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিঙ্গা লাগিয়েছেন এবং শিঙ্গা লাগানেওয়ালাকে বিনিময় (মুজরী) দিয়েছেন। যদি অপছন্দনীয় হতো তাহলে তিনি এটা করতেন না।' (সহীহ বুখারী-২২৭৯, ২২৭৮, মুসলিম ৪১২৪, ৫৮৭৯, আবু দাউদ ৩৪২৫, মুসনাদে আহমাদ ১১২৯)

সাত : ক্ষতিকর বস্তু হারামকরণ।

জীবনের নিরাপত্তার জন্য ইসলাম যে সমস্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে তার মধ্যে আরেকটি হলো মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর সকল বস্তু হারাম ঘোষণা করা। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

'তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে।' (আ'রাফ ৭:১৫৭)

এ আয়াতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর মৌলিক দায়িত্ব সমূহের মধ্য থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে যে, তিনি পবিত্র জিনিসকে হালাল ঘোষণা করবেন। আর অপবিত্র জিনিসকে হারাম ঘোষণা করবেন। একারণে পবিত্র কুরআনের অপর আয়াতে মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর কতগুলো বস্তুকে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ

'তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত ও শূকরের গোশত এবং যা আল্লাহ ভিন্ন কারো নামে জবেহ করা হয়েছে; গলা চিপে মারা জন্তু, প্রহারে মরা জন্তু, উঁচু থেকে পড়ে মরা জন্তু অন্য প্রাণীর শিঙের আঘাতে মরা জন্তু এবং যে জন্তু, হিংস্র প্রাণী খেয়েছে তবে যা তোমরা জবেহ করে নিয়েছ তা ছাড়া, আর যা মূর্তি পূঁজার বেদিতে বলি দেয়া হয়েছে এবং জুয়ার তীর দ্বারা বণ্টন করা হয়, এগুলো গুনাহ। (মায়েদা ৫:৩)

আট : ধূমপান হারাম।

জীবনের নিরাপত্তার জন্য যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে আরেকটি হলো স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সকল বস্তু হারাম ঘোষণা করা। আর ক্ষতিকর বস্তুর মধ্যে বর্তমান আধুনিক যুগে একটি মারাত্মক বস্তু হলো ধূমপান। যা সর্বজন স্বীকৃত। এমনকি খোদ বিড়ি-সিগারেটের গায়েও লেখা থাকে, 'ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।' আর ক্ষতিকর বস্তু খাওয়া বা পান করা হারাম। অতএব ধূমপান করা ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ রূপে হারাম। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগে এই ধূমপান পদ্ধতি না থাকার কারণে শরী'আতের বিধান বর্ণনা করতে গিয়ে অনেকে বিভ্রান্তির স্বীকার হয়েছেন। কেউ এটাকে মাকরূহ বলেছেন। কেউ মাকরূহ তাহরীমি বলেছেন। আবার কেউ সরাসরি হারাম বলেছেন। আর এই সর্বশেষ মতটিই সঠিক। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীস থেকে দলিল সমূহ নিম্নে পেশ করা হলো।

১. ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর

ধূমপান স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, এটা সর্বজনস্বীকৃত। পৃথিবীর সকল সভ্য ও জ্ঞানী লোকেরা ধূমপানকে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর বলে আখ্যায়িত করেছে। এ কারণে বিড়ি-সিগারেটের গায়ে লেখা থাকে 'ধূমপানে মৃত্যু ঘটে, ধূমপানে স্ট্রোক হয়, ধূমপানে যক্ষা হয়, ধূমপানে বিষপান' ইত্যাদি। আর পবিত্র কুরআনের উসূল অনুযায়ী মানব দেহের জন্য ক্ষতিকর সকল বস্তু হারাম।

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

'তাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করে আর অপবিত্র বস্তু হারাম করে।' (আ'রাফ ৭:১৫৭)

অতএব ধূমপান করা হারাম।

২. ধূমপান আত্মহত্যার শামিল

ধূমপান মানুষকে আস্তে আস্তে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। আর মৃত্যুর দিকে নিজেকে ঠেলে নিয়ে যাওয়া হারাম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

'এবং নিজ হাতে নিজদের ধ্বংসে নিক্ষেপ করো না।' (বাকারা ২:১৯৫)

যেহেতু আত্মহত্যা করা হারাম সেহেতু ধীরে ধীরে যে জিনিস কোনো মানুষকে মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায় সেটাও হারাম। অতএব ধূমপান করা হারাম। আত্মহত্যা করা হারাম হওয়া প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

'আর তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।' (নিসা ৪:২৯)

৩. ধূমপান অপচয়

ধূমপান করা অপচয়, কেননা ধূমপানে না খাদ্যের প্রয়োজন মিটায় না পানির প্রয়োজন মিটায়। না অন্য কোনো উপকার করে। আর যেটা কোনো উপকার করে না নিশ্চয়ই সেটা অপচয়। আর অপচয়কারীকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা শয়তানের ভাই বলে ঘোষণা করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

'আর তোমরা অপচয় করো না। নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।' (বণী ইসরাঈল ১৭:২৭)

এ আয়াতে একদিকে যেমন অপচয় করা হারাম ঘোষনা করা হয়েছে। অপরদিকে অপচয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আর যে কাজ করলে মানুষ শয়তানের ভাই হয়ে যায় সেটা অবশ্যই হারাম। অতএব ধূমপান করা হারাম।

৪. ধূমপান একটি খবিস কাজ

ধূমপান একটি খবিস (মন্দ) কাজ, আর যত খবিস কাজ রয়েছে ইসলামে তা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

'এবং তাদের জন্য উত্তম বস্তু হালাল করে আর নিকৃষ্ট বস্তু হারাম করে।' (আ'রাফ ৭:১৫৭)

৫. ধূমপান দুর্গন্ধযুক্ত এবং কষ্টদায়ক

ধূমপান দুর্গন্ধযুক্ত এবং মানুষের জন্য কষ্টদায়ক। যারা ধূমপান করে না তাদের কাছে এটা খুবই কষ্টদায়ক। আর মানুষকে কষ্ট দেওয়া হারাম। অতএব ধূমপান করাও হারাম। কাঁচা পিয়াজ, রসুন ও মূলা জাতীয় তরকারিতে সামান্য দুর্গন্ধ রয়েছে। যা ধূমপানের চেয়ে অনেক কম। কিন্তু যেহেতু এগুলো খেলে মানুষ কষ্ট পায় তাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁচা পিয়াজ, রসুন ও দুর্গন্ধযুক্ত কাঁচা কোনো তরকারি খেয়ে মসজিদে আসতে বারণ করেছেন। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ قَالَ أَوَّلَ يَوْمٍ الثُّومِ ثُمَّ قَالَ الثُّومِ وَالْبَصَلِ وَالْكُرَّاثِ فَلَا يَقْرَبْنَا فِي مَسَاجِدِنَا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ الْإِنْسُ

'জাবের থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি কাঁচা পিয়াজ, রসুন, কুর্‌রাছ (দুর্গন্ধময় এক জাতীয় সবজি তরকারি) খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটেও না আসে। কেননা নিশ্চয়ই মানুষ যাতে কষ্ট পায় মালায়েকাহ (ফেরেশতা)গণও তাতে কষ্ট পান। (বুখারী ৮৫৪, ৮৫৫, মুসলিম ১২৭৬, ১২৭৭, আবু দাউদ ৩৮২৭)

ধূমপানের দুর্গন্ধ অধূমপায়ীদের জন্য আরো বেশি কষ্টকর। অতএব ধূমপান করাও হারাম।

৬. ধূমপানকারী বেঈমান হয়ে মারা যাওয়ার আশঙ্কা আছে

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الْبَقْلَةِ الثُّومِ – وَقَالَ مَرَّةً مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّومَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ

'জাবের থেকে বর্ণিত রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন– যে ব্যক্তি কাঁচা পিয়াজ, রসুন, কুর্‌রাছ (দুর্গন্ধময় মূলা জাতীয় এক প্রকার তরকারি) খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের নিকটেও না আসে। কেননা মানুষ যাতে কষ্ট পায় ফেরেস্তারাও তাতে কষ্ট পায়।' (মুসলিম ১২৮২, নাসায়ী ৭০৬, মুসনাদে আহমাদ ১৫০১৪, মেশকাত ৫২৫৫)

অতএব, ধূমপায়ীর নিকট আল্লাহর রহমতের ফেরেস্তারা আসবে না। সুতরাং মৃত্যুর সময় শয়তানের খপ্পরে পরে বেঈমান হয়ে মারা যাওয়ার আশঙ্কা খুবই প্রবল।

৭. ধূমপানকারী জাহান্নামীদের সাথে সাদৃশ্যতা রাখে। কারণ জাহান্নামীদের নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের হবে। আর ধূমপায়ীদের নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের হয়। আর দুনিয়াতে যে যার সাথে মিল রাখবে আখিরাতে তার সাথে তার হাশর হবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

'ইবনে উমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের সাথে সাদৃশ্যতা রাখে সে ঐ সম্প্রদায়েরই একজন।' (সুনানে আবু দাউদ ৪০৩৩, মেশকাত ৪৩৪৭)

সুতরাং ধূমপানকারী জাহান্নামীদের সাথে মিল রাখার কারনে সে নিজেও জাহান্নামীদের একজন। আর যে কাজ করলে মানুষ জাহান্নামে যায় সে কাজটি হারাম।

৮. ধোঁয়া আল্লাহর আজাব তথা কিয়ামতের লক্ষণ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ

'যেদিন স্পষ্ট ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন হবে আকাশ।' (দুখান ৪৪:১০)

ধূমপানকারীরা নাক-মুখ দিয়ে ধোঁয়া বের করে আল্লাহর গযব কেই আহ্বান করে।

৯. ধুমপানের কারণে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি লোপ পায়। অথচ আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞান বুদ্ধি সংরক্ষণ করা ফরজ। নষ্ট করা হারাম। এই কারণেই মদকে হারাম করা হয়েছে। কারণ তা মানুষের বিবেক-বুদ্ধি নষ্ট করে দেয়।

১০. ধুমপানের কারনে ধূমপানকারীর ঠোটের সৃষ্টিগত রূপ বিকৃত হয়ে যায়। আর কোনো অঙ্গ ইচ্ছাকৃতভাবে বিকৃত করা হারাম এবং শয়তানের কাজ।

وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

'আর অবশ্যই আমি তাদের পথভ্রষ্ট করব, মিথ্যা আশ্বাস দেব এবং অবশ্যই তাদের আদেশ দেব, ফলে তারা পশুর কান ছিদ্র করবে এবং অবশ্যই তাদের আদেশ করব, ফলে অবশ্যই তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবে'। আর যারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে, তারা তো স্পষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হলো।' (নিসা ৪:১১৯)

১১. ধূমপানের কারনে ধূমপানকারীর অভ্যন্তরে ধোঁয়া প্রবেশ করে। আর ধোঁয়া আগুন থেকে সৃষ্টি আর আগুন ভক্ষণ করা হারাম। নিশ্চই আল্লাহ তায়ালা আমাদের খাবারের জন্য আগুন সৃষ্টি করেননি।

১২. ধূমপানকারীরা বাথরুমে গিয়েও ধূমপান করে। বাথরুমের দুর্গন্ধ আর ধূমপানের স্বাদ মিলিয়ে খায় বলেই সিগারেটের বিজ্ঞাপনে লেখা থাকে 'স্বাদে গন্ধে অতুলনীয়।' অথচ বাথরুম হলো মল-মূত্র ত্যাগ করার জায়গা খাবার জায়গা নয়।

তিন : আক্বল-জ্ঞান বা বিবেক-বুদ্ধি হেফাজত করার জন্য ইসলামের বিধান সমুহ

এক : মদপান ও সকল নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম করা হয়েছে।

মানুষের আক্বল-জ্ঞান বা বিবেক-বুদ্ধি আল্লাহ প্রদত্ত বড় একটি নি'আমত। বোকা নির্বোধ ও আহম্মক লোকদের সমাজেও যেমন কোনো গুরুত্ব নেই, ইসলামেও তেমন কোনো গুরুত্ব নেই। এজন্য পবিত্র কুরআনে বারবার জ্ঞানী লোকদের সম্বোধন করা হয়েছে। এই নি'আমতের মূল্যায়ন করা বা সংরক্ষণ করা অত্যন্ত জরুরি। এ কারণেই ইসলামে মদ্যপান করা হারাম করা হয়েছে। যেহেতু তৎকালীন আরব সমাজে মদ্যপানের ব্যাপক প্রচলন ছিলো, তাই মদ্যপান করাকে একবারে হারাম না করে ধাপে ধাপে হারাম করা হয়েছে। প্রথম ধাপে সুস্পষ্টভাবে হারাম ঘোষণা না করে বলা হয়েছে মদের মধ্যে লাভ ও ক্ষতি দুটোই রয়েছে। তবে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, এ দু'টোয় রয়েছে বড় পাপ ও মানুষের জন্য উপকার। আর তার পাপ তার উপকারিতার চেয়ে অধিক বড়। (বাকারা ২:২১৯)

এ আয়াতের মাধ্যমে সাহাবায়ে কিরামগণ জানতে পারলেন মদ্যপানে লাভের চেয়ে ক্ষতি বেশি। তাই অনেকেই মদ্যপান করা ছেড়ে দিলেন। দ্বিতীয় ধাপে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সালাত আদায় করতে এমনকি সালাতের ধারে-কাছে আসতে নিষেধ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ

'হে মুমিনগণ, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তোমরা সালাতের নিকটবর্তী হয়ো না, যতক্ষণ না তোমরা বুঝতে পার যা তোমরা বলো।' (নিসা ৪:৪৩)

এ আয়াতের মাধ্যমে সাহাবায়েকিরাম আরও সতর্ক ও সাবধান হলেন। এমনকি অনেকে মদপান ছেড়েও দিলেন। কেননা যেই জিনিস পান করে সালাতের ধারে-কাছেও আসতে নিষেধ করা হয়েছে সেটা নিশ্চয়ই জঘন্য খারাপ। এভাবে যখন মদের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেলো এবং মদ ছেড়ে দেওয়ার জন্য সকলেই মানসিকভাবে প্রস্তুত ছিলো তখনই তৃতীয় ধাপে মদের ব্যাপারে চূড়ান্ত বিধান নাযিল করা হয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

'হে মুমিনগণ, নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ তো নাপাক শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও। শয়তান শুধু মদ ও জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সঞ্চার করতে চায়। আর (চায়) আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে তোমাদের বাধা দিতে। অতএব, তোমরা কি বিরত হবে না?' (মায়িদা ৫:৯০-৯১)

এখানে আয়াতের শেষে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা প্রশ্ন করেছেন, 'তোমরা কি বিরত হবে না?' সাহাবায়ে কিরাম সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন,

فَقَالَ عُمَرُ: انْتَهَيْنَا، انْتَهَيْنَا

‘নিশ্চয়ই আমরা বিরত হলাম হে আমাদের রব।’ (তাফসীর ইবনে কাসীর আল মায়িদা: ৫:৯০-৯১ তাফসীর দ্রষ্টব্য)

এ আয়াতের মাধ্যমে চূড়ান্তভাবে মদ্যপান করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, বিবেক-বুদ্ধি সংরক্ষণ করার জন্য ইসলামের সর্বপ্রকার নেশা দ্রব্য হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হয়েছে−

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ......فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

‘আবু মূসা আশআরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সকল নেশা জাতীয় দ্রব্য হারাম।’ (বুখারী ৪৩৪৩, ৪৩৪৪, ৪৩৪৫; মুসলিম ৫৩৩২, ৫৩৩৫; আবু দাউদ ৩৬৮৬; ইবনে মাজাহ ৩৩৮৮, ৩৩৮৯, ৩৩৯১, ৩৩৯২; তিরমিযী ১৮৬৩, ১৯২৫, ১৯২৬, ১৯২৮)

দুই : হাদ্দুল খমার।

মদপানকারীর জন্য হদ বা নির্ধারিত শাস্তির বিধান করা হয়েছে−

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ جِيءَ بِالنُّعَيْمَانِ أَوْ ابْنِ النُّعَيْمَانِ شَارِبًا فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ فِي الْبَيْتِ أَنْ يَضْرِبُوا قَالَ فَكُنْتُ أَنَا فِيمَنْ ضَرَبَهُ فَضَرَبْنَاهُ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيدِ

‘উকবা বিন হারেছ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন; নুআইমান অথবা ইবনে নুআইমানকে নিয়ে আসা হলো মদ পানরত অবস্থায়, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘরে উপস্থিত ব্যক্তিদেরকে আদেশ করলেন তাকে প্রহার করার জন্য উকবা বলেন যারা প্রহার করেছিল তদের মধ্যে আমিও একজন এবং আমরা তাকে জুতা এবং খেজুর গাছের ডাল দিয়ে প্রহার করলাম।’ (সহীহ বুখারী ২৩১৬)

তিন : মদের ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ।

মদপান করা ও নেশার মুলোৎপাটন করার উদ্দেশ্যে মদের ব্যবসা করা, বহন করা, তৈরি করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। পবিত্র হাদীসে ইরশাদ হয়েছে−

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ لَعَنَ الْخَمْرَ وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَشَارِبَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَسَاقِيَهَا وَمُسْتَقِيَهَا

‘ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন, আমার নিকট জিব্রাইল (আ.) আসলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! আল্লাহ তা'আলা লা'নত করছেন মদকে, যে মদ নিংরায় তাকে, যার জন্য নিংরানো হয়, যে তা পান করে, যে বহন করে, যার জন্য বহন করা হয়, যে মদ বিক্রি করে, যে পরিবেশন করে, যার জন্য পরিবেশন করা হয় তাদের সকলের ওপর লা'নত।’ (মুসনাদে আহমাদ ৫৮১৬, ইবনে মাজাহ ৩৩৮০, আবু দাউদ ৩২৮২, সহীহ ইবনে হিব্বান-৫৩৫৬)

চার : বংশ হিফাজত করার ক্ষেত্রে ইসলামের বিধান

ইসলামে যেসকল মৌলিক বিষয়গুলো সংরক্ষণ করার প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে তার মধ্যে বংশ হিফাজত করা অন্যতম। কেননা বংশ পরিচয় মানব জাতির জন্য আল্লাহ প্রদত্ত একটি স্বতন্ত্র নি'আমত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বংশ পরিচয়ের কথা উল্লেখ করে অনুগ্রহ প্রকাশ করেছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

‘আর তিনিই পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি তাকে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্কযুক্ত করেছেন। আর তোমার রব হলো প্রভূত ক্ষমতাবান।’ (ফুরকান ২৫:৫৪)

এ আয়াতে বংশের বিষয়টিকে গুরুত্বসহকারে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি মানবজাতির একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এ কারণে এটিকে রক্ষা করা অত্যন্ত জরুরি। আর সেজন্য ইসলামে অনেকগুলো পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে কয়েকটি উল্লেখ করা হলো।

এক : যিনা-ব্যাভিচার ও অবৈধ মেলা-মেশা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

'আর তোমরা ব্যভিচারের কাছে যেয়ো না, নিশ্চয়ই তা অশ্লীল কাজ ও মন্দ পথ।' (বণী ইসরাঈল ১৭:৩২)

দুই : যিনা ব্যভিচারী অবিবাহিত হলে '১০০ দোররা'র বিধান।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

'ব্যভিচারিণী ও ব্যভিচারী তাদের প্রত্যেককে একশ'টি করে বেত্রাঘাত করো। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান এনে থাক তবে আল্লাহর দ্বীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি দয়া যেন তোমাদের পেয়ে না বসে। আর মুমিনদের একটি দল যেন তাদের আজাব প্রত্যক্ষ করে।' (নুর ২৪:২)

এ আয়াতে বিবাহিত অবিবাহিত পার্থক্য করা হয় নাই। কিন্তু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ أَمَرَ فِيمَنْ زَنَى وَلَمْ يُحْصَنْ بِجَلْدِ مِائَةٍ وَتَغْرِيبِ عَامٍ

'যায়েদ ইবনে খালেদ (রা.) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি অবিবাহিত যিনাকারীকে একশত বেত্রঘাত এবং এক বৎসরের জন্য দেশান্তর করার নির্দেশ দিতেন।' (সহীহ বুখারী ২৬৪৯)

তিন : যিনা-ব্যভিচারী বিবাহিত হলে 'রজম বা পাথর ছুড়ে হত্যা'র বিধান

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ مُحَمَّدًا –صلى الله عليه وسلم– بِالْحَقِّ وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْكِتَابَ فَكَانَ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةُ الرَّجْمِ قَرَأْنَاهَا وَوَعَيْنَاهَا وَعَقَلْنَاهَا فَرَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ فَأَخْشَى إِنْ طَالَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ مَا نَجِدُ

الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ وَإِنَّ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ حَقٌّ عَلَى مَنْ زَنَى إِذَا أَحْصَنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ الْحَبَلُ أَوْ الاعْتِرَافُ

'ওমর (রা.) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মিম্বরের ওপর বসা অবস্থায় বলেন যে, আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য সহ প্রেরণ করেছেন এবং তার ওপর কিতাব নাযিল করেছেন আর তার ওপর যে সমস্ত আয়াত নাযিল করা হয়েছিল তার মধ্যে রজমের আয়াতও ছিল আমরা তা পড়েছি, মুখস্ত করেছি এবং অনুধাবন করেছি এবং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার জীবদ্দশায় রজমের আয়াত বাস্তবায়ন করেছেন এবং তার পরে আমরাও করেছি তবে আমি ভয় পাচ্ছি যে, দীর্ঘকাল পরে এমন একটি সময় আসবে যে, লোকেরা বলবে; 'আমরা আল্লাহর কিতাবে রজমের বিষয়ে কোনো আয়াত পাইনি'। পরবর্তীতে তারা পথভ্রষ্ট হবে আল্লাহ তা'আলার নাযিল কৃত ফরজ বিধান পরিত্যাগ করার কারণে। নিশ্চয়ই আল্লাহর কিতাবের বিধান রজম প্রতিষ্ঠিত করা হবে ঐ সমস্ত পুরুষ এবং মহিলার ওপর যারা বিবাহের পর যিনায় লিপ্ত হবে এবং তাদের এই যিনা দলিলের মাধ্যমে প্রমাণিত হবে অথবা মহিলার গর্ভ প্রকাশিত হবে অথবা তাদের কেউ সেচ্ছায় স্বীকারোক্তি দিবে।' (সহীহ বুখারী-৪৫১৩)

ইসলামে যিনা-ব্যভিচারে উৎসাহ প্রদানকারী সকল কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছ। এজন্য বিবাহে উৎসাহ প্রাদান করা হয়েছে, দাসীদের বিয়ে করার বিধান দেয়া হয়েছে। মহিলাদের পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে। মহিলাদের আকর্ষণীয় কণ্ঠে পর পুরুষদের সাথে কথা বলা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে, চক্ষু নিচু রাখতে বলা হয়েছে, প্রবেশের পূর্বে অনুমতির বিধান দেয়া হয়েছে। বেগানা মহিলার সাথে নির্জনে বা একান্তে সাক্ষাত করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। বৈবাহিক জীবনে ক্ষতির আশঙ্কা করলে 'তালাক' ও 'খোলা' করার বিধান রাখা হয়েছে।

চার : বিবাহে উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً

'তোমরা বিয়ে করো নারীদের মধ্যে যাকে তোমাদের ভালো লাগে; দু'টি, তিনটি অথবা চারটি। আর যদি ভয় করো যে, তোমরা সমান আচরণ করতে পারবে না, তবে একটি।' (নিসা ৪:৩)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পছন্দনীয় নারীদের বিয়ে করতে বলেছেন এবং প্রয়োজন হলে চারটি পর্যন্ত বিয়ে করার অনুমতি দিয়েছেন। আরো লক্ষণীয় বিষয় হলো এ আয়াতে শুরুই করা হয়েছে দু'টি দিয়ে। তারপর শেষে বলা হয়েছে যদি সমান আচরণ করতে না পারো তাহলে একটি বিয়ে করবে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَبَابًا لَا نَجِدُ شَيْئًا فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা কতিপয় অসহায় যুবক রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সঙ্গে ছিলাম, তিনি আমাদের উদ্দেশ্যে বললেন, হে যুবক সকল! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ রাখে সে যেন বিবাহ করে। কেননা নিশ্চয়ই তা চক্ষুকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থানকে হেফাজত করে। আর যে ব্যক্তি বিয়ে করার সামর্থ রাখে না সে যেন অবশ্যই সাওম পালন করে। কেননা তা যৌন শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে।' (বুখারী ৫০৬৫, ৫০৬৬, মুসলিম ৩৪৬৪, ৩৪৬৬, নাসায়ী, ২২৪১, ৩২১১)

পাঁচ : পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে।

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

'হে নবী, তুমি তোমার স্ত্রীদের, কন্যাদের ও মুমিনদের নারীদের বলো, 'তারা যেন তাদের জিলবাবে[2]র কিছু অংশ নিজেদের ওপর ঝুলিয়ে দেয়, তাদের চেনার ব্যাপারে এটাই সবচেয়ে কাছাকাছি পন্থা হবে। ফলে তাদের

[2] জিলবাব হচ্ছে এমন পোশাক যা পুরো শরীরকে আচ্ছাদিত করে।

কষ্ট দেয়া হবে না। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (আহযাব ৩৩:৫৯)

এ আয়াতে বুঝা যায় যে সকল নারীরা পর্দা করবে তাদের কেউ উত্যক্ত করতে পারবে না। ইভটিজিং করতে পারবে না। সুতরাং যারা আদালতের রায়ের মাধ্যমে পর্দার বিধান বাতিল করে ইভটিজিং বন্ধ করতে চায় তারা আল্লাহর সঙ্গে উপহাস করছে। ইভটিজিং বন্ধ করার একমাত্র উপায় আল্লাহর বিধান কায়েম করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

'আর তোমরা নিজ গৃহে অবস্থান করবে এবং প্রাক- জাহেলি যুগের মতো সৌন্দর্য প্রদর্শন করো না। আর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের আনুগত্য করো। হে নবী পরিবার, আল্লাহ তো কেবল চান তোমাদের থেকে অপবিত্রতাকে দূরীভূত করতে এবং তোমাদের সম্পূর্ণরূপে পবিত্র করতে।' (আহযাব ৩৩:৩৩)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'মুমিন পুরুষদের বলো, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয়ই

তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত। আর মুমিন নারীদের বলো, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। আর যা সাধারণত প্রকাশ পায় তা ছাড়া তাদের সৌন্দর্য তারা প্রকাশ করবে না। তারা যেন তাদের ওড়না দিয়ে বক্ষদেশকে আবৃত করে রাখে। আর তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, নিজদের ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাই এর ছেলে, বোনের ছেলে, আপন নারীরা, তাদের ডান হাত যার মালিক হয়েছে, অধীনস্থ যৌনকামনামুক্ত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া কারো কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজদের গোপন সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মুমিনগণ, তোমরা সকলেই আল্লাহর নিকট তাওবা কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।' (নুর ২৪:৩০,৩১)

ছয় : মহিলাদের আকর্ষণীয় কণ্ঠে পর পুরুষদের সাথে কথা বলা হারাম।

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

'হে নবী–পত্নিরা, তোমরা অন্য কোনো নারীর মতো নও। যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো, তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুব্ধ হয়। আর তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে।' (আহযাব ৩৩:৩২)

সাত : চক্ষুকে সংযত রাখার বিধান দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

'মুমিন পুরুষদের বলো, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয়ই তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।' (নূর ২৪:৩০)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

'... আর মুমিন নারীদের বলো, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে.. ।' (নুর ২৪:৩১)

আট : কারো ঘরে প্রবেশের পূর্বে অনুমতির বিধান দেয়া হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য কারও গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা অনুমতি নেবে এবং গৃহবাসীদের সালাম দেবে। এটাই তোমাদের জন্য কল্যাণকর, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ করো। (নূর ২৪:২৭)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلاةِ الْعِشَاءِ ثَلاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

'হে মুমিনগণ, তোমাদের ডানহাত যার মালিক হয়েছে (দাসী) এবং তোমাদের মধ্যে যারা প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন অবশ্যই তিন সময়ে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের সালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন তোমরা তোমাদের পোশাক খুলে রাখ এবং 'ইশার সালাতের পর; এই তিনটি তোমাদের [গোপনীয়তার] সময়। এই তিন সময়ের পর (অন্য কোনো সময়ে বিনা অনুমতিতে আসলে) তোমাদের এবং তাদের কোনো দোষ নেই। তোমাদের একে অন্যের কাছে যাতায়াত করতেই হয়। এভাবে আল্লাহ তোমাদের উদ্দেশ্যে তাঁর আয়াতসমূহ বর্ণনা করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।' (নুর ২৪:৫৮)

নয় : তালাক, খোলা বা স্বামীর মৃত্যুর কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ হলে সেক্ষেত্রে 'ইদ্দত' পালন করার বিধান দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ

نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

'পুরুষরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, এ কারণে যে, আল্লাহ তাদের একের ওপর অন্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং যেহেতু তারা নিজদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে। সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর অন্তরালে হিফাযাতকারিনী ঐ বিষয়ের যা আল্লাহ হিফাযাত করেছেনে। আর তোমরা যাদের অবাধ্যতার আশঙ্কা করো তাদের সদুপদেশ দাও, বিছানায় তাদের ত্যাগ করো এবং তাদের (মৃদু) প্রহার করো। এরপর যদি তারা তোমাদের আনুগত্য করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সমুন্নত মহান। আর যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদের আশঙ্কা করো তাহলে স্বামীর পরিবার থেকে একজন বিচারক এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন বিচারক পাঠাও। যদি তারা মীমাংসা চায় তাহলে আল্লাহ উভয়ের মধ্যে মিল করে দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞানী, সম্যক অবগত। (নিসা ৪:৩৪-৩৫)

অপর আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

'আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দেবে অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছে যাবে তখন হয়তো বিধি মোতাবেক তাদের রেখে দেবে অথবা বিধি মোতাবেক তাদের ছেড়ে দেবে। তবে তাদের কষ্ট দিয়ে সীমালঙ্ঘনের উদ্দেশ্যে তাদের আটকে রেখো না। আর যে তা করবে সে তো নিজের প্রতি জুলুম করবে। আর তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে উপহাসরূপে গ্রহণ করো না। আর তোমরা স্মরণ করো তোমাদের ওপর আল্লাহর নি'আমত এবং তোমাদের ওপর কিতাব ও হিকমত যা নাযিল করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের উপদেশ দেন। আর আল্লাহকে ভয় করো

এবং জেনে রাখ যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ সব বিষয় সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত।' (বাকারা ২:২৩১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ

'আর যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দেবে অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছবে তখন তোমরা তাদের বাধা দিয়ো না যে, তারা তাদের স্বামীদের বিয়ে করবে যদি তারা পরস্পরে তাদের মধ্যে বিধি মোতাবেক সম্মত হয়। এটা উপদেশ তাকে দেয়া হচ্ছে, যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এটি তোমাদের জন্য অধিক শুদ্ধ ও অধিক পবিত্র। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।' (বাকারা ২:২৩২)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

'তোমাদের কোনো অপরাধ নেই যদি তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও এমন অবস্থায় যে, তোমরা তাদের স্পর্শ করনি কিংবা তাদের জন্য কোনো মোহর নির্ধারণ করনি। আর উত্তমভাবে তাদের ভোগ-উপকরণ দিয়ে দাও, ধনীর ওপর তার সাধ্যানুসারে এবং সংকটাপন্নের ওপর তার সাধ্যানুসারে। সুকর্মশীলদের ওপর এটি আবশ্যক।' (বাকারা ২:২৩৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

'হে নবী! (বলুন) তোমরা যখন স্ত্রীদের তালাক দেবে, তখন তাদের ইদ্দত অনুসারে তাদের তালাক দাও এবং 'ইদ্দত হিসাব করে রাখবে এবং তোমাদের রব আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা তাদের তোমাদের বাড়িঘর থেকে বের করে দিয়ো না এবং তারাও বের হবে না। যদি না তারা কোনো

স্পষ্ট অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। আর যে আল্লাহর (নির্ধারিত) সীমারেখাসমূহ অতিক্রম করে সে অবশ্যই তার নিজের ওপর জুলুম করে। তুমি জান না, হয়তো এর পর আল্লাহ, (ফিরে আসার) কোনো পথ তৈরি করে দিবেন। (তালাক ৬৫:১)

পাঁচ : মান-মর্যাদা হিফাজত করার জন্য ইসলামের বিধান

মানুষ আল্লাহর সৃষ্টির সেরা সম্মানিত মাখলুক। ইরশাদ হচ্ছে–

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

'আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদের স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদের দিয়েছি উত্তম রিয্ক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের ওপর আমি তাদের অনেক মর্যাদা দিয়েছি।' (বণী ইসরাঈল ১৭:৭০)

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সর্বোত্তম গঠনে। (তীন ৯৫:৪)

এই মানবজাতির মান-মর্যাদা, ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করেছে ইসলাম। কজেই কেউ যদি কারো মানহানিকর কোনো কাজ করে তার জন্য রাখা হয়েছে বিশেষ শাস্তির বিধান। যথা–

এক : হাদ্দুল কাজাফ।

কেউ কারো ওপর যিনাব্যভিচারের অপবাদ দিলে চারজন সাক্ষী হাজির করতে হবে। তা না পারলে 'হদ্দে ক্বাজাফ' অপবাদের শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। এ প্রসেঙ্গ পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

'আর যারা সচ্চরিত্র নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারপর তারা চারজন সাক্ষী নিয়ে আসে না, তবে তাদের আশিটি বেত্রাঘাত করো এবং

তোমরা কখনই তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করো না। আর এরাই হলো ফাসিক। তবে যারা এরপরে তাওবা করে এবং নিজেদের সংশোধন করে, তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (নূর ২৪:৪-৫)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُبِينٌ لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ

'নিশ্চয়ই যারা এ অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। এটাকে তোমরা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর মনে করো না, বরং এটা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। তাদের থেকে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য রয়েছে, যতটুকু পাপ সে অর্জন করেছে। আর তাদের থেকে যে ব্যক্তি এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য রয়েছে মহা আজাব। যখন তোমরা এটা শুনলে, তখন কেন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা তাদের নিজদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করলো না এবং বললো না যে, 'এটাতো সুস্পষ্ট অপবাদ'? তারা কেন এ ব্যাপারে চারজন সাক্ষী নিয়ে আসল না? সুতরাং যখন তারা সাক্ষী নিয়ে আসেনি, তখন তারাই আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদী। (নূর ২৪:১১-১৩)

এটি উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) এর প্রতি মিথ্যা অপবাদের ঘটনা। ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফিরার পথে একস্থানে রাত্রিযাপনের জন্য অবস্থান করেন। রাতের শেষ ভাগে আয়েশা (রা.) প্রাকৃতিক প্রয়োজনে একটু দূরে যান। কিন্তু পথে তিনি তাঁর গলার হারটি হারিয়ে ফেলেন। তিনি তাঁর হার খুঁজতে থাকেন। এদিকে কাফেলা রওনা হয়ে যায়। তিনি হাওদার ভেতরেই আছেন মনে করে কেউ তাঁর খোঁজ করেনি কারণ তাঁর শারীরিক গড়ন ছিল হালকা। হার খুঁজে পেয়ে তিনি এসে দেখেন যে, কাফেলা চলে গেছে। তখন তিনি ছুটাছুটি না করে সেখানেই বসে পড়েন। এ আশায় যে কাফেলার রেখে যাওয়া মালামালের সন্ধানে নিয়োজিত কোনো লোক আসবেন। অবশেষে এ কাজে নিয়োজিত সাফওয়ান (রা.) সকাল বেলায় আয়েশা (রা.) কে দেখতে

পেলেন এবং নিজের উটে তাঁকে আরোহন করিয়ে নিজে পায়ে হেঁটে উটের রশি টেনে সসম্মানে তাঁকে নিয়ে কাফেলার সাথে মিলিত হন। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই কয়েকজনকে সাথে নিয়ে আয়েশা (রা.) এর ব্যাপারে মিথ্যা অপবাদ রটাতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ তা'আলা এই আয়াতগুলো নাযিল করে আয়েশা (রা.) এর পবিত্রতা ঘোষণা করেন এবং অপবাদ রটনাকারীদের কঠোর শাস্তির কথা জানিয়ে দেন। এই ঘটনাটি 'ইফ্‌ক' এর ঘটনা হিসেবে প্রসিদ্ধ।

এভাবে অপবাদ রটনাকারীদের শাস্তির বিধান নাযিল করা হয়েছে। তাছাড়া তাদের প্রতি রয়েছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা-এর অভিশাপ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'যারা সচ্চরিত্রা সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে মহা আজাব। (নুর ২৪:২৩)

দুই : গিবত বা পরের দোষ চর্চা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ [الحجرات/১২]

'হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয়ই কোনো কোনো অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্‌ত খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ অধিক তাওবা কবুলকারী, অসীম দয়ালু। (হুজরাত ৪৯:১২)

পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عن جابر وأبي سعيد إياكمْ والغِيبَةَ فإنَّ الغِيبَةَ أشَدُّ مِنَ الزِّنى إنّ الرَّجُلَ قد يَزْنِي

ويَتُوبُ فيَتُوبُ اللهُ عليه وإنّ صاحبَ الغيبَةِ لا يُغْفَرُ لهُ حَتّى يَغْفِرَ لهُ صاحبُهُ

'জাবের এবং আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, তোমরা গিবত থেকে বেঁচে থাক। কেননা গিবত যিনা থেকেও জঘন্য অপরাধ। কারণ যখন কোনো ব্যক্তি যিনা করে ফেলে তখন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। কিন্তু গিবতকারীকে আল্লাহ তা'আলা ততক্ষণ পর্যন্ত ক্ষমা করেন না যতক্ষন পর্যন্ত যার গিবত করা হয়েছে সে ক্ষমা না করে। (জামেউল কাবীর লিস্‌সুয়ূতী-১/১০১১২)

তিন : বিদ্রুপ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

তানাবুজ বিল আলক্বাব বা খারাপ নামে কাউকে ডাকা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করা হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'হে ঈমানদারগণ, কোনো সম্প্রদায় যেন অপর কোনো সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোনো নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর তোমরা একে অপরের নিন্দা করো না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ উপনামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম কতই না নিকৃষ্ট! আর যারা তাওবা করে না, তারাই তো জালিম। (হুজরাত ৪৯:১১)

চার : সন্দেহ, সংশয় যুক্ত জিনিস বর্জন করে সন্দেহ মুক্ত জিনিসকে গ্রহণ করার নির্দেশ দান করা হয়েছে।

عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَلَالُ بَيِّنٌ وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَةٌ فَمَنْ تَرَكَ مَا شُبِّهَ عَلَيْهِ مِنْ الْإِثْمِ كَانَ لِمَا اسْتَبَانَ أَتْرَكَ وَمَنْ اجْتَرَأَ عَلَى مَا يَشُكُّ فِيهِ مِنْ الْإِثْمِ أَوْشَكَ أَنْ يُوَاقِعَ مَا اسْتَبَانَ وَالْمَعَاصِي حِمَى اللَّهِ مَنْ يَرْتَعْ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ

'নু'মান বিন বশির (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন আমি রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, হালাল বিষয়াদি স্পষ্ট এবং হারাম ও স্পষ্ট। আর এ দুটির মাঝে রয়েছে কিছু সন্দেহ যুক্ত জিনিস।

অধিকাংশ মানুষ জানেনা এগুলো কি হালালের অন্তর্ভুক্ত না হারামের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে তা ছেড়ে দিবে সে তার ধর্ম এবং সম্মানকে পবিত্র রাখল। আর যে তার মধ্যে লিপ্ত হবে সে অচিরেই হারামের মধ্যে লিপ্ত হবে। যেমন কোনো ব্যক্তি সংরক্ষিত এলাকার সীমানা ঘেঁষে পশু চড়ালে অচিরেই তা সীমানার মধ্যে প্রবেশ করে। জেনে রাখ, প্রত্যেক বাদশাহের একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে আর আল্লাহ তা'আলার সংরক্ষিত এলাকা হচ্ছে হারাম বিষয় সমূহ। (বুখারী ৫২, ২০৫১, মুসলিম ৪১৮১, সুনানে তিরমিযি-১২০৫, নাসায়ী ৫৪১২)

এ হাদীসে সন্দেহ ও সংশয়যুক্ত জিনিস বর্জন করতে বলা হয়েছে। কেননা সন্দেহযুক্ত জিনিস গ্রহণ করতে করতে একসময় হারামকেও গ্রহণ করতে পারে। অথচ হারাম গ্রহণ করা সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

وَقَالَ حَسَّانُ بْنُ أَبِي سِنَانٍ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَهْوَنَ مِنْ الْوَرَعِ دَعْ مَا يَرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يَرِيبُكَ

'সন্দেহ যুক্ত জিনিসগুলোকে বর্জন করো এবং সন্দেহ মুক্ত জিনিসগুলোকে গ্রহণ করো।' (বুখারী ২০৫১)

আরো একটি হাদীসে সন্দেহ ও সংশয়মুক্ত জিনিস গ্রহণ করতে বলা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَبْلُغُ الْعَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقْوَى حَتَّى يَدَعَ مَا حَاكَ فِي الصَّدْرِ

'ইবনে উমর (রা.) বলেন বান্দা তাকওয়ার বাস্তবতায় পৌছতে পারে না যতক্ষন না সে সন্দেহ যুক্ত জিনিস গুলোকে বর্জন করে।' (সহীহ বুখারী ৭)

অপর হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

فَقَالَ يَا وَابِصَةُ أُخْبِرُكَ مَا جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْهُ أَوْ تَسْأَلُنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخْبِرْنِي قَالَ جِئْتَ تَسْأَلُنِي عَنْ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ قُلْتُ نَعَمْ فَجَمَعَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ فَجَعَلَ يَنْكُتُ بِهَا فِي صَدْرِي وَيَقُولُ يَا وَابِصَةُ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَإِنْ أَفْتَاكَ النَّاسُ قَالَ سُفْيَانُ وَأَفْتَوْكَ

'হে ওয়াবেসা! তুমি এসেছ আমার কাছে নেক এবং গুনাহ্ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য? আমি বললাম হ্যাঁ। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের আঙুলগুলো একত্র করে আমার বক্ষের উপরে মৃদু আঘাত করে বললেন; হে ওয়াবেসা! তুমি তোমার অন্তরকে জিজ্ঞাসা করো। তোমার মন বা অন্তর যেটার ওপর স্থীর হয় (জায়েয বলে ফাতওয়া দেয়) সেটাই নেক। আর যে বিষয়ে তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, দিধা-দ্বন্দ্ব দেখা দেয় সেটাই গুনাহ্। যদিও লোকেরা (মুফতি সাহেবরা) তোমাকে জায়েজ বলে ফাতওয়া দেন।' (মুসনাদে আহমাদ ১৮০০১, ১৮০০৬, ১৮৩০, ১৮৩৫)

ছয় : মাল হিফাজত করার জন্য ইসলামের বিধান সমুহ

এক : অন্যের মাল অবৈধভাবে ভোগ করা হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

'আর তোমরা নিজেদের মধ্যে তোমাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না এবং তা বিচারকদের (ঘুষ হিসেবে) প্রদান করো না। যাতে মানুষের সম্পদের কোনো অংশ পাপের মাধ্যমে জেনে বুঝে খেয়ে ফেলতে পার। (বাকারা ২:১৮৮)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) এ আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলেন–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،"قَوْلُهُ: " وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ " ، قَالَ: هَذَا فِي الرَّجُلِ يَكُونُ عَلَيْهِ مَالٌ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ فِيهِ بَيِّنَةٌ، فَيَجْحَدُ الْمَالَ، وَيُخَاصِمُهُمْ إِلَى الْحُكَّامِ، وَهُوَ يَعْرِفُ أَنَّ الْحَقَّ عَلَيْهِ، وَقَدْ عَلِمَ أَنَّهُ آثِمٌ آكِلٌ حَرَامًا

'এটি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যার কাছে কারো সম্পদ রয়েছে অথচ তার কোনো প্রমাণ নেই। ফলে সে অস্বীকার করলো এবং বিষয়টি বিচারকের কাছে উপস্থাপন করলো। অথচ সে জানে যে এ সম্পদ তার নয়। বরং যে দাবি করছে তার। সে জেনে শুনে এভাবে প্রতারণা করে বিচারকের মাধ্যমে ফায়সালা নিয়ে সম্পদ ভোগ করলো। যদিও সে নিশ্চিত যে সে অন্যায়কারী এবং হারাম ভক্ষণকারী।' (তাফসীরে ইবনে আবী হাতেম উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরে দ্রষ্টব্য) অতঃপর ইবনে আব্বাস (রা.) অন্যায়ভাবে

অন্যের মাল ভোগ করার আরেকটি প্রকার বর্ণনা করেন যা সবচেয়ে জঘন্য ও ঘৃণিত। আর তা হলো–

وَذَكَرَ نَوْعاً هُوَ شَرُّ أَنْوَاعِ أَكْلُ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ ، وَهُوَ دَفْعُ الرِّشْوَة إِلَى الْقُضَاة وَالْحَاكِمِيْنَ لِيَحْكُمُوْا لَهُمْ بِغَيْرِ الْحَقِّ فَيُوْرِطُوا الْقُضَاةَ فِي الْحُكْمِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَأْكُلُوْا أَمْوَالَ إِخْوَانِهِمْ بِشَهَادَةِ الزُّوْرِ وَالْيَمِيْنِ الْغُمُوْسِ الْفَاجِرَة وَهِيَ الَّتِيْ يَحْلِفُ فِيْهَا الْمَرْءُ كَاذِباً

'বিচারকদের ঘুষ দেওয়া যাতে অন্যায়ভাবে তার পক্ষে বিচারের রায় দেওয়া হয়। অতঃপর বিচারক ঘুষের মাধ্যমে অন্যায়ভাবে তার পক্ষে রায় দেয় এবং সেও মিথ্যা হলফ করে তার পক্ষে রায় নিয়ে নেয়।' (আইসারুত তাফাসীর বাকারার ১৮৮ নং আয়াতের তাফসীর) এমনিভাবে অন্যায়ভাবে অন্যের মাল আত্মসাৎ না করার প্রতি উৎসাহিত করে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আরো ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

'হে মুমিনগণ, তোমরা পরস্পরের মধ্যে তোমাদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসার মাধ্যমে হলে ভিন্ন কথা। আর তোমরা নিজেরা নিজদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু।' (নিসা ৪:২৯)

পরবর্তী আয়াতে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভোগ করার আরেকটি চমৎকার দিক বর্ণনা করা হয়েছে। আর তা হলো ধর্মীয় মুখোশ পরিধান করার মাধ্যমে। যেমন, পীর সাহেবগণ তাদের মুরীদদের বিভিন্ন আদব শিক্ষা দেন। তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ আদব হলো খালি হাতে পীরের সাথে দেখা করা বেয়াদবি। এমনিভাবে কেউ অসুস্থ হলে বা বিপদে পড়লে টাকা-পয়সার বিনিময়ে বিভিন্ন খতম পড়ানোর পরামর্শ দেওয়া। যেমন খতমে খাঁজে গান, খতমে ইউনুস, খতমে জালালি, খতমে নারিয়া, বুখারী খতম, কুরআন খতম ইত্যাদীর মাধ্যমে, আবার কেউ কবর মাজার তৈরি করে বিভিন্ন মরা পীর-বুজুর্গদের দোহাই দিয়ে টাকা-পয়সা আত্মসাৎ করা। আবার কেউ তাবিজ-কবজ বিক্রি করে, আবার কেউ জীন-ভূতের আছর বা

মানুষের ক্ষতির দোহাই দিয়ে টাকা-পয়সা আদায় করে। আর এ সবকিছুই করেন এক শ্রেণীর পীর-বুজুর্গ ও আলেম নামধারী ধর্মীয় প্রতারকেরা। এদের প্রসেঙ্গ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّه

'হে ঈমানদারগণ, নিশ্চয়ই পণ্ডিত ও সংসার বৈরাগীদের অনেকেই মানুষের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, আর তারা আল্লাহর পথে বাঁধা দেয়।' (তাওবাহ ৯:৩৪)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّهُ خَاصَمَتْهُ أَرْوَى فِي حَقٍّ زَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى مَرْوَانَ فَقَالَ سَعِيدٌ أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا شَيْئًا أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

'সাইদ ইবনে যায়েদ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, যে ব্যক্তি অন্যের জমি থেকে অন্যায়ভাবে এক বিঘাত পরিমাণ জমি দখল করবে কিয়ামতের দিবসে ঐ পরিমাণ সাত তবক জমি তার গলার মালা বনিয়ে দেয়া হবে।' (সহীহ বুখারী-৩১৯৮)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা উপরোক্ত আয়তের মাধ্যমে অন্যের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করার বিভিন্ন দিক উল্লেখ করে সকলকে সাবধান করেছেন। অতঃপর ইয়াতীমদের মাল ভক্ষণ করা আরো মারাত্মক অন্যায় বলে আখ্যায়িত করে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

'নিশ্চয়ই যারা ইয়াতিমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা তো তাদের পেটে আগুন খাচ্ছে; আর অচিরেই তারা প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে।' (নিসা ৪:১০)

দুই : বাকপটুতার মাধ্যমে অন্যায়ভাবে সম্পদ গ্রাস করাকে নিষেধ করা হয়েছে।

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّته منْ بَعْضٍ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخيه شَيْئًا بِقَوْله فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قطْعَةً منْ النَّارِ فَلَا يَأْخُذْهَا

'উম্মে সালামা রা. থেকে বর্ণিত, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমরা অনেক সময় আমার কাছে পারস্পরিক বিবাদের মীমাংসার জন্য আসো। অনেক সময় দেখা যায় যে একজন অপরজন হতে বেশি বাকপটু ও অধিক যুক্তির অধিকারী হয়। (জেনে রেখো কথার চাতুর্যে যদি কেউ তার অপর ভাইয়ের কোনো হক অন্যায়ভাবে নেয়) আমি যদি কারো বাকপটুতায় তার জন্য তার অপর ভাইয়ের হক দিয়ে দেই, তাহলে সেটি তার জন্য জাহান্নামের আগুনের একটি টুকরো হবে তাই সে যেন তা গ্রহণ না করে)।' (সহীহ বুখারী- ২৬৮০, মুসলিম ৩৫৭০, মুসনাদে আহমাদ ২৫৬৭০)

হাদীসে আরো বলা হয়েছে–

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيه قَالَ جَاءَ رَجُلٌ منْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ منْ كنْدَةَ إِلَى النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ الْحَضْرَمِىُّ يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِى عَلَى أَرْضٍ لِى كَانَتْ لأَبِى فَقَالَ الْكنْدِىُّ هِىَ أَرْضِى فِى يَدِى أَزْرَعُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– للْحَضْرَمِىِّ أَلَكَ بَيِّنَةٌ قَالَ لاَ قَالَ فَلَكَ يَمِينُهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّه إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ لاَ يُبَالِى عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْه وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ منْ شَىْءٍ فَقَالَ لَيْسَ لَكَ منْهُ إِلاَّ ذَلكَ فَانْطَلَقَ ليَحْلفَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– لَمَّا أَدْبَرَ أَمَا لَئنْ حَلَفَ عَلَى مَاله ليَأْكُلَهُ ظُلْمًا لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ وَهُوَ عَنْهُ مُعْرِضٌ

'আল কামা স্বীয় পিতা ওয়ায়েল ইবনে হুজর থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন যে, হাদরামাউত থেকে এক ব্যক্তি ও কিন্দা থেকে এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে আসলো। হাদরামাউত নিবাসী লোকটি বললো, ইয়া-রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই লোকটি আমার পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত জমিন জবর-দখল করে

রেখেছে। প্রতিউত্তরে কিন্দা নিবাসী লোকটি বললো, ওটাতো আমার জমি। আমার দখলে আছে এবং আমিই তাতে কৃষি কাজ করি। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদরামাউত নিবাসী লোকটিকে বললেন, তোমার কি কোনো প্রমাণ আছে। লোকটি বললো, না কোনো প্রমাণ নেই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তাহলে তো তোমার প্রতিপক্ষের কসমের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত হবে।' হাদরামাউত নিবাসী লোকটি বললো, 'তাহলে তো সে মিথ্যা কসম করে আমার সম্পদ নিয়ে নিবে। কেননা লোকটি পাপীষ্ঠ। সে মিথ্যা কসম করতে আল্লাহকে ভয় করে না।' রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'এটা ছাড়া তোমার আর কোনো পথ নেই।' লোকটি হলফ করার জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলো। লোকটি যখন হলফ করে চলে যাচ্ছিলো তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'লোকটি যদি অন্যায়ভাবে পরের মাল ভক্ষণ করার জন্য মিথ্যা হলফ করে থাকে তাহলে সে আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাৎ করবে যে, আল্লাহ তা'আলা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবেন।' (সহীহ মুসলিম ৩৭৫, আবু দাউদ ৩২৪৭, ৩৬২৫, নাসায়ী ৫৯৮৯)

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّه –صلى الله عليه وسلم– أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ لاَ يَقْبَلُ إِلاَّ طَيِّبًا وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمنينَ بِمَا أَمَرَ بِه الْمُرْسَلينَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا منَ الطَّيِّبَات وَاعْمَلُوا صَالحًا إِنِّى بِمَا تَعْمَلُونَ عَليمٌ وَقَالَ يَا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُلُوا منْ طَيِّبَات مَا رَزَقْنَاكُمْ ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطيلُ السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْه إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذَلكَ

'আবু হুরাইরা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'হে লোকসকল! নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র। কেবল মাত্র পবিত্র জিনিসই তিনি গ্রহণ করেন। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সাধারণ মুমিনদের প্রতি সেই একই আদেশ করেছেন, যা তিনি রাসুলগণের প্রতি আদেশ করেছেন। আর তা হলো–

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

'হে রাসুলগণ, তোমরা পবিত্র ও ভালো বস্তু থেকে খাও এবং সৎকর্ম করো। নিশ্চয়ই তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আমি সম্যক জ্ঞাত।' (মুমিনুন ২৩:৫১)

এ আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র ও উত্তম বস্তু খাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। ঠিক একই নির্দেশ দিয়েছেন সাধারণ মুমিনদেরও। তিনি ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ

'হে মুমিনগণ, আহার করো আমি তোমাদের যে পবিত্র রিযক দিয়েছি তা থেকে এবং আল্লাহর জন্য শোকর কর, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত করো।' (বাকারা ২:১৭২)

অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'একজন মানুষ দীর্ঘ সফর করে (মক্কায় আসে)। সফরের কারণে তার চুলগুলো ধূলো মলিন ও এলোমেলো হয়ে যায়। এ অবস্থায় আল্লাহর কাছে দুহাত দারাজ করে আল্লাহকে আহ্বান করতে থাকে আর বলতে থাকে 'ইয়া রাব্বি!' 'ইয়া রাব্বি!'। অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং হারাম খাদ্য দিয়েই সে লালিত-পালিত হয়েছে। তার দু'আ কি করে কবুল হতে পারে?' (মুসলিম ২৩৯৩; আহমাদ ৮৩৪৮)

তিন : ঘুষ নেওয়া।

হারাম উপার্জনের আরেকটি পন্থা হলো ঘুষ। এটি সম্পর্কে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– الرَّاشِىَ وَالْمُرْتَشِىَ

'আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ের প্রতি লানত করেছেন।' (আবু দাউদ ৩৫৮২, তিরমিযী ১৩৩৬, ১৩৩৭, ইবনে মাজাহ্ ২৩১৩)

চার : মিথ্যা কসমকারী ব্যবসায়ী।

عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قَالَ فَقَرَأَهَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله

عليه وسلم– ثَلاَثَ مِرَارٍ قَالَ أَبُو ذَرٍّ خَابُوا وَخَسِرُوا مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

'আবু জর (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, 'তিন প্রকারের মানুষ যাদের সাথে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামতের দিবসে কথা বলবেন না এবং তাদের দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দিবেন না এবং তাদের (গুনাহ থেকে) পবিত্র করবেন না। তাদের জন্য রয়েছে মর্মন্তুদ শাস্তি'। হাদীসের বর্ণনাকারী আবু জর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথাটি তিনবার বলেছেন। তখন আবু জর (রা.) বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওরা ধবংস হোক, ক্ষতিগ্রস্ত হোক, তারা কারা? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তারা হলো ক. (অহঙ্কার বশত:) টাখনু গিঁড়ার নিচে লুঙ্গি-পাজামা পরিধানকারী, খ. উপকার করে অনুগ্রহ প্রকাশকারী বা খোঁটা দানকারী, গ. মিথ্যা হলফ করে অচল মাল সচলকারী।' (বুখারী ২৩৬৯, ২৬৭২, মুসলিম ৩০৬, ৩০৭, ৩০৯ তিরমিযী ১২১১, ১৫৯৫, আবু দাউদ ৩৪৭৬, ৪০৮৯, নাসায়ী ২৫৬২, ২৫৬৩, ২৫৭৪ইবনে মাজাহ ২২০৭, ২২০৮, মুসনাদে আহমাদ ৭৪৪২, ১০২২৬)

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِى غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَسَمَّانَا بِاسْمٍ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ اللَّغْوُ وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بِالصَّدَقَةِ

'কায়েস ইবনে আবী গরাজাহ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমরা ব্যবসায়ীরা সামাসীরা নামে প্রসিদ্ধ ছিলাম। অতঃপর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার আমাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করলেন। তখন তিনি আমাদের এমন একটি নাম রাখলেন যেটি পূর্বের নামের চেয়ে ভালো। আর তা হলো তিনি বললেন, 'হে তাযের (ব্যবসায়ী) গোষ্ঠী! নিশ্চয়ই ব্যবসার সাথে বেহুদা কথাবার্তা ও অযথা কসম করা হয়ে থাকে। সুতরাং তোমরা সাদাকার মাধ্যমে (দানের মাধ্যমে) তার প্রতিকার করো।' (আবু দাউদ ৩৩২৮, নাসায়ী ৩৭০৬, ৩৮০৭, ইবনে মাজাহ ২১৪৫, মুসনাদে আহমাদ ১৬১৩৫)

পাঁচ : দালালী।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ التَّلَقِّي وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِيِّ وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَأَنْ يَسْتَامَ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ وَنَهَى عَنْ النَّجْشِ وَعَنْ التَّصْرِيَةِ

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাজারের মুখে ঘাঁটি পেতে গ্রাম্য লোকদের মাল ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। (কেননা এতে গ্রাম্য কৃষক ধোঁকা খেতে পারে, অথবা বাজারের লোক সরাসরি কৃষক থেকে ক্রয় করলে যে মূল্যে ক্রয় করতে পারতো তার থেকে বঞ্চিত হবে)। শহরের ব্যক্তি গ্রাম্য কৃষকদের মাল বিক্রি করে দিতে নিষেধ করেছেন। (অর্থাৎ গ্রাম্য কৃষক থেকে মাল রেখে দিয়ে আস্তে আস্তে বিক্রয় করে দেওয়া। এতে শহরের লোকদের ক্ষতি হয়। কেননা কৃষক তাড়াতাড়ি বিক্রি করে চলে যাওয়ার জন্য একটু কম মূল্যে বিক্রয় করে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিলো। কিন্তু শহরের লোক সেটা করবে না। এ কারণে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি কৃষকের উপকারের জন্য হয় সেটা নিষেধাজ্ঞার আওতায় পড়বে না)। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরো নিষেধ করেছেন, কোনো মেয়েলোক কর্তৃক কোনো পুরুষকে বিয়ে করার জন্য তার পূর্বের স্ত্রীকে তালাক দেওয়ার শর্তারোপ করা এবং কোনো জিনিস ক্রয়ের উদ্দেশ্যে একজনের কথাবার্তা চলাবস্থায় অপরজনকে প্রস্তাব করতে নিষেধ করেছেন। আরো নিষেধ করেছেন দালালি করা থেকে (অর্থাৎ মাল চালিয়ে দেওয়ার জন্য অযথা মালের প্রশংসা করা। অথবা কেনার উদ্দেশ্য ছাড়াই শুধুমাত্র দাম বাড়ানোর জন্য দাম বলা)। আরো নিষেধ করেছেন তাসরিয়াহ করা থেকে। (অর্থাৎ দুধের পশুর দুধ কয়েকদিন পর্যন্ত দোহন না করে বিক্রয়ের জন্য বাজারে নিয়ে যাওয়া। যাতে স্তন বড় দেখা যায় এবং ক্রেতা অধিক দুগ্ধ লাভের আশায় চড়া মূল্যে ক্রয় করে)।' (বুখারী ২৭২৭, মুসলিম ৩৮৯১, ৩৮৯৪, নাসায়ী ৪৫০৩)

ছয় : ভেজাল।

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى

'আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাজারের একটি খাদ্য-দ্রব্যের স্তূপের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি স্তূপের ভিতরে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে ভেতরের মালগুলো ভিজা পেলেন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একি!' সে বললো ইয়া রাসুলুল্লাহ! বৃষ্টির পানি লেগেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'তুমি ঐ ভিজা অংশকে উপরে রাখনি কেনো, যাতে লোকেরা দেখতে পেতো? যে (মানুষকে) ধোঁকা দেয় সে আমাদের (মুসলিমদের) অন্তর্ভুক্ত নয়।' (মুসলিম ২৯৫, মেশকাত ২৮৬০)

সাত : ইয়াতিম।

عَنْ سَهْلٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ فِي الْجَنَّةِ هَكَذَا وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا

'সাহল (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমি এবং ইয়াতিমের দায়ীত্ব গ্রহণকারী জান্নাতে পাশাপাশি অবস্থান করবো।' (বুখারী ৫৩০৪, মুসলিম ৭৬৬০)

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ

'আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাতটি ধংসাত্মক গুনাহ থেকে বাঁচো।' প্রশ্ন করা হলো ইয়া রাসুলুল্লাহ! কি সেগুলো? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'সেগুলো হলো ১. শিরক করা, ২. জাদু করা, ৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ৪. ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করা। ৫. সুদ খাওয়া, ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালায়ন করা, ৭. স্বতী-সাধ্বী মুমিন

নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।' (বুখারী ৩৮৬৬, ৬৮৫৭, মুসলিম ২৭২, আবু দাউদ ২৮৭৬, নাসায়ী ৩৬৭৩)

আট : ইয়াতিমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা।

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

'নিশ্চয়ই যারা ইয়াতিমদের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে তারা তো তাদের পেটে আগুন খাচ্ছে; আর অচিরেই তারা প্রজ্বলিত আগুনে প্রবেশ করবে।' (নিসা ৪:১০)

وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا

'আর তোমরা ইয়াতিমদের তাদের ধন-সম্পদ দিয়ে দাও এবং তোমরা অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র বস্তু দ্বারা পরিবর্তন করো না এবং তাদের ধন-সম্পদকে তোমাদের ধন-সম্পদের সাথে খেয়ো না। নিশ্চয়ই তা বড় পাপ।' (নিসা ৪:২)

নয় : চোরের জন্য 'হদ' হাত কাটার বিধান রাখা হয়েছে।

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

'আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আজাব স্বরূপ এবং আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।' (মায়িদা ৫:৩৮)

এ আইন বাস্তবয়ন করলে দেশে চোর থাকতে পারে না। সোনার বাংলা ও সোনার মদিনার মধ্যে এখানেই পার্থক্য। সোনার মদিনায় আজান হয়ে গেলে স্বর্ণের দোকান পর্যন্ত একটি কাল পর্দা ঝুলিয়ে দোকান খোলা রেখে লোকেরা মসজিদে চলে যায়। কোনো প্রকার চোরের ভয় থাকে না। অথচ সোনার বাংলায় ভালো জুতা নিয়ে মসজিদে গেলে নামাজের পরে তা আর খুজে পাওয়া যায় না। এ পার্থক্য এ জন্য যে, সোনার মদিনায় চোরের হাত কাটার বিধান কার্যকর রয়েছে। আর সোনার বাংলায় এ আইনকে বর্বর ও মধ্যযুগীয় আইন বলে বাতিল করা হয়েছে। অথচ আল্লাহর আইন বাতিল করার অধিকার কারো নেই। কারণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন,

وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ 'আর আল্লাহ-ই হুকুম করেন এবং তাঁর হুকুম প্রত্যাখ্যান করার কেউ নেই।' (রা'দ ১৩:৪১)। এজন্যই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে মক্কা বিজয়ের পরে কুরাইশ বংশের শাখা বানু মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করার পর তার হাত না কাটার ব্যাপারে সুপারিশ করা হলো তখন তিনি তা কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন। যা নিম্নের হাদিসে উল্লেখ রয়েছে–

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا وَمَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمْ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, বনু মাখযুম গোত্রের এক মহিলা চুরি করলে বিষয়টি কুরাইশদের অত্যন্ত চিন্তায় ফেলে দিল। তারা বললো, এই মহিলার ব্যাপারে কে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে সুপারিশ করবে? এরপর তারা বললো আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রিয় পালক নাতি উসামা বিন যায়েদ ছাড়া অন্য কেউ এই দুঃসাহস করতে পারে না। তখন উসামা (রা.) রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে সুপারিশ করলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি কি আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত শাস্তির ব্যাপারে সুপারিশ করছ? অতঃপর তিনি খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন, নিশ্চয়ই তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতরা ধ্বংস হয়েছে এজন্য যে যখন তাদের কোনো সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করত, তাকে ছেড়ে দিত। আর যখন কোনো গরীব দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত তখন তার ওপর আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি বাস্তবায়ন করত। আল্লাহর শপথ করে বলছি, যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতেমাও চুরি করত তাহলে আমি অবশ্যই তার হাত কেটে দিতাম।' (বুখারী ৩৪৭৫)

দশ : ছিনতাই, রাহজানী, ডাকাতির জন্য শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং জমিনে ফাসাদ করে বেড়ায়, (ডাকাতি) তাদের আজাব কেবল এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহাআজাব। (মায়িদা ৫:৩৩)

এ আয়াতে ডাকাতির বিভিন্ন অবস্থার ওপর ভিত্তি করে ভিন্ন ভিন্ন শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। তাছাড়া মানসিকভাবেও এ ধরনের কাজগুলোকে ঘৃণিত ও বর্জনীয় উল্লেখ করে হাদীসে সাবধান করা হয়েছে। পবিত্র হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيهَا أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্নিত, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, কোনো যেনাকার যখন যেনা করে তখন সে মুমিন অবস্থায় যেনা করে না। মদ্যপায়ী যখন মদ পান করে, তখন সে মুমিন অবস্থায় মদপান করে না। কোনো চোর যখন চুরি করে তখন সে মুমিন অবস্থায় চুরি করে না এবং কোনো ছিনতাইকারী যখন ছিনতাই করে তখন সে মুমিন অবস্থায় ছিনতাই করে না। (বুখারী ২৩৪৩, ২৪৭৫, মুসলিম ২১১, ২১৭, তিরমিযী ২৬২৫, আবু দাউদ ৪৬৯১)

এগার : বেচা-কেনা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ধোঁকা দেয়া হারাম ঘোষণা করা হয়েছে।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْد حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّه عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاة

'আবু হুরায়রা (রা.) হতে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রতারণা ও ধোঁকামূলক ব্যবসা নিষেধ করেছেন।' (মুসনাদে আহমদ-৮৮৮৪)

হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে–

عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش المسلمين فليس منا

'হুযায়ফাতুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, যে ব্যক্তি মুসলিমদের ধোকা দিবে সে আমাদের মুসলিম উম্মাহ্ এর অন্তর্ভুক্ত না।' (তারিখুল কাবীর লিল বুখারী -৭/৫৬)

বার : লেন-দেন, চুক্তিপত্র লিখে রাখা ও স্বাক্ষী রাখার বিধান দেয়া হয়েছে।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

'হে মুমিনগণ, যখন তোমরা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য পরস্পর ঋণের লেনদেন করবে, তখন তা লিখে রাখবে। আর তোমাদের মধ্যে একজন লেখক যেন ইনসাফের সাথে লিখে রাখে এবং কোনো লেখক আল্লাহ তাকে যেরূপ শিক্ষা দিয়েছেন, তা লিখতে অস্বীকার করবে না। সুতরাং সে যেন লিখে রাখে এবং যার ওপর পাওনা সে (ঋণ গ্রহীতা) যেন তা লিখিয়ে রাখে।

আর সে যেন তার রব আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করে এবং পাওনা থেকে যেন সামান্যও কম না দেয়। অতঃপর যার ওপর পাওনা রয়েছে সে (ঋণ গ্রহীতা) যদি নির্বোধ বা দুর্বল হয়, অথবা সে লেখার বিষয়বস্তু বলতে না পারে, তাহলে যেন তার অভিভাবক ন্যায়ের সাথে লেখার বিষয়বস্তু বলে দেয়। আর তোমরা তোমাদের পুরুষদের মধ্য হতে দু'জন সাক্ষী রাখ। অতঃপর যদি তারা উভয়ে পুরুষ না হয়, তাহলে একজন পুরুষ ও দু'জন নারী– যাদের তোমরা সাক্ষী হিসেবে পছন্দ করো। যাতে তাদের (নারীদের) একজন ভুল করলে অপরজন স্মরণ করিয়ে দেয়। সাক্ষীরা যেন অস্বীকার না করে, যখন তাদের ডাকা হয়। আর তা ছোট হোক কিংবা বড় তা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত লিপিবদ্ধ করতে তোমরা বিরক্ত হয়ো না। এটি আল্লাহর নিকট অধিক ইনসাফপূর্ণ এবং সাক্ষ্য দানের জন্য যথাযথ। আর তোমরা সন্দিহান না হওয়ার অধিক নিকটবর্তী। তবে যদি নগদ ব্যবসা হয় যা তোমরা হাতে হাতে লেনদেন কর, তাহলে তা না লিখলে তোমাদের কোনো দোষ নেই। আর তোমরা সাক্ষী রাখ, যখন তোমরা বেচা-কেনা করবে এবং কোনো লেখক ও সাক্ষীকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হবে না। আর যদি তোমরা কর, তাহলে নিশ্চয়ই তা হবে তোমাদের সাথে অনাচার। আর তোমরা আল্লাহর তাকওয়া অবলম্বন করো এবং আল্লাহ তোমাদের শিক্ষা দেবেন। আর আল্লাহ সব বিষয়ে সম্যক জ্ঞানী। (বাক্বারা ২:২৮২)

তের : মাল অপচয় করা, নষ্ট করা, বোকা-জ্ঞানহীন লোকদের হাতে মাল অর্পন নিষেধ করা হয়েছে।

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

'আর তোমরা নির্বোধদের হাতে তোমাদের ধন-সম্পদ দিও না, যাকে আল্লাহ তোমাদের জন্য করেছেন জীবিকার মাধ্যম এবং তোমরা তা থেকে তাদের আহার দাও, তাদের পরিধান করাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বলো।' (নিসা ৪:৫)

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে–

وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

'আর আত্মীয়কে তার হক দিয়ে দাও এবং মিসকিন ও মুসাফিরকেও। আর কোনোভাবেই অপব্যয় করো না।' (বণী ইসরাঈল ১৭:২৬)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

انَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

'নিশ্চয়ই অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার রবের প্রতি খুবই অকৃতজ্ঞ।' (বণী ইসরাঈল ১৭:২৭)

চোদ্দ : ওয়ারিশদের মধ্যে সম্পত্তি বণ্টনের বিধান জারি করা হয়েছে এবং সীমালঙ্ঘন না করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

'আল্লাহ তোমাদের তোমাদের সন্তানদের সম্পর্কে নির্দেশ দিচ্ছেন, এক ছেলের জন্য দুই মেয়ের অংশের সমপরিমাণ। তবে যদি তারা দুইয়ের অধিক মেয়ে হয়, তাহলে তাদের জন্য হবে, যা সে রেখে গেছে তার তিন ভাগের দুই ভাগ; আর যদি একজন মেয়ে হয় তখন তার জন্য অর্ধেক। আর তার মাতা পিতা উভয়ের প্রত্যেকের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ সে যা রেখে গেছে তা থেকে, যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি তার সন্তান না থাকে এবং তার ওয়ারিছ হয় তার মাতা পিতা তখন তার মাতার জন্য তিন ভাগের এক ভাগ। আর যদি তার ভাই-বোন থাকে তবে তার মায়ের জন্য ছয় ভাগের এক ভাগ। অসিয়ত পালনের পর, যা দ্বারা সে অসিয়ত করেছে অথবা ঋণ পরিশোধের পর। তোমাদের মাতা পিতা ও তোমাদের সন্তান-সন্ততিদের মধ্য থেকে তোমাদের উপকারে কে অধিক নিকটবর্তী তা তোমরা জান না। আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।' (আন নিসা ৪:১১)

পবিত্র কুরআনে আরো ইরশাদ হয়েছে–

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

'পুরুষের জন্য মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গিয়েছে তা থেকে একটি অংশ রয়েছে। আর নারীদের জন্য রয়েছে মাতা পিতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে গেছে তা থেকে একটি অংশ– তা থেকে কম হোক বা বেশি হোক– নির্ধারিত হারে। আর যদি বণ্টনে নিকটাত্মীয় এবং ইয়াতিম ও মিসকিনরা উপস্থিত হয়, তাহলে তোমরা তাদের তা থেকে আহার দাও এবং তাদের সাথে উত্তম কথা বলবে।' (নিসা ৪:৭-৮)

পনের : যাকাত ফরজ করা হয়েছে।

দান-সদকার জন্য উৎসাহিত করা হয়েছে। গরিব আত্মীয়স্বজনদের ওপর মাল ব্যায় করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। যাতে সে চুরি করতে বাধ্য না হয়।

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

'আর তোমরা সালাত কায়েম করো, যাকাত প্রদান করো এবং রুকুকারীদের সাথে রুকু করো।' (বাকারা ২:৪৩)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

'আর তোমরা সালাত কায়েম করো ও যাকাত দাও এবং যে নেক আমল তোমরা নিজেদের জন্য আগে পাঠাবে, তা আল্লাহর নিকট পাবে। তোমরা যা করছ নিশ্চয়ই আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা।' (বাকারা ২:১১০)

وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ

'আর ভিক্ষুককে তুমি ধমক দিওনা।' (দুহা: ১০)

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

'তাদের সম্পদে রয়েছে প্রার্থী ও বঞ্চিতের হক।' (যারিয়াত ৫১:১৯)

উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হলো দ্বীন ও দুনিয়ার বড় ধরনের ক্ষতি করতে পারে এমন সব অপরাধের জন্য ইসলামী শরীয়ত নির্ধারিত 'হদ' বা শাস্তি নাজিল করেছে এবং তা কোনো মুজতাহিদ বা মুফতির ইজতেহাদের

অপেক্ষায় রাখেন নাই। বরং আল্লাহ (সুব.) নিজেই কুরআনে তার বিধান অবতীর্ণ করেছেন।

ষোল : সুদ হারাম করা হয়েছে এবং সুদের সকল পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

সুদ একটি মারাত্মক ব্যাধি। মুসলিম জাতির ধ্বংসের একটি ভয়াবহ অস্ত্র। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবার এক সুস্পষ্ট ঘোষণার নাম সুদ। সুদ সম্পর্কে কুরআনের ঘোষনা–

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

'যারা সুদ খায়, তারা তার ন্যায় (কবর থেকে) উঠবে, যাকে শয়তান স্পর্শ করে পাগল বানিয়ে দেয়। এটা এ জন্য যে, তারা বলে, বেচা-কেনা সুদের মতোই। অথচ আল্লাহ বেচা-কেনা হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। অতএব, যার কাছে তার রবের পক্ষ থেকে উপদেশ আসার পর সে বিরত হলো, যা গত হয়েছে তা তার জন্যই ইচ্ছাধীন। আর তার ব্যাপারটি আল্লাহর হাওলায়। আর যারা ফিরে গেল, তারা আগুনের অধিবাসী। তারা সেখানে স্থায়ী হবে।' (বাক্বারা ২:২৭৫)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

'হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সুদের যা অবশিষ্ট আছে, তা পরিত্যাগ করো, যদি তোমরা মুমিন হও। যদি তোমরা তা না করো তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের পক্ষ থেকে যুদ্ধের ঘোষণা নাও, আর যদি তোমরা তাওবা করো, তবে তোমাদের মূলধন তোমাদেরই থাকবে।

তোমরা যুলুম করবে না এবং তোমাদের ওপর জুলুম করা হবে না।' (বাকারা ২:২৮৭-২৮৮)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

'হে ঈমানদারগন! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ খেও না। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক যাতে কল্যাণ অর্জন করতে পার এবং তোমরা সে আগুন থেকে বেঁচে থাক যা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। আর তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহ ও রাসুলের, যাতে তোমাদের ওপর রহমত করা হয়।' (আল-ইমরান ৩:১৩০-১৩২)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

'আর তোমরা যে সুদ দিয়ে থাক, মানুষের সম্পদে বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য তা মূলত আল্লাহর কাছে বৃদ্ধি পায় না। আর তোমরা যে জাকাত দিয়ে থাক আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করে (তাই বৃদ্ধি পায়) এবং তারাই বহুগুণ সম্পদ প্রাপ্ত।' (রুম ২৪:৩৯)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

'সুতরাং ইয়াহুদিদের জুলুমের কারণে আমি তাদের ওপর উত্তম খাবারগুলো হারাম করেছিলাম, যা তাদের জন্য হালাল করা হয়েছিল এবং আল্লাহর রাস্তা থেকে অনেককে তাদের বাধা প্রদানের কারণে। আর তাদের সুদ গ্রহণের কারণে, অথচ তা থেকে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল এবং অবৈধভাবে মানুষের সম্পদ খাওয়ার কারণে। আর আমি তাদের মধ্য থেকে কাফিরদের জন্য প্রস্তুত করেছি যন্ত্রণাদায়ক আজাব।' (নিসা ৪:১৬০-১৬১)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

'আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান-খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ পছন্দ করেন না কোনো অবিশ্বাসী পাপীকে।' (বাকারা ২:২৭৬)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عن بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন; রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভিশাপ দিয়েছেন সুদ গ্রহীতা, সুদ দাতা, সুদের সাক্ষী এবং সুদের মহুরিকে। (আবু দাউদ ৩৩৩৫; নাসায়ী ৫১১৮; তিরমিযী ১২০৬) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنَّ آخِرَ مَا نَزَلَ مِنْ الْقُرْآنِ آيَةُ الرِّبَا وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّيبَةَ

'উমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেন, কুরআনের সর্বশেষ আয়াত সুদের আয়াত। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মৃত্যু হয়ে গেল অথচ তিনি আমাদের রেবার (সুদ) কোনো তাফসীর করে যাননি। অতএব তোমরা রেবা (সুদ) এবং রিবা (সুদের সন্দেহ) উভয়টাকেই ত্যাগ করো।' (ইবনে মাজাহ ২২৮৬; মুসনাদে আহমদ ২৪৬)

এখানে সর্বশেষ আয়াত বলতে সুরা বাক্বারার ২৭৫ নং আয়াতকে বুঝান হয়েছে। তাই এটা মানসুখও হয় নাই এবং কোনো অস্পষ্টতাও নেই। এ কারনেই রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাফসীর করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অতএব তোমরা সুদকেও বর্জন করো এবং সুদকে বৈধ করার জন্য কোনো প্রকার হিলা গ্রহণ করাকেও বর্জন করো। এটাকেই 'রাইবাহ' বলা হয়েছে। অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَا اَحَدٌ اَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا اِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ اَمْرِهِ اِلَيْ قِلَّةٍ

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) হতে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে কেউ সুদের মাধ্যমে সম্পদ বৃদ্ধি করবে, তার পরিণতি হবে করুণ।' (ইবনে মাজাহ ২২৮৯)

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَفْوَاجًا

'যেদিন শিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে, সেদিন তোমরা দলে দলে সমাগত হবে।' (নাবা ৭৮:১৮)

এই আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে 'তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান' নামক কিতাবে একটি দীর্ঘ হাদীস বারা ইবনে আজিব থেকে বর্ণিত হয়েছে, যার একটি অংশ হল–

'কিয়ামতের দিবসে আমার উম্মতকে দশটি দলে উপস্থিত করা হবে। বানরের আকৃতিতে, শুকরের আকৃতিতে, মাথা নিচে ও পা উপরে করে চেহারার উপরে ভর করে টেনে আনা হবে, অন্ধ, বোবা বধির করে, একদল যারা নিজেদের জিহ্বাকে চাবাতে থাকবে– তাদের জিহ্বা সিনা পর্যন্ত ঝুলন্ত থাকবে এবং তার থেকে পুঁজ নির্গত হতে থাকবে যার দুর্গন্ধ গোটা হাশরবাসীকে কষ্ট দিবে, আর একদল যাদের সীসা গলানো পোষাক পরিধান করিয়ে দেয়া হবে যা তাদের চামড়ার সাথে লেগে থাকবে। যারা শুকরের আকৃতিতে– তারা হলো হারামখোর। আর যাদের মাথা নিচে ও পা উপরে– তারা হলো সুদখোর। আর যারা অন্ধ তারা হলো অত্যাচারী শাসক/বিচারক। যারা বধির তারা হলো নিজের আমলে তুষ্ট। যারা জিহবা চাবাচ্ছিল তারা হলো ঐ সকল আলেম ও বক্তা যারা নিজের কথানুযায়ী আমল করত না। যাদের হাত কাটা তারা হলো যারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দিত। আর যাদের আগুনের খেজুর বৃক্ষে শুলিবিদ্ধ করা হয়েছে– তারা হলো ক্ষমতার অপব্যবহার করে মানুষের প্রতি জুলুমকারীরা। আর যারা দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল তারা হলো প্রবৃত্তির অনুসরণকারীরা। সীসা গলানো পোষাক পরিহিতরা হলো তারা যারা অহঙ্কারী এবং নিজেদের বড় মনে করত।' (তাফসীরে আদওয়াউল বায়ান, ৯ম খণ্ড, পৃ:৭, ইমাম মুহাম্মদ আল আমীন আল শানকিতি)

এ ছাড়া বিদায় হজ্বে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে ভাষণ দিয়েছিলেন, তার গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ ছিল-

وَرِبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُ رِبَا عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

'...জাহিলিয়াতের সকল সুদ পদদলিত করলাম এবং সর্বপ্রথম আমি আমার চাচা আব্বাস বিন আবদুল মুত্তালিব এর সকল সুদ রহিত ঘোষণা করলাম।...' (আবু দাউদ ৩৩৩৬; ইবনে মাজাহ ৩০৫৫; ইবনে খুযাইমা ২৮০৯)

رِبَا শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো বৃদ্ধি, অতিরিক্ত, প্রবৃদ্ধি ইত্যাদি। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে ইসলামে সব ধরনের বৃদ্ধি বা প্রবৃদ্ধিকে হারাম করা হয়েছে। বস্তুত সম্পদের একটা বিশেষ ধরনের মুনাফা কিংবা বৃদ্ধির নাম হচ্ছে রিবা (সুদ)।

- প্রখ্যাত ইসলামী অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিক উমার চাপরার মতে ইসলামি শরীয়তে রিবা বলতে ঐ অর্থকেই বোঝায় যা ঋণের শর্ত হিসেবে মেয়াদ শেষে ঋণ গ্রহীতা অতি অবশ্যই মূল অর্থসহ ঋণদাতাকে পরিশোধ করতে বাধ্য।
- ইমাম ফখরুদ্দীন আল রাজি বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে আরববাসী সকলেরই রিবা সম্বন্ধে জানা ছিল এবং তাদের মধ্যে এটি বহুল প্রচলিতও ছিল। সে যুগেও তারা প্রথা সিদ্ধভাবে ঋণ দিতো এবং শর্ত অনুসারে তার ওপর মাসিক নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করত, কিন্তু আসল বা মূলধন এর পরিমাণ থাকতো অপরিবর্তিত। যখন ঋণের মেয়াদ শেষ হতো এবং ঋণগ্রহীতা তা পরিশোধে ব্যর্থ হতো তখন সুদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে পরিশোধের সময়ও বাড়িয়ে দেয়া হতো। (তাফসীরে কবীর)
- ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, পণ্য বা অর্থের বিনিময়ে প্রদেয় অতিরিক্ত পণ্য বা অর্থই হলো রিবা।
- ইমাম আবু বকর আল জাসসাস আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বলেন, রিবা দু'রকম। একটি ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে, অপরটি ক্রয়-বিক্রয় ছাড়া। দ্বিতীয় প্রকারই জাহিলিয়াতের যুগের রিবা। তিনি আরও বলেন, জাহিলিয়াতের যুগে ঋণ গ্রহনের সময়ে ঋণদাতা ও ঋণ গ্রহীতার মধ্যে একটি চুক্তি হতো। তাতে স্বীকার করে নেয়া হতো যে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মূলধনের ওপর একটি নির্ধারিত পরিমাণ অতিরিক্তসহ আসল পরিমাণ মূলধন ঋণদাতাকে ফেরৎ দিতে হবে।
- প্রখ্যাত তাফসীর বিদ ইবনে জারীর বলেন, জাহিলিয়াত আমলে প্রচলিত রিবা যা আল-কুরআনে হারাম ঘোষণা করা হয়েছে তা হলো 'কাউকে নির্দিষ্ট

মেয়াদের জন্য ঋণ দিয়ে মূলধনের অতিরিক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণ করা।' আরবরা এটাই করতো এবং নির্দিষ্ট মেয়াদে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে সুদ বাড়িয়ে দেয়ার শর্তে পরিশোধের মেয়াদও বাড়িয়ে দেয়া হতো। (তাফসীরে ইবনে জারীর, ৩য় খণ্ড)

সুদের প্রকারভেদ :

রিবা দুই প্রকার– ক. রিবা আন নাসিয়া اَلنَّسِيْئَةُ খ. রিবা আল ফাদল اَلْفَضْلُ

ক. রিবা আন নাসিয়া اَلنَّسِيْئَةُ

রিবা আন নাসিয়া হচ্ছে টাকার ক্ষেত্রে যেমন : একজন লোক দশ হাজার টাকা কারও কাছ থেকে ধার নিল এই শর্তে যে, একমাস পরে তাকে এগার হাজার টাকা দিবে। অর্থাৎ টাকার বিনিময়ে টাকা লেনদেন করার ক্ষেত্রে অতিরিক্ত দেয়া নেয়া।

খ. রিবা আল ফাদল **اَلْفَضْلُ** রিবা আল ফাদল এর উদ্ভব হয় পণ্য সামগ্রী হাতে হাতে বিনিময়ের সময়ে। একই জাতীয় পণ্যের কম পরিমাণের বিনিময়ে বেশি পরিমাণ পণ্য বিনিময় করা। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সোনা সোনার বিনিময়ে বিক্রি করবে না। হ্যাঁ উভয় দিকে সোনা যদি সমপরিমাণ হয় তাহলে বিক্রি করা যাবে। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এক দিকে বেশি আর অপর দিকে কম এরূপ করবে না। রৌপ্য রৌপের বিনিময়ে বিক্রি করবে না। হ্যাঁ তবে যদি সমান সমান হয় তবে বিক্রি করা যাবে। ক্রয়-বিক্রয়ের সময় এক দিকে বেশি আর অপর দিকে কম এরূপ করবে না। উপস্থিত মাল অনুপস্থিত মালের বিনিময়ে বিক্রি করবে না।' (বুখারী ২১৭৭; মুসলিম ৪১৩৮; নাসায়ী ৪৫৮৪; তিরমিজি ১২৪১)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুল আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সোনার পরিবর্তে সোনা, রৌপ্যের পরিবর্তে রৌপ্য, গমের পরিবর্তে গম, যবের পরিবর্তে যব, খেজুরের পরিবর্তে খেজুর ও লবণের পরিবর্তে লবণ একটি আরেকটির অনুরূপ হওয়া চাই এবং হাতে হাতে নগদ বিক্রি হওয়া চাই। যদি কোনো ব্যক্তি এতে বেশি দেয় অথবা বেশি নেয় তাহলে সে সুদি লেনদেন করল। সুদ দাতা এবং সুদ গ্রহীতা উভয় পক্ষের গুনাহ সমধরনের।' (মুসলিম ৪১৪৮; নাসায়ী ৪৫৭৯)

সুদ ও মুনাফার মধ্যে পার্থক্য :

বর্তমান বিশ্বের উন্নত রাষ্ট্রগুলোতে এমনকি আমাদের দেশেও অনেকে সুদ ও মুনাফাকে এক জিনিস বলে মনে করে থাকে। অথচ এ ধারণা মূলত: আইয়ামে জাহিলিয়াত বা বর্বর যুগের। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে, قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا 'তারা বলে ব্যবসাতো সুদেরই মতো। অথচ আল্লাহপাক ব্যবসাকে হালাল করেছেন, আর সুদকে হারাম করেছেন'। হাল যমানার অনেকেই সুদকে মুনাফা বলেও প্রচার করছে। বই পুস্তকে, পত্র-পত্রিকায় 'সুদ'-এর স্থানে মুনাফা, লাভ ও Interest ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করে হারামকে নিজেদের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার লক্ষ্যে হালাল বানানোর ব্যর্থ প্রয়াসে লিপ্ত। তার বলে, 'সুদের অর্থ যেমন অতিরিক্ত, বেশি, বৃদ্ধি; অনুরূপ ব্যবসার মাধ্যমে অর্জিত মুনাফাও তো অতিরিক্ত, বেশি বা বৃদ্ধি। সুতরাং সুদ এবং মুনাফা একই জিনিস।' তাদের এ ধারণা নিছক ভ্রান্ত আর ভ্রান্ত। সুদ আর মুনাফা এক জিনিস কখনো হতে পারে না। বাহ্যিক দৃষ্টিতে এক মনে হলেও এ দু'য়ের মাঝে বিরাট তফাৎ রয়েছে। মৌলিক কয়েকটি পার্থক্য নিচে উপস্থাপন করা হলো–

১. ইসলামে সর্ব প্রকার সুদ হারাম। ইসলামে বৈধ পন্থায় অর্জিত মুনাফা হালাল।

২. কাউকে ঋণ দিয়ে নির্ধারিত সময়ের পর পূর্ব শর্তানুযায়ী যা কিছু অতিরিক্ত আদায় করা হয় তা হলো সুদ। ক্রয়-বিক্রয়ে দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্রব্যের ক্রয় মূল্যের ওপর অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করা হয় তা হচ্ছে মুনাফা।

৩. সুদের ক্ষেত্রে টাকা বা মুদ্রাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়। মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে টাকাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। বরং পণ্যের আদান প্রদানে টাকাকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৪. সুদ পূর্ব নির্ধারিত থাকে। মুনাফা অনির্ধারিত থাকে।

৫. সুদ নিশ্চিত আয়। অর্থাৎ ঋণদাতা নির্ধারিত মেয়াদান্তে সুদে মূলে ফেরৎ পাবে এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত। মুনাফা অনিশ্চিত আয়। অর্থাৎ বিক্রেতার লাভ হতেও পারে, নাও পারে।

৬. সুদের হার স্বল্পকালে পরিবর্তন হয় না। মুনাফা দ্রুত পরিবর্তনশীল।

৭. সুদে লোকসানের ঝুকি নেই। মুনাফা অর্জনে লোকসানের ঝুঁকি নিতে হয়।

৮. সুদের সম্পর্কে ঋণ ও সময়ের সাথে। মুনাফার সম্পর্ক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে।

ইসলামী ব্যাংকের নামে সুদের প্রচলন

সারা বিশ্বের ইসলামী ব্যাংকগুলো অশুভ অনৈতিক পদ্ধতি উদ্ভাবনের মাধ্যমে রিবাকে পাশ কাটানোর উদ্দেশ্যে কৌশলে বরং রিবাকে বৈধতা প্রদানের প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। সরল প্রাণ মুসলিম জনগণকে সুদি-ব্যাংকিং এর বিকল্প হিসেবে তারা যা উপস্থাপন করছে তা মূলত রিবারই ছদ্মরূপ ছাড়া আর কিছুই নয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, তারা মুরাবাহা নামক একটি পরিভাষা কৌশলে ব্যবহার করে এবং ত্রুটিপূর্ণভাবে তাকে সংজ্ঞায়িত করে। কিন্তু বাস্তবিক ক্ষেত্রে জনসাধারণকে প্রচ্ছন্নভাবে ধোঁকা দিয়েই এই ধরনের লেনদেন করা হয় যা নিশ্চিতভাবেই রিবার প্রভাব মুক্ত নয়। এই মুরাবাহা প্রকল্পের আওতায় কোনো দ্রব্য নগদ মূল্যে ক্রয় করে এবং বেশি মূল্যে তা বাকিতে বিক্রি করে। এক্ষেত্রে ব্যাংকের যুক্তি হচ্ছে এই যে, যেহেতু এ

ধরনের লেনদেনে ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে দ্রব্যের মূল্য সম্পর্কে আগেই সমঝোতা হয়ে থাকে সেহেতু এ ধরনের লেনদেন হালাল।

যদি কোনো ব্যাংক বাজার থেকে ১০ লাখ টাকা দিয়ে একটি গাড়ি ক্রয় করে এবং সে বাজারেই নগদ ১৭ লাখ টাকায় বিক্রয় করে তবে এই লেনদেনটি হবে সন্দেহজনক। কারণ যদি বাজারে ১০ লাখ টাকায় গাড়িটি পাওয়া যায় তাহলে কে ১৭ লাখ টাকা দিয়ে ব্যাংকের কাছ থেকে সেই একই গাড়ী কেন কিনতে যাবে? সেক্ষেত্রে যদি কোনো ক্রেতার বাজারদর সম্পর্কে ধারণা না থাকে এবং সে অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে তাকে ঠকিয়ে ৭ লাখ টাকা বেশি আদায় করা হয়, এ ধরনের প্রতারণাও রিবার অন্তর্ভুক্ত।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ : غَبْنُ الْمُسْتَرْسِلِ رِبًا

আনাস বিন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, একজন মুসতারসালকে (বাজারদর সম্পর্কে যে জানেনা এমন ক্রেতা) ঠকানো রিবার অন্তর্ভুক্ত। (বায়হাকী ১১২৪৩)

যদি কোনো ক্রেতা বাজার দর সম্পর্কে জানার পরও ১৭ লাখ টাকা দিয়ে সে গাড়িটি ক্রয় করে তাহলে বুঝতে হবে এ ধরনের অস্বাভাবিক লেনদেনের মধ্যে নিশ্চয়ই কোনো গলদ কিংবা কোনো অন্তর্নিহিত কারণ আছে। নয়তো ক্রেতা মানসিক ভারসাম্যহীন। সেক্ষেত্রে লেনদেনটি অবৈধ হবে।

অপরদিকে ব্যাংক যদি গাড়িটি নগদ ১০ লাখ টাকা দিয়ে কিনে ১৭ লাখ টাকায় বাকিতে বিক্রি করে তবে মূল্য বৃদ্ধির যথাযথ কারণ এখানে সময়ের উৎপাদক (ঋণ দানের মাধ্যমে সুদ গ্রহণ) ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। এ ধরনের লেনদেনে সময়ের সাথে সাথে টাকার পরিমাণও বেড়ে যায়। তাই এই অবস্থায় শুধু টাকাই টাকা উৎপাদনে সক্ষম হয়ে যায়। এ ধরনের লেনদেনের সাথে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সময়কার রিবা আন-নাসিয়ার সাথে কোনো তফাৎ নেই। রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীস অনুযায়ী এটি অবশ্যই রিবাভিত্তিক লেনদেন।

যে সমস্ত পথহারা মুসলিমগরা কৌশলে উপস্থাপিত মুরাবাহাকে হালাল বলে মনে করে তাকে আঁকড়ে ধরে আছেন তাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কে ভয় পাওয়া উচিত। কারণ তারা মুরাবাহাকে হালাল বলে

প্রচার করে সাধারণ মুসলিম জনগণকে প্রতারণা করছেন, এই কাজে তাদের কোনো কল্যাণ তো হবেই না বরং পথভ্রষ্টকারী হিসেবে তাদের শাস্তি দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়া হবে। কেননা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন–

رَبَّنَا هَـٰؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ

'হে আমাদের রব! এরাই হলো সেসব লোক যারা আমাদের বিভ্রান্ত করেছিল কাজেই এদের আজাব দ্বিগুণ করে দিন।' (আ'রাফ ৭:৩৮)

বায়' মুয়াজ্জাল সম্পর্কে ব্যাখ্যা

বাকিতে কোনো কিছু লেনদেন করাকে اَلْبَيْعُ الْمُؤَجَّلُ বায়' মুয়াজ্জাল বলে। কোনো দ্রব্য বর্তমান অবস্থায় ক্রয় করে পরবর্তীকালে মূল্য পরিশোধ করা হল বকেয়া বা বাকিতে লেনদেন। বাকিতে লেনদেন সর্বদা রিবা হয় না। আমাদের রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বাকিতে খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতেন। তবে সে সময়ের বাকিতে লেনদেন বা বায়' মুয়াজ্জাল আর বর্তমান সময়ের বাকিতে ক্রয়ের মধ্যে বেশ কিছু পদ্ধতিগত পার্থক্য আছে, সেগুলো হলো

১) কোনো দ্রব্য বাকিতে ক্রয়ের ক্ষেত্রে তৎকালীন সময়ে বাড়তি মূল্য পরিশোধ করতে হতো না। সম্মানিত পাঠক, লক্ষ্য করুন! বর্তমানে বাড়ি, গাড়ি বা কোনো কিছু বাকিতে ক্রয় করার জন্য উক্ত বন্ধকী ব্যবস্থায় ঋণের বিপরীতে পরিশোধযোগ্য মূল্যের চেয়ে অধিক মূল্য পরিশোধ করতে হয়, এবং এটাই রিবা।

২) বন্ধক রাখার মাধ্যমে ঋণের নিরাপত্তা বিধান বাকিতে কোনো কিছু ক্রয় করার ক্ষেত্রে কোনো কিছু বন্ধক রাখা হতো যা উক্ত লেনদেনের নিশ্চয়তা প্রদান করতো। ঋণ পরিশোধের পূর্বেই ক্রেতা মৃত্যুবরণ করলে উক্ত বন্ধকীকৃত পণ্য বিক্রির মাধ্যমে বাকিতে কেনা পণ্যের মূল্য উদ্ধার করা সম্ভব হতো আবার ক্রেতাও ঋণ মুক্ত হয়ে যেতো।

৩) বাকিতে ক্রয়কৃত পণ্য সামগ্রী সর্বদিক থেকে ঝামেলামুক্ত ছিল, অর্থাৎ পরিশোধের সময় কোনো প্রকার অজুহাত বা ফাসাদ সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। (যেমন আমের ফলন যা এখনো সংগ্রহ করার উপযুক্ত হয়নি)।

উপরোক্ত লেনদেন রিবার প্রভাবমুক্ত। এ ধরনের পণ্য বাকিতে ক্রয় করার ক্ষেত্রে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুমোদন রয়েছে।

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা.) বলেছেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোনো এক ইয়াহুদির নিকট হতে নির্দিষ্ট মেয়াদে (বাকিতে) মূল্য পরিশোধের শর্তে খাদ্য ক্রয় করেন এবং তার নিকট লোহার বর্ম বন্ধক রাখেন। (বুখারী ১৯৩৩; মুসলিম ৩৯৬৯)

আয়েশা (রা.) আরো বলেন, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওফাত কালে ত্রিশ 'সা' যবের বিনিময়ে এক ইয়াহুদির কাছে তাঁর কোর্তা (জামা) বন্ধক ছিল (সা হলো রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর যুগের ওজন প্রকাশের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ)

সুদ ও মুনাফার একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র

সুদ	মুনাফা
১. ইসলামে সর্বপ্রকার সুদ হারাম।	১. ইসলামে সর্ব প্রকার মুনাফা হালাল।
২. কাউকে ঋণ দিয়ে নির্ধারিত সময়ের পর পূর্ব শর্তানুযায়ী যা কিছু অতিরিক্ত আদায় করা হয় তা হলো সুদ।	২. ক্রয়-বিক্রয়ে দ্রব্যের বিক্রয় মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে দ্রব্যের ক্রয় মূল্যের ওপর অতিরিক্ত অর্থ ধার্য করা হয় তা হচ্ছে মুনাফা।
৩. সুদের ক্ষেত্রে টাকা বা মুদ্রাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়।	৩. মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে টাকাকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয় না। বরং পণ্যের আদান প্রদানে টাকাকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা হয়।
৪. সুদ পূর্ব নির্ধারিত থাকে।	৪. মুনাফা অনির্ধারিত থাকে।
৫. সুদ নিশ্চিত আয়। অর্থাৎ ঋণদাতা নির্ধারিত মেয়াদান্তে সুদে মূল্য ফেরৎ পাবে এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত।	৫. মুনাফা অনিশ্চিত আয়। অর্থাৎ বিক্রেতার লাভ হতেও পারে নাও হতে পারে।
৬. সুদের হার স্বল্পকালে পরিবর্তন	৬. মুনাফা দ্রুত পরিবর্তনশীল।

হয় না।	
৭. সুদে লোকসানের ঝুঁকি নেই।	৭. মুনাফা অর্জনে লোকসানের ঝুঁকি বহন করতে হয়।
৮. সুদের সম্পর্ক ঋণ ও সময়ের সাথে।	৮. মুনাফার সম্পর্ক ক্রয়-বিক্রয়ের সাথে।

সংক্ষেপে মূল কথা

দ্বীন হিফাজত করার জন্য মুরতাদের শাস্তি 'হাদ্দুর রিদ্দাহ'।
জান হিফাজত করার জন্য ক্বিসাস এর বিধান 'হাদ্দুল ক্বিসাস'।
বিবেক-বুদ্ধির হেফাজত করার জন্য মাদক এর শাস্তি 'হাদ্দুল খাম্‌র'।
বংশ হিফাজত করার জন্য যিনা-ব্যভিচার এর শাস্তি 'হাদ্দুয্‌ যিনা'।
মান-মর্যাদা হিফাজত করার জন্য অপবাদের শাস্তি 'হাদ্দুল ক্বাযাফ'।
মাল হিফাজত করার জন্য চুরির শাস্তি 'হাদ্দুস সারাক্বা' ইত্যাদি।

এই বিধানগুলো মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নিজেই নাজিল করেছেন। সুতরাং কেউ যদি আল্লাহর এ সকল আইনকে অস্বীকার করে বা এ যুগে এ আইন চলে না বা চললেও তার চেয়ে মানব রচিত আইন ভালো এ জাতীয় আকিদা পোষণ করে সে ব্যক্তি মুসলিম থাকে না বরং সে ব্যক্তি কাফের ও মুরতাদ হয়ে যায়।

চতুর্থ অধ্যায় : اِجْتِنَابُ النَّوَاهِيْ 'ইজতিনাবুন নাওয়াহী'

কবীরা গুনাহ সমূহ :

এক : আল্লাহর সাথে শিরক করা। শিরক দুই প্রকার :

১. শিরকে আকবার : আল্লাহর সাথে আল্লাহ ছাড়া অন্য কোনো কিছুর ইবাদত করা। অথবা যে কোনো প্রকারের ইবাদতকে আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর জন্য নিবেদন করা। যেমন : আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উদ্দেশ্যে প্রাণী জবেহ করা ইত্যাদি। যদি কোনো ব্যক্তি ইবাদতের কিছু অংশে গাইরুল্লাহকে শরীক করে তবুও তা শিরক। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে−

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

'নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা তার সাথে শিরক করাকে ক্ষমা করবেন না। তবে শিরক ছাড়া অন্যান্য গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন।' (নিসা ৪:৪৮)

২. শিরকে আসগার বা ছোট শিরক : রিয়া অর্থাৎ লোক দেখানোর উদ্দেশ্য নিয়ে আমল করা ইত্যাদি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন−

الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ

'অতএব দুর্ভোগ সে মুসল্লীদের যারা তাদের সালাত সম্পর্কে বেখবর যারা তা লোক দেখানোর জন্য করে।' (মাউন ১০৭:৪-৬)

হাদীসে কুদসীতে উল্ল্যেখ রয়েছে−

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِى غَيْرِى تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন, আমি অংশিদারিত্ব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোনো কাজ করে আর ঐ কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি ঐ ব্যক্তিকে তার শিরকে ছেড়ে দেই।' (মুসলিম ৭৬৬৬)

দুই : মানুষ হত্যা করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

'আর যারা আল্লাহর সাথে অন্য ইলাহকে ডাকে না এবং যারা আল্লাহ যে নাফ্সকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন যথার্থ কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করে না। আর যারা ব্যভিচার করে না। আর যে তা করবে সে আজাবপ্রাপ্ত হবে।' (ফুরকান ২৫:৬৮)

উল্লেখিত আয়াতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন। আর যারা হত্যা করবে তাদের জন্য কঠিন শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। সুতরাং শরীয়ত অনুমোদিত কারণ ছাড়া মানুষ হত্যা করা কবীরা গুনাহ।

তিন : জাদু করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ

'কিন্তু শয়তানেরা কুফরি করে মানুষকে জাদু শিক্ষা দিত।' (বাকারা ২:১০২)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِى حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا وَالتَّوَلِّى يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاَتِ الْمُؤْمِنَاتِ

'আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা সাতটি ধংসাত্বক গুনাহ থেকে বেঁচে থাক। প্রশ্ন করা হলো ইয়া রাসুলুল্লাহ! কি সেগুলো? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সেগুলো হলো : ১. শিরক করা, ২. জাদু করা, ৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, ৪. ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করা, ৫. সুদ খাওয়া, ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পালায়ন করা, ৭. স্বতী-সাদ্ধী মুমিন নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেওয়া।' (বুখারী ৩৮৬৬, ৬৮৫৭, মুসলিম ২৭২, আবু দাউদ ২৮৭৬, নাসায়ী ৩৬৭৩)

চার : সালাত ত্যাগ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

'তাদের পর আসলো (অপদার্থ) বংশধর। তারা সালাত নষ্ট করল ও লালসার বশবর্তী হলো, সুতরাং তারা অচিরেই কু-কর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে।' (মারইয়াম ১৯:৫৯)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ تَرْكَ الصَّلاَةِ

'নিশ্চয়ই মুমিন ব্যক্তি এবং শিরক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত ত্যাগ করা।' (মুসলিম ২৫৬)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন–

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْعَهْدَ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ

'বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমাদের এবং তাদের (কাফেরদের) মধ্যে পার্থক্য হলো সালাত, যে তা পরিত্যাগ করল সে কাফের হয়ে গেল।' (নাসায়ী ৪৬২; তিরমিজি ২৬২১; ইবনে মাজাহ ১০৭৯)

পাঁচ : যাকাত আদায় না করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

'আল্লাহ যাদের তার অনুগ্রহ প্রদান করেছেন এবং তারা তা নিয়ে কৃপণতা করে, তারা যেন ধারণা না করে যে, তা তাদের জন্য কল্যাণকর। বরং তা তাদের জন্য অকল্যাণকর। যা নিয়ে তারা কৃপণতা করেছিল, কিয়ামত দিবসে তা দিয়ে তাদের বেড়ি পরানো হবে। আর আসমানসমূহ ও জমিনের

উত্তরাধিকার আল্লাহরই জন্য। আর তোমরা যা আমল করো সে ব্যাপারে আল্লাহ সম্যক জ্ঞাত।' (আল ইমরান ৩:১৮০)

ছয় : কোনো কারণ ছাড়া রমাদানের সাওমা ভঙ্গ করা বা না রাখা।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ بُنِىَ الإِسْلاَمُ عَلَى خَمْسَةٍ عَلَى أَنْ يُوَحَّدَ اللَّهُ وَإِقَامِ الصَّلاَةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ وَالْحَجِّ

'আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইসলাম পাঁচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহর এককত্ব ঘোষণা করা, সালাত কায়েম করা, যাকাত আদায় করা, রমজানে সিয়াম পালন করা এবং হজ্জ করা।' (মুসলিম ১৯; বুখারী ৮; তিরমিজি ২৬০৯)

সাত : সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ্জ না করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

'আর এ ঘরের হজ্জ করা সে সকল মানুষের জন্য অবশ্য কর্তব্য যারা সেখানে যাওয়ার সামর্থ রাখে। আর যে প্রত্যাখ্যান করবে সে জেনে রাখুক আল্লাহ সারা বিশ্বের কোনো কিছুর মুখাপেক্ষী নয়।' (আল ইমরান ৩:৯৭)

আট : মাতা পিতার অবাধ্য হওয়া। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ – ثَلاَثًا – الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ

'আবু বাকরা (রা.) বলেন, আমরা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে বসে ছিলাম এমন সময় তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহ কি তা বলে দিব না? আর তা হলো আল্লাহর সাথে শরীক করা, মাত-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা কথা বলা।' (মুসলিম ২৬৯; বুখারী ৬৮৭১; নাসায়ী ৪০২১; তিরমিজি ২৩০১)

নয় : আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা এবং নিকট আত্মীয়দের পরিত্যাগ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ – أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ

'ক্ষমতা লাভের পর সম্ভবত তোমরা পৃথিবীতে ফাসাদ করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এদের প্রতিই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা অভিসম্পাত করেন, অতঃপর তাদের বধির ও দৃষ্টিহীন করেন।' (মুহাম্মদ ৪৭:২২-২৩)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ

'জুবাইর ইবনে মুত্বঈম (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, আত্মীয়তার ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।' (মুসলিম ৬৬৮৫; আবু দাউদ ১৬৯৮)

দশ : ব্যভিচার করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

'তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেওনা। নিশ্চয়ই এটা অশ্লীল কাজ ও অতি মন্দ পথ।' (ইসরা ১৭:৩২)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا زَنَى الرَّجُلُ خَرَجَ مِنْهُ الإِيمَانُ كَانَ عَلَيْهِ كَالظُّلَّةِ فَإِذَا انْقَطَعَ رَجَعَ إِلَيْهِ الإِيمَانُ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন কোনো মানুষ ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তখন তার থেকে ঈমান বের হয়ে যায়। ঈমান তার মাথার ওপর ছায়ার মতো অবস্থান করে যখন সে বিরত থাকে ঈমান আবার ফিরে আসে।' (আবু দাউদ ৪৬৯২; তিরিমিজি ২৬২৫)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبُهُ مِنَ

الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ

'আবু হুরাইরা (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ইরশাদ করেন, আদম সন্তানের ওপর ব্যভিচারের কিছু অংশ লিপিবদ্ধ হয়েছে সে অবশ্যই তার মধ্যে লিপ্ত হবে। দুই চক্ষুর ব্যভিচার হলো দৃষ্টি এবং তার দুই কানের ব্যভিচার হলো শ্রবন, মুখের ব্যভিচার হলো কথা বলা, হাতের ব্যভিচার হলো স্পর্শ করা, পায়ের ব্যভিচার হলো পদক্ষেপ আর অন্তরে ব্যভিচারের আশা ও ইচ্ছার সঞ্চার হয়, অবশেষে লজ্জাস্থান একে সত্য অথবা মিথ্যায় পরিণত করে।' (মুসলিম ৬৯২৫)

এগার : পুং মৈথুন বা স্ত্রীর মলদ্বারে সঙ্গম করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ (৮০) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

'লুত (আ.) কে পাঠিয়েছিলাম, সে তার সম্প্রদায়কে বলেছিল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী বাদ দিয়ে পুরুষের নিকট গমন করো, তোমরা তো সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।' (আরাফ ৭:৭০-৭১)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

'ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা কাউকে লূত সম্প্রদায়ের কাজ (সমকাম) করতে দেখলে, যে করে এবং যার সাথে করা হয় উভয়কে হত্যা করে ফেল।' (আবু দাউদ ৪৪৬৪; তিরমিজি ১৪৫৬; ইবনে মাজাহ ২৫৬১)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَىْ رَجُلٍ أَتَىْ

رَجُلاً أَوْ امْرَأَةً فِي الدُّبُرِ

'ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ ব্যক্তির দিকে দৃষ্টি দিবেন না, যে কোনো পুরুষের সাথে সমকামিতায় লিপ্ত হয় অথবা কোনো মহিলার পেছনের রাস্তা দিয়ে সহবাস করে।' (তিরমিজি ১১৬৫)

বার : সুদ খাওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ

'যারা সুদ খায় তারা দাঁড়াবে ঐ ব্যক্তি ন্যায় যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল করে দেয়।' (বাকারা ২:২৭৫)

তের : এতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

'যারা এতিমের অর্থ-সম্পদ অন্যায়ভাবে খায়, তারা নিজেদের পেটে আগুনই ভর্তি করেছে এবং সত্তরই তারা অগ্নিতে প্রবেশ করবে।' (নিসা ৪:১০)

চোদ্দ : আল্লাহ এবং তাঁর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর মিথ্যা আরোপ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ

'যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে কেয়ামতের দিন আপনি তাদের মুখ কাল দেখবেন।' (যুমার ৩৯:৬০)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে সে যেন তার অবস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নিল।' (মুসলিম ৪; বুখারী ১২৯১; আবু দাউদ ৩৬৫৩)

পনের : যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

'আর যে ব্যক্তি লড়াইয়ের ময়দান হতে পিছু হটে যাবে সে আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। তার স্থান হচ্ছে জাহান্নাম আর তা খুবই নিকৃষ্ট প্রত্যাবর্তন স্থল। অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তন করতে কিংবা নিজ সৈন্যদের নিকট স্থান নিতে আসে সে ব্যতীত।' (আনফাল ৮:১৬)

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বর্তমান যুগে মুসলমানরা শুধু যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করে না বরং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে কোনো ধরনের অংশই নিতে চায় না। আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন।

ষোল : শাসক ব্যক্তি কর্তৃক প্রজাদের ধোঁকা দেয়া এবং তাদের ওপর অত্যাচার করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'শুধু তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, যারা মানুষের ওপর অত্যাচার চালায় এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।' (শুরা ৪২:৪২)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যে আমাদের ধোঁকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।' (মুসলিম ২৯৪)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ইরশাদ করেন, অত্যাচার কেয়ামতের দিন চরম অন্ধকার হবে।' (বুখারী ২৪৪৭; মুসলিম ৬৭৪১; তিরমিজি ২০৩০)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ مَنْ وَلاَّهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ شَيْئًا مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَاحْتَجَبَ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمُ احْتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَ حَاجَتِهِ وَخَلَّتِهِ وَفَقْرِهِ

'মুআবিয়া (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি কোনো বিষয়ে মুসলিমদের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব পান, অতঃপর সে তাদের অভাব-অনটন ও প্রয়োজনের সময় নিজেকে গোপন করে রাখে, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কেয়ামতের দিন তার অভাব দুরকরণের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন না।' (আবু দাউদ ২৯৫০)

বর্তমানে আমাদের অবস্থা অত্যন্ত দু:খজনক। এর কারণ হলো আমরা আমাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করি। আর বাতিলের ব্যাপারে একেবারেই নিশ্চুপ, নির্বিকার এবং অন্যায়ের কোনো প্রতিকার নেই।

সতের : গর্ব, অহঙ্কার, আত্মম্ভরিতা, হট-ধর্মিতা করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ

'নিশ্চয়ই আল্লাহ অহঙ্কারীকে পছন্দ করেন না।' (নাহল ১৬:২৩)

যে ব্যক্তি সত্যের বিরূদ্ধে অহঙ্কার করে তার ঈমান তার কোনো উপকার করতে পারে না। ইবলিসের অবস্থা এর জলন্ত প্রমাণ।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِى قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ قَالَ رَجُلٌ إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُونَ ثَوْبُهُ حَسَنًا وَنَعْلُهُ حَسَنَةً قَالَ إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ وَغَمْطُ النَّاسِ

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যার অন্তরে এক বিন্দু পরিমান অহঙ্কার রয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। জনৈক ব্যক্তি বললেন, যে কোনো ব্যক্তি চায় তার জামা-কাপড়, জুতা-সেন্ডেল সুন্দর হোক তাহলে এটাও কি অহঙ্কার? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, আল্লাহ নিজে সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন (অর্থাৎ

এগুলি অহংকারের অন্তর্ভূক্ত নয়)। অহঙ্কার হলো সত্যকে গোপন করা আর মানুষকে অবজ্ঞা করা।' (মুসলিম ২৭৫; তিরমিজি ১৯৯৯)

আঠার : মিথ্যা সাক্ষী দেয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুরআনে তাঁর প্রকৃত বান্দাদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন–

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

'তারা মিথ্যা এবং বাতিল কাজে যোগদান করে না।' (ফুরকান ২৫:৭২)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِى بَكْرَةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَقَالَ أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ – ثَلاَثًا – الإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ أَوْ قَوْلُ الزُّورِ

'আবু বাকরা (রা.) বলেন, আমরা একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে থাকা অবস্থায় তিনি বললেন, আমি কি তোমাদের সবচেয়ে বড় গুনাহ কি তা বলে দিব না? আর তা হলো আল্লাহর সাথে শরীক করা, মাত-পিতার অবাধ্য হওয়া এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।' (মুসলিম ২৬৯; বুখারী ৬৮৭১; নাসায়ী ৪০২১; তিরমিজি ২৩০১)

উনিশ : মাদকদ্রব্য সেবন করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ নাপাক ও শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' (মায়েদা ৫:৯০)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

'ইবনে ওমর (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে ইরশাদ করেন, প্রত্যেক নেশা জাতীয় দ্রব্য হলো মদ আর সকল প্রকার মদ হারাম।' (মুসলিম ৫৩৩৯)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

'ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ মদ পানকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, প্রস্তুতকারী, বহনকারী এবং যার জন্য বহন করছে তাদের সকলকে অভিসম্পাত দিয়েছেন।' (আবু দাউদ ৩৬৭৬)

বিশ : জুয়া খেলা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে মুমিনগণ! নিশ্চয়ই মদ, জুয়া, প্রতিমা-বেদী ও ভাগ্যনির্ধারক তীরসমূহ নাপাক ও শয়তানের কর্ম। সুতরাং তোমরা তা পরিহার করো, যাতে তোমরা সফলকাম হও।' (মায়েদা ৫:৯০)

একুশ : সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'যারা সচ্চরিত্রা, সরলমনা মুমিন নারীদের প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে মহাআজাব।' (নূর ২৪:২৩)

বাইশ : গণীমতের মাল আত্মসাৎ করা। যে ব্যক্তি গণীমতের মাল পাওনাদারদের মধ্যে বণ্টন করার পূর্বে কোনো কিছু আত্মসাৎ করে সে, কিয়ামতের দিন ঐ সম্পদকে বহন করা অবস্থায় উপস্থিত হবে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'আর যে ব্যক্তি গণীমতের মালে খেয়ানত করল সে কেয়ামতের দিন সেই খেয়ানতকৃত বস্তু বহন করে উপস্থিত হবে।' (আল ইমরান ৩:১৬১)

তেইশ : চুরি করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

حَكِيمٌ

'আর পুরুষ চোর ও নারী চোর তাদের উভয়ের হাত কেটে দাও তাদের অর্জনের প্রতিদান ও আল্লাহর পক্ষ থেকে শিক্ষণীয় আজাবস্বরূপ এবং আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময় ।' (মায়েদা ৫:৩৮)

চব্বিশ : ডাকাতি করা। মানুষের সম্পদ ছিনতাই করা অথবা বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাদের থেকে নিয়ে নেয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের আজাব কেবল এই যে, তাদের হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদের দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা আর তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহাআজাব।' (মায়েদা ৫:৩৩)

পঁচিশ : মিথ্যা শপথ করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ هُوَ عَلَيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ

'আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে এবং তা দ্বারা কোনো মুসলিমের সম্পদকে অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করে সে আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করবে এমন অবস্থায় যে আল্লাহ তার ওপর ক্রোধান্বিত।' (বুখারী ২৩৫৬; মুসলিম ৩৭২; আবু দাউদ ৩২৪৫)

হাদীসে আরও ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبَائِرُ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ

'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কবীরা গুনাহ হলো- আল্লাহর সাথে শরীক করা, মাতা-পিতার নাফরমানী করা, হত্যা করা, মিথ্যা শপথ করা।' (বুখারী ৬৬৭৫; নাসায়ী ৪০২২; তিরমিজি ৩০২০)

ছাব্বিশ : যুলুম, অত্যাচার করা। যুলুম বিভিন্নভাবে হতে পারে। মানুষের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করা, অন্যায়ভাবে প্রহার করা, গালি দেয়া, তাদের ওপর বাড়াবাড়ি করা, দুর্বলদের ওপর চড়াও হওয়া ও অন্যান্য যে সকল কাজে মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা সবই যুলুম। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ

'অত্যাচারীরা শীঘ্রই জানবে তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়?' (শুআরা ৩৬:২২৭)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা জুলুম করা থেকে বেঁচে থাক, কারণ যুলুম কেয়ামতের দিন গভীর অন্ধকারে পরিণত হবে।' (মুসলিম ৬৭৪১)

সাতাইশ : চাঁদাবাজী ও অন্যায় টোল আদায় করা। বাস্তবিক পক্ষে এটি এক ধরনের ডাকাতি। কারণ এতে মানুষের ওপর এক ধরনের জরিমানা নির্ধারণ করা হয়। চাঁদা উসুলকারী, লেখক এবং গ্রহণকারী গুনাহের মধ্যে সমানভাবে শামিল হবে। এরা সবাই হারাম ভক্ষণকারী, চাঁদাবাজ এবং জুলুমের বড় সহযোগী হিসেবে গণ্য হবে। শুধু তাই নয় বরং সেই প্রকৃত পক্ষে জুলুমকারী ও অত্যাচারী।

আঠাইশ : হারাম খাওয়া, তা যে কোনো উপায়ে হোক না কেন। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ

'তোমরা একে অন্যের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করো না।' (বাকারা ২:১৮৮)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم ..ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلَ يُطِيلُ

السَّفَرَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِىَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তি দীর্ঘ পথ অতিক্রম করলো। বিক্ষিপ্ত চুল, ধূলা-বালিযুক্ত শরীর নিয়ে দু'হাত আসমানের দিকে উঠিয়ে দুআ করতে থাকে আর বলতে থাকে, হে রব! হে রব! অথচ তার খাদ্য হারাম, পানীয় হারাম, পোশাক হারাম এবং হারাম দ্বারা শক্তি সঞ্চয় করা হয়েছে। তাহলে কিভাবে তার দুআ কবুল করা হবে।' (মুসলিম ২৩৯৩; তিরমিজি ২৯৮৯)

উনত্রিশ : আত্মহত্যা করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

'আর তোমরা নিজেরা নিজেদের হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের ব্যাপারে পরম দয়ালু। আর যে ঐ কাজ করবে সীমালঙ্ঘন ও অন্যায়ভাবে, আমি অচিরেই তাকে আগুনে প্রবেশ করাব। আর সেটি হবে আল্লাহর ওপর সহজ।' (নিসা ৪:২৯-৩০)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে:

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ فَحَدِيدَتُهُ فِى يَدِهِ يَتَوَجَّأُ بِهَا فِى بَطْنِهِ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ شَرِبَ سَمًّا فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا وَمَنْ تَرَدَّى مِنْ جَبَلٍ فَقَتَلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَرَدَّى فِى نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ধরালো অস্ত্র দ্বারা নিজেকে হত্যা করে সে উক্ত অস্ত্র দ্বারা জাহান্নামের আগুনে নিজের পেটে আঘাত করতে থাকবে। সে চিরদিন এই জাহান্নামে অবস্থান করবে। যে বিষপান করে নিজেকে হত্যা করল সে চিরদিন জাহান্নামে অবস্থান করবে এবং বিষ পান করে নিজেকে হত্যা করতে থাকবে। আর যে নিজেকে পাহাড় থেকে ফেলে

দিয়ে হত্যা করবে সেও চিরদিন জাহান্নামে অবস্থান করবে এবং পাহাড় থেকে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে।' (মুসলিম ৩১৩; তিরমিজি ২০৪৪)

ত্রিশ : অধিকাংশ সময় মিথ্যা বলা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ...إِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই মিথ্যা পাপাচারের দিকে পথ দেখায়। আর পাপাচার জাহান্নামে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যা বলতে থাকলে আল্লাহর নিকট মিথ্যুক হিসেবে তার নাম লেখা হয়ে যায়।' (বুখারী ৬০৯৪; মুসলিম ৬৮০৩; আবু দাউদ ৪৯৯১; তিরমিজি ১৯৭১)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ

'এবং তাদের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত যারা মিথ্যাবাদী।' (আল ইমরান ৩:৬১)

একত্রিশ : মানব রচিত বিধানে দেশ পরিচালনা ও বিচার ফয়সালা করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

'আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই কাফির।' (মায়েদাহ ৫:৪৪)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

'আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই যালেম।' (মায়েদাহ ৫:৪৫)

অপর আয়াতে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

'আর যারা আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, তার মাধ্যমে ফয়সালা করে না, তারাই ফাসেক।' (মায়েদাহ ৫:৪৭)

বত্রিশ : বিচার ফয়সালার ক্ষেত্রে ঘুষ গ্রহণ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

'তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ ভোগ করো না। এবং জনগণের সম্পদের কিয়দাংশ জেনে-শুনে পাপ পন্থায় আত্মসাৎ করার উদ্দেশ্যে শাসন কর্তৃপক্ষের হাতেও তুলে দিও না।' (বাকারা ২:১৮৮)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي

'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঘুষ দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ের ওপর অভিশাপ করেছেন।' (আহমদ ৬৯৮৪)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَفَعَ لِأَحَدٍ شَفَاعَةً فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً فَقَبِلَهَا فَقَدْ أَتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ الرِّبَا

'আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কোনো ব্যক্তি তার ভাইয়ের জন্য কোনো বিষয়ে সুপারিশ করে, পরবর্তীতে তার জন্য হাদিয়া বা উপঢৌকন প্রেরণ করা হয় এবং সে তা গ্রহণ করে। তাহলে উক্ত ব্যক্তি এক মারাত্মক ধরনের সুদের দ্বারে প্রবেশ করলো।' (আহমদ ২২২৫১)

তেত্রিশ : মহিলা পুরুষের বেশ ধারণ করা এবং পুরুষের মহিলার বেশ ধারণ করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنْ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنْ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

'ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলার বেশধারী পুরুষের ওপর এবং পুরুষের বেশধারী মহিলাদের

ওপর অভিসম্পাত করেছেন।' (বুখারী ৫৮৮৫; আবু দাউদ ৪০৯৯; ইবনে মাজাহ ১৯০৪)

চৌত্রিশ : আপন স্ত্রীকে ব্যভিচারে সুযোগ দেওয়া। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخَبَثَ

'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জান্নাত হারাম করেছেন, (১) যে মদ তৈরি করে, (২) যে মাতা-পিতার নাফরমানী করে, (৩) ঐ চরিত্রহীন ব্যক্তি যে নিজ স্ত্রীকে অশ্লীলতা ও ব্যভিচার করতে সুযোগ দেয়।।' (আহমদ ৫৩৭২)

দাইউস ঐ ব্যক্তিকে বলে যে তার স্ত্রী অশ্লীল কাজ বা ব্যভিচার করলে সে ভালো মনে করে গ্রহণ করে অথবা প্রতিবাদ না করে চুপ থাকে।

পয়ত্রিশ : হালালকারী এবং যারা জন্য হালাল করা হয় উভয়ে গুনাহগার। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَلِيٍّ رضى الله عنه عَنِ النَّبِيِّ –صلى الله عليه وسلم–أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

'আলী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হালালকারী এবং যার জন্য হালাল করা হয় উভয়ের প্রতি আল্লাহর অভিশাপ।' (আবু দাউদ ২০৭৮; তিরমিজি ১১১৯; ইবনে মাজাহ ১৯৩৪)

এর ব্যাখ্যা হলো, কেউ তিন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে এই শর্তে বিবাহ করলো যে, সে সহবাস করে আবার তালাক দিয়ে দিবে, যাতে প্রথম স্বামী পুনরায় বিবাহ করতে পারে, এই ব্যক্তিকে মুহাল্লিল বা হালালকারী বলে।

ছত্রিশ : পেশাব থেকে বেঁচে না থাকা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ الْبَوْلِ وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

'ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

একদা দুটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করেন এবং বলেন, এই দুই কবরবাসীকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কোনো বড় ধরনের কাজের জন্য নয়। বরং তাদের একজনের অভ্যাস ছিল সে প্রসাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করতো না। আর অন্য জন মানুষের একজনের দোষ অন্যের কাছে বলে বেড়াতো।' (বুখারী ২১৮; বায়হাকী ৪৩০৯; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ১২১৬৯)

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

'আপন পোশাক পবিত্র করুন।' (মুদ্দাসির ৭৪:৪)

অতএব আপনাদের কাপড়ে বা শরীরে যেন প্রসাব না জড়ায়। যদি কোনো কারণে জড়িয়েও যায় তাহলে তা সাথে সাথে পবিত্র করে নিবেন।

আমরা আমাদের নিজের জন্য ও আপনাদের জন্য এই বিপদ হতে মহান আল্লাহর দয়া ও রহমতের দ্বারা পরিত্রাণ কামনা করছি।

সাইত্রিশ : চুতষ্পদ জন্তুর চেহারা বিকৃতি করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– أَمَا بَلَغَكُمْ أَنِّى قَدْ لَعَنْتُ مَنْ وَسَمَ الْبَهِيمَةَ فِى وَجْهِهَا أَوْ ضَرَبَهَا فِى وَجْهِهَا

'জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমাদের নিকট কি পৌঁছে নাই, যে ব্যক্তি চতুষ্পদ জন্তুর চেহারা বিকৃত করে অথবা চেহারার ওপর আঘাত করে আমি তার ওপর অভিশাপ করছি।' (আবু দাউদ:২৫৬৬)

আটত্রিশ : দুনিয়া অর্জনের লক্ষ্যে ইলমে দ্বীন শিক্ষা করা এবং সত্যকে গোপন করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ – إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

'আমি যে সব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি মানুষের জন্য কিতাবে তা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করার পরও যারা তা গোপন রাখে আল্লাহ তাদের অভিসম্পাত দেন এবং অভিশাপকারীরাও তাদের অভিশাপ দেয়। কিন্তু যারা তওবা করে ও নিজেদের সংশোধন করে আর সত্যকে

সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করে। তাদের প্রতি আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' (বাকারা ২:১৫৯-১৬০)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ لِيُبَاهِيَ بِهِ الْعُلَمَاءَ وَيُجَارِيَ بِهِ السُّفَهَاءَ وَيُصْرِفَ بِهِ وُجُوْهَ النَّاسِ إِلَيْهِ أَدْخَلَهُ اللهُ جَهَنَّمَ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি জ্ঞানীদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করার লক্ষ্যে অথবা মূর্খের সাথে বিতর্কের উদ্দেশ্যে অথবা মানুষের দৃষ্টি তার প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করে আল্লাহ তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। (ইবনে মাজাহ ২৬০; তাবরানী ৫৭০৮; আলবানী র: হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তি দ্বীনি ইলম শিক্ষা করল ধন-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে, সে কেয়ামতের দিন জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।' (আবু দাউদ ৩৬৬৬; ইবনে মাজাহ ২৫২; আহমদ ৮৪৫৭)

উনচল্লিশ : খিয়ানত করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

'হে ইমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তার রাসুলের সাথে খেয়ানত করো না এবং জেনে শুনে নিজেদের পারস্পরিক আমানতের খেয়ানত করো না। (আনফাল ৮:২৭)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَلَّمَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

'আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যার আমানতদারী নাই, তার ঈমান নাই, আর যে

প্রতিজ্ঞা পূরণ করে না তার কোনো ধর্ম নাই।' (আহমদ ১২৫৬৭; বায়হাকী ১৩০৬৫)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ

'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, চারটি দোষ যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে হবে প্রকৃত মুনাফেক। আর যার মধ্যে এর একটি পাওয়া যাবে তার মধ্যে নিফাকের একটি দোষ পাওয়া গেল, যতক্ষণ না সে ঐ দোষ বর্জন করবে (১) যখন তার নিকট আমানত রাখা হয় সে, খেয়ানত করে।' (বুখারী ৩৪)

চল্লিশ : খোঁটা দেয়া। আল্লাহ বলেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনুগ্রহের কথা প্রকাশ করে এবং কষ্ট দিয়ে নিজেদের দান ছদকা ধ্বংস করো না।' (বাকারা ২:২৬৪)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِى ذَرٍّ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ ثَلاَثَةٌ لاَ يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلاَ يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ الْمُسْبِلُ وَالْمَنَّانُ وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ

'আবু যর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন ব্যক্তির সাথে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা কেয়ামতের দিন কোনো কথা বলবেন না, তাদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি দিবেন না, তাদের গুনাহ হতে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্যে রয়েছে যন্ণাদায়ক শাস্তি। (১) যে ব্যক্তি পরিধেয় কাপড় টাখনু-গিরার নীচে ঝুলিয়ে দেয়, (২) খোঁটাদানকারী, যে কোনো কিছু দান করে খোঁটা দেয় (৩) যে মিথ্যা শপথ করে দ্রব্য সামগ্রী বিক্রি করে।' (মুসলিম ৩০৬; আবু দাউদ ৪০৮৯; নাসায়ী ২৫৬২)

একচল্লিশ : তকদীরকে অস্বীকার করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنِ ابْنِ الدَّيْلَمِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ اللَّهَ عَذَّبَ أَهْلَ سَمَاوَاتِهِ وَأَهْلَ أَرْضِهِ لَعَذَّبَهُمْ غَيْرَ ظَالِمٍ لَهُمْ وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانَتْ رَحْمَتُهُ لَهُمْ خَيْرًا مِنْ أَعْمَالِهِمْ وَلَوْ كَانَ لَكَ جَبَلُ أُحُدٍ أَوْ مِثْلُ جَبَلِ أُحُدٍ ذَهَبًا أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا قَبِلَهُ اللَّهُ مِنْكَ حَتَّى تُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ وَتَعْلَمَ أَنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَأَنَّكَ إِنْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا دَخَلْتَ النَّارَ

'ইবনে দায়লামী (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছেন, যদি আল্লাহ তাআলা আসমান ও জমিনের সকল অধিবাসীকে আজাব দেন তাহলে তার আজাব দেয়াটা কোনো প্রকার অন্যায় হবে না। আর যদি দয়া করেন তবে তা তাদের আমলের তুলনায় অনেক বেশি হবে। যদি কোনো ব্যক্তির নিকট ওহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণ থাকে এবং তা আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করে আল্লাহ তার এ দান বিন্দু পরিমাণও গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে আর এ কথা বিশ্বাস করবে যে, কোনো ব্যক্তি সঠিক কাজ করলে সে তা তকদীর অনুযায়ী করেছে এটা ভুল করা তার জন্য নির্ধারিত ছিল না। আর যে ভুল করল এটা সঠিকভাবে করা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না। যদি তুমি এ বিশ্বাসের বাইরে মৃত্যু বরণ করো তাহলে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।' (ইবনে মাজাহ ৭৭; তাবরানী ৪৯৪০; আহমদ ২১৬১১)

বিয়াল্লিশ : মানুষের নিকট অন্যের গোপন তথ্য ফাঁস করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَلَا تَجَسَّسُوا

'তোমরা মানুষের ত্রুটি বিচ্যুতি খুঁজে বেড়াবে না।' (হুজরাত ৪৯:১২)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِىَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ ...مَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ يَفِرُّونَ بِهِ مِنْهُ صُبَّ فِى أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

'ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো সম্প্রদায়ের লোকের কথা শ্রবণ করার চেষ্টা করে তাদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও, কিয়ামতের দিন তার কানে গলিত শীশা ঢালা হবে।' (বুখারী ৭০৪২; আবু দাউদ ৫০২৬; তিরমিজি ১৭৫১)

তেতাল্লিশ : পরনিন্দা করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ - هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

'যে বেশি শপথ করে এবং যে পশ্চাতে নিন্দা করে একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে আপনি তার আনুগত্য করবেন না।' (কলম ৬৮:১০-১১)

নমীমাহ বলা হয়, একের কথা অপরের নিকট বলে বেড়ানো পারস্পারিক ঝগড়া ফাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুটি কবরের কাছ দিয়ে যাওয়া অবস্থায় বললেন, এ কবরবাসীদের শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তবে কোনো বড় ব্যাপারে নয়, তাদের একজন এমন ব্যক্তি যে একের কথা অন্যের নিকট লাগাতো। (বুখারী ২১৬)

চৌচল্লিশ : অভিশাপ করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ

'আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, মুসলিমকে অভিশাপ করা অন্যায় এবং তাকে হত্যা করা কুফরি।' (বুখারী ৪৮; মুসলিম ২৩০; নাসায়ী ৪১১৬)

হাদীসে আরও ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا لَعَنَ شَيْئًا صَعِدَتِ اللَّعْنَةُ إِلَى السَّمَاءِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ دُونَهَا ثُمَّ تَهْبِطُ إِلَى الأَرْضِ فَتُغْلَقُ أَبْوَابُهَا دُونَهَا ثُمَّ تَأْخُذُ يَمِينًا وَشِمَالاً فَإِذَا لَمْ تَجِدْ مَسَاغًا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِى لُعِنَ فَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ أَهْلاً وَإِلاَّ رَجَعَتْ إِلَى قَائِلِهَا

'আবু দারদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো লোক যখন অন্য কাউকে অভিশাপ করে তখন অভিশাপটি আকাশে উঠতে চেষ্টা করে। কিন্তু তার জন্য আকাশের দরজাগুলো বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর জমিনের দিকে অবতরণ করে। কিন্তু জমিনের দরজাগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর অভিশাপটি ডানে বামে ঘুরতে থাকে। কোথাও যাওয়ার সুযোগ না পেয়ে যার ওপর করা হল তার

নিকট যায়, যদি সে অভিশাপের উপযুক্ত হয়। অন্যথায় অভিশাপকারীর ওপর প্রত্যাবর্তন করে।' (আবু দাউদ ৪৯০৭)

পয়তাল্লিশ : গাদ্দারী করা, ওয়াদা পালন না করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ تَابَعَهُ شُعْبَةُ عَنْ الْأَعْمَشِ

'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, চারটি দোষ যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফেক হবে। আর যার মধ্যে এর একটি পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফেকের একটি চরিত্র পাওয়া গেল। যতক্ষণ পর্যন্ত যে উক্ত অভ্যাস ত্যাগ না করে। যখন আমানত রাখা হয় তখন সে খেয়ানত করে আর যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন প্রতিজ্ঞা করে তখন গাদ্দারী করে আর যখন ঝগড়া করে তখন গালি দেয়।' (বুখারী ৩৪)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم–لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِ غَدْرِهِ أَلاَ وَلاَ غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারীর জন্যে কেয়ামতের দিন একটি নিদর্শন থাকবে। তার গাদ্দারীর পরিমাণ অনুযায়ী তাকে উচ্চ করা হবে। তবে জনগনের সাথে প্রতারণাকারী শাসকের চেয়ে বড় গাদ্দার আর কেউ হবে না।' (মুসলিম ৪৬৩৬; তিরমিজি ২১৯১; বায়হাকী ১৭০৭৮)

ছেচল্লিশ : গণক জ্যোতিষীদের বিশ্বাস করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَالْحَسَنِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَتَى كَاهِنًا أَوْ عَرَّافًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

'আবু হুরাইরা এবং হাসান (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি গণক বা জ্যোতিষীর

নিকট আসলো এবং তারা যা বললো তা সত্য বলে গ্রহণ করলো সে মূলত: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তাকে অস্বীকার করলো।' (আহমাদ ৯৫৩৬; বায়হাকী ১৬৯৩৮; ইবনে মাজাহ ৬৩৯; আবু দাউদ ৩৯০৬)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَهُ عَنْ شَىْءٍ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোনো স্ত্রী থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো গণকের নিকট আসলো এবং তাকে ভাগ্য সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসা করল চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবুল হবে না।' (মুসলিম ৫৯৫৭)

সাতচল্লিশ : স্বামীর অবাধ্য হওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا

'আর তোমরা স্ত্রীদের মধ্যে অবাধ্যতার আশঙ্কা করলে তাদের সদুপদেশ দাও, তাদের শয্যা ত্যাগ করো এবং প্রহার করো। যদি তাতে তারা অনুগত হয়ে যায় তবে তাদের জন্যে কোনো পথ অনুসন্ধান করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবার উপরে শ্রেষ্ঠ।' (নিসা ৪:৩৪)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি কোনো পুরুষ তার স্ত্রীকে বিছানায় আহবান করে আর স্ত্রী অস্বীকার করার ফলে স্বামী রাগান্বিত অবস্থায় রাত্রিযাপন করে তখন ঐ স্ত্রীর ওপর ফেরেশতারা সকাল পর্যন্ত অভিশাপ করতে থাকে।' (বুখারী ৩২৩৭; মুসলিম ৩৬১৪; আবু দাউদ ২১৪৩)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا وَلَا تُؤَدِّي الْمَرْأَةُ حَقَّ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى تُؤَدِّيَ حَقَّ زَوْجِهَا عَلَيْهَا كُلَّهُ حَتَّى لَوْ سَأَلَهَا نَفْسَهَا وَهِيَ عَلَى ظَهْرِ قَتَبٍ لَأَعْطَتْهُ إِيَّاهُ

'আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি আমি মহিলাদের আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করার আদেশ দিতাম তাহলে নারীদের প্রতি আদেশ দিতাম তারা যেন তাদের স্বামীদের সেজদা করে। ঐ সত্তার শপথ করে বলছি যার হাতে আমার জীবন, মহিলারা ঐ পর্যন্ত আল্লাহর হক আদায় করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বামীর হক আদায় না করে, এমনকি স্বামী যদি যাত্রা পথে ঘোড়ার পৃষ্ঠেও তাকেও আহ্বান করে তখনও তাকে বাঁধা দিবে না।' (আহমাদ ১৯৪০৩)

সুতরাং নারীদের কর্তব্য, তারা সর্বাবস্থায় স্বামীর সন্তুষ্টি অর্জনে সচেষ্ট হবে এবং তার অসন্তুষ্টি হতে বেঁচে থাকবে, কখনো স্বামীকে জৈবিক চাহিদা পূরণে বাধা দেবে না। তবে যদি শরয়ী কোনো আপত্তি থাকে যেমন- হায়েয নেফাস অথবা ফরয সাওম ইত্যাদি তাহলে শুধু সহবাস হতে নিষেধ করতে পারে। মহিলাদের জন্য কর্তব্য হল সর্বদা স্বামীর নিকট লজ্জাবতী হওয়া, তার আদেশের আনুগত্য করা, তার সকল প্রকার অপছন্দনীয় কাজ হতে বিরত থাকা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ

'ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি জান্নাতে উঁকি মেরে দেখি, জান্নাতের অধিকাংশ অধিবাসী দরিদ্র এবং জাহান্নামে উঁকি মেরে দেখি, তার অধিকাংশ অধিবাসী মহিলা।' (বুখারী ৩২৪১; মুসলিম ৭১১৪)

অত্র হাদীসের ব্যাখ্যায় ইমাম হাফেয শামসুদ্দিন আয-যাহাবী (রহ.) বলেন, মহিলাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি আনুগত্যের অভাব, স্বামীর অবাধ্যতা এবং পর্দাহীনতাই এর মূল কারণ। মহিলারা যখন ঘর থেকে বের

হয় তখন সর্বোচ্চ সুন্দর পোশাক পরে বিশেষ সাজ-সজ্জা অবলম্বন করে, যা মানুষকে ফিৎনায় পড়তে বাধ্য করে। সে নিজে নিরাপদে থাকলেও মানুষ তার থেকে নিরাপদ থাকে না। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه و سلم قال الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ فَإِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ

'আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহিলারা আবরণীয়। কিন্তু যখন তারা রাস্তায় বের হয় তখন শয়তান তাকে মাথা উচু করে দেখে।' (তিরমিযি ১১৭৩)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ اَلْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ وَإِنَّهَا لَا تَكُوْنُ أَقْرَبُ إِلى اللهِ مِنْهَا فِيْ قَعْرِ بَيْتِهَا

'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মহিলারা হল আবরণীয়, তারা যখন ঘর হতে বের হয় তখন শয়তান তাদের মাথা উচু করে দেখে। তারা যত বেশি ঘরের কোণে অবস্থান করবে ততই আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে।' (তাবরানী ২৮৯০)

অপর হাদীসে আরও বলা হয়েছে–

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنْ النِّسَاءِ

'উসামা ইবনে যায়েদ (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, আমার পরে পুরুষদের ওপর মহিলাদের মতো ক্ষতিকর আর কোনো ফিৎনা আমি রেখে যাই নাই।' (বুখারী ৫০৯৬; মুসলিম ৭১২১; তিরমিজি ২৭৮০)

মহিলাদের জন্য সবচেয়ে নিরাপদ হলো, তার ঘরে অবস্থান করা, আল্লাহর ইবাদত, স্বামীর আনুগত্য, তার অধিকার সম্পর্কে সচেতন থাকা, স্বামীর ওপর কোনো প্রকার বাড়াবাড়ি না করা এবং আপন চরিত্রে কোনো প্রকার কলঙ্ক না জড়ানো।

উল্লিখিত প্রতিটি হাদীসে স্ত্রীর কাছে স্বামীর অধিকার যে কত বড় তা বুঝানো হয়েছে। বাস্তবিক পক্ষে এ বিষয়টি অত্যান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

হে মুসলিম ভাইয়েরা! আপনাদের প্রতি আমার বিনীত উপদেশ এই যে, আপনারা এমন নারীদের বিবাহ করবেন যারা মুমিনা, পর্দানশীল, স্বামীর অনুগত, আপনার ধন-সম্পদ রক্ষাকারিণী এবং যে পর্দাহীনভাবে সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে রাস্তায় বের হবে না। আর আপনার আনুগত্য করবে।

যদি আপনার স্ত্রী মুমিনা ও অনুগত মহিলা হয় তাহলে আপনি হিতাকাঙ্খী হবেন, তার সাথে কোনো রকমের হঠকারিতাপূর্ণ আচরণ করবেন না। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَإِنَّهُنَّ خُلِقْنَ مِنْ ضِلَعٍ وَإِنَّ أَعْوَجَ شَيْءٍ فِي الضِّلَعِ أَعْلَاهُ فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيمُهُ كَسَرْتَهُ وَإِنْ تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ أَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা মেয়েদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তাদের পাজরের হাড় হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। আর পাজরের হাড় সবচেয়ে বাঁকা হয়, যদি তুমি সোজা করতে চেষ্টা করো ভেঙ্গে যাবে, আর যদি ছেড়ে দাও তাহলে সর্বদা বাঁকা থাকবে। সুতরাং তাদের সাথে সৎ ব্যবহার করতে থাক।' (বুখারী ৫১৮৫; মুসলিম ৩৭২০)

তাদের সাথে সৎ ব্যবহার হল, তাদের আল্লাহর আদেশের আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া এবং নিষেধ কাজ হতে বিরত থাকতে আদেশ করা। এগুলো তাদের জান্নাতের পথে নিয়ে যাবে।

আটচল্লিশ : কাপড়, দেয়াল, পাথর ইত্যাদিতে প্রাণীর ছবি আঁকা।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ الَّذِينَ يَصْنَعُونَ هَذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ

'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যারা চিত্রাংকন করে তাদের কেয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। আর তাদের বলা হবে তোমরা যা সৃষ্টি করেছিলে তাদের আত্মা ও জীবন দান করো।' (বুখারী ৫৯৫১; মুসলিম ৫৬৫৭; নাসায়ী ৫৩৭৭)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِي بِقِرَامٍ فِيهِ تَمَاثِيلُ فَلَمَّا رَآهُ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ يَا عَائِشَةُ أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِينَ يُضَاهُونَ بِخَلْقِ اللَّهِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ

'আয়েশা (রা.) বলেন, একদিন রাসুলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন ঘরের দরজায় এমন একটি পর্দা টানানো ছিল যার মধ্যে প্রাণীর ছবি আঁকা ছিল। তিনি দেখা মাত্র পর্দাটি ছিঁড়ে ফেললেন ও তার চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি বললেন, হে আয়েশা! কেয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি শাস্তি দেয়া হবে ঐ সব লোকদের যারা আল্লাহর সৃষ্টির সাথে সাদৃর্শ অবলম্বন করে কিছু তৈরি করে। আয়েশা (রা.) বলেন, এরপর আমি উক্ত পর্দা কেটে একটি অথবা দুটি বালিশ তৈরি করলাম।' (মুসলিম ৫৬৫০)

উনপঞ্চাশ : শোক প্রকাশার্থে চেহারার ওপর আঘাত করা, মাতম করা, কাপড় ছেড়া, মাথা মুন্ডানো বা চুল উঠানো, বিপদের সময় নিজের ধ্বংসের জন্য দুআ করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَطَمَ الْخُدُودَ وَشَقَّ الْجُيُوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, শোক প্রকাশ করতে যেয়ে যে চেহারার ওপর প্রহার করে এবং কাপড় ছিড়ে ফেলে এবং জাহিলিয়াতের অভ্যাসের অনুসরণ করে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়।' (বুখারী ১২৯৪; মুসনাদে আহমদ ৪৩৬১)

পঞ্চাশ : অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

'ব্যবস্থা নেয়া হবে কেবল তাদের বিরূদ্ধে যারা মানুষের ওপর অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে বেড়ায়, তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি।' (শুরা ৪২:৪২)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– إِنَّ اللَّهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لاَ يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلاَ يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ

'ইয়াদ ইবনে হিমার (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তাআলা আমার নিকট ওহী প্রেরণ করেছেন, যে তোমরা এমন বিনয়ী হও যাতে কেউ কারো ওপর বিদ্রোহ এবং গর্ব না করে।' (আবু দাউদ ৪৮৯৭; মুসলিম ৮৩৮৯)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ ذَنْبٍ أَحْرَى أَنْ يُعَجِّلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْعُقُوبَةَ لِصَاحِبِهِ فِي الدُّنْيَا مَعَ مَا يَدَّخِرُ لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ الْبَغْيِ وَقَطِيعَةِ الرَّحِمِ

'আবু বাকরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আত্নীয়তা ছিন্ন করা এবং অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করা এমন দুটি মারাত্মক অপরাধ যার শাস্তি আখিরাতে নির্ধারিত থাকা সত্ত্বেও দুনিয়াতে দেয়া হবে।' (আহমাদ ২০৩৯৮)

একান্ন : দুর্বল, চাকর-চাকরাণী, স্ত্রী ও চতুষ্পদ জন্তুর ওপর অত্যাচার করা।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ

'ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি তার গোলামকে শাস্তি দিল বা থাপ্পর দিল এমন কোনো অভিযোগে যা সে করে নাই, তার প্রতিকার হলো তাকে মুক্ত করে দেয়।' (মুসলিম ৪৩৭৯; আহমদ ৫০৫১)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُ الَّذِينَ يُعَذِّبُونَ النَّاسَ فِى الدُّنْيَا

"হিশাম ইবনে হাকীম ইবনে হিযাম (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ সব লোকদের শাস্তি দিবেন যারা দুনিয়াতে মানুষদের কষ্ট দিত।' (মুসলিম ৬৮২৪; আবু দাউদ ৩০৪৭)

বাহান্ন : প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়া। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না যার প্রতিবেশী তার অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকে না।' (মুসলিম ১৮১)

তিপ্পান্ন : মুসলিমদের কষ্ট দেয়া ও গালি দেয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا

'যারা বিনা অপরাধে মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদের কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্য পাপের বোঝা বহন করে।' (আহযাব ৩৩:৫৮)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ شَرَّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ تَرَكَهُ النَّاسُ اتِّقَاءَ شَرِّهِ

'আয়েশা (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বলেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে মর্যাদার দিকে দিয়ে ঐ ব্যক্তি সর্ব নিকৃষ্ট, যাকে মানুষ তার অনিষ্টতা হতে বাঁচার লক্ষ্যে এড়িয়ে চলে।' (বুখারী ৬০৩২)

চুয়ান্ন : অহঙ্কার করে লুঙ্গি কাপড় ইত্যাদি ঝুলিয়ে পরিধান করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ مِنْ الْإِزَارِ فَفِي النَّارِ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, গোড়ালির নীচে যে অংশে কাপড় পরা হবে, তা জাহান্নামে যাবে।' (বুখারী ৫৭৮৭)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَى مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ঐ ব্যক্তির দিকে রহমতের দৃষ্টি দিবেন না যে অহঙ্কার করে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধান করে।' (বুখারী ৫৭৮৮)

বর্তমানে এ ব্যাধি ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। প্রায় সবার মধ্যে এ সমস্যাটি পরিলক্ষিত হচ্ছে। অনেককেই দেখা যায়, তারা গোড়ালির নীচে কাপড় পরিধান করে, অনেক সময় মাটি পর্যন্ত কাপড় ঝুলিয়ে দেয়। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সকলকে বিপদ থেকে রক্ষা করুন। অবশ্য এ নিষেধাজ্ঞা পুরুষদের জন্য।

পঞ্চান্ন : স্বর্ণ-রৌপ্যের পাত্রে পানাহার করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ، قَالَتْ قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِنَّ الَّذِي يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ فِي آنِيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فَإِنَّمَا يُجَرْجِرُ فِي بَطْنِهِ نَارُ جَهَنَّمَ

'উম্মে সালাম (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি স্বর্ণ ও রূপার পাত্রে খায় বা পান করে সে মূলত: তার পেটে জাহান্নামের আগুনকেই স্থান দেয়।' (ইবনে আবী শায়বা ২৪৬১৩)

ছাপ্পান্ন : পুরুষের রেশমি কাপড় পরিধান করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا يَلْبَسُ الْحَرِيرَ فِي الدُّنْيَا مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ فِي الْآخِرَةِ

'ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুনিয়াতে যে ব্যক্তি রেশমী কাপড় পরে তার

জন্যে আখেরাতে কোনো অংশই নেই।' (বুখারী ৫৮৩৫; মুসলিম ৫৫২৪; নাসায়ী ৫৩২২)

সাতান্ন : গোলামের পলায়ন করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ جَرِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ

'জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, গোলাম যখন পলায়ন করে তখন তার কোনো সালাতই গ্রহণ করা হয় না।' (মুসলিম ২৩৯)

অন্য বর্ণনায় আছে, যতক্ষণ না সে তার মনিবের নিকট প্রত্যাবর্তন করে।

আটান্ন : আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো উদ্দেশ্যে পশু যবেহ করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ

'আলী ইবনে আবু তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর জন্য জবেহ করে তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ।' (মুসলিম ৫২৪০)

গাইরুল্লাহর জন্য জবেহ করা দৃষ্টান্ত হলো কেউ জবেহ করার সময় বললো 'আমি শয়তানের নামে জবেহ করছি, অথবা দেব-দেবীর নামে অথবা পীর সাহেবদের নামে জবেহ করছি' ইত্যাদি।

উনষাট : জেনে শুনে অন্যকে পিতা বলে স্বীকৃতি দেয়া। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ سَعْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ

'সাআ'দ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জেনে শুনে নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যকে পিতা বলে ঘোষণা দেয় তার ওপর জান্নাত হারাম করা হয়েছে।' (বুখারী ৬৭৬৬; মুসলিম ২২৯; আবু দাউদ ৫১১৫)

ষাট : তর্ক-বিতর্ক, ঝগড়া এবং শত্রুতা পোষন করা। অর্থাৎ কারো কথার ভুল-ভ্রান্তি প্রকাশের দোষ তালাশ করা। একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ... وَمَنْ خَاصَمَ فِى بَاطِلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لَمْ يَزَلْ فِى سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ عَنْهُ

'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অনর্থক কোনো বিষয়ে জেনে শুনে বিতর্ক করে সে ঐ পর্যন্ত আল্লাহর অসন্তুষ্টির সাথে জীবন যাপন করে যতক্ষন না সে বিতর্ক থেকে ফিরে আসে।' (আবু দাউদ ৩৫৯৯)

হাদীসে আরও ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا ضَلَّ قَوْمٌ بَعْدَ هُدًى كَانُوا عَلَيْهِ إِلَّا أُوتُوا الْجَدَلَ

'আবু উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো জাতি সঠিক পথের ওপর থাকার পর পথভ্রষ্ট হয় নাই, কিন্তু যখনই তারা বিতর্কে লিপ্ত হয়েছে তখনই পথভ্রষ্ট হয়েছে।' (তিরমিজী ৩২৫৩; ইবনে মাজাহ ৪৮; আহমদ ২২১৬৪)

অর্থাৎ সত্য অন্বেষণ বা উদঘাটনের জন্য নয়, বিতর্ক করার জন্য বিতর্কে লিপ্ত হয়।

একষট্টি : প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি দান করতে অস্বীকার করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَنَعَ فَضْلَ مَائِهِ أَوْ فَضْلَ كَلَئِهِ مَنَعَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَضْلَهُ

'আমর ইবনে শুআইব (রা.) তার পিতা থেকে তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অতিরিক্ত পানি ও অতিরিক্ত ঘাস দান করা থেকে বিরত থাকে আল্লাহ তাকে কেয়ামতের দিন দয়া ও সওয়াব দিতে অস্বীকার করবেন।' (আহমাদ ৭০৫৭; মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা ২১৩৩৯)

বাষট্টি : ওযনে ও মাপে কম দেয়া

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন-

وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ

'যারা মাপে কম দেয় তাদের জন্য দুর্ভোগ।' (মুতাফ্‌ফেফীন ৮৩:১)

তেষট্টি : আল্লাহর পাকড়াও হতে নিশ্চিত হওয়া। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَكْثُرُ أَنْ يَقُوْلَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَىْ دِيْنِكَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ آمَنَّا وَبِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ فَهَلْ تَخَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْقُلُوْبَ بَيْنَ إِصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ اللهِ يُقَلِّبُهُمَا كَمَا يَشَاءُ

'আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথাটি বেশি বেশি বলতেন, হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আপনি আমাদের অন্তরকে আপনার দ্বীনের ওপর অটল রাখুন। অতঃপর তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনি কি আমাদের ঈমানের ব্যাপারে আশঙ্কা করেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর দিলেন, মানুষের অন্তর দয়াময় আল্লাহরই দুই আঙুলের মাঝে, তিনি যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে পরিবর্তন করেন।' (তিরমিজী ২১৪০; মুসলিম ৬৯২১)

সুতরাং হে মুসলিম ভাইয়েরা! আপনাদের ঈমান, আমল, সালাত ও সকল প্রকার নেক আমল যতই বেশি ও সুন্দর হোক না কেন অহঙ্কার করবেন না। কারণ এগুলো আল্লাহর দয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। যদি কোনো না কোনো সময় তিনি এগুলি আপনার থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যান তখন আপনি উটের পেটের চেয়েও বেশি খালী হয়ে যাবেন। আপনি আপনার আমলের কারণে গর্ব করা হতে বিরত থাকুন এবং এমন কথা বলবেন না যা অজ্ঞ ও মূর্খরা বলে, যেমন আমি অমুকের চেয়ে ভালো। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা মানুষের অন্তরের গোপন ও প্রকাশ্য সকল বিষয়ে অবগত। আপনার দুর্বলতা, গুনাহের আধিক্য, আমল কম হওয়ার অনুভূতি অন্তরে স্থান দিয়ে সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকুন এবং এমন একটি অবস্থায় থাকুন যে অবস্থার বর্ণনা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাদীসে দিয়েছেন। তিনি বলেন–

عَنْ عُقْبَةَ بْنُ عَامِرٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا النَّجَاةُ قَالَ أَمْلِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ

'উকবা ইবনে আমের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমার সংসারে ব্যস্ততা সত্ত্বেও তুমি

জিহ্বাকে সংযত রাখবে, গুনাহের কাজের ওপর কান্নাকাটি করবে।' (তিরমিজী ২৪০৬; আহমদ ২২২৩৫; ইবনে আবী শায়বা ৩৫৬৬৬)

ঐসব লোকদের মতো হয়ো না যাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন–

أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ

'তারা কি আল্লাহর পাকড়াওয়ের ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে গেছে? ক্ষতিগ্রস্ত লোকজন ব্যতীত কেউ আল্লাহর পাকড়াও থেকে নির্ভয় হয় না।' (আরাফ ৭:৯৯)

বস্তুত আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করা এবং সর্বদা এ কথাগুলো বলতে থাকা উচিত–

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قُلُوْبَنَا عَلَيْ دِيْنِكَ

'হে অন্তরের পরিবর্তনকারী! তুমি আমাদের অন্তরকে তোমার দ্বীনের ওপর অটল অবিচল রাখ।"

চৌষট্টি : মৃত জন্তু, প্রবাহিত রক্ত এবং শূকরের গোস্ত খাওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ

'আপনি বলে দিন, যে বিধান ওহীর মাধ্যমে আমার কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে আমি কোনো ভক্ষণকারীর জন্য কোনো হারাম খাদ্য পাইনি। মৃত, প্রবাহিত রক্ত এবং শূকরের গোস্ত ব্যতীত। এগুলো অপবিত্র।' (আনআম ৬:১৪৫)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ بُرَيْدَةَ أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ مَنْ لَعِبَ بِالنَّرْدَشِيرِ فَكَأَنَّمَا صَبَغَ يَدَهُ فِى لَحْمِ خِنْزِيرٍ وَدَمِه

'বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি দাবা খেলায় প্রবৃত্ত হয়, সে যেন তার হাতকে শুকরের রক্তে রঞ্জিত করার মতো অন্যায় করে।' (মুসলিম ৬০৩৩; বায়হাকী ২১৪৭৭)

এই হাদীসে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শূকরের রক্ত গোস্ত হাতে নেয়াকে গুনাহ সাব্যস্ত করেছেন শুধু তাই নয় বরং বড় গুনাহ বলে অভিহিত করেছেন। সুতরাং শূকরের গোস্ত খাওয়া যে কত বড় গুনাহ তা

সহজেই অনুমান করা যায়। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ বিপদ হতে রক্ষা করুন।

পঁয়ষট্টি : জুমুআর সালাত ও জামাত ছেড়ে দিয়ে বিনা কারণে একা একা সালাত আদায় করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونُنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ

'আবু হুরাইরা (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, যদি মানুষ জুমুআর সালাত পরিত্যাগ করা থেকে বিরত না থাকে তাহলে আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর মেরে দিবেন যার ফলে তারা গাফেল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হবে।' (মুসলিম ২০৩৯; নাসায়ী ১৩৬৮; আহমদ ২২৯০)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ

'ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আযান শুনল অথচ কোনো প্রকার ওজর ছাড়া জামাতে উপস্থিত হল না তার (একাকী) সালাত আল্লাহর নিকট কবুল হয় না।' (ইবনে মাজাহ ৭৯৩)

ছেষট্টি : আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَلَا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ

'তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমত থেকে একমাত্র কাফের সম্প্রদায়ই নিরাশ হয়।' (ইউসুফ ১২:৮৭)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم قَالَ لاَ يَمُوتُنَّ أَحَدُكُمْ إِلاَّ وَهُوَ يُحْسِنُ الظَّنَّ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

'জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন, তোমাদের কেউ যেন আল্লাহর প্রতি ভালো ধারণা পোষণ ছাড়া মৃত্যুবরণ না করে।' (মুসলিম ৭৪১২; আবু দাউদ ৩১১৫)

সাতষট্টি : মুসলিমকে কাফের বলে আখ্যায়িত করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ قَالَ لِأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا

'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার কোনো মুসলিম ভাইকে বলে, হে কাফের! এর পরিণাম তাদের কোনো না কোনো একজনের ওপর বর্তাবেই।' (বুখারী ৬১০৪; মুসলিম ২২৪)

অর্থাৎ যাকে কাফের বলা হলো যদি সে বাস্তবেই কাফের হয় তাহলে তার ওপর বর্তাবে অন্যথায় যে বললো সে নিজেই কাফের বলে গণ্য হবে।

আটষট্টি : ষড়যন্ত্র করা এবং ধোঁকা দেওয়া। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ

'কুচক্রের শাস্তি কারও ওপর পতিত হয় না, কুচক্রীর ওপরই পতিত হয়।' (ফাতের ৩৫:৪৩)

উনসত্তর : মুসলিমদের ত্রুটি-বিচ্যুতি তালাশ করা এবং তাদের গোপন তথ্য প্রকাশ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ - هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

'যে বেশি শপথ করে, যে পশ্চাতে নিন্দা করে এবং একের কথা অপরের নিকট লাগিয়ে ফিরে আপনি তার আনুগত্য করবেন না।' (কলম ৬৮:১০-১১)

একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– يَقُولُ ...مَنْ قَالَ فِى مُؤْمِنٍ مَا لَيْسَ فِيهِ أَسْكَنَهُ اللَّهُ رَدْغَةَ الْخَبَالِ حَتَّى يَخْرُجَ مِمَّا قَالَ

'আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো মুমিন সম্পর্কে এমন দোষ বর্ণনা করে যা তার মধ্যে আদৌ নেই, আল্লাহ জাহান্নামীদের নির্গত পচা গলা পুজের মধ্যে তার স্থান নির্ধারণ করে দিবেন। ফলে সে যা বলেছে তা বের করে দিতে চাবে, কিন্তু পারবেনা।' (আবু দাউদ ৩৫৯৯)

সত্তুর : কোনো সাহাবীকে গালি দেয়া । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي سَعِيد الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُد ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلَا نَصِيفَهُ

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা আমার সাহাবীদের গালি দিও না । যদি তোমাদের কেউ ওহুদ পাহাড় পরিমাণ আল্লাহর রাস্তায় দান করে তবুও তাদের কারো একটি মুটি বা আধা মুটি পরিমাণ দানের সমান হবে না ।' (বুখারী ৩৬৭৩; মুসলিম ৬৬৫১; আবু দাউদ ৪৬৬০; তিরমিজি ৩৮৬১; ইবনে মাজাহ ১৬১)

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَنْ سَبَّ أَصْحَابِيْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ

'ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার সাহাবীকে গালি দেয় তার ওপর আল্লাহ তাআলা, মালায়েকা এবং সমস্ত মানুষের অভিশাপ ।' (তাবারানী ১২৭০৯)

একাত্তর : অন্যায় বিচার । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– : الْقُضَاةُ ثَلاَثَةٌ قَاضِيَانِ فِى النَّارِ وَقَاضٍ فِى الْجَنَّةِ قَاضٍ قَضَى بِغَيْرِ الْحَقِّ وَهُوَ يَعْلَمُ فَذَاكَ فِى النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى وَهُوَ لاَ يَعْلَمُ فَأَهْلَكَ حُقُوقَ النَّاسِ فَذَاكَ فِى النَّارِ وَقَاضٍ قَضَى بِالْحَقِّ فَذَاكَ فِى الْجَنَّةِ

'বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, বিচারক তিন প্রকারের । দুই প্রকার বিচারক জাহান্নামে যাবে এবং এক প্রকার বিচারক জান্নাতে যাবে । যে বিচারক বিচারকার্যে সত্যকে উদঘাটন করার পর জেনে শুনে অন্যায়ভাবে বিচার করছে সে জাহান্নামে যাবে এবং যে বিচারক না জেনে শুনে বিচার করে মানুষের হক নষ্ট করে সে জাহান্নামে যাবে । আর যে বিচারক মূল সত্যকে উদঘাটন করে এবং তদানুসারে বিচার করে সে জান্নাতে যাবে ।' (তিরমিযি ১৩২২; তাবরানী ১১৫৪)

বাহাত্তর : ঝগড়া করার সময় অতিরিক্ত গালি দেয়া । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنْ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ

'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, চারটি দোষ যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক । আর যার মধ্যে এর একটি পাওয়া যাবে তার মধ্যে মুনাফিকের একটি চরিত্র পাওয়া গেল যতক্ষণ পর্যন্ত যে উক্ত অভ্যাস ত্যাগ না করে । দোষগুলো হল, যখন আমানত রাখা হয় সে খেয়ানত করে, যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন প্রতিজ্ঞা করে তখন গাদ্দারী করে আর যখন ঝগড়া করে তখন গালি দেয় ।' (বুখারী ৩৪)

তিহাত্তর : কোনো বংশ বা তার লোকদের খারাপ গুণে অভিহিত করা । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– اثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ الطَّعْنُ فِى النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুটি দোষ মানুষের মধ্যে কুফর সমতুল্য । (১) বংশের কুৎসা রটানো । (২) মৃত ব্যক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক কান্নাকাটি করা । (মুসলিম ২৩৬)

চুহাত্তর : মৃত ব্যক্তির জন্য আনুষ্ঠানিক ও উচ্চ শব্দে কান্নাকাটি করা । যেমন পূর্বের হাদীসে এ সম্পর্কে পুরোপুরি নিষেধ এসেছে ।

পচাত্তর : জমিনের সীমানা উঠিয়ে ফেলা বা পরিবর্তন করা । হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم–قَالَ ...لَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الأَرْضِ

'আলী ইবনে আবী তালেব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ অভিশাপ করেছেন ঐ

ব্যক্তির ওপর যে জমিনের সীমানা পরিবর্তন করে।' (মুসলিম ৫২৩৯)

ছিয়াত্তর : অপসংস্কৃতি ও কু-প্রথার প্রচলন করা অথবা বিভ্রান্তির দিকে আহ্বান করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنِ جَرِيرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– ...مَنْ سَنَّ فِى الإِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَىْءٌ

'জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো কুপ্রথা বা বিদআত চালু করল সে নিজেতো গুনাহগার হবেই এমনকি তার পরে যে ব্যক্তি ঐ কুপ্রথার ওপর আমল করবে তার গুনাহও তার ওপর বর্তাবে, তবে এ কারণে ঐ ব্যক্তির গুনাহের অংশ বিন্দু পরিমাণ ও কমানো হবে না।' (মুসলিম ২৩৯৮)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ ...مَنْ دَعَا إِلَى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি কোনো গোমরাহীর প্রতি মানুষকে আহবান করে, ঐ ব্যক্তি গুনাহের মধ্যে ঐ পরিমাণ অংশীদার হবে যে পরিমাণ গুনাহ ঐ গোমরাহীর অনুসারীদের হবে। তবে এ কারণে তাদের গুনাহের একটুও কমানো হবে না।' (মুসলিম ৬৯৮০)

সাতাত্তর : নারী অন্যের চুল ব্যবহার করা, শরীরে উঁলকি আকা, ভ্রু উপড়ানো, দাঁত ফাঁক করা।

বর্তমানে আধুনিক যুগে বিউটি পার্লারের মাধ্যমে এমন কিছু কাজ করা হয় যা জাহেলি যুগেও ছিল। যেমন চোখের ভ্রু উপড়ে ফেলে চিকন ও সরুকরণ, দাঁত কেটে চিকন করে ফাঁক বানানো, ছোট মেশিনের সাহায্যে চামরা কেটে কেটে বা ছিদ্র করে তার ভিতরে রং প্রবেশ করিয়ে বিভিন্ন ছবি আঁকা, অথবা প্রিয়জনের নাম লেখা অথবা ছবি অঙ্কন করা, নিজের মাথায় চুল কম থাকার কারণে অন্যের চুল দিয়ে মাথা ভরপুর রাখা ইত্যাদি। ইসলামে এসব কিছুই সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ ও বর্জনীয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছে, সে নারীর ওপর আল্লাহর অভিশাপ যে অন্য নারীর মাথায় কৃত্রিম চুল স্থাপন করে কিংবা নিজ মাথায় মেকি চুল স্থাপন করে এবং যে অন্যের গাত্রে উল্কি করে অথবা নিজের গাত্রে উল্কি করায়।' (বুখারী ৫৯৩২; মুসলিম ৫৬৯৩)

আটাত্তর : ধারালো অস্ত্র দিয়ে কারো দিকে ইশারা করা। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ –صلى الله عليه وسلم– مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأَبِيهِ وَأُمِّهِ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তার কোনো ভাইয়ের দিকে ধারালো অস্ত্র দ্বারা ইশারা করে ফেরেশতাগণ তার ওপর অভিশাপ করতে থাকে, যদিও সে তার আপন ভাই হয়।' (মুসলিম ৯৮৩২)

অন্য একটি হাদীসে এই ধমকির কারণ ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন–

فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي لَعَلَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ فِي يَدِهِ فَيَقَعُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ النَّارِ

'হতে পারে শয়তান তার হাত থেকে অস্ত্র নিয়ে ব্যবহার করবে। ফলে সে জাহান্নামের গুহায় নিপতিত হবে।'

উনআশি : হারাম শরীফে ধর্মদ্রোহী কাজ করা। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন–

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ

'এবং মসজিদে হারাম যা আমি করেছি স্থায়ী ও বহিরাগত সকলের জন্য সমান। আর তাতে যে অন্যায়ভাবে কোনো ধর্মদ্রোহী কাজ করার ইচ্ছা করে, আমি তাকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আস্বাদান করাবো। (হজ্ব ২২:২৫)

আশি : মাহরাম স্ত্রীলোকদের বিয়ে করা। যে সকল মহিলাদের বিয়ে করা যাবে না তাদের তালিকা পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামের পরিভাষায় তাদের মাহরাম বলা হয়। এদের বিয়ে করা গুনাহে কবীরা ও হারাম। আর এটাকে বৈধ মনে করে বিয়ে করলে ইসলাম থেকে খারেজ তথা কাফের ও মুশরিক হয়ে যাবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا – حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

'যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না। কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে। এটা অশ্লীল, গযবের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ। তোমাদের জন্য হারাম করা হয়েছে তোমাদের মা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকন্যা; ভগিনীকণ্যা, তোমাদের সে মা যারা তোমাদের স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মা তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ, সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোনো গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ ক্ষমাকরী, দয়ালু এবং নারীদের মধ্যে তাদের ছাড়া সকল সধবা স্ত্রীলোক তোমাদের জন্যে নিষিদ্ধ। তোমাদের দক্ষিণ হস্ত যাদের মালিক হয়ে যায় (দাসী)-এটা তোমাদের জন্য আল্লাহর হুকুম। এদের ছাড়া তোমাদের জন্যে সব নারী হালাল করা হয়েছে, শর্ত এই যে, তোমরা তাদের স্বীয় অর্থের বিনিময়ে

তলব করবে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য-ব্যভিচারের জন্য নয়। অনন্তর তাদের মধ্যে যাকে তোমরা ভোগ করবে, তাকে তার নির্ধারিত হক দান করো।' (নিসা ৪:২২-২৪) এ পর্যন্ত যা আলোচিত হলো, সেগুলো মারাত্মক কবীরা গুনাহ যা পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আলোকে উলামায়ে কেরামগণ উল্লেখ করেছেন এবং বিশেষ করে ইমাম হাফেয শামসুদ্দীন আয যাহাবী রহ. আল কাবায়ের কিতাবে সংকলন করেছেন। আল্লাহ যেন এ সকল গুনাহ থেকে আমাদের বেঁচে থাকতে সাহায্য করেন এবং আমাদের তাওফীক দান করেন যে সব কাজ তিনি পছন্দ করেন না এবং সন্তুষ্ট হন না, তা থেকে বেঁচে থাকতে। আমরা ঐ সব গুনাহ যা আমাদের থেকে প্রকাশ পেয়েছে আল্লাহ যেন আমাদের ঐ সকল পাপ ক্ষমা করেন এবং আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি তিনি যেন আমাদের ঐসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত না করেন যাদের সম্পর্কে হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ أَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ ؟ قَالُوْا اَلْمُفْلِسُ فِيْنَا يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَلْمُفْلِسُ مِنْ أُمَّتِيْ مَنْ يَأْتِيْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلَاتِهِ وَصِيَامِهِ وَزَكَاتِهِ وَيَأْتِيْ وَقَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَ سَفَكَ دَمَ هَذَا وَضَرَبَ هَذَا فَيَقْعُدُ فَيُقْتَصُّ هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يُقْتَصَّ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِي النَّارِ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা কি জান আমার উম্মতের মধ্যে প্রকৃত দরিদ্র কে? প্রকৃত দরিদ্র ঐ ব্যক্তি, যে কেয়ামতের দিন অনেক সালাত, সাওম, যাকাত নিয়ে উপস্থিত হবে। তবে সে দুনিয়াতে কাউকে হত্যা করেছে, মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কাউকে গাল-মন্দ করেছে, কারো সম্পদ আত্মসাৎ করেছে অথবা কাউকে প্রহার করেছে। কেয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তির নেক আমল বা ছওয়াব তাদের (তার দ্বারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে) দেয়া হবে। যদি তার নেক আমলের ছওয়াব পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধ করার পূর্বেই শেষ হয়ে যায় তাহলে তাদের গুনাহগুলোকে তার ওপর চাপিয়ে দেয়া হবে এবং তারপর তাদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।' (তিরমিজি ২৪১৮)

اَلْمَنْهِيَّاتُ (আরো কিছু নিষিদ্ধ কাজ) :

পূর্বে উল্লেখিত নিষিদ্ধ কাজগুলো গুনাহে কাবীরার সাথে সম্পৃক্ত। এখন আমরা এমন কিছু বিষয় উল্লেখ করবো যা ইসলামে নিষেধ করা হয়েছে তবে সেগুলো গুনাহে কাবীরার সাথে সম্পৃক্ত নয়। বরং মুআ'মালাত, মুআ'শারাত ও ব্যক্তিগত আচার-ব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত। নিম্নে ধারাবাহিকভাবে উল্লেখ করা হলো।

এক : اِشْتِمَالُ الرَّجُلِ فِيْ ثَــوْبٍ وَاحِــدٍ اَلْاحْتِبَاءُ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ (এক কাপড়ে ইহতিবা অথবা ইশতিমাল করা)। ইহতিবা ও ইশতিমাল বলা হয় গলা থেকে পা পর্যন্ত সিলাই বিহীন একটি মাত্র কাপড় বা চাদর দিয়ে জড়ানো। তবে যদি লজ্জাস্থান ঢাকার জন্য কোনো কিছু না থাকে সেটাকে ইহতিবা বলা হয় আর যদি কাঁধের একাংশ বা শরীরের একপার্শ্ব খোলা থাকে তাকে ইশতিমাল বলা হয়। এটা নিষিদ্ধ হওয়ার কারণ হচ্ছে এতে যেকোনো মুহূর্তে ছতর খুলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّمَ عَــنْ لِبْسَتَيْنِ أَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى فَرْجِهِ مِنْهُ شَيْءٌ وَأَنْ يَشْتَمِلَ بِالثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى أَحَدِ شِقَّيْهِ مِنْهُ شَيْئٌ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুই ধরনের পোশাক পরিধান করা থেকে নিষেধ করেছেন। এক হলো, এক কাপড়ে এমনভাবে ইহতিবা (জড়ানো) করা যাতে লজ্জাস্থানে ঐ কাপড়ের কোনো অংশ থাকে না। আর দ্বিতীয় প্রকার হলো, 'ইশতিমালে সম্মা' অর্থাৎ এক চাদরে এমনভাবে জড়ানো যাতে শরীরের একপার্শ্বে কোনো কাপড় থাকে না।' (বুখারী ৫৮২১; আবু দাউদ ৪০৮২)

দুই : اَلْاِنْتِعَــالُ قَائِمًــا (দাঁড়ানো অবস্থায় জুতো পরিধান করা)। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– **عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا** 'জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে জুতা পরিধান করতে নিষেধ করেছেন।' (আবু দাউদ ৪১৩৭; তিরমিজি ১৮৮৫; ইবনে মাজাহ ৩৬৮১)

দাঁড়িয়ে জুতো পরিধান করলে গোটা দেহের ভর এক পায়ের ওপর চলে যায় এতে যে কোনো কঠিন রোগের সূত্রপাত হতে পারে। অথচ শরীরের প্রতি খেয়াল রাখা জরুরি। হাদীসে বলা হয়েছে, **فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْــكَ حَقًّــا** 'নিশ্চয়ই তোমার ওপর তোমার দেহের হক রয়েছে।' (বুখারী ১৯৭৫) অতএব পায়ের ওপর অতিরিক্ত বোঝা চাপানো অন্যায় ও জুলুম। কারণ গোটা দেহের অবস্থান উভয় পায়ের ওপর। যখন এক পা জুতো পরিধান করার জন্য উত্তোলন করা হয় তখন অবশ্যই গোটা দেহের ভর এক পায়ের ওপর চলে যায়। এতে রগ এলোমেলো হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা আছে এবং কঠিন রোগ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা আছে। কেননা রগ হলো রক্ত ও বায়ু চলাচলের পথ যখন এটি সংকীর্ণ হয়ে যায় তখন রক্ত ও বায়ুর প্রচণ্ড চাপ বেড়ে যায়। এতে অনেক সময় রক্ত স্থানচ্যুত হয়ে যায় এবং জমাট বেঁধে যায়। এভাবে রক্ত নষ্ট হয়ে যায়। এমনিভাবে কখনো বায়ু আটকে যায় এবং মারাত্মক ধরনের ক্ষতি হয়। অথচ দেহের ক্ষতি সাধন করা বৈধ নয়। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ (সুব.) ইরশাদ করেছেন– **وَلاَ تُلقُوا بِأَيِــدِيكُم إِلى التَهلُكَــة** 'তোমরা তোমাদের নিজ হাতে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।' (বাকারা ২:১৯৫)

তিন : اَلْبَوْلُ فِي الْمُغْتَــسَلِ (গোসল খানায় পেশাব করা)। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– **عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ لَا يَبُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ فِيْ مُسْتَحَمِّهِ فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ** 'আব্দুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ যেন গোসলখানায় পেশাব না করে। কেননা বেশিরভাগ ওয়াস ওয়াসা সেখান থেকেই তৈরি হয়।' (ইবনে মাজাহ ৩০৪) এ হাদীসে গোসলখানায় পেশাব করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা গোসলখানার পানির সাথে পেশাব মিশ্রিত হয়ে কাপড়-চোপড়ে ছিটে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। আর এখান থেকে কাপড়-চোপড় নাপাক হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। অবশ্য যে সকল গোসলখানায় পানি জমা হয় না। যেমন শহরের পাকা গোসলখানা। সেসকল গোসলখানায় পেশাব করা হাদীসের নিষেধাজ্ঞার আওতাভূক্ত নয়। তবে সর্বাবস্থায় পরহেজ করাই উত্তম।

চার : اَسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ وَاسْتِدْبَارُهَا بِبَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ (কেবলার দিকে মুখ করে অথবা পিঠ করে ইস্তিঞ্জা করা)। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَتَيْتُمْ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا 'আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমরা পেশাব পায়খানা করতে যাবে তখন কেবলার দিকে মুখ করবে না এবং পিঠও করবে না।' (বুখারী ৩৯৪; নাসায়ী ২১; তিরমিজি ৮)

পাঁচ : اَلْبَوْلُ قَائِمًا (দাঁড়িয়ে পেশাব করা)। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَبُولُ إِلَّا جَالِسًا

'আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তোমাদের যদি কেউ বলে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন তবে তা তোমরা বিশ্বাস করো না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসেই পেশাব করতেন।' (নাসায়ী ২৯; তিরমিজি ১২)

এই হাদীসে বলা হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বসে পেশাব করতেন। আর এটিই হলো রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাধারণ অভ্যাস। আর তৎকালীন আরবরা এটিকে সাধারণভাবে নিত না। এ কারণেই তারা কৌতূহলী হয়ে একে অপরকে বলাবলী করতো। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ حَسَنَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ كَهَيْئَةِ الدَّرَقَةِ فَوَضَعَهَا ثُمَّ جَلَسَ خَلْفَهَا فَبَالَ إِلَيْهَا فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ انْظُرُوا يَبُولُ كَمَا تَبُولُ الْمَرْأَةُ فَسَمِعَهُ فَقَالَ أَوَ مَا عَلِمْتَ مَا أَصَابَ صَاحِبُ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانُوا إِذَا أَصَابَهُمْ شَيْءٌ مِنْ الْبَوْلِ قَرَضُوهُ بِالْمَقَارِيضِ فَنَهَاهُمْ صَاحِبُهُمْ فَعُذِّبَ فِي قَبْرِهِ 'আব্দুর রহমান ইবনে হাসানাহ (রা.) বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে আসলেন, তাঁর হাতে একটি ঢালের মতো ছিল। ওটাকে এক জায়গায় রাখলেন এবং তার দিকে ফিরে পেশাব করলেন। তখন সাধারণ

লোকদের কেউ কেউ বলতে লাগলো, 'দেখ! এই লোকটি মেয়ে লোকদের মতো পেশাব করছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকটির এই কথা শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, তুমি কি জান না, বণী ইসরাঈলের লোকদের অবস্থা কি ছিল? তাদের প্রতি নির্দেশ ছিল তাদের কাপড়-চোপড়ের পেশাব লাগলে তা কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলতে হবে। কিন্তু তারা তা করে নি। ফলে তাদের কবরে শাস্তি দেওয়া হয়েছে।' (আবু দাউদ ২২; নাসায়ী ৩০; ইবনে মাজাহ ৩৪৬) এ সকল হাদীস থেকে বুঝা যায় যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাধারণতঃ বসেই পেশাব করতেন এবং এটিই সুন্নাহ। তবে প্রয়োজনে দাঁড়িয়ে পেশাব করাও জায়েজ আছে। কেউ কেউ বলে থাকেন, দাঁড়িয়ে পেশাব করা হারাম বা মাকরুহে তাহরিমী। কেননা বর্তমান যুগের ফাসেক-ফাজের ও বেদ্বীন লোকেরা দাঁড়িয়ে পেশাব করে থাকে। কিন্তু তাদের এই যুক্তি সঠিক নয়। কেননা হাদীসে যদি কোনো বিষয় সুস্পষ্টভাবে জায়েজ বলে প্রমাণিত হয়। সেটি ফাসেক-ফাজেররা আমল করলেও হারাম হয়ে যাবে না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে দাঁড়িয়ে পেশাব করার সহীহ হাদীস বর্ণিত রয়েছে। যেমন– عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ أَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا 'হুযাইফা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক গোত্রের ডাস্টবিনের কাছে এলেন, অতঃপর দাঁড়িয়ে পেশাব করলেন।' (বুখারী ২৪৭১; মুসলিম ৬৪৭; আবু দাউদ ২৩; নাসায়ী ১৮; ইবনে মাজাহ ৩০৬)

এ হাদীসে স্পষ্টভাবে দাঁড়িয়ে পেশাব করার প্রমান পাওয়া গেল। আয়শা (রা.) এর হাদীসে বর্ণিত বিষয়টি তাঁর জানা অনুযায়ী তিনি বলেছেন। কেননা দাঁড়িয়ে পেশাব করার ঘটনাটি ছিল বাহিরের। আর আয়শা (রা.) ঘরের খবর জানতেন। বাহিরের খবর সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন দাঁড়িয়ে পেশাব করেছিলেন তার স্পষ্ট বর্ণনা হাদীসে উল্লেখ নেই। তবে মুহাদ্দিসীনদের এ ব্যাপারে বিভিন্ন বক্তব্য পাওয়া যায়। কেউ বলেছেন, বয়ানে জাওয়াযের জন্য অর্থাৎ দাঁড়িয়ে পেশাব করা জায়েজ সেটা জানানোর জন্যই তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। কেউ বলেছেন, বসার জায়গা না থাকার কারণে তিনি দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। আবার কেউ বলেছেন, হাটু ব্যথা অথবা মেরুদণ্ডের

হাড্ডি ব্যথা থাকার কারণে দাঁড়িয়ে পেশাব করেছেন। কারণ যাই হোক, দাঁড়িয়ে পেশাব করা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত। তাই ওজরের ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে পেশাব করতে কোনো বাঁধা নেই। তবে বিনা ওজরে বসে পেশাব করাই জরুরি।

ছয় : اَلْاِسْتِنْجَاءُ بِرَوْثٍ أَوْ عَظْمٍ (হাড্ডি অথবা শুকনো গোবর দিয়ে ইস্তিঞ্জা করা)। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে– عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَسْتَطِيبَ أَحَدُكُمْ بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثٍ 'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাড্ডি অথবা (শুকনো) গোবর দিয়ে ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন।' (মুসলিম ৬২৯; আবু দাউদ ৩৮; নাসায়ী ৩৯; তিরজিজি ১৬)

সাত : كَشْفُ مَا يَحْدُثُ فِي الْجِمَاعِ (স্বামী-স্ত্রীর গোপন কথা বলাবলি করা)। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّهَا كَانَتْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ قُعُودٌ عِنْدَهُ فَقَالَ لَعَلَّ رَجُلًا يَقُولُ مَا يَفْعَلُ بِأَهْلِهِ وَلَعَلَّ امْرَأَةً تُخْبِرُ بِمَا فَعَلَتْ مَعَ زَوْجِهَا فَأَرَمَّ الْقَوْمُ فَقُلْتُ إِي وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُنَّ لَيَقُلْنَ وَإِنَّهُمْ لَيَفْعَلُونَ قَالَ فَلَا تَفْعَلُوا فَإِنَّمَا ذَلِكَ مِثْلُ الشَّيْطَانِ لَقِيَ شَيْطَانَةً فِي طَرِيقٍ فَغَشِيَهَا وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

'আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, তিনি নিজে আরও কতিপয় পুরুষ ও নারী রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বসে ছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সম্ভবত কোনো পুরুষ ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর সাথে যা ঘটে তা বলাবলি করে। আর সম্ভবত কোনো মেয়ে লোক তার স্বামীর সাথে যা ঘটে তা বলাবলি করে। উপস্থিত লোকেরা হ্যাঁ সূচক উত্তর দিল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না! তোমরা এটা করো না। কেননা উহা ঐ পুরুষ শয়তানের মতো যে রাস্তায় কোনো স্ত্রী শয়তানকে জড়িয়ে ধরলো আর লোকেরা তা তাকিয়ে দেখতে লাগলো।' (আহমদ ২৭৫৮৩; তাবরানী ৪১৪; ইবনে আবী শায়বা ১৭৮৫০)

আট : اَلْاِسْتِنْجَاءُ بِالْيَمِيْنِ (ডান হাতে ইস্তেঞ্জা করা)। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ النَّبِيَّ –صلى الله عليه وسلم– نَهَى ... وَأَنْ يَسْتَطِيبَ

'আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ডান হাতে ইস্তিঞ্জা করতে নিষেধ করেছেন।' (মুসলিম ৬৩৮; বুখারী ৫৬৩০; আবু দাউদ ৮; নাসায়ী ২৫; তিরমিজি ১৫; ইবনে মাজাহ ৩১০)

নয় : اَلْحَذْفُ بِالْبُنْدُقِ (কোনো প্রাণীকে প্রশিক্ষণের জন্য গুলির নিশানা বানানো)। প্রশিক্ষণের জন্য কোনো প্রাণীকে দূরে বেঁধে রেখে তাকে নিশানা বানানো এবং এভাবে কোনো প্রাণীকে হত্যা করা বৈধ নয়। কেননা কোনো প্রাণীকে খাওয়ার জন্য যবেহ করা বৈধ। কিন্তু গুলি করার দ্বারা যবেহ্ এর কাজ হয় না। বরং এটা আঘাত প্রাপ্ত অথবা পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়া অথবা ফাঁস দিয়ে হত্যা করার সমতুল্য। যা ইসলামে বৈধ নয়। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ

'শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব.) প্রত্যেক ক্ষেত্রে ইহসান (দয়া) করা ফরজ করেছেন। সুতরাং যখন তোমরা কাউকে হত্যা করবে তখন উত্তম পন্থায় হত্যা করবে। আর যখন কোনো পশুকে যবেহ করবে তখন উত্তম পন্থায় যবেহ করবে। তোমাদের সকলেই যেন অবশ্যই তার ছুরিকে ধারালো করে নেয় এবং পশুকে আরাম দেয়।' (মুসলিম ৫১৬৭; আবু দাউদ ২৮১৭; নাসায়ী ৪৪১৭; ইবনে মাজাহ ৩১৭০; তিরমিজি ১৪০৯)

এখানে আরেকটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, একাধিক পশু যবাই করার ক্ষেত্রে কোনো পশুকে অন্য পশুর সামনে যবাই না করা উচিত। এতে অন্য পশুর মনে ভীতির সঞ্চার হয়। যা এই হাদীস অনুযায়ী কাম্য নয়।

দশ : اَللَّعْبُ بِالْحَمَامِ (কবুতর নিয়ে খেলা করা)। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– رَأَى رَجُلاً يَتْبَعُ حَمَامَةً فَقَالَ شَيْطَانٌ يَتْبَعُ شَيْطَانَةً

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে দেখলেন কবুতরের পিছনে ধাওয়া করছে (কবুতর নিয়ে খেলা করছে) তখন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একটা পুরুষ শয়তান একটা স্ত্রী শয়তানের পিছু নিয়েছে।' (আবু দাউদ ৪৯৪২; ইবনে মাজাহ ৩৭৬৫)

এগার : نِكَاحُ الشِّغَارِ (নিকাহে শিগার)। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الْآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْس بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ

'ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিকাহে শিগার থেকে নিষেধ করেছেন, নিকাহে শিগার হচ্ছে কোনো ব্যক্তি তার নিজের মেয়েকে অন্যের কাছে বিয়ে দিল এই শর্তে যে, সেও তার মেয়েকে ঐ ব্যক্তির কাছে বিয়ে দিবে এবং এটাই পরস্পরের মোহর হিসেবে গণ্য হবে। ভিন্ন কোনো মোহর আদায় করা হবে না।' (বুখারী ৫১১২; মুসলিম ৩৫৩০)

বার : التَّزَوُّجُ مِنْ وَلَائِد أَهْلِ الْكِتَابِ(আহলে কিতাবদের মেয়ে বিয়ে করা)। আহলে কিতাব তথা ইয়াহুদী খৃষ্টানদের মেয়ে বিয়ে করা। কেননা বিয়ে করার জন্য সাধারণ শক্তি সামর্থ থাকলে মুমিন নারীদের বিয়ে করতে বলা হয়েছে। তা না পারলে দাসী নারীদের বিয়ে করতে বলা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

'আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি স্বাধীন মুসলিম নারীকে বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে না, সে তোমাদের অধিকারভুক্ত মুসলিম ক্রীতদাসীদের বিয়ে করবে।' (নিসা ৪:২৫) এ আয়াতে বলা হয়েছে, মুমিন নারীকে বিয়ে করতে না পারলে মুমিন কৃতদাসীদের বিয়ে করার জন্য। তাই আহলে কিতাবদের নারীদের বিয়ে করা যাবে না।

তের : تَعْلِيْقُ التَّمَائِمِ (তাবীজ ঝুলানো)। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ إِلَيْهِ رَهْطٌ فَبَايَعَ تِسْعَةً وَأَمْسَكَ عَنْ وَاحِد فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ بَايَعْتَ تِسْعَةً وَتَرَكْتَ هَذَا قَالَ إِنَّ عَلَيْهِ تَمِيمَةً فَأَدْخَلَ يَدَهُ فَقَطَعَهَا فَبَايَعَهُ وَقَالَ مَنْ عَلَّقَ تَمِيمَةً فَقَدْ أَشْرَكَ

'উকবা ইবনে আমর আল জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট দশ জনের একটি দল আসলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নয় জনের বাইয়াত নিলেন কিন্তু একজনের বাইয়াত নেওয়া থেকে বিরত রইলেন। সাহাবাগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসুল! আপনি নয়জনের বাইয়াত নিলেন কিন্তু এই লোকটিকে কেনো বর্জন করলেন? রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, নিশ্চয়ই তার কাছে তাবিজ আছে। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে হাত ঢুকিয়ে তাবিজটি ছিড়ে ফেললো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বাইয়াত নিলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সে অবশ্যই শিরক করলো।' (আহমদ ১৭৩২২) অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ زَيْنَبَ امْرَأَة عَبْد اللَّه قَالَتْ كَانَ عَبْدُ اللَّه إِذَا جَاءَ مِنْ حَاجَة فَانْتَهَى إِلَى الْبَاب تَنَحْنَحَ وَبَزَقَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَهْجُمَ مِنَّا عَلَى شَيْءٍ يَكْرَهُهُ قَالَتْ وَإِنَّهُ جَاءَ ذَاتَ يَوْمٍ فَتَنَحْنَحَ قَالَتْ وَعِنْدِي عَجُوزٌ تَرْقِينِي مِنْ الْحُمْرَة فَأَدْخَلْتُهَا تَحْتَ السَّرِير فَدَخَلَ فَجَلَسَ إِلَى جَنْبِي فَرَأَى فِي عُنُقِي خَيْطًا قَالَ مَا هَذَا الْخَيْطُ قَالَتْ قُلْتُ خَيْطٌ أُرْقِيَ لِي فِيه قَالَتْ فَأَخَذَهُ فَقَطَعَهُ ثُمَّ قَالَ إِنَّ آلَ عَبْد اللَّه لَأَغْنِيَاءُ عَنْ الشِّرْك سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ قَالَتْ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَقُولُ هَذَا وَقَدْ كَانَتْ عَيْنِي تَقْذِفُ فَكُنْتُ أَخْتَلِفُ إِلَى فُلَان الْيَهُودِيِّ يَرْقِيهَا وَكَانَ إِذَا رَقَاهَا سَكَنَتْ قَالَ إِنَّمَا ذَلِكَ عَمَلُ الشَّيْطَان كَانَ يَنْخُسُهَا بِيَده فَإِذَا رَقَيْتِهَا كَفَّ عَنْهَا إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيك أَنْ تَقُولِي كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا

'আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের স্ত্রী যয়নব থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদের অভ্যাস ছিল এই, তিনি যখন বাহির থেকে আসতেন

দরজার কাছে এসে গলা পরিষ্কার করার আওয়াজ দিতেন এবং থু-থু ফেলতেন। যাতে তিনি আমাকে কোনো অপছন্দীয় অবস্থায় না দেখেন। এ রকমই একদিন তিনি দরজার কাছে এসে গলায় আওয়াজ দিলেন। তখন আমার কাছে একজন বৃদ্ধা মহিলা ছিল। যে আমাকে সংক্রামক ব্যাধি থেকে ঝাঁড়-ফুঁক করছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদের কণ্ঠ শুনে আমি বৃদ্ধা মহিলাকে খাটের নিচে লুকিয়ে ফেললাম। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ঘরে প্রবেশ করে আমার পার্শ্বে বসলেন এবং আমার গলায় সুতা দেখতে পেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি? আমি বললাম, এটি একটি সুতা যাতে আমার জন্য ঝাঁড়-ফুঁক করা হয়েছে। একথা শুনা মাত্র আব্দুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা.) তা ছিড়ে ফেললেন এবং বললেন, আব্দুল্লাহর পরিবার এসকল শিরক থেকে অমুক্ষাপেখী। আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি নিশ্চয়ই ঝাঁড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজ ও সুতা-দাগা শিরক। আমি বললাম, তুমি এ কথা বলছ, অথচ আমার চোখে ব্যাথা হতো বা চোখ দিয়ে পানি ঝরতো, সে কারণে অমুক ইয়াহুদীর কাছে আসা যাওয়া করি এবং সে আমাকে ঝাঁড়-ফুঁক করতো। যখন সে ঝাঁড়-ফুঁক করে তখন চোখ ঠান্ডা হয়ে যায়। একথা শুনে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বললেন, এটি একটি শয়তানের কাজ। শয়তান তার হাত দিয়ে খোঁচাতে থাকে যখন সে ঝাঁড়-ফুঁক করে তখন থেমে থাকে। নিশ্চয়ই তোমার জন্য ঐ কথাগুলোই বলা যথেষ্ট ছিল যা রাসুলুল্লাহ বলেছিল– أَذْهِبْ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ اشْفِ أَنْتَ الشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاؤُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقَمًا 'বিপদ দূর করে দাও হে মানুষের রব! শিফা দান করো, নিশ্চয়ই তুমি শিফা দানকারী। তোমার শিফা ব্যতিত আর কোনো শিফা নেই। এমন শিফা দান করো, যার পর আর কোনো অসুস্থতা থাকে না।' (আহমদ ৩৬৫১)

চৌদ্দ : اَلنَّظْرَةُ الثَّانِيَةُ (দ্বিতীয় বার দৃষ্টি ফিরানো)। কোনো বেগানা নারীর প্রতি যদি হঠাৎ দৃষ্টি পড়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি অনত্র ফিরিয়ে নেয় তাহলে সে জন্য সে গুনাহগার হবে না। কিন্তু যদি দৃষ্টি স্থীর করে রাখে অথবা পূর্ণবার তাকায় তাহলে সে গুনাহগার হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে– عَنِ بُرَيْدَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– لِعَلِيٍّ يَا عَلِيُّ لاَ تُتْبِعِ النَّظْرَةَ النَّظْرَةَ فَإِنَّ لَكَ الأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَةُ 'বুরাইদা (রা.) থেকে

বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলী (রা.) কে বললেন, হে আলী! দৃষ্টির পরে দৃষ্টি করো না। নিশ্চয়ই প্রথমটি তোমার দ্বিতীয়টি তোমার নয় (অর্থাৎ একবার যখন দৃষ্টি পড়ে গেল এবং সে বুঝতে পারল যে এটি একটি বেগানা মহিলা তখন তাকে সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতে হবে। এতে যতটুকু সে দেখে ফেলেছে সে জন্য গুনাহগার হবে না। কিন্তু তার পরে যদি পূর্ণবার তাকায় অথবা প্রথমবার নজর পড়ার পরে তাকিয়েই থাকে তাহলে অবশ্যই সে গুনাহগার হবে।' (আবু দাউদ ২৪৫১; তিরমিজি ২৭৭৭;)

পনের : حُضُوْرُ اللَّعْبِ أَوِ الْبَاطِلِ (খেলাধুলা ও বেহুদা কাজে অংশগ্রহণ করা)। আল্লাহ (সুব.) মানব জাতিকে সৃষ্টি করেছেন ইবাদত করার জন্য। খেলাধুলা ও বেহুদা সময় নষ্ট করার জন্য নয়। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ

'তোমরা কি ধারণা করো যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে ফিরে আসবে না?' (মুমিনূন ২৩:১১৫)
হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

'আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, মানুষের প্রতি আল্লাহর দুটি গুরুত্বপূর্ণ নেয়ামত রয়েছে। অথচ মানুষ ঐ দুটি নেয়ামতের ব্যাপারে একেবারেই উদাসীন। একটি হলো সুস্থতা আরেকটি হলো অবসর।' (বুখারী ৬৪১২; তিরমিজি ২৩০৪; ইবনে মাজাহ ৪১৭০)
খেলাধূলায় অংশগ্রহণ করার মাধ্যমে এই গুরুত্বপূর্ণ দুটি নেয়ামতকে শুধু অবজ্ঞাই করা হয় না। বরং এর মাধ্যমে অনেক গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতও ছুটে যায় এবং এর মাধ্যমে শয়তান একজন মানুষকে চিরস্থায়ীভাবে দ্বীন থেকে সরিয়ে দেয়।

ষোল : اَلشِّعْرُ الْمَهْجُوْرُ (মন্দ কবিতা পাঠ করা)। কবিতা সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি হলো ভালোগুলো প্রশংসীত ও গ্রহণযোগ্য। আর

মন্দগুলো বর্জনীয়। কবিরা বেশিরভাগ কল্পকথা বলে। এ কারণেই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন–

وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُبِينٌ

'আমি রাসুলকে কবিতা শিক্ষা দেইনি এবং তা তার জন্য শোভনীয়ও নয়। এটা তো এক উপদেশ ও প্রকাশ্য কোরআন।' (ইয়াসীন ৩৬:৬৯) এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, কবিতা ভালো হলেও ভালো মানুষের জন্য শোভণীয় নয়। পবিত্র কুরআনের আরেকটি আয়াতে কবিদের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ – أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ – وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ

'বিভ্রান্ত লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে। তুমি কি দেখ না যে, তারা প্রতি ময়দানেই উদভ্রান্ত হয়ে ফিরে? এবং এমন কথা বলে, যা তারা করে না।' (শুআরা ২৬:২২৪-২২৬) পক্ষান্তরে ভালো কবিতা ও কবিদের প্রশংসা করা হয়েছে। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ مِنَ الشِّعْرِ لَحِكْمَةً

'উবাই ইবনে কাব থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয়ই কিছু কবিতা এমন রয়েছে যা বিজ্ঞানময়।' (ইবনে মাজাহ ৩৭৫৫) এ হাদীসে কবিতার প্রশংসা করা হয়েছে। অপর হাদীসে কবিদেরও প্রশংসা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيَّ يَسْتَشْهِدُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَيَقُولُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ نَشَدْتُكَ بِاللَّهِ هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ يَا حَسَّانُ أَجِبْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ نَعَمْ

'আবু সালামা ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আওফ থেকে বর্ণিত, তিনি হাস্‌সান ইবনে সাবেতকে আবু হুরাইরা (রা.) এর নিকট স্বাক্ষ্য দানের আবেদন করে জিজ্ঞাসা করছেন। হে আবু হুরাইরা! আমি তোমাকে আল্লাহর কসম দিয়ে জিজ্ঞাসা করছি, তুমি কি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছ যে, তিনি (আমাকে উদ্দেশ্য করে) বলেছেন, হে হাস্‌সান! তুমি আল্লাহর রাসুলের পক্ষ থেকে (কাফেরদের) জবাব দাও

(অতঃপর আমার জন্য দোআ করলেন) হে আল্লাহ! তুমি তাকে রূহুল কুদুস (জিবরাইল) এর মাধ্যমে সহযোগিতা করো। আবু হুরাইরা (রা.) বললেন, হ্যাঁ! (আমি আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এই কথা বলতে শুনেছি)।' (বুখারী ৪৫৩, ৩২১২, ৬১৫২; মুসলিম ৬৫৩৯; নাসায়ী ৭১৫; আহমদ ২১৯৩৬)

রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও কবিতা আবৃত্তি করেছেন–

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبْ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبْ

'আমি সত্য নবী, মিথ্যা নবী নই। আমি আব্দুল মুত্তালিবের সন্তান।' (বুখারী ২৮৭৪; মুসলিম ৪৭১৫; বায়হাকী ১৩৬৭৫; আহমদ ১৮৪৬৮)

তাছাড়া আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কয়েকজন কবি ছিলেন যারা 'শুআরাউ রাসুলিল্লাহ' বা আল্লাহর রাসুলের কবি নামে প্রসিদ্ধ ছিল। আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হাস্‌সান ইবনে সাবেত, কাব ইবনে মালেক প্রমুখ সাহাবীগণ।

সতের : تَزَيُّنُ الْمَرْأَةِ لِغَيْرِ زَوْجِهَا (স্বামী ছাড়া অন্য কারো জন্য সাজ-সজ্জা করা)।

মহিলাদের জন্য নিজ স্বামীর সামনে সৌন্দর্য প্রদর্শন করা, সাজ-সজ্জা করা শুধু বৈধই নয় বরং উত্তম। কিন্তু স্বামী ছাড়া অন্য কারো কাছে সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করার নিমিত্তে সাজ-সজ্জা করা হারাম। বর্তমানে এক শ্রেণীর মহিলাদের প্রগতিশীলতার নামে পুরুষের মতো প্যান্ট-শার্ট পরে বিভিন্ন মার্কেটে ঘুরতে দেখা যায় এবং নিজের সৌন্দর্য প্রদর্শন করে বেড়ায়। এটি ইসলামে সম্পূর্ণভাবে হারাম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

'তোমরা গৃহাভ্যন্তরে অবস্থান করবে। মূর্খতার যুগের অনুরূপ নিজেদের প্রদর্শন করবে না।' (আহযাব ৩৩:৩৩)

শুধু তাই না বর্তমানে অনেক মহিলাদের পায়ে বিভিন্ন অলংকার পরতে দেখা যায়। এর মধ্যে কোনোটি হাঁটার সময় আওয়াজ করে। এগুলোও হারাম। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ

'তারা যেন তাদের গোপন সাজ-সজ্জা প্রকাশ করার জন্য জোরে পদচারণা না করে ।' (নূর ২৪:৩১)

অনেক মেয়েদের রাস্তা, ঘাটে, বাজারে আকর্ষণীয় কণ্ঠে কথা বলতে শুনা যায় । পর ছেলেদের মন আকৃষ্ট করাই যার একমাত্র উদ্দেশ্য । অথচ মহিলাদের এভাবে আকর্ষণীয় কণ্ঠে পর পুরুষের সাথে কথা বলা স্পষ্টভাবে নিষেধ করা হয়েছে । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا

'হে নবী পত্নীগণ! তোমরা অন্য নারীদের মতো নও; যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, তবে পরপুরুষের সাথে কোমল ও আকর্ষণীয় ভঙ্গিতে কথা বলো না, ফলে সেই ব্যক্তি কুবাসনা করে, যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে । তোমরা সঙ্গত কথাবার্তা বলবে ।' (আহযাব ৩৩:৩২)

আঠার : امْتِنَاعُ الْمَرْأَةِ عَنْ زَوْجِهَا (মহিলাদের স্বামীর ডাকে সাড়া না দেওয়া) । হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো মহিলা যদি স্বামীর বিছানা থেকে আলাদা হয়ে রাত্রী যাপন করে মালায়েকারা (ফেরেশতারা) সে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার ওপর লা'নত করতে থাকে ।' (বুখারী ৫১৯৪; আহমদ ৯০১৩)

ইসলামে স্বামীর গুরুত্ব অপরিসীম । তাই স্বামী যদি স্ত্রীকে আহবান করে, বিশেষ করে সহবাসের জন্য তাহলে অবশ্যই সাড়া দিতে হবে । অবশ্য যদি নাপাক থাকে অথবা বিশেষ কোনো সমস্যা থাকে তাহলে স্বামীকে জানিয়ে দিবে । স্বামীর সাথে রাগ করে বা গোস্বা করে আলাদা বিছানায় থাকলে অথবা স্বামীর ডাকে সাড়া না দিলে তার ওপর লা'নত বর্ষিত হতে থাকবে । স্বামীর গুরুত্ব সম্পর্কে আরেকটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لِأَحَدٍ لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যদি আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে সেজদা করার জন্য আদেশ করতাম তাহলে মহিলাদের হুকুম করতাম যাতে তারা তাদের স্বামীকে সেজদা করে ।' (তিরমিজি ১১৫৯)

উনিশ : بَيْعُ الصَّنَمِ (মূর্তি তৈরি করা, বিক্রি করা, সংরক্ষণ করা ও পাহাড়াদারি করা) ।

মূর্তি পূজা ইসলামে সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ । সকল নবীরা মূর্তি ভেঙ্গেছেন । ইব্রাহিম (আ.) মূর্তি ভেঙ্গেছেন । আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা বিজয়ের পরে সর্বপ্রথম মূর্তি ভেঙেছেন । যে নবী মূর্তি ভাঙার কারণে আগুনে নিক্ষেপিত হলেন সেই নবী ইব্রাহিম (আ.) আল্লাহর কাছে মূর্তি পূজা করার থেকে আশ্রয় প্রার্থণা করেছেন । পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

'যখন ইব্রাহিম (আ.) বললেন, হে রব! এ শহরকে শান্তিময় করে দিন এবং আমাকে ও আমার সন্তান-সন্ততিকে মূর্তি পূজা থেকে দূরে রাখুন ।' (ইব্রাহিম ১৪:৩৫)

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আরো ইরশাদ করেছেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

'হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য-নির্ধারক শরসমূহ, এসবই শয়তানের অপবিত্র কার্য ছাড়া কিছুই নয় । অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাক যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও ।' (মায়েদা ৫:৯০)

এ আয়াতে প্রতিমা বলতে মূর্তি ও স্মৃতিসৌধ সব কিছু অন্তর্ভূক্ত । সুতরাং যারা মূর্তি তৈরি করে, সংরক্ষণ করে, মূর্তি পূজা করে তারা সকলেই মূর্তি পূজকদের অন্তর্ভূক্ত । এমনিভাবে যারা পুলিশের চাকরি নিয়ে অথবা অন্য কোনো রাজনৈতিক কারণে রাত জেগে মূর্তির পাহারাদারি করে তারাও মূর্তি পূজকদের সহায়ক বলে বিবেচিত হবে ।

বিশ : بَيْعٌ وَسَلَفٌ (কোনো কিছু বিক্রি করা এবং সাথে সাথে তার কাছে কোনো কিছু ধার চাওয়া) ।

একই আকদের ভিতরে বেচা-কেনা করা আবার অন্য কোনো আকদ ঢুকিয়ে দেওয়া নিষেধ। যেমন : কেউ কোনো কিছু বিক্রি করলো এবং শর্তারোপ করলো যে, আমি তোমার কাছে অমুক জিনিসটি দশ হাজার টাকা দিয়ে বিক্রি করলাম তবে শর্ত হলো তুমি আমাকে এত পরিমাণ টাকা ধার দিবে। এ ধরনের বেচা-কেনা জায়েজ নেই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– نَهَى عَنْ بَيْعٍ وَسَلَفٍ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ فِى صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ وَعَنْ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

'আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেচা-কেনা ও অগ্রীম কিছু শর্তারোপ করাকে নিষেধ করেছেন। আরও দুই ধরনের বেচা-কেনা করাকে নিষেধ করেছেন। প্রথম হলো একই আকদের মাধ্যমে দুইটা লেনদেন করা। দ্বিতীয় হলো নিজের কাছে যা নেই তা বিক্রি করা।' (বায়হাকী ১১১৯৭; আহমদ ৬৬২৮)

একুশ : ضَرْبُ الْوَجْهِ (মুখমণ্ডলে প্রহার করা)।

কাউকে শাস্তি দিতে চাইলে দেওয়া যেতে পারে। তবে চেহারায় আঘাত করা যাবে না। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– وَفِى حَدِيثِ ابْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبِ الْوَجْهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যখন তোমাদের কেউ তার অপর ভাইয়ের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তখন যেন চেহারায় আঘাত করা থেকে বিরত থাকে। কেননা আল্লাহ (সুব.) আদমকে তাঁর নিজ সুরতে সৃষ্টি করেছেন।' (মুসলিম ৬৮২১; আবু দাউদ ৪৪৯৫; আহমদ ৫৯৯১)

বাইশ : اَلنَّظْرُ إِلَى الْعَوْرَةِ (সতরের দিকে তাকানো)। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ لاَ يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلاَ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

'আবু সাইদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো পুরুষের সতরের দিকে এবং কোনো নারী কোনো নারীর সতরের দিকে তাকাবে না।' (মুসলিম ৭৯৪; তিরমিজি ২৭৯৩; ইবনে মাজাহ ৬৬১; আহমদ ১১৬০১)

তেইশ : اَلْخَلْوَةُ بِالْأَجْنَبِيَّةِ (বেগানা নারীর সাথে নির্জনে একত্র হওয়া)।

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ لَا يَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ ثَالِثُهُمَا

'ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো পুরুষ যখন কোনো নারীর সাথে নির্জনে একত্র হয় তখন অবশ্যই তাদের উভয়জনের সাথে তৃতীয় জন্য হয় শয়তান (অর্থাৎ তাদের সাথে শয়তান যুক্ত হয়ে যায়)।' (তিরমিজি ১১৭১; আহমদ ১১৪)

অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ وَلَا تُسَافِرَنَّ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَحْرَمٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اُكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا وَخَرَجَتْ امْرَأَتِي حَاجَّةً قَالَ اذْهَبْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ

'ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, কোনো পুরুষ কোনো মহিলার সাথে যেন নির্জনে একত্র না হয়। কোনো মহিলা যেন মাহরাম ব্যতিত সফর না করে। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসুল! আমার নাম অমুক অমুক যুদ্ধে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। অপর দিকে আমার স্ত্রী হজ্জের উদ্দেশ্যে (মাহরাম বিহীন) বের হয়ে গেছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যাও! তুমি তোমার স্ত্রীর সাথে হজ্জ করো।' (বুখারী ৩০০৬)

এ হাদীস থেকে বুঝা গেল যে, মাহরাম বিহীন মহিলাদের জন্য সফর করা কত মারাত্মক অন্যায়। জিহাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ আমল বাদ দিয়ে স্ত্রীর মাহরাম হিসেবে হজ্জে গমন করার জন্য পাঠিয়ে দিলেন।

চব্বিশ : اَلْأَكْلُ بِالشِّمَالِ (বাম হাতে খাবার খাওয়া)। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে−

عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ −صلى الله عليه وسلم− قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِه وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِه فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِه وَيَشْرَبُ بِشِمَالِه

'ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের যে কেউ খানা খাবে সে যেন অবশ্যই ডান হাতে খায়। আর যখন পান করবে তখন যেন অবশ্যই ডান হাতে পান করে। কেননা শয়তান বাম হাতে পানাহার করে।' (মুসলিম ৫৩৮৪; আবু দাউদ ৩৭৭৮; তিরমিজি ১৭৯৯; ইবনে মাজাহ ৩২৬৬)

পঁচিশ : اَلتَّثَاؤُبُ فِي الصَّلَاةِ (সালাতের মধ্যে হাঁই তোলা)।

হাঁই তোলা পছন্দনীয় নয়। কেননা এটা অলসতা ও উদাসীনতা থেকে তৈরি হয় যা শয়তানের কাজ। তাই হাঁই তোলার ভাব দেখা দিলে যথাসাধ্য বন্ধ রাখার চেষ্টা করবে। তা না পারলে মুখে হাত রাখবে। বিশেষ করে যদি সালাতের ভেতরে হাঁই তোলার ভাব তৈরি হয় তাহলে অবশ্যই তা বন্ধ করার চেষ্টা করবে। না পারলে মুখে হাত রাখবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে−

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْعُطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُ مَا اسْتَطَاعَ وَلاَ يَقُلْ هَاهْ هَاهْ فَإِنَّمَا ذَلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ يَضْحَكُ مِنْهُ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ (সুব.) হাঁচি দেওয়া পছন্দ করেন। হাঁই তোলা অপছন্দ করেন। সুতরাং যদি কারো হাঁই তোলার প্রয়োজন হয় সে যেন অবশ্যই সেটাকে যথাসাধ্য প্রতিহত করার চেষ্টা করে। মুখ খুলে 'হা-হা' অথবা 'আ-আ' করবে না। কেননা হাঁই তোলার উৎস শয়তান। শয়তান এতে হাসা-হাসি করে।' (আবু দাউদ ৫০৩০)

সালাতের ভিতরে হাঁই তোলা প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে−

عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ −صلى الله عليه وسلم− إِذَا تَثَاوَبَ أَحَدُكُمْ فِى الصَّلاَةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ

'আবু সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি সালাতের ভিতরে হাঁই তোলে তখন যেন অবশ্যই সাধ্যানুযায়ী তা বন্ধ করার চেষ্টা করে। কেননা হাঁই তোলা অবস্থায় শয়তান প্রবেশ করে।' (মুসলিম ৭৬৮৫)

যদি কোনোভাবে বন্ধ করা না যায় তাহলে মুখে হাত রাখতে হবে এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে−

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْعَطَاسَ وَيَكْرَهُ التَّثَاؤُبَ فَإِذَا تَثَاءَبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ أَوْ لِيَضَعَ يَدَهُ عَلَىْ فِيْهِ فَإِنَّهُ إِذَا تَثَاءَبَ فَقَالَ : آهْ فَإِنَّمَا هُوَ الشَّيْطَانُ يَضْحَكُ مِنْ جَوْفِه

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই হাঁচি আল্লাহর কাছে প্রিয়। হাঁই তোলা অপছন্দনীয়। সুতরাং যদি তোমাদের কারো হাঁই আসে তবে সে অবশ্যই যথাসাধ্য বন্ধ রাখার চেষ্টা করবে অথবা মুখে হাত রাখবে। কেননা যখন হাই তোলে ও 'আ-আ' বলে তখন মনে করতে হবে শয়তান তার পেটের ভেতরে গিয়ে হাসছে।' (ইবনে হিব্বান ২৩৫৮)

ছাব্বিশ : اَلْحَلْفُ بِالْآبَاءِ وَالْكَعْبَةِ (বাপ-দাদা, ছেলে-সন্তান, কাবা ইত্যাদির নামে কসম করা)।

আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নামে কসম করা জায়েজ নেই। কেননা যে জিনিসের নামে কসম করা হয় তাকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। অথচ আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোনো কিছুকে সর্বাধিক গুরুত্ব ও সম্মান প্রদর্শণ করা জায়েজ নেই। তাই পিতা-মাতা, পূর্বপুরুষ, ছেলে-মেয়ে, সন্তানাদি, কাবা, মসজিদ, কুরআন, কারো হায়াত অর্থাৎ এক কথায় কোনো গায়রুল্লার নামে কসম করা জায়েজ নেই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে−

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ −صلى الله عليه وسلم− لاَ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ وَلاَ بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلاَ بِالأَنْدَادِ وَلاَ تَحْلِفُوا إِلاَّ بِاللَّهِ وَلاَ تَحْلِفُوا بِاللَّهِ إِلاَّ وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা পিতা-মাতা ও পূর্বপুরুষের নামে কসম করো না। আর না কাউকে আল্লাহর সমকক্ষ বানিয়ে কসম করবে। আল্লাহ ব্যতিত

কারো নামে কসম করবে না। আর আল্লাহর নামে কসম করলে অবশ্যই সত্য কসম করবে। মিথ্যা কসম করবে না।' (আবু দাউদ ৩২৫০; নাসায়ী ৩৭৭৮)

সাতাইশ : سُوْمُ الرَّجُلِ عَلَىْ سُوْمِ أَخِيْه، وَخُطْبَته عَلَــىْ خُطْبَــة أَخِيْــه (কারো প্রস্তাব চলাকালীন অবস্থায় প্রস্তাব করা)।

কোনো কিছু বেচা-কেনার ক্ষেত্রে কেউ কোনো প্রস্তাব করলে তার সাথে ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত অন্য কেউ প্রস্তাব করবে না। এমনিভাবে বিবাহের ক্ষেত্রে কেউ কোনো ছেলে বা মেয়েকে প্রস্তাব করলে তার সাথে চূড়ান্ত ফয়সালা না হওয়া পর্যন্ত অন্য কোনো ছেলে বা মেয়ে প্রস্তাব করবে না। কেননা এটা একদিকে শিষ্টাচার পরিপন্থী কাজ অপরদিকে কুরআন-সুন্নাহরও পরিপন্থী কাজ। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ لاَ يَخْطُبُ الرَّجُلُ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ وَلاَ يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কোনো ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের ওপর প্রস্তাব করবে না। এমনিভাবে কোনো ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের দরদাম চলাকালীন দাম বলবে না।' (মুসলিম ৩৫০৮; আহমদ ১০৮৪৯)

আঠাইশ : قُعُوْدُ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِد وَهُوَ جُنُــبٌ (জুনুবী অবস্থায় মসজিদে বসা)।

জুনুবী অর্থাৎ গোসল ফরজ হওয়া অবস্থায় মসজিদে অবস্থান করা জায়েজ নেই। কেননা এটা মসজিদের তা'জীম ও মর্যাদার পরিপন্থী কাজ। আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেন–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا

'হে ঈমাণদারগণ! তোমরা যখন নেশাগ্রস্ত থাক, তখন সালাতের ধারে-কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না বুঝতে সক্ষম হও যা কিছু তোমরা বলছ, আর (সালাতের কাছে যেও না) ফরয গোসলের আবস্থায়ও যতক্ষণ না গোসল করে নাও তবে পথ অতিক্রম করার কথা (মুসাফিরের কথা) স্বতন্ত্র।' (নিসা ৪:৪৩)

উনত্রিশ : اتِّخَاذُ الْمَسْجِد طَرِيْقًا (মসজিদকে রাস্তা বানানো)।

মসজিদ ইবাদতের জন্য নির্ধারিত। একে রাস্তা হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এটা মসজিদের আদব। তবে যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তাহলে মসজিদে ঢুকে দু'রাকাআত সালাত আদায় করে তারপরে অন্য দিক দিয়ে বের হলে অসুবিধা নেই। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ السَّلَمِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلَ أَحَــدُكُمْ الْمَسْجِدَ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ

'আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যখন তোমাদের কোনো ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করবে তখন অবশ্যই বসার পূর্বে দু'রাকাআ'ত সালাত আদায় করবে।' (বুখারী ৪৪৪; মুসলিম ১৬৮৭; নাসায়ী ৭২৯; তিরমিজি ৩১৬; ইবনে মাজাহ ১০১২)

ত্রিশ : مُبَاشَرَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَــائِضٌ بِــدُوْن ثَــوْب (মহিলাদের সাথে হায়েজ-নেফাস অবস্থায় কোনো কাপড় ছাড়া মেলামেশা করা)।

হায়েজ ও নেফাস অবস্থায় মহিলারা নাপাক থাকে। এ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা জায়েজ নেই। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُــوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّــهَ يُحِــبُّ التَّــوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

'আর তারা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা অশুচি। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তম রূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন করো তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদের হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদের পছন্দ করেন। (বাকারা ২:২২২)

এ আয়াতে হায়েজ অবস্থায় স্ত্রী ব্যবহার করা থেকে নিষেধ করা হয়েছে। তবে যদি একান্ত প্রয়োজন হয় তাহলে কাপড়ের ওপর দিয়ে ব্যবহার করতে পারে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ مَيْمُونَةَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُبَاشِرَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ أَمَرَهَا فَاتَّزَرَتْ وَهِيَ حَائِضٌ

'মায়মুনা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তার স্ত্রীদের থেকে কারো সাথে মেলামেশা করতে চাইতেন তখন সে হায়েজ অবস্থায় থাকলে তাকে লুঙ্গি বা চাদর বেঁধে নিতে বলতেন।' (বুখারী ৩০৩)

একত্রিশ : اَلْكَلَامُ أَوِ الْعَبْثُ يَوْمَ الْجُمْعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ (জুমুআর দিন খুতবা চলা অবস্থায় কথা বলা বা বেহুদা কাজে লিপ্ত থাকা)। জুমুআর দিন মসজিদের খুতবা চলা অবস্থায় কোনো প্রকার কথা-বার্তা বলা, খেলাধুলা করা বিশেষ করে বর্তমানে মোবাইল নিয়ে টেপা-টেপি করা, ছবি তোলা, গেমস খেলা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এমনকি কেউ যদি কথা বলে আর তাকে কেউ বলে 'চুপ করো!' তাহলে সেও কথা বলার গুনাহে গুনাহগার হবে। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বলা হয়েছে–

عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِتْ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْتَ

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ইমামের খুতবা চলাকালীন সময় তুমি যদি তোমার সাথীকে বল। চুপ করো! তাহলে অবশ্যই তুমি অন্যায় কাজ করলে।' (বুখারী ৯৩৪; মুসলিম ২০০২; আবু দাউদ ১১১৪; নাসায়ী ১৪০০)

এ হাদীস থেকে বুঝা যায় বিষয়টি কত গুরুত্বপূর্ণ। যেখানে সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধ করার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে সেখানে অন্য কোনো কাজ করাতো আরো বেশি নিষেধ হওয়া উচিত।

বত্রিশ : إِحْرَاقُ شَيْءٍ مِنَ الْحَيَوَانِ بِالنَّارِ (কোনো প্রাণীকে আগুনে পুড়িয়ে মারা)। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فِى سَفَرٍ ...وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ قُلْنَا نَحْنُ قَالَ إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ

'আব্দুর রহমান ইবনে আব্দুল্লাহ (রা.) তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন, আমরা এক সফরে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছিলাম। তিনি একটি পিপড়ের টিবি দেখলেন যা পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, কারা এটি পুড়িয়েছে? সাহাবাগণ উত্তর দিলেন, আমরা। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগুনের দ্বারা শুধু মাত্র আগুনের রব (আল্লাহ সুব.)ই শাস্তি দিতে পারেন।' (আবু দাউদ ২৬৭৭; আহমদ ১৬০৩৪)

তেত্রিশ : تَغْيِيرُ الْحُدُوْدِ بِغَيْرِ حَقٍّ (অন্যায়ভাবে কারো জমিনের সীমানা পরিবর্তন করা)। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِيَّاهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ

'সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফায়েল (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমান জমি অন্যায়ভাবে কেড়ে নেয়, কিয়ামতের দিন আল্লাহ (সুব.) তার ঘাড়ে সাত তবক জমি লটকিয়ে দিবেন।' (মুসলিম ৪২১৭; বুখারী ৩১৯৮)

চৌত্রিশ : اَلْقَزْعُ (বাচ্চাদের মাথার চুল কিছু অংশ রেখে বাকি অংশ কামিয়ে ফেলা)। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ الْقَزَعِ

'ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম 'কাযা' করতে নিষেধ করেছেন।' (বুখারী ৫৯২১; আবু দাউদ ৪১৯৬)

পয়ত্রিশ : بَيْعُ حَبَلِ الْحَبَلَةِ (গর্ভস্থিত বাচ্চার গর্ভের প্রসবের মেয়াদের ওপর বিক্রি করা)। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ وَكَانَ بَيْعًا يَتَبَايَعُهُ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ كَانَ الرَّجُلُ يَبْتَاعُ الْجَزُورَ إِلَى أَنْ تُنْتَجَ النَّاقَةُ ثُمَّ تُنْتَجُ الَّتِي فِي بَطْنِهَا

'আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম গর্ভস্থিত বাচ্চার গর্ভের প্রসবের মেয়াদের ওপর ভিত্তি করে

বিক্রি করতে নিষেধ করেছেন। এ এক ধরনের বিক্রয়, যা জাহিলিয়াতের যুগে প্রচলিত ছিল। কেউ এ শর্তে উটনি ক্রয় করত যে, এই উটনিটি প্রসব করবে পরে ঐ শাবক তার গর্ভ প্রসব করার পর তার মূল্য দেওয়া হবে।' (বুখারী ২১৪৩; মুসলিম ৩৮৮৩; আবু দাউদ ৩৩৮৩)

ছত্রিশ : اَلْهِجْرَانُ (মুমিনদের সাথে কথা বলা পরিত্যাগ করা)। হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هَذَا وَيُعْرِضُ هَذَا وَخَيْرُهُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ

'আবু আইয়ুব আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তির জন্য জায়েজ নেই সে তার ভাইয়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথা বন্ধ রাখবে। দু জনেরই দেখা হয় কিন্তু একজন একদিকে ফিরে যায় অপরজন আরেকদিকে ফিরে যায়। দু'জনের মধ্যে উত্তম হচ্ছে যে প্রথম সালাম দিবে।' (বুখারী ৬০৭৭; মুসলিম ৬৬৯৭; আবু দাউদ ৪৯১৩; তিরমিজি ১৯৩২)

সাইত্রিশ : اَلْاِسْتِعَانَةُ بِالْمُشْرِكِيْنَ فِي الْحَرْبِ (যুদ্ধের ময়দানে মুশরিকদের সাহায্য নেওয়া)।

ইসলামের জন্য যুদ্ধ করাকে কুরআন-সুন্নাহর পরিভাষায় জিহাদ বলা হয়। মুমিনরা সামার্থ্য অনুযায়ী শক্তি অর্জন করে আল্লাহর ওপর পূর্ণ ভরসা করে জিহাদ করবে এটাই ইসলামের শিক্ষা। সংখ্যার আধিক্যতা অথবা অস্ত্র শক্তির ওপর নির্ভর করে নয়। ইসলামের যতগুলো যুদ্ধ হয়েছে সবগুলোই তার বাস্তব প্রমাণ। হুনাইনের যুদ্ধে মুসলিম সেনাদের সংখ্যা বেশি ছিল কিন্তু সেই সংখ্যা আধিক্যতা কোনো কাজে আসে নাই। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ

'যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল, কিন্তু তা তোমাদের কোনো কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও

তোমাদের জন্য সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে।' (তাওবা ৯:২৫)

অবশ্য পরে যখন সংখ্যা আধিক্যতার গৌরব ধূলোয় মিশে গেল এবং পূর্ণ ভরসা আল্লাহর নুসরতের ওপর চলে গেল তখন ঠিকই আল্লাহ (সুব.) সাহায্য করেছেন। যা পবিত্র কুরআনের উপরোক্ত আয়াতের পরের আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে–

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

'তারপর আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা নিজের পক্ষ থেকে তাঁর রাসুল ও মুমিনদের প্রতি সান্তনা অবতীর্ণ করেন এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এটি হল কাফেরদের কর্মফল।' (তওবা ৯:২৬)

মুমিনদের সাহায্য করার জন্য আল্লাহ (সুব.) প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ

'হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে সাহায্য করো, আল্লাহ্‌ও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ়প্রতিষ্ঠা করবেন।' (মুহাম্মদ ৪৭:৭)

তাই দ্বীন কায়েমের জন্য কোনো মুশরিকদের সহযোগীতা নেওয়া উচিত নয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِىِّ –صلى الله عليه وسلم– أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– قِبَلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ الْوَبَرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُذْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَجْدَةٌ فَفَرِحَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– حِينَ رَأَوْهُ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– جِئْتُ لأَتَّبِعَكَ وَأُصِيبَ مَعَكَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ لاَ قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَتْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالشَّجَرَةِ أَدْرَكَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ –صلى الله عليه وسلم– كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ فَارْجِعْ

فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– فَانْطَلِقْ

'রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্ত্রী আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বদরের যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। যখন হাররা আল ওবারা নামক স্থানে পৌঁছলেন তখন এক ব্যক্তি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে আসলো যার বীরত্ব ও প্রচণ্ড দাপট সম্পর্কে লোকমুখে প্রসিদ্ধ ছিল। তাকে দেখে সাহাবায়ে কিরামগণ খুশি হলেন। লোকটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে বললো। আমি আপনার সঙ্গি হতে চাই এবং আপনার সঙ্গে আমি বিপদাপদের অংশীদার হতে চাই। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের ওপর ঈমান এনেছ? লোকটি বললো না। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তাহলে ভাগো! আমি কোনো মুশরিকের সাহায্য নিতে চাই না। অতঃপর সে চলে গেল। আবার যখন আমরা আশ শাজারা নামক জায়গায় এলাম লোকটি আবার রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকটে এসে প্রথম বারের মতো প্রস্তাব করলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাকে সেই আগের মতোই উত্তর দিলেন, যাও! আমি কোনো মুশরিকের সাহায্য নিতে চাই না। অতঃপর আমরা যখন বাইদা নামক জায়গায় পৌঁছলাম তখন লোকটি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে এসে আগের মতোই প্রস্তাব করলো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আগের মতোই প্রশ্ন করলেন, তুমি কি আল্লাহ এবং তাঁর রাসুলের প্রতি ঈমান রাখ। লোকটি বললো, হ্যা!। তখন রাসুলুল্লাহ বললেন, তাহলে চলো।' (মুসলিম ৪৮০৩; তিরমিজি ১৫৫৮)

আটত্রিশ : اَلْإِمَامَةُ وَ الْأَذَانُ وَ تَعْلِيمُ الْقُرْآنِ بِالْـأَجْرِ (পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ইমামতি, মুয়াজ্জেনি ও কুরআন শিক্ষা)।

কুরআন শিক্ষা দেওয়া, আযান দেওয়া, ইমামতি করা এগুলো সবই ইবাদত। আর যে কোনো ইবাদত কোনো পার্থিব উদ্দেশ্যে করা বৈধ নয়।

বরং শুধু মাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যই করতে হবে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

'আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কোরবাণী এবং আমার জীবন ও মরণ বিশ্বরব আল্লাহ্রই জন্য।' (আনআম ৬:১৬২)

একারণেই দ্বীনি ইলম পার্থিব সম্পদ উপার্জনের জন্য হাসিল করা জায়েজ নেই। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَعْنِى رِيحَهَا

'আবু হুরাইরা (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ইলম আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অর্জন করা হয়ে থাকে সে ইলম যদি পার্থিব জগতের সামান্য সম্পদ উপার্জণের উদ্দেশ্যে শিক্ষা করা হয় সে ব্যক্তি জান্নাত তো দূরের কথা জান্নাতের সুগন্ধ পর্যন্ত পাবে না।' (আবু দাউদ ৩৬৬৬; ইবনে মাজাহ ২৫২; সহীহ জামে আলবানী ৬১৫৯)

এ কারণেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

'তাদের এ ছাড়া কোনো নির্দেশ করা হয়নি যে, তারা খাঁটি মনে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্রই ইবাদত করবে।' (বাইয়িন্যাহ ৯৮:৫)

সুতরাং যে কোনো ইবাদতের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করাই উদ্দেশ্য হতে হবে। দাওয়াত, তা'লীম, খেদমত সবকিছুইর উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহ (সুব.) কে রাজি খুশি করা। পার্থিব সুবিধা অর্জন করা নয়। একারণেই পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ

'অনুসরণ করো তাদের, যারা তোমাদের কাছে কোনো বিনিময় কামনা করে না, অথচ তারা সুপথ প্রাপ্ত।' (ইয়াসীন ৩৬:২১)

নবী-রাসুলগণ ইসলামের দাওয়াত দিতে গিয়ে পার্থিব কোনো বিনিময় চাইতেন না। বরং তারা দাওয়াতের কাজ করতে গিয়ে পার্থিব স্বার্থগুলো

ত্যাগ করতেন। তারা ঘোষণা করে দিতেন, আমরা কোনো বিনিময় চাই না। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ

‘এরা এমন ছিল, যাদের আল্লাহ্ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাদের পথ অনুসরণ করুন। আপনি বলে দিন: আমি তোমাদের কাছে এর জন্য কোনো পারিশ্রমিক চাই না। এটি (কুরআন) সারা বিশ্বের জন্যে একটি উপদেশমাত্র।’ (আনআম ৬:৯০)

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اجْعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي قَالَ أَنْتَ إِمَامُهُمْ وَاقْتَدِ بِأَضْعَفِهِمْ وَاتَّخِذْ مُؤَذِّنًا لاَ يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا

‘ওসমান ইবনে আবুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আবেদন করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি আমাকে আমার এলাকার ইমাম বানিয়ে দিন। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তাদের ইমাম (অর্থাৎ তোমাকে তোমার এলাকার ইমাম বানিয়ে দেওয়া হলো)। তুমি তোমার মুসল্লিদের মধ্য থেকে দূর্বলতম ব্যক্তির প্রতি লক্ষ্য রেখে ইমামতি করবে। আর এমন একজন মুআজ্জিন নিয়োগ করবে যে তার আযানের বিনিময়ে কোনো পারিশ্রমিক নিবে না।’ (আবু দাউদ ৫৩১; নাসায়ী ৬৭১; তিরমিজি ২০৯; আহমদ ১৬২৭০)

এ কারণেই ইসলামের প্রথম দিকে খেলাফত ব্যবস্থা থাকাকালীন ইমাম, মুআজ্জিন ও কুরআনের শিক্ষকদের যাবতীয় ভরণ-পোষণের দায়িত্ব রাষ্ট্রীয় কোষাগার বায়তুল মাল থেকে বহন করা হতো। কিন্তু বর্তমানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ সকল ব্যক্তিবর্গ কিছুই লাভ করেন না। ফলে যদি তাঁরা জীবিকার অন্বেষণে চাকরী-বাকরি, ব্যাবসা-বাণিজ্য বা অন্য পেশায় আত্মনিয়োগ করেন, তবে ছেলে-মেয়েদের কোরআন শিক্ষার ধারা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যাবে। এ জন্য কোরআন শিক্ষার বিনিময়ে প্রয়োজনানুপাতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয বলে সাব্যস্ত করা হয়েছে। অনুরূপভাবে ইমামতি, আযান, হাদীস ও ফেক্বাহ শিক্ষাদান প্রভৃতি যে সব

কাজের ওপর দ্বীন ও শরীয়তের স্থায়িত্ব ও অস্তিত্ব নির্ভর করে সেগুলোকেও কোরআন শিক্ষাদানের সাথে সংযুক্ত করে প্রয়োজনমতো এগুলোর বিনিময়েও বেতন বা পারিশ্রমিক গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। (দুররে-মুখতার, শামী)

এ ব্যাপারে ইমাম ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন–

وَأَمَّا الْاسْتِئْجَارُ لِنَفْسِ الْقِرَاءَةِ وَالْإِهْدَاءُ فَلَا يَصِحُّ ذَلِكَ فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ إِنَّمَا تَنَازَعُوْا فِيْ جَوَازِ أَخْذِ الْأَجْرَةِ عَلَى تَعْلِيْمِ الْقُرْآنِ وَالْأَذَانِ وَالْإِمَامَةِ وَالْحَجِّ عَنِ الْغَيْرِ لِأَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ يَسْتَوْفِي الْمَنْفَعَةَ فَقِيْلَ يَصِحُّ لِذَلِكَ كَمَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ مِنْ مَذْهَبِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَقِيْلَ لَا يَجُوْزُ لِأَنَّ هَذِهِ الْأَعْمَالَ يَخْتَصُّ فَاعِلُهَا أَنْ يَكُوْنَ مِنْ أَهْلِ الْقُرْبَةِ فَإِنَّهَا إِنَّمَا تَصِحُّ مِنَ الْمُسْلِمِ دُوْنَ الْكَافِرِ فَلَا يَجُوْزُ إِيْقَاعُهَا إِلَّا عَلَىْ وَجْهِ التَّقَرُّبِ إِلَىْ اللهِ تَعَالَىْ وَإِذَا فَعَلَتْ بِعَرَوْضٍ لَمْ يَكُنْ فِيْهَا أَجْرٌ بِالْاتِّفَاقِ لِأَنَّ اللهَ إِنَّمَا يَقْبَلُ مِنَ الْعَمَلِ مَا أُرِيْدُ بِهِ وَجْهَ لَا مَا فَعَلَ لِأَجْلِ عَرُوْضِ الدُّنْيَا وَقِيْلَ يَجُوْزُ أَخْذُ الْأَجْرَةِ عَلَيْهَا لِلْفَقِيْرِ دُوْنَ الْغَنِيِّ وَهُوَ الْقَوْلُ الثَّالِثُ فِيْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ كَمَا أَذِنَ اللهُ لِوَلِيِّ الْيَتِيْمِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَ الْفَقْرِ وَيَسْتَغْنِيْ مَعَ الْغَنِيِّ وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْوَىْ مِنْ غَيْرِهِ عَلَىْ هَذَا فَإِذَا فَعَلَهَا الْفَقِيْرُ لِلّٰهِ وَإِنَّمَا أَخَذَ الْأَجْرَةَ لِحَاجَتِهِ إِلَىْ ذَلِكَ وَلْيَسْتَعِيْنُ بِذَلِكَ عَلَىْ طَاعَةِ اللهِ فَاللهُ يَأْجُرُهُ عَلَىْ نِيَّتِهِ فَيَكُوْنُ قَدْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ صَالِحًا

‘ইমাম ইবনে তাইমিয়্যা (র.) বলেন, শুধু তেলাওয়াত করার জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বা হাদীয়া গ্রহণ করা বৈধ নয়। এ ব্যাপারে সকলেই একমত। ওলামায়ে কিরামদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে কুরআন শিক্ষাদান, আযান, ইমামতির পারিশ্রমিক নিয়ে। একদল আলেম এটাকে জায়েজ বলেছেন। ইমাম মালেক ও ইমাম শাফেয়ীর প্রসিদ্ধ মত এটিই। আরেকদল আলেম এটিকে নাজায়েজ বলেছেন। কেননা এসকল আমল অবশ্যই এমন ব্যক্তিকে আঞ্জাম দিতে হবে যে ব্যক্তি আল্লাহর নৈকট্য অর্জনকারীদের অন্তর্ভূক্ত। অর্থাৎ মুসলিম। কাফের নয়। সুতরাং এ সকল আমল আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্যই করতে হবে। পার্থিব সম্পদ অর্জনের জন্য নয়। যদি পার্থিব উদ্দেশ্যে কেউ এসকল ইবাদত করে তাহলে সে কোনো সওয়াব পাবে না। কেননা আল্লাহ (সুব.) শুধু ঐ আমলই গ্রহণ করেন যা কেবল

মাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়। আর যে সকল আমল পার্থিব উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য করা হয়। সেগুলো আল্লাহর কাছে গৃহীত হয় না। আল্লাহ (সুব.) পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন, **وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيــــلً** ‘আর তোমরা আমার আয়াতসমূহ সামান্যমূল্যে বিক্রি করো না।’ (বাকারা ২:৪১) আবার কেউ বলেছেন, গরীব অভাবীদের জন্য বিনিময় নেওয়া জায়েজ। ধনীদের জন্য নয়। যেমনিভাবে এতিমের অভিভাবকের জন্য গরীব হলে প্রয়োজন অনুযায়ী এতিমের মাল থেকে ভোগ করতে পারে। কিন্তু ধণী হলে বিরত থাকতে হবে। এটি ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মতামত। এটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ মত। অতএব যদি গরীব হয় তাহলে প্রয়োজন মাফিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করবে। আমলের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর জন্যই আর পারিশ্রমিক নিবে নিজের প্রয়োজন মিটানোর জন্য। যাতে উক্ত আমলগুলো করতে সুবিধা হয়। তাতে আশা করা যায় আল্লাহ (সুব.) তাকে তার নিয়ত অনুযায়ী সওয়াব দান করবেন। আর সেও হালাল কামাই থেকে গ্রহণ করেছে বলে মনে করা হবে।’ (মাজমূআতুল ফাতাওয়া ইমাম ইবনে তায়মিয়্যা তৃতীয় খণ্ড ৩২ পৃষ্ঠা)

এ মতের সমর্থনে আবু বকর সিদ্দীক (রা.) এর ঘটনাটিও গুরুত্বপূর্ণ। তিনি যখন খলীফাতুল মুসলিমীন হিসেবে মনোনীত হন। তখন তাঁর ঘোষণাটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ قَالَ لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنْ مَئُونَةِ أَهْلِي وَشُغِلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ

‘আয়শা (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আবু বকর সিদ্দীক (রা.) যখন খলীফা নিযুক্ত হলেন তখন তিনি ভাষণ দিলেন যে, নিশ্চয়ই আমার জাতি এ ব্যাপারে অবগত যে, আমার পেশা আমার পরিবারের খরচ বহন করার ব্যাপারে যথেষ্ট। কিন্তু এখন আমি মুসলিম জাতির খেলাফতের দায়িত্ব পালনে মশগুল আছি। সেহেতু এখন থেকে আবু বকরের পরিবার বাইতুল মাল থেকে খাবার গ্রহণ করবে এবং মুসলিম জাতির খেদমতের পেশায় নিয়োজীত থাকবে।’ (বুখারী ২০৭০; বায়হাকী ১৩৩৮৮)

যখন ইমামতে কুবরার জন্য বায়তুল মাল থেকে প্রয়োজনীয় খরচ বহন করা বৈধ হলো তখন ইমামতে ছুগরা (মসজিদের ইমামতি) এর জন্যও প্রয়োজন মাফিক পারিশ্রমিক গ্রহণ করা বৈধ হবে। আর বাইতুল মালের অবর্তমানে সাধারণ মুসলিমদের দায়িত্ব এসব ধর্মীয় আলেমদের প্রয়োজনে সহযোগীতা করা। কেননা এসব কাজ অব্যাহত না থাকলে আস্তে আস্তে ইসলামের অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব ধ্বংস হয়ে যাবে। এ কারণেই পরবর্তী ওলামায়ে কিরামগণ ইসলামের মৌলিক কাজের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েজ বলে ফাতওয়া প্রদান করেছেন। সুতরাং এ অনুমতি এ সব বিশেষ প্রয়োজনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ রাখা একান্ত আবশ্যক।

‘তবে ঈসালে সওয়াব উপলক্ষে খতমে-কোরআনের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা সর্বসম্মতভাবে না জায়েযঃ আল্লামা শামী ‘দুররে মুখতারের শরাহ’ এবং ‘শিফাউল-আলীল’ নামক গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে এবং অকাট্য দলিলাদিসহ একথা প্রমাণ করেছেন যে, কোরআন শিক্ষাদান বা অনুরূপ অন্যান্য কাজের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণের যে অনুমতি পরবর্তীকালের ফক্বীহগণ দিয়েছেন, তার কারণ এমন এক ধর্মীয় প্রয়োজন যাতে বিচ্যুতি দেখা দিলে গোটা শরীয়তের বিধান ব্যবস্থার মূলে আঘাত আসবে। কেননা পূর্বে কোরআনের শিক্ষকমন্ডলীর জীবনযাপনের ব্যয়ভার ইসলামী বায়তুল মাল (ইসলামী ধনভান্ডার) বহন করত, কিন্তু বর্তমানে ইসলামী শাসন ব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে এ শিক্ষকমন্ডলী কিছুই লাভ করেন না। এ জন্য পারিশ্রমিকের বিনিময়ে মৃতদেহের ঈসালে-সওয়াবের উদ্দেশে কোরআন খতম করানো বা অন্য কোনো দোআ-কালাম ও অজিফা পড়ানো হারাম। কারণ, এর ওপর কোনো ধর্মীয় মৌলিক প্রয়োজন নির্ভরশীল নয়। সুতরাং যেহেতু পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন পড়া হারাম, সুতরাং যে পড়বে এবং যে পড়াবে তারা উভয়েই গোনাহগার হবে। বস্তত: যে পড়েছে সেই যখন কোনো সওয়াব পাচ্ছে না তখন মৃত আত্মার প্রতি সে কি পৌঁছাবে? কবরের পাশে কোরআন পড়ানো বা পারিশ্রমিকের বিনিময়ে কোরআন খতম করানোর রীতি সাহাবী, তাবেয়ীন এবং প্রথম যুগের উম্মতগণের দ্বারা কোথাও বর্ণিত বা প্রমাণিত নেই। সুতরাং এগুলো নিঃসন্দেহে বিদ’আত।’ (তফসীর মাআরেফুল কুরআন, বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর পৃষ্ঠা ৩৫, সুরা বাক্বারা ৪১ নং আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)